# দ্বারকানাথ ঠাকুর

বিস্মৃত পথিকৃৎ

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

# দ্বারকানাথ ঠাকুর

## বিস্মৃত পথিকৃৎ

কৃষ্ণ কৃপালনী

অনুবাদ
ক্ষিতীশ রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-2989-8

প্রথম প্রকাশ : 1984 (শক 1906)
নতুন অক্ষরবিন্যাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ : 2000 (শক 1921)

Dwarkanath Tagore *(Bangla)*
**মূল্য : 70.00 টাকা**
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

# সূচী

# ভূমিকা

১৯৫৯ অব্দের গ্রীষ্মের মরশুমে একটি রকফেলার বৃত্তির সূত্রে আমি বিভিন্ন ভাষায় বড় বড় লেখকদের পরিচয় লাভের জন্য বিলেত, যুক্তরাষ্ট্র এবং য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময় লণ্ডনের অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস ও ন্যু ইয়র্কের গ্রোভ প্রেস আমায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার কথা বলেন এবং প্রস্তাব করেন যে তাঁরা একত্রযুক্ত হয়ে একই সময়ে এ-বই প্রকাশ করবেন লণ্ডন ও ন্যু ইয়র্ক থেকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের আসন্নপ্রায় জন্মশতবার্ষিকীর (মে, ১৯৬১) পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা এই প্রস্তাব করে থাকবেন। তাঁরা নিশ্চয় ভেবে থাকবেন শতবার্ষিকীর অবসরে পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে নূতন আগ্রহের সঞ্চার হতে পারে। তাঁদের এই সাধু প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেও আমি নিজে এ-দায়িত্ব নিতে দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করেছিলাম। এ-দায়িত্ব গ্রহণ করা মানে একটি সুদীর্ঘ ও ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় ব্রতী হওয়া এবং যে-ভাষা আমার মাতৃভাষা নয়—সেই ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী সযত্ন অভিনিবেশে পুনরায় পড়ে নেওয়া। কিন্তু প্রকাশকেরা নাছোড়বান্দা, আমার একাধিক বন্ধুও জোর করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ভক্তি ও আনুগত্য এবং তাঁর বিরাট সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ই জয়ী হল, সূচনায় যে-দ্বিধা-সংকোচ দেখা দিয়েছিল—কাটিয়ে উঠলাম।

ইতিমধ্যে একটা বছর ঘুরে গেল, আমি কাজে হাত লাগালাম পরের বছর গ্রীষ্মকালে। কাজ করতে গিয়ে ক্রমাগত একটি প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। কোথা থেকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং নানা বিষয়ে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য, মূলত ইহজাগতিক অথচ বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী, সঙ্গীতে ও আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন শিল্পে ঐকান্তিক প্রীতি, ভারতে নাট্যশিল্পের পুনরুত্থানের জন্য (তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের এ-বিষয়ে অনীহা সত্ত্বেও) সক্রিয় আগ্রহ এবং প্রচলিত প্রকাশভঙ্গির সমস্ত বিধিনিষেধ ভাসিয়ে দেবার মতো সৃজনীশক্তির দুর্বার প্রবাহ? একথা অবশ্যস্বীকার্য যে কেউ কেউ সৃষ্টি-প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, প্রতিভা এমন বস্তু নয় যা বানানো যায়, তত্রাচ জন্মার্জিত উত্তরাধিকার ও পরিবেশের প্রভাব অতি বড়ো প্রতিভাধর ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারেন না। ঠাকুর-পরিবারের উত্তরাধিকারে এমন কিছু কি ছিল হঠাৎ

যা বিকশিত হয়ে উঠতে পারল অলৌকিক প্রতিভার শ্বেত শতদলের মতো?

আমার পক্ষে মেনে নেওয়া দুরূহ যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বহুবিচিত্র প্রতিভার সমারোহ সংহত হয়েছিল, সে তিনি পেয়েছিলেন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের নিস্তব্ধ নির্জন ধ্যানের আসনে সমাহিত একজন উগ্রতপা, একমনা, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মহর্ষির কাছ থেকে। যদিচ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তাঁর পিতৃদেবের পরম স্নেহভাজন শিষ্যরূপে কল্পনা করতে গৌরব বোধ করতেন, এক মন্দিরের বেদী থেকে কিংবা বক্তৃতামঞ্চের বেদী-জ্ঞানে গুরুদেবের পরিচ্ছদ ধারণ করে ধর্মোপদেশ দেবার বেলা ছাড়া, তাঁর সঙ্গে মহর্ষির কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। কেবল সাহিত্য-রচয়িতারূপে তিনি যে বহুবিচিত্র মানসের অধিকারী ছিলেন—এমন তো নয়। বাইরে থেকে তাঁর আবেগ একটু অনুত্তাপ মনে হলেও জীবনের বিচিত্র লীলার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল যেমন গভীর তেমনি দীপ্যমান। এই পৃথিবীর মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে শান্ত চোখে তিনি সবকিছু নিরীক্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু কখনো কখনো বার্ণার্ড শ'-র মতো তাঁর চোখে একটা কৌতুকের ঝিলিক খেলত চারদিকের সমস্ত ব্যাপার দেখে। যে-**গীতাঞ্জলি**-র ধর্মসঙ্গীতের জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই **গীতাঞ্জলি**-র গান রচনাকালেও তাঁর হাস্যকৌতুকের বিরাম ছিল না। আরো একটি ব্যাপার আমার নজরে এল—অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মহর্ষি তাঁর মনের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি ক্রমেই যেন হ্রাস পেতে থাকে, বাল্য বয়সের অনেক মনগড়া বিধিনিষেধ থেকে তিনি যেন ক্রমেই নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর মতামতে একটা প্রশস্ত উদারতা দেখা দিয়েছিল, মতের বিরোধকে তিনি যেন বেশি করে মেনে নিতে শিখেছিলেন, অচেনা অজানার প্রতি তাঁর ভয় বা সংশয় অনেকটা যেন কেটে গিয়েছিল, খামখেয়ালীপনাও তিনি যেন খুশি হয়ে বরদাস্ত করতে পেরেছিলেন, বিশ্বজনীন দৃষ্টি নিয়ে তিনি যেন জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলে দেখতে শিখেছিলেন।

মহর্ষি-প্রভাবের মোহিনী মায়ার আবরণ অপসারণ করে আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঠাকুর-পরিবারের পূর্বসূরীদের কেউ কি এমন ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে অন্তত অংশতও সম্ভবপর করে থাকবেন? এই সন্ধিৎসু অবস্থায় আমি যেন আচমকা ধাক্কা খেলাম দ্বারকানাথের গায়ে লেগে। কই, ঠাকুর-পরিবারের লোকেদের মুখে কিংবা বহুকাল শান্তিনিকেতনে থেকেও আমি তো এঁর নাম বড় একটা শুনিনি। হ্যাঁ, রাজা রামমোহন রায়ের কথা খুবই শোনা যেত, প্রায় দেবতাজ্ঞানে তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাও নিবেদিত হত প্রচুর। অথচ যে-ব্যক্তি আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিদ্রোহীর নিত্যসঙ্গী হয়ে, তাঁর হাতে হাত লাগিয়ে আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে কাজ করলেন, এমনকি রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর তথাকথিত অনুগত ভক্তের দল যখন নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরিহার করতে উদ্যত হল, তখন যিনি সমাজ-কে জীইয়ে রাখলেন, তিনি কেন অবজ্ঞাত উপেক্ষিত

হয়ে রইলেন? এই বিস্মৃতপ্রায় লোকটি কি তবে কুলে কালি দিয়েছিলেন বলে পরিবারের কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করে না? যে-লোকটি তাঁর জীবিতকালে এত লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হল কেন? এইসব নানা প্রশ্ন মনে উদয় হওয়াতে দ্বারকানাথ সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তারপর হঠাৎ একদিন ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে অনুরোধ এল যেন আমি সংক্ষেপে দ্বারকানাথের একটি জীবনচরিত রচনা করি। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস ও গ্রোভ প্রেস আমায় যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখতে বলেছিলেন তখন যেমন হতচকিত ও দ্বিধান্বিত বোধ করেছিলাম, এন.বি.টি.-র অনুরোধ পেয়ে আমার মনের অবস্থা হল ঠিক সেই রকম—কেবল কারণটা ছিল ভিন্ন। পৌত্রর বিষয়ে জীবনীর উপকরণ এমনই প্রচুর ও আয়ত্তগম্য যে কোনটা ফেলে কোনটা রাখি—এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পিতামহের বেলা দেখা গেল উপকরণ বড়ই স্বল্প; মনে হত এত অনিশ্চিত ও সূক্ষ্ম মালমশলার ভিত্তির উপর একটা প্রামাণ্য জীবনী কি খাড়া করা যাবে? শান্তিনিকেতনে যেটুকু উপকরণ পাওয়া গেল তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনবিভাগে মালমশলা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এক কিশোরীচাঁদ মিত্র-রচিত বিগত শতকের *Memoir*-এবং ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত টুকরো কথা ও পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ছাড়া আর বিশেষ কিছু তথ্যসামগ্রী পাওয়া গেল না। পারম্পর্য বজায় রেখে একটি জীবনচরিত লেখার মতো যথেষ্ট সামগ্রী কি এসব থেকে পাওয়া যাবে?

মনের এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৯৭৬ অব্দের মে মাসে, ডেভনশায়র-এর ডার্টিংটন হল থেকে আমন্ত্রণ এল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের আয়োজিত একটি উৎসব ও সেমিনারে যোগ দেবার জন্য। এতে করে আমার পক্ষে সম্ভবপর হল লণ্ডনে আরো পাঁচ মাস কাটিয়ে ইণ্ডিয়া অফিস ও অন্যান্য ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে তথ্যসংগ্রহের কাজ করা। সখেদে স্বীকার করতে হয় দ্বারকানাথের সমসাময়িক পুস্তক, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র (এমনকি কলকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত সামগ্রীও) সে-দেশে যেমন সযত্ন-সংরক্ষিত, সূচিভুক্ত ও সহজলভ্য, তেমনটা আমাদের নিজেদের দেশে নয়। সে যাই হোক, আমি বিলেতের সুযোগ সুবিধার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কালি কলম, ফাউণ্টেন পেন এমনকি বলপয়েণ্ট কলমের ব্যবহারও নিষিদ্ধ বলে, আমায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পেনসিলে নোট নিতে হয়েছিল। নোট নিয়েছিলাম প্রচুর—এ-জীবনচরিত মূলত সেইসব নোটের ভিত্তিতেই লেখা।

বিশেষ বেদনার সঙ্গে বলতে হয় যে এত করেও যেটুকু উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তার ভিত্তিতে একটা নিশ্চিত ধরনের জীবনকথা সংকলন করা শক্ত ছিল।

দ্বারকানাথ আসলে ছিলেন এক কর্মী পুরুষ—কাজের কাজী।[১] বিলাতে (এবং কিছু পরিমাণে ফ্রান্স ও ইতালিতেও) তিনি বিস্তর লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, কারো কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কও পাতিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজারাজড়া থেকে শুরু করে চরমপন্থী রাজনীতিকও। এইসব সম্পর্কসূত্র অবলম্বন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পারিবারিক নথিপত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা কেবল-যে বাঞ্ছনীয় এমন নয়, জীবনীকারের দিক থেকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কৃত্যবিশেষ। বিলেতে অধিকাংশ উচ্চবংশীয় বা অভিজাত পরিবারের নিজস্ব মহাফেজখানা থাকে—ভারতে তেমনটা বড় একটা দেখা যায় না। দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ১৮৪৫-৪৬ অব্দে পিতার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ বিদেশ-সফরের সঙ্গী ছিলেন, নগেন্দ্রনাথের ডায়ারিতে বিলেতের কতিপয় অভিজাত পরিবারের—ডিউক, ডাচেস, আর্ল, ব্যারনেট প্রভৃতির—তালিকা পাওয়া যায়। সহজেই অনুমেয় এইসব পরিবারের সঙ্গে দ্বারকানাথের যাওয়া-আসা, লেন-দেনের সম্বন্ধ ছিল। প্রচুর সময় ও সংস্থান থাকলে এইসব পরিবারের ওয়ারিশদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাঁদের অনুমতিক্রমে পারিবারিক মহাফেজখানায় রক্ষিত দ্বারকানাথের সমসাময়িক নথিপত্র খুঁজে পেতে দেখা হয়তো যেতে পারত। কিন্তু আমার না ছিল সময় না সংস্থান। আমার থাকা, খাওয়া, কাজকর্ম করার যাবতীয় খরচ আমার নিজের যৎসামান্য সংস্থান থেকে বহন করতে হত এবং এমন এক দেশে যেখানে জীবনযাপনের ব্যয় আমাদের দেশের তুলনায় অন্তত দশ গুণ বেশি। বিদেশী মুদ্রা থেকে যতটুকু আমার উদ্বৃত্ত ছিল তা থেকে কোনো প্রকারে নির্বাহ করা যেত থাকা, খাওয়া এবং লাইব্রেরি প্রভৃতি ঘুরে দেখার পরিবহন খরচ।

বিদেশে অনেক জায়গায় এবং বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের গবেষণা-প্রকল্পের জন্য য়ুনিভার্সিটি, ফাউণ্ডেশন বা অন্যান্য সংস্কৃতি পরিষৎ থেকে মুক্তহস্তে অনুদান দেবার ব্যবস্থা থাকে। প্রফেসর ব্লেয়র বি. ক্লিং[৩] (দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক জীবন নিয়ে তাঁর বহু পরিশ্রমসাধ্য ও চমৎকার পুস্তক—*Partner in Empire*, আমার এই জীবনী-রচনার কাজে প্রচুর সহায়তা করেছে) তাঁর সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতে জানিয়েছেন যে আমেরিকার পাঁচটি সংস্থার 'উদার বদান্যতা' তাঁর এই গবেষণা-কর্ম সম্ভবপর করেছে। আমেরিকার সংস্কৃতি-জগতের পক্ষে খুবই শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁদের দেশে সু-পরিচিত-নামা না হওয়া সত্ত্বেও জনৈক ভারতীয়কে নিয়ে একটি গবেষণা-প্রকল্পে তাঁরা এভাবে অর্থ সাহায্য করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষে ঠিক তেমনি লজ্জাকর বিষয় এই যে, আমরা দ্বারকানাথের মতো নবভারত-রচয়িতাদের মধ্যে এমন উল্লেখযোগ্য একজন পুরোধাকে অবহেলা-ভরে বিস্মৃত হয়েছি।

বর্তমান লেখকের একান্ত আশা জীবনী-হিসাবে এ বইয়ের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও এই বিস্মৃত পথিকৃৎ-এর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে এ-বই সাধারণের মধ্যে আগ্রহবৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং হয়তো কোনো উদ্যমী জিজ্ঞাসুকে এমন প্রেরণা দেবে যে তিনি কোনো

ফাউণ্ডেশন বা য়ুনিভার্সিটির সহায়তা ও আনুকূল্যে দ্বারকানাথের জীবন ও কার্য-কলাপের পূর্ণতার জ্ঞানলাভে ব্রতী হতে পারবেন। এই সুযোগে লেখক তাঁর ধন্যবাদ জানাতে চান ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-কে, কারণ তাঁদের প্ররোচনায় এই প্রাথমিক অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয়েছিল এবং জীবনীরচনার ক্ষেত্রে এই নিতান্ত পরীক্ষামূলক পরিভ্রমণের ফলাফল প্রকাশ তাঁরাই সম্ভবপর করলেন।

**কৃষ্ণ কৃপালনী**

## টীকা

১। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর *Memoir of Dwarkanath Tagore* ডেভিড হেয়ারের স্মারণিক বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৭০ অব্দে লিখিত-বক্তৃতারূপে পাঠ করেন। পুস্তকাকারে মুদ্রণের পূর্বে সে-রচনা তিনি কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু সে করেছিলেন বক্তৃতার কাঠামোর মধ্যেই। তার ফলে *Memoir* পূর্ণাঙ্গ জীবনী হয়ে উঠতে পারেনি; দ্বারকানাথের জীবন ও কার্যকলাপের টুকিটাকি অসম্বন্ধ অংশ তিনি যেন একত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের জীবনী-রচনায় তিনিই প্রথম পথিকৃৎ—সে হিসাবে *Memoir* খুবই মূল্যবান রচনা। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটিমাত্র যে কপি ছিল এ-বইয়ের, সযত্ন সংরক্ষণের অভাবে তার অবস্থা ছিল খুবই জীর্ণদশাগ্রস্ত। লেখকের বিশেষ অনুরোধে ন্যাশনাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সে-কপি নয়াদিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভস-এ পাঠিয়ে মেরামতি ও বাঁধাই করিয়ে আনবার পর লেখক সে-বই ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করেন। তার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় ছেঁড়া বইখানি নাড়াচাড়া করতে চান নি।

২। লণ্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত 'কোট অব আর্মস' অথবা কুল-পরিচয় চিহ্নের তলায় যে সংকল্পবাক্যটি লেখা আছে তাতে বলা হয়েছে Work Will Win 'কাজের হবে জয়।' অক্লান্তকর্মা দ্বারকানাথ তাঁর কাজের পুরস্কাররূপে জীবনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, অর্থবিত্তও অর্জন করেছিলেন বিস্তর, কিন্তু আখেরে তাঁর কর্মফল স্থায়ী হয় নি, কাজকারবার ফেল পড়ায় একপ্রকার পরাজয়ই ঘটেছিল তাঁর। পৌত্র রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পিতামহের সংকল্পবাক্যের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ করে বলতে পারতেন—'কথার হবে জয়'। কথার বেসাতি করে তিনি জয়ী হয়েছিলেন, সাফল্যলাভ করেছিলেন, যশোলাভও করেছিলেন। কথা তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় করেছে।

৩। প্রফেসর ব্লেয়র বি ক্লিং বর্তমানে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস-বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। ১৯৮১ অব্দের ৩০ জুন তারিখে লেখককে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'আপনার রচিত দ্বারকানাথ-জীবনী কিছুকাল আগেই আমার হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বই পাবার সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ না জানিয়ে আগে আমি বইটি পড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। আপনার লেখা রবীন্দ্র-জীবনচরিতের মতো এ-বইটিও ভাবি সুপাঠ্য হয়েছে, লেখার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের একটা সত্যকার দরদ আছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দ্বারকানাথের কাজ-কারবার আমি হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরে থাকব, কিন্তু আপনি সমগ্র মানুষটিকে যেন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। আমার বইখানা লেখবার আগে যদি আপনার বই হাতে পেতাম খুব ভালো হত। আমার বিষয়ে ও আমার বইয়ের বিষয়ে আপনি যে-সব সস্নেহ উল্লেখ করেছেন—তাও আমার খুব ভালো লেগেছে।...'

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লেখক তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টকে যাঁদের প্রবর্তনা নাছোড়বান্দা তাগিদ ও সহৃদয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ-বই প্রকাশ হত না; লণ্ডনের ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ১৯৭৬ অব্দে তাঁর গবেষণাকর্মে উপদেশ ও সহায়তা দানের জন্য; ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর এবং তাঁদের সহকর্মিবৃন্দকে; এডিনবরার পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান এবং সিটি কাউন্সিলের অভিলেখাগারের রক্ষককে; কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টরকে; কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্-এর তত্ত্বধায়কদের ও তাঁদের সহকর্মিবৃন্দকে; কলকাতা জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষকে এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রসদনের কর্মিবৃন্দকে। সহৃদয় কৃতজ্ঞতা লেখকের ব্যক্তিগত বন্ধুবৃন্দের প্রতিও—তাঁদের মধ্যে আছেন শান্তিনিকেতনের শ্রী পুলিনবিহারী সেন, শ্রী ক্ষিতীশ রায়, শ্রী মনোরঞ্জন গুহ ও শ্রী শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়; কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট-এর সস্ত্রীক সোমেন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভূতপূর্ব ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক প্রফেসর অমলেন্দু বসু, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী অধুনা পারী নিবাসিনী মাদাম কৃষ্ণা রিবু, কলকাতার শ্রী সুভো ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও অধুনা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ওকল্যাণ্ড য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রী অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাথুরিয়াঘাটার রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও অধুনা জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী সন্দীপ ঠাকুর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

# ইতি উচ্যতে

বাংলাদেশের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ পরিবাবের মতো ঠাকুর পরিবারের বংশবৃত্তান্তও অতিকথা-উপকথা-আশ্রিত। গল্পরূপে মনোজ্ঞ হলেও তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। পৃথিবীর সর্বদেশেই পুরাণ থেকে ইতিহাসের উদ্ভব। ভারতের ক্ষেত্রে সে কথা অধিকতর প্রযোজ্য। এখানে অতিকথা-উপকথা দোহন করেই ইতিহাসের সূত্রপাত। পুরাণের কাহিনী এ দেশের জনমানসে এমনি বদ্ধমূল যে ইতিহাস এখনো অতিকথা বা উপকথাকে পুরোপুরি অতিক্রম করে উঠতে পারেনি। বরঞ্চ বলা যায় এখনো নূতন নূতন অতিকথা-উপকথার জন্ম হচ্ছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে পরিচিত বাংলাদেশকে বৈদিক যুগে আর্য সংস্কৃতির বহির্ভূত জনপদ বলে মনে করা হত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এদেশের আদিবাসীদের 'দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাপে লিপ্ত এইসব অনার্য বর্বরদের মধ্যে যাঁরা স্বল্পকালও অবস্থান করেন, প্রায়শ্চিত্তাদি করে তাঁদের শুদ্ধ হতে হয়। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবেরা বহু দেশ ঘুরেছেন, কিন্তু এই অপবিত্র দেশে তাঁরা নাকি পা দিতে চান নি। প্রাচীন যুগের জৈন লেখকেরা বলেছেন যে এদেশে পথঘাট বলতে কিছু নেই এবং এদেশের অধিবাসীরা এমনি অসভ্য ও রূঢ় প্রকৃতির যে শান্তিপ্রিয় শ্রমণেরা পর্যন্ত এদের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করে থাকেন। বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিষাদ বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। বলা হয় আজকের দিনের কোল, শবর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তাদেরই বংশধর। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর কোনো কোনো জাতি অল্পাধিক সংখ্যায় এদেশে বসবাস স্থাপন করে থাকবে। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে তারও কিছুকাল পরে অলপাইন গোষ্ঠীভুক্ত আর্যেতর কিছু কিছু বহিরাগত জাতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে থাকবে।

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে বাংলাদেশ যে ধীরে ধীরে আর্যীকৃত হয়ে থাকবে তার সমর্থন মেলে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-উল্লিখিত একটি কাহিনী থেকে :

'দৃষ্টিশক্তিহীন এক স্থবির ঋষি একদা গঙ্গাবক্ষে ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে বহুদেশ অতিক্রম করে এই অঞ্চলে যখন এলেন, রাজা বলী তাকে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর

প্রাসাদে। নিঃসন্তান রাজা প্রার্থনা জানালেন তাঁর মহিষীতে উপগত হয়ে—ঋষি যেন ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করেন। তদনুসারে মহিষীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তানের জন্ম—তাঁদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পাঁচজনের নামে পাঁচটি রাজত্বের উদ্ভব। বর্তমান বাংলাদেশ, ওড়িশা ও বিহারের ভাগলপুর জেলার মধ্যে মোটামুটি ছিল এই পাঁচ রাজ্যের বিস্তার।'

সে যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ যে অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এবং তার পরেও বহু শতাব্দ ধরে বাংলা ছিল বৌদ্ধধর্মের শক্তিশালী কেন্দ্র। চীন পরিব্রাজক ফা-শিয়েন (খৃস্টীয় পঞ্চম শতক) ও হুয়েনৎ-সাঙ (খৃস্টীয় সপ্তম শতক) উভয়েই এদেশে বহু বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব বিষয়ে লিখে গেছেন। শোনা যায়, ফা-শিয়েন তাম্রলিপ্ত বিহারে (মেদিনীপুর জেলার তমলুক) দুই বৎসর কাল বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অনুলিপি-করণে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ যা অবশিষ্ট ছিল বৌদ্ধধর্মের সংঘাতে তার অনেকখানিই ভাঙচুর হয়ে গিয়ে থাকবে। কালে এই বৌদ্ধধর্মই আবার বহুবিধ তন্ত্রসাধনায় পর্যবসিত হয়ে যায়। ফলে, খৃস্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ যখন অল্পে অল্পে হিন্দু রাজাদের অধীনে আসে, ক্রমোচ্চ পর্যায়ে জাতি-বিন্যাসের প্রশ্নটি নূতন করে ভাবতে হয়। এই পুনর্বিন্যাস ঘটে বাংলাদেশের বাইরে সনাতন হিন্দুধর্মের যেসব শক্ত ঘাঁটি ছিল সেইসব অঞ্চল থেকে উচ্চবর্ণের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আমদানি করে। অধুনাতন বাংলাদেশের অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এইসব বহিরাগত অভিজাত ব্রাহ্মণদের সাক্ষাৎ বংশধর বলে পরিচয় দিতে চান—যদিচ তাঁরা অবশ্যই জানেন যে সূচনায় এঁদের আমদানি করা হয়েছিল কৃত্রিম উপায়ে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে।

ইতিপূর্বে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত প্রাচীন বাংলার দুই খণ্ড ইতিহাসের বিষয়ে উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থে তিনি এই বহিরাগত ব্রাহ্মণদের বিষয়ে কতিপয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন যে এসব আখ্যান পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য কি না ঠিক বলা যায় না। একটি আখ্যানে বলা হয়েছে :

'খৃস্টীয় সপ্তম শতকের সূচনায় গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। বলা হয়, তিনি একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। শশাঙ্ক ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ও প্রতিযোগী। হর্ষচরিত-রচয়িতা কবি বাণভট্ট এবং চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাঙ—উভয়েই রাজা শশাঙ্কের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি ছিলেন গর্বান্ধ ও বুদ্ধবিদ্বেষী। বলা হয়, তিনি নাকি গয়ার বোধিদ্রুম কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং নিকটস্থ মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারণ করেন। হুয়েনৎ-সাঙ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলে গেছেন যে রাজার আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে জানার পর রাজা শশাঙ্কের মনে সন্ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং তাঁর সারা দেহ

বিস্ফোটকে গলিত পচিত হবার ফলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।'

ডক্টর মজুমদার বলেন, এই আখ্যানের জের টানা যায় বাঙালী ব্রাহ্মণদের বংশ-বৃত্তান্তে। মন্ত্রশক্তির গুণে তাঁর আরোগ্য বিধান করতে, সরযূ নদীর তীরবর্তী যে বারোজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শশাঙ্ক আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণেরা দাবী করেন, তাঁরা সেই বারোজন ব্রাহ্মণের বংশধর। আখ্যানমতে শশাঙ্ক অবশ্য নিরাময় হয়েছিলেন।

এই আখ্যানের ভিত্তি হল বৌদ্ধ-উপাখ্যান। এছাড়া আরো অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে ব্রাহ্মণ্য আকর গ্রন্থে। সেগুলি সাধারণ্যে অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করে বললেও, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে এইসব আখ্যান ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ্য আকর গ্রন্থ বলতে বোঝায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের কুলজী বা বংশবৃত্তান্ত। অধিকাংশ কুলজী সংকলিত হয়ে থাকবে পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে, পাণ্ডুলিপি আকারে। পরবর্তী নামী ঐতিহাসিকদের মতে, সংকলয়িতারা যত প্রাচীন হোন-না কেন, কালে এইসব পাণ্ডুলিপিতে নানারকম রদবদল প্রক্ষিপ্ত হবার ফলে কুলজীগুলির অধুনাতন সংস্করণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে।[৮]

এইসব কুলজী বাঙালী ব্রাহ্মণদের প্রধানত দুই শ্রেণীর বংশাবলী নিয়ে রচিত— রাঢ়ী শ্রেণী (পশ্চিমবঙ্গের) এবং বারেন্দ্র শ্রেণী (উত্তরবঙ্গের)। বলা হয়, এই দুই শ্রেণীর পাঁচজন আদিপুরুষ বাংলায় এসেছিলেন রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণক্রমে। এই রাজার অস্তিত্ব ও রাজত্বকাল নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মেলে না। ইনি খৃস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে বলা হয়। ঠাকুর পরিবারের বিবরণ দিতে গিয়ে জেমস্ ফারেল লিখেছেন :

'প্রখ্যাত প্রত্নবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে সম্ভবত ৯৯৪ খৃস্টাব্দে বীরসেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মতে, বীরসেন আদিশূরের উত্তরপুরুষ ছিলেন না, ছিলেন আদিশূর স্বয়ং। জনৈক বৌদ্ধ-নৃপতিকে পরাজিত করে তিনি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড়রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে স্বীকৃত থাকায় ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের অবনতি ঘটেছিল।'[৯]

দেবতার বররূপে একটি পুত্রলাভের আগ্রহে আদিশূর চেয়েছিলেন শুদ্ধ বৈদিক মতে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে। (কেউ কেউ বলেন, দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।) কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠানে পারদর্শী কোনো ব্রাহ্মণ তখন তাঁর রাজ্যে ছিল না বলে, আদিশূর কান্যকুব্জের (আধুনিক কনৌজ—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) তদানীন্তন রাজাকে অনুরোধ করেন যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তিনি যেন পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠান। সনাতন হিন্দুধর্মের শক্ত ঘাঁটিরূপে তখন কান্যকুব্জের খুব নামডাক ছিল।

এই পাঁচ ব্রাহ্মণ এলেন অশ্বপৃষ্ঠে, হাতে তাঁদের ধনুঃশর, প্রত্যেকের সঙ্গে একটি

করে পরিচারক। যোদ্ধবেশ দেখে আদিশূর প্রথম প্রথম তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন ও যথাযোগ্য মর্যাদা দানে বিরত থাকেন। রাজার আচরণে বিরক্ত হলেন ব্রাহ্মণেরা; রাজা ও রানীকে আশীর্বাদ করার জন্য যেসব পুষ্প ও ওষধি সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলি রাগতভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একটি শুষ্ক তরুকাণ্ডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক তরু পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করল। এই অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে আদিশূর কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলেন ও ব্রাহ্মণদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে যথাযোগ্য সম্মাননায় তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। ব্রাহ্মণেরাও প্রীত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধা করে ফিরে গেলেন কান্যকুব্জে।

কিন্তু দেশে ফেরার পর তাঁদের অবস্থা হল শোচনীয়। আত্মীয়স্বজনেরা বললেন, বাংলাদেশের মতো পাণ্ডব-বর্জিত দেশে যাবার ফলে তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত হয়েছে, সুতরাং সমাজ তাদের ফিরিয়ে নিতে চায় না। এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মনের দুঃখে সেই পঞ্চব্রাহ্মণ তাঁদের পঞ্চসহচর সহ বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং আদিশূরের আশ্রয় চান। আদিশূর ব্রহ্মত্র হিসাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচটি গ্রাম উৎসর্গ করলেন। তারপর থেকে তাঁরা পরিচিত হলেন তাঁদের গ্রামের নামে। ভারতের অনেক অঞ্চলে এখনো এই প্রথা প্রচলিত। এই পঞ্চব্রাহ্মণ থেকে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের উদ্ভব। তাঁদের পঞ্চসহচর হলেন বাংলা কায়স্থ সমাজের আদি পুরুষ।

বলা হয় 'আদিশূরের বংশধর বল্লাল সেন এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থের বংশধরদের 'কুলীন' উপাধিতে ভূষিত করেন যাতে তাঁরা বহু বিবাহ করে প্রচুর সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।'

এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র কুলজী ঘাঁটলেই জানা যায়। এই পাঁচজনের একজন ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশের পাঁচ ছেলের মধ্যে একজনের নাম ছিল ভট্টনারায়ণ। বেণীসংহার' নামে একটি সংস্কৃত নাটক লিখে ইনি নামজাদা হয়েছিলেন। বলা হয়, এই ভট্টনারায়ণই ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ।

ঠাকুর পরিবারের ইতিবৃত্ত রচনায় জেম্‌স্ ফারেল-কে পরিবারের কতিপয় ব্যক্তি সহয়তা করেছিলেন। তাঁদের একজনের মুখে ফারেল শুনেছিলেন যে, ভট্টনারায়ণের বংশধরদের অন্যতম ছিলেন ধরণীধর, যিনি 'মনুসংহিতা'র উপর টীকা লিখে বিখ্যাত হন। ধরণীধরের পৌত্র ধনঞ্জয় সংকলন করেছিলেন বৈদিক শব্দের 'নির্ঘণ্ট', উপরন্তু বল্লাল সেনের আমলে তিনি ছিলেন একজন ন্যায়াধীশ। তাঁর বংশধর হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা।

বলা বাহুল্য, পূর্বপুরুষদের নিয়ে এই সমস্ত দাবিদাওয়ার পিছনে আছে পরিবারের প্রচলিত নানা কিংবদন্তী যার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুব দৃঢ় বলা যায় না। দ্বারকানাথের প্রথম জীবনী-রচয়িতা কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন : 'কুলজী প্রণয়নকারীদের কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষরূপে দেখা যায় হলধরকে(?)। বলা হয়,

বিধি-বিধানে সুপণ্ডিত হলধর ছিলেন প্রধান অমাত্য। তিনিই নাকি রাজধানী গৌড়ের স্থপতি এবং কুলীনপ্রথার প্রবর্তক ছিলেন। এইসব উক্তির পিছনে অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।"[৫]

তবে অধিকতর সহজে বিশ্বাসযোগ্য একটি সম্ভবনা এই হতে পারে যে ভট্টনারায়ণ বংশের উত্তরপুরুষদের কেউ কেউ জ্ঞানী-গুণী ছিলেন অথবা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভট্টনারায়ণের ষোলোটি ছেলের মধ্যে (এখানে বলে রাখা উচিত যে ভট্টনারায়ণের কোনো কন্যাসন্তান ছিল না, অথবা অন্যান্য হিন্দু কুলজীর মতো তাঁর বংশবৃত্তান্তেও কন্যাদের উল্লেখ অবান্তর বলে মনে করা হয়ে থাকবে।) চতুর্দশ সন্তান দীনকে মহারাজ ক্ষিতিশূর বর্ধমানের নিকটবর্তী অঞ্চলে কুশ নামক একটি গ্রাম দান করেছিলেন। গ্রামের নাম অনুসারে তিনি ও তাঁর বংশধরেরা 'কুশারী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফির মতে[৬] কলকাতার ঠাকুর পরিবার এই দীন কুশারীর সাক্ষাৎ বংশধর। অপর এক কুলজী মতে ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব হয় ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র থেকে। ইনি 'বন্দ্য' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলে এঁর বংশধরেরা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত। এই দ্বিতীয় কুলজীর বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে হয়তো সন্দেহের অবকাশ আছে।

সে যাই হোক না কেন, ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের।[৭] তিনি ছিলেন ভট্টনারায়ণের পঞ্চবিংশতিতম অধস্তন পুরুষ। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর রচিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে বলেছেন, ঠাকুর পরিবারের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে বিগত দশপুরুষের উল্লেখ করে যে শ্লোক উচ্চারণ করা হত, তার সূচনায় থাকত পুরুষোত্তমের নাম ও সর্বশেষে দ্বারকানাথের।[৮]

পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সর্বপ্রথমে তাঁর নাম উচ্চারিত হত বলেই পুরুষোত্তম উল্লেখযোগ্য ছিলেন এমন নয়। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও অন্য এক কারণে তিনি উল্লেখযোগ্য —সম্ভবত নৈকষ্য কুলীন বংশে তথাকথিত কলঙ্কের প্রথম আঁচড় লাগে তাঁরই সুবাদে। তাঁর সময় থেকেই ঠাকুর বংশ 'পীরালি' ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ম্লেচ্ছসংসর্গ-দুষ্ট ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হতে থাকেন। মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার দরুন ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁরা পতিত বলে গণ্য হন এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ সম্বন্ধ ঘুচে যায়।

এই সংসর্গ-দোষ কী ভাবে বর্তায়—সে এক আখ্যান বিশেষ। অন্যান্য কেচ্ছার মতো এই আখ্যানেরও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে। এইসব গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য যাই হোক না কেন, গল্প হিসাবে এগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।

একটি গল্পে বলা হয়, ভট্টনারায়ণ থেকে চতুর্বিংশতি অধস্তন পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথ, ইশবপুরের শূদ্র রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন

বলে জাতিচ্যুত হন। অপর সব গল্পের তুলনায় এই গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতা সবচেয়ে অল্প। উচ্চতম বর্ণের ব্রাহ্মণ সন্তান নিম্নতম বর্ণের শূদ্রানীকে (হোক না সে রাজকুমারী) বিবাহ করার ফলে জাতিচ্যুত হতে পারেন; কিন্তু সেই 'পতিত' স্বামী কেন 'পীরালি' পদবাচ্য হতে যাবেন, পীরালি নামটা তো মুসলমান সংসর্গের ইঙ্গিত বহন করে। জাতে ছোট হলেও রাজকুমারী তো ছিলেন হিন্দু।

অপর এক উপাখ্যানে প্রকাশ যে পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন (তিনি পুরুষোত্তম না জগন্নাথ—সেকথা পরিষ্কার জানা যায় না) জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কন্যার পিতা ছিলেন পীর আলি নামক জনৈক মুসলমান সাধুর ভক্ত এবং সেই সূত্রে তিনি পীরালি ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত হন। পূর্বোক্ত আখ্যানের মতো এ গল্পও যে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা ঠিক বলা যায় না। বিভিন্ন জাতির বহুসংখ্যক হিন্দু, মুসলমান পীরের দরগায় বহুশত বৎসর ধরে পূজা-অর্চনা করেছে, সিন্নি দিয়েছে, কিন্তু কই সেজন্য তো তারা কলুষিত কিংবা জাতিচ্যুত হন নি। আজকের দিনেও হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী দিল্লিতে খাজা নিজামুদ্দীন, আজমীরে খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তি এবং শিরদিতে সাঁইবাবার সমাধিস্থলে পূজা দিতে যান।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেন ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে আরো একটি আখ্যানের সন্ধান দিয়েছেন। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ শুনতে পান যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সেকথা শুনে নবাব নবদ্বীপের অদূরবর্তী পিরল্যা গ্রামের উপর হানা দিয়ে, সেখানকার ব্রাহ্মণদের বাধ্য করেন মুসলমানদের হাত থেকে জল গ্রহণ করতে। সেই থেকে পিরল্যা অর্থাৎ পীরালি ব্রাহ্মণেরা পতিত বলে বিবেচিত হন এবং অন্যান্য গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন বন্ধ করে দেন।

এ বিষয়ে যে গল্পটি বহুলপ্রচলিত ও বহুগুণে বিশ্বাসযোগ্য তা হল এই : পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে দিল্লির সুলতান বাংলাদেশের যশোহর অঞ্চলের শাসকরূপে খান জাহান আলিকে পাঠান। সন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করে তিনি রাজ্যবিস্তার করেছিলেন ও বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে দিল্লির সুলতান তাঁকে নবাব পদবীতে ভূষিত করেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক তাঁর নেকনজরে পড়েন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই যুবকটি এক মুসলমান কন্যার প্রণয়াসক্ত ছিলেন বলে, খান জাহান আলি অল্পায়াসে এঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণে রাজি করিয়েছিলেন। একেই বলা চলে, এক ঢিলে দুই পাখি মারা। মুসলমান হয়ে ব্রাহ্মণ যুবক মোহম্মদ তাহির নামে পরিচিত হন। মুসলমান প্রণয়িনীকে বিবাহ করে ইনি নবাবকর্তৃক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণে ও মসজিদস্থাপনে এঁর প্রবল আগ্রহ থাকায়, লোকে এঁর নাম দিয়েছিলেন পীর আলি। কালে তিনি নবাবের উজির ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

মোহম্মদ তাহির পীর আলি যখন নবাবের অধীনে চেঙুটিয়া পরগণার শাসক, তাঁর সঙ্গে স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের বেশ হৃদ্যতা জমে ওঠে। এই পরিবারের অনেক লোককে তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; এঁরা ছিলেন পীর আলির দেওয়ান। রমজানের রোজা পর্বে একদিন পীর আলি বসে আছেন পাত্রমিত্রসহ তাঁর প্রাসাদের বারান্দায়, এমন সময় মালী এসে তাঁর হাতে দিল সদ্য গাছ থেকে পাড়া একটি বড় লেবু। আঘ্রাণ নিয়ে পীর আলি বললেন, 'আহা কী মিষ্টি গন্ধ!' সামনেই বসেছিলেন কামদেব, তিনি ঠাট্টা করে বললেন, 'হুজুর যখন লেবু আঘ্রাণ করেছেন তখনি তাঁর রোজা ভেঙে গেছে কারণ হিন্দু শাস্ত্রে বলে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্।' পীর আলি চুপ করে রইলেন, কিন্তু কামদেবের উপহাস এই ভূতপূর্ব ব্রাহ্মণ সন্তানের বুকে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতো বাজল। চতুর পীর আলি মনে মনে স্থির করলেন এ অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে ব্রাহ্মণকে জব্দ করতে হবে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর পীর আলির প্রাসাদে এক সান্ধ্য মজলিসে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন সপরিজন দুভাই কামদেব ও জয়দেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ পার্ষদেরা। বৈঠকখানায় আলি আপ্যায়ন করছেন তাঁর হিন্দু অতিথি সজ্জনদের। সেই সময় পাশের ঘরেই মুসলমান অতিথিদের জন্য বিরাট খানার পরিবেশন চলছে—উপাদেয় ভোজ্যের মধ্যে গোমাংসও রয়েছে। পেঁয়াজ-রসুন, জিরা-জাফ্‌রান প্রভৃতি মসলার গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে। ব্রাহ্মণ অতিথিরা শশব্যস্ত হয়ে তাঁদের অনভ্যস্ত নাক ঢাকলেন উড়নীর খুঁট দিয়ে। স্মিত হেসে পীর আলি কামদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ঠাকুরমশাই, ব্যাপারখানা কী?' নাকমুখ ঢাকা অবস্থায় কামদেব কোনো প্রকারে জবাব দিলেন, 'হুজুর, নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ।' এক গাল হেসে পীর আলি বললেন, 'আহা, তাতে হয়েছে কি? নাক ঢাকবার আগেই তো ঘ্রাণে টের পেয়েছিলেন। আর সেই যে আপনাদের শাস্ত্রে বলে না ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্। তবে তো সবাই আপনারা আধপেটা করে নিষিদ্ধ বস্তু আহার করেইছেন। এখন আসুন, পুরো পেট ভোজনটা হয়েই যাক।'

ব্রাহ্মণ অতিথিরা আতঙ্কিত হয়ে লম্বা লম্বা পা বাড়াতে লাগলেন বেরোবার দরজার দিকে। হুলুস্থুল কাণ্ড! কিন্তু পীর আলি পূর্ব থেকেই তাঁর মুসলমান কর্মচারীদের বলে রেখেছিলেন কামদেব ও জয়দেবকে আটকাতে। বলপূর্বক তাঁদের নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণে বাধ্য করা হল। অতঃপর ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের নূতন ভাবে নামকরণ হয়—কামদেব হলেন কামালউদ্দীন খান চৌধুরী এবং জয়দেব—জামালউদ্দীন খান চৌধুরী। যশোহর থেকে মাইল দশেক দূরে সিঙ্গিয়া গ্রামখানা দুই ভাইকে জায়গীর-স্বরূপ দান করা হয়। অপর দুজন ভাই ও অন্যান্য সব আত্মীয়-কুটুম্ব, গোমাংস ভক্ষণ না করে সান্ধ্য মজলিস থেকে পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রেহাই পেলেন না, সমাজের বিচারে তাঁরাও পতিত হলেন এবং পীরালি ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হলেন। সমাজের বিচারে কোনো পরিবার একঘরে হলে তার অন্যতম কুফল দেখা যায় কন্যাদের

বিবাহের বেলা। দুর্ভাগিনীদের জন্য সুপাত্র সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। কামদেবের লঘু পরিহাসের জন্য সব চেয়ে গুরু দণ্ড পেয়েছিলেন তাঁর অপর দুজন ভাই—রতিদেব ও শুকদেব। সমাজে পতিত হবার ফলে রতিদেবের মন একেবারে ভেঙে যায়। তিনি তাঁর গৃহসম্পত্তি পরিবার পরিজন ছোটভাই শুকদেবের হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়ে যান উত্তরবঙ্গে।

শুকদেবের দায়িত্বে তখন এক অনূঢ়া ভগ্নী এবং অরক্ষণীয়া একটি কন্যা। তখন অতি অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ দিতে হত। কন্যাদায়ে বিভ্রান্ত শুকদেব পাগলের মতো এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে প্রভূত যৌতুকের বিনিময়ে দুটি সুপাত্র পেয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের পাণিগ্রহণ করার জন্যে যে যুবকটি এগিয়ে এলেন তিনি কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি মমতাবশত নিতান্ত দুঃসাহসীর মতো সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এই দুঃসাহসী যুবকটি খুলনা জেলার পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারী—শূদ্রানী রাজকুমারীকে বিবাহ করার দরুন যাঁর নামে ইতিপূর্বে অপবাদ রটেছিল। দ্বারকানাথের প্রপৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত প্রপিতামহের জীবনীতে[১১] কিন্তু বলেছেন, পীরালি মেয়েটিকে বিবাহ করার জন্য যে দুঃসাহসিক তরুণ ব্রাহ্মণটি এগিয়ে আসেন—তিনি জগন্নাথ নন, জগন্নাথের পুত্র পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রনাথ একটি আখ্যানের অবতারণা করেছেন : পুরুষোত্তম ছিলেন একজন ডাকসাইটে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যশোহরে এসে তিনি তাঁর নিত্যকার অভ্যাসমতো প্রাতে অবগাহনের জন্য নদীতীরে গেছেন। সেকথা জানতে পেরে শুকদেবও গিয়েছেন পিছু পিছু। স্নান সমাপন করে পুরুষোত্তম ঘাটে পা দিয়েই দেখতে পেলেন প্রার্থীর ভঙ্গিতে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। সচরাচর এইরকম অবস্থায় ধার্মিক ব্রাহ্মণ প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন।[১২] সুতরাং শুকদেব যখন তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য পুরুষোত্তমকে প্রার্থনা জানালেন পুরুষোত্তম 'না' বলতে পারলেন না।

পুরুষোত্তম অথবা তাঁর পিতা জগন্নাথ—যিনিই এই দুঃসাহসিক হঠকারিতার জন্য দায়ী, তিনিই নিশ্চিত কুশারী কুলে পীরালি-কলঙ্ক লেপনের জন্য দায়ী—অন্তত পক্ষে পারিবারিক ঐতিহ্যে এইরকম কথাই প্রচলিত। বংশ হিসাবে কুশারীরা কোনো প্রত্যক্ষ দোষ-দুষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায় না। সূচনায় একটি মাত্র দোষ যা ঘটেছিল তা হল এই যে পূর্বপুরুষদের একজন কলঙ্কিত পীরালি পরিবারে বিবাহ করেছিলেন এবং সে-কলঙ্ক একপ্রকার গায়ের জোরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুকদেব-পরিবারের উপর। পরে অবশ্য—বিশেষত দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর—সনাতন হিন্দু ধর্মের বাঁধা সড়ক ছেড়ে বেরিয়ে আসার দরুন, পরিবারের একটি শাখা ধর্ম বিরোধীরূপে নিন্দিত হয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঠাকুর পরিবারের বংশবৃত্তান্ত নিয়ে যেসব আখ্যান রচিত হয়েছিল—ঐতিহাসিক নিরিখে তার কোনোটিই সম্পূর্ণ

বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরঞ্চ বলা চলে যাঁরা এইসব আখ্যানের সত্যতা-প্রমাণে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়েছিলেন তাঁরা কেবল অধিকতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে গেছেন। নদীয়া পণ্ডিতসমাজের সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নিম্নলিখিত মন্তব্য এই সন্দেহের সমর্থনে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'মুসলমান পাকশালার মসলাদার গোমাংসের গন্ধে অর্ধভোজনের ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যার জন্য পুরুষোত্তম ও পীর আলির অন্য অতিথিরা সবংশে চিরকাল পতিত হতে পারেন। স্বেচ্ছাক্রমে কেউ যদি সত্য সত্য গোমাংস ভক্ষণ করে থাকেন—সে পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে। হিন্দুশাস্ত্র বা সংহিতায় এমন কোনো অযৌক্তিক বা অনড় অটল বিধান নেই যার ফলে নিষিদ্ধ মাংসের ঘ্রাণ নেবার মতো অনিচ্ছাকৃত অপরাধে কোনো ব্যক্তি চিরকালের মতো পতিত বলে গণ্য হতে পারেন।' যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ধারণা : যশোহর জরিপ বিভাগের কর্তা ছিলেন পীর আলি এবং পুরুষোত্তম ছিলেন তাঁর অন্যতম আমিন। আমিনদের স্বভাবই হল ছলে-বলে-কৌশলে প্রজাদের পৈতৃক জমিতে চড়াও হয়ে সে জমি খাসে আনা। পুরুষোত্তম নিশ্চয় তাঁর স্বজাতিদের কাছ থেকেও জমি কেড়ে নিয়ে থাকবেন। এই কারণে তারা সবাই একজোট হয়ে স্থির করে যে পুরুষোত্তম নিষিদ্ধ মাংস ঘ্রাণ করেছেন বা আস্বাদ করেছেন, এই অপবাদে তাঁকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে।' যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরো লিখেছেন : 'বলা হয় ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কলকাতায় পা দেবার অর্ধশতাব্দী কাল পরেও পীরালিরা সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রাপ্য মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাঁরা অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী হবার পর, বাগবাজারের বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় সমাজের চোখে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে জোট বাঁধেন। হয়তো কলকাতার ধনী ও বনেদি কায়স্থেরাও গোপনে দুর্গাচরণের এই ষড়যন্ত্রে উশকানি দিয়ে থাকবেন।'[১৩]

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সত্য নিরূপণে কীভাবে জনশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত হতেন উপরোক্ত উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ। কেবল ভারতে কেন সারা পৃথিবীতেও যদি অর্থ-প্রতিপত্তি সুকৌশলে বিনিয়োগ করা হয়, তা'হলে হেন উদ্দেশ্য নেই যা সাধিত না হতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা চলে পীরালিত্ব নিয়ে ঠাকুরবাবুদের যদি যথেষ্ট মাথাব্যথা থাকত, কুলের কলঙ্ক মোচন করতে তাঁদের খুব বেশি বেগ পেতে হত না। মনে হয় তাঁদের এ নিয়ে যথেষ্ট মাথাব্যথা ছিল না। ঠাকুরবংশের পরবর্তী ইতিহাস এই কথাটাই প্রমাণ করে যে গোঁড়ামির পায়ে মাথা কুটতে তাঁদের গরবে বাধত। অপরপক্ষে গোঁড়ামি নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে তাঁরা মজা পেতেন।

আপাতদৃষ্টিতে সমাজচ্যুত হবার ফলে তাঁদের কিছু কিছু অসুবিধা ঘটলেও, আখেরে ফল কিছু খারাপ হয়নি। পুরুষোত্তম ও তাঁর অধস্তন পুরুষেরা প্রাচীন সংস্কারের বিধিনিষেধ ডিঙিয়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন নানাবিধ দুঃসাহসিক অভিযানে। ভাগ্যান্বেষণের জন্য অথবা কন্যাদের সুপাত্র-সন্ধানে বাধ্য হয়ে তাঁদের বার বার ঠাঁইবদল

করতে হয়েছে। সমাজের আইনকানুন মেনে চলার অধিকার খুইয়েছিলেন বলে, এইসব আইন-কানুনের বিরোধিতা করতে তাঁরা ভয় পাননি। সমাজ তাঁদের ব্রাহ্মণ্য বিশুদ্ধতা হরণ করেছিল বলে সমাজের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা তাঁরা পরিহার করেছিলেন। সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভরশীল হয়ে তাঁরা বৃহত্তর জগতে তাঁদের শ্রেয়োলাভের জন্য তৎপর হতে পেরেছিলেন। এইভাবে কালে তাঁরা ভারতের নবযুগের অগ্রদূতরূপে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

## টীকা

১. দ্রঃ *History of Bengal*, Vol. I, Hindu Period. রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত। প্রকাশনা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩। অপিচ *History of Ancient Bengal*, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশনা : G. Bhardwaj & Co কলিকাতা, ১৯৭১। অধিকাংশ পুরাণ আখ্যানেব উৎস হল এই দুটি ইতিহাসগ্রন্থ।

২. তদেব।

৩. *The Tagore Family : A Memoir*, দ্বিতীয় সংস্করণ; James W. Furrel প্রণীত। নিজেদের মধ্যে প্রচারের জন্য মুদ্রিত। প্রকাশনা : Thacker, Spink & Co কলিকাতা, ১৮৯২।

৪. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রপিতামহ 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ যে 'বেণীসংহার' নাটকের রচয়িতা—সাধারণ্যে স্বীকৃত এই তথ্যের বিরোধিতা করেছেন। দ্রঃ ঐ 'জীবনী'। প্রকাশনা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৪।

৫. *Memoir of Dwarkanath Tagore*, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রণীত। ডেভিড হেয়ার-এর সপ্তবিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত কলিকাতা টাউন হল-এর এক সভায় ১ জুন ১৮৭০ অব্দে এই স্মৃতিকথা পঠিত হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রথম প্রকাশনা : Thacker, Spink & Co কলিকাতা, ১৮৭০। পৃ. ৩।

৬. 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড; নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি প্রণীত। প্রকাশনা : প্রভাতচন্দ্র বসু, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯২৪। কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত *Memoir*-এর বাংলা সংস্করণে কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের টীকায় উদ্ধৃত।

৭. বিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য : পণ্ডিতের উপাধি।

৮. 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', অজিতকুমাব চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশনা : জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭০। মূল শ্লোকটি এই প্রকার : 'ওঁ পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দাম্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চানন : পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণির্নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।'

৯. *History of Bengali Language and Literature:* দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা, ১৯৫৪।

১০ একটি পাঠে বলা হয়েছে যে পিরিলিয়া গ্রামের অধিবাসী হিসাবে তাঁর এই প্রকার নামকরণ হয়েছিল।

১১. 'পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ এই রায়চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া পীরালি হন।' 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী', কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৭।

১২. বলা হয় রামমোহন রায়ের মাতার সঙ্গে তাঁর পিতার বিবাহ হয় এই রকম বরদানের ফলে। পিতা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে নিয়ম অনুসারে বিবাহ সম্বন্ধ হতে পারত না।

১৩. *Hindu Castes and Sects;* যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশনা : Thacker, Spink & Co. Calcutta, 1896, "The Degraded Brahmins—The Pirali Tagore of Calcutta", Part VI; pp. 119-124.

□

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# গল্প থেকে ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার ইতিবৃত্তান্ত এবং ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষদের ইতিবৃত্তান্ত উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র বর্তমান। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে যতটুকু বলা হয়েছে তার প্রায় ষোলো আনাই প্রচলিত অতিকথা-উপকথা গল্প-আখ্যান থেকে আহরণ করা। এইসব গল্প বা আখ্যানের সত্যাসত্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়, কিন্তু তাই বলে তাদের একেবারে অবাস্তর বা নিরর্থক বলে বাতিল করাটাও ঠিক নয়। এইসব গল্প বা আখ্যানের অনেকখানি কোনো দেশ বা জাতির স্মৃতি দিয়ে গড়া। অগোচরে থেকে এইসব স্মৃতিই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের অদৃশ্য বুনিয়াদ গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী যেসব হাতিয়ার নিয়ে কাজকারবার করেন, গল্প বা আখ্যান তার নাগালের বাইরে থাকলেও তাদের তুচ্ছ করা যায় না। এক হিসাবে তারা ইতিহাসের ঘটনা থেকেও বেশি সত্য কারণ তারাই উদ্দীপ্ত করে একটা গোটা দেশ বা জাতির কল্পনা—যা ইতিহাস পারে না।

সে যাই হোক, আপাতত কল্পনার কুহেলিকা থেকে সম্ভাব্যতার আলোছায়া ঘেরা জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারি—যতক্ষণ না ইতিহাসের সত্যে পৌঁছাই। ইতিহাসের সত্য নিয়েও তো আমাদের মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব থাকে অনেক সময়।

পুরুষোত্তম থেকে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে আমরা দেখি মহেশ্বর ও শুকদেব নামে দু'ভাই তখনো যশোহরে বসবাস করছেন। এই মহেশ্বর বা মহেশের পুত্র পঞ্চানন কুশারী হলেন আজকের ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস-স্বীকৃত পূর্বপুরুষ। পারিবারিক অন্তর্বিবাদে তিক্তবিরক্ত হয়ে কিংবা স্বীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে অথবা নূতন কিছু করার ঝুঁকি নেবার আগ্রহে, পঞ্চানন যশোহরের ভিটে ছেড়ে কাকা শুকদেবকে নিয়ে তদানীন্তন আদি গঙ্গার তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই আদি গঙ্গাই পরে বর্তমান হুগলি নদীর সঙ্গে মিশে যায় এবং গোবিন্দপুর গ্রাম হয় আজকের দিনের বিরাট শহর কলকাতার অঙ্গবিশেষ। এ ব্যাপারটা ঘটেছিল সপ্তদশ অব্দের শেষ দশকে—বর্তমান গ্রন্থে যাঁর জীবনী রচিত তাঁর জন্মের শ'খানেক বছর আগে।

তখন দেশময় একটা উত্তেজনার আবহাওয়া। কেবল শহরে নগরে নয়, বাংলাদেশের তন্দ্রাতুর পল্লী অঞ্চলেও, তখন মুখে মুখে সুদূর কালাপানি পেরিয়ে আসা শ্বেতকায়

বিদেশীদের নানা দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা গল্পগুজব আকারে রটনা হচ্ছে। তারা নাকি পাল-তোলা জাহাজে চেপে এসে নেমেছে গঙ্গার মোহনায়; এ দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে বলে কুঠিবাড়ি তুলেছে। একে বিদেশী, তায় ম্লেচ্ছ, আহারে-বিহারে পোশাকে-আশাকে ভারি অদ্ভুত, আচার-বিচারের বালাই নেই। এই বণিকেরা তুলাদণ্ড নিয়ে পণ্যদ্রব্য ওজন করছে, আবার নিমেষে নিষ্কাসিত করছে কোমরবন্ধ থেকে তরবারি—একাধারে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলে কি হয়, চালচলনে এমনি গুমর যে স্বয়ং নবাব এদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। অদ্ভুত আকারের বিরাট বিরাট পাল-তোলা জাহাজে গঙ্গার মোহনা পেরিয়ে নোঙর ফেলল—প্রতিটি জাহাজ নানারকম পণ্যদ্রব্যে ঠাসা। এইসব বিদেশীদের যদি রসদ জোগান দেওয়া যায়, এদের ফাইফরমায়েস খাটা যায়, তা হলে নবাবের মুন্সীর চেয়ে বেশি রোজগার করা যেতে পারে।

গোবিন্দপুর নিতান্তই ছোটো গ্রাম—মাত্র কয়েক ঘর জেলের বসবাস। এই গ্রামের অদূরেই নোঙর ফেলেছিল বিদেশীদের জাহাজ। একে জাতে ছোট তায় নেহাতই গরিব সেই জেলেরা খুব খুশী হল তাদের গাঁয়ে এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার এসে ঘর বাঁধলেন বলে। শুকদেব ও পঞ্চাননকে তারা ভক্তিসম্ভ্রম করত দেবতাজ্ঞানে—দেবতার মতনই তাঁদের চেহারা—যেমন গায়ের রঙ তেমনি মুখাকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব। পঞ্চাননের অধস্তন পুরুষেরা সুদর্শন হয়েছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরই সূত্রে। জেলে প্রতিবেশীরা নিশ্চয় জানত না যে, যে-ব্রাহ্মণদের তারা পূজনীয় জ্ঞান করছে তাদের কুলে কলঙ্ক রয়েছে। আর যদিই-বা জানত, তাতে তাদের কিছু এসে যেত না. জেলেরা শুকদেব ও পঞ্চাননকে ডাকত 'ঠাকুর' বলে, ব্রাহ্মণেতর জাতের পক্ষে সদ্ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর' বলে ডাকাটাই ছিল সেকালের রেওয়াজ।

পঞ্চানন ছিলেন কর্মতৎপর ও উপায়-সন্ধানী মানুষ—জাতপাতের বালাই তাঁর বড়ো একটা ছিল না। অচিরেই তিনি অর্থোপার্জনের উপায় একটা খুঁজে পেলেন, সেই জাহাজী গোরা সাহেবদের জন্য রসদ জুগিয়ে ও তাঁদের সব ফাইফরমায়েস খেটে। তিনি নিশ্চয় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য, কাজ চালাবার মতো তাদের ভাষা কিছুটা শিখে নিয়ে থাকবেন। গোরা সওদাগর ও পল্টনেরা জেলেদের মুখে শুনে শুনে নিশ্চয় ভেবে থাকবেন 'ঠাকুর' হল পঞ্চাননের পদবী। সুতরাং তারা তাঁকে ডাকত মিস্টার 'ঠাকুর' বলে, কিন্তু 'ঠাকুর' কথাটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারত না বলে তাদের মুখে শোনাত 'টেগোর' অথবা 'টাগুর'। এইভাবে পঞ্চানন কুশারী হয়ে গেলেন পঞ্চানন টেগোর। বাংলাদেশের বাইরে সর্বত্র টেগোর নামটাই প্রচলিত—যদিও জেলেদের সুবাদে পাওয়া ঠাকুর নাম এখনো বাংলায় চালু। পঞ্চাননের বংশে কুশারী নাম টেঁকেনি।

পঞ্চাননেরা কৌলীন্য হারিয়ে 'পতিত' হয়েছিলেন মুসলমানদের আমলে।

গোবিন্দপুরের জেলেরা যদিবা তাদের ঠাকুর উপাধি দিয়েছিল, খৃস্টান ফিরিঙ্গিদের মুখে সে নাম বিকৃত হয়েছিল টেগোর-এ। এই জাতি-হারা নাম-হারা অবস্থাটাকে একটা প্রতীকরূপে যদি আমরা ভাবতে পারি—তা হলে দেখব পরবর্তীকালে এই নামগোত্রহীন পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা হিন্দু, মুসলিম ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির তিন ধারার একটি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন তাঁদের জীবনে। আজকের দিনের ভারত হল সেই ত্রিবেণীসঙ্গমের পরিণাম।

যে অঞ্চলে, ইংরেজরা প্রথম তাঁদের কুঠিবাড়ি স্থাপন করেছিলেন, সে তল্লাটটা আদিতে ছিল চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বড়িশা গ্রামের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের। মাত্র তেরো হাজার টাকা মূল্যে জন্ কোম্পানি এই জমিদারদের কাছ থেকে তিনটি গ্রামের পত্তনী ক্রয় করেন—এই তিনটি গ্রাম হল কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর।[১] তখন কে জানত এই সামান্য হস্তান্তরকে ভিত্তি করে একদিন গড়ে উঠবে পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ।

পঞ্চাননের ছিল দুই ছেলে—জয়রাম[২] ও সন্তোষরাম। নিজের উপর কোম্পানির সায়েবদের নেকনজর থাকায় পঞ্চানন তাঁদের ধরেকয়ে জয়রামের জন্য কোম্পানির অধীনে একটি শাঁসালো চাকরি জুটিয়ে দেন। ১৭০৭ অব্দে রাল্‌ফ সেল্‌ডন যখন কলকাতার প্রথম কলেক্টররূপে নিযুক্ত, তিনি জয়রাম ও সন্তোষরাম দুই ভাইকেই আমিন পদে বহাল করেন, আমিনের কাজ ছিল রাজস্ব আদায় এবং সুতানুটি ও সন্নিহিত অঞ্চলে নগর পত্তন করার জন্য জমি জরিপ করা। কলেক্টর ও অন্যান্য সায়েবদের সঙ্গে পঞ্চাননের বিশেষ সদ্ভাব থাকায়, পিতার নির্দেশ ও সহায়তায় জমিজমা কেনাবেচা ও গৃহাদি নির্মাণে দালালী করে দুই ছেলেই প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং নিজেরাই গৃহসম্পত্তির মালিক হয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে থাকেন। কলকাতার যে অঞ্চল ধর্মতলা[৩] নামে পরিচিত—সেকালে সেটাই ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের সবার বড়ো কেন্দ্র। জয়রাম সেই ধর্মতলাতেই তুলেছিলেন তাঁর বসতবাটী। সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী ব্যক্তির মতো তাঁর একটি বাগানবাড়িও ছিল নদীর ধারে, পরে সেই জমি কোম্পানী খাস করে নেন ফোর্ট পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে।[৪]

ইতিপূর্বে ১৭৪১-৪২ অব্দে কলকাতার উপর মারাঠা বর্গীরা যখন হানা দেয়, কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ঘিরে একটি সুদীর্ঘ পরিখা তৈরী করেন বর্গীদের প্রতিহত করার জন্য। সে পরিখা 'মারাঠা ডিচ্'-নামে খ্যাত ছিল, পরে সেই পরিখার উপর মাটি চাপিয়ে সার্কুলার রোড নির্মিত হয়। এই পরিখা খননের কাজ তদারকী করার জন্য কোম্পানী জয়রামকে ভার দেন। এইসব নানা কাজকারবার, ঠিকাদারী ও দালালীতে নিযুক্ত থাকার ফলে জয়রামের বেশ অর্থাগম হতে থাকে।

কিশোরীচাঁদ মিত্র একটু লঘু পরিহাসের সুরে জয়রামের সৌভাগ্যলাভ বিষয়ে যা বলে গেছেন, সেকথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'জয়রামের সময়ে কোম্পানীর

সরকার ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ হাতে নেন। যেনতেন প্রকারেণ জয়রাম সে যুগের পি. ডব্লু. ডি. অর্থাৎ বাস্তুবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। দুর্গ নির্মাণের কাজ তদারকীর ভার ছিল এই বিভাগের উপর ন্যস্ত। নির্মাণ কার্য সমাধা হতে প্রচুর বিলম্ব ঘটায়, প্রচুর টাকা খেসারত দিতে হয়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার থেকে শুরু করে সর্দার-মিস্ত্রি পর্যন্ত যারাই একাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সকলেই টাকা কামাই করেছিল বিস্তর। এই টাকা কামাইয়ের ব্যাপারে জয়রাম তাঁর গোরা প্রভুদের অনুবর্তী হতে পেরেছিলেন কিনা—সেকথা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে সেকালে তত্ত্বতদারকীর কাজে সরকারের ঢিলেমী ছিল বেজায়, অনেক সময় কাজ কিছু হতই না। উপরন্তু কর্মচারীদের মধ্যে সততা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এমত অবস্থায় চারিদিকের প্রলোভন থেকে জয়রাম নিজেকে মুক্ত রাখলেই সেটা হত বিস্ময়ের। সে যাই হোক না কেন, জয়রাম যখন দেহরক্ষা করেন তখন তাঁর অর্থবিত্ত প্রচুর না হলেও দিব্য সচ্ছল অবস্থা...”[৫]

হতে পারে কিশোরীচাঁদ উপরোক্ত কথাগুলি যথাযথ পারম্পর্য রেখে বলেননি। বলা হয়, জয়রাম দেহরক্ষা করেন ১৭৬৫ অব্দে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম্ নূতন করে নির্মিত হয় পলাশী যুদ্ধেরও (১৭৫৭) এক বছর পরে। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফীর[৬] মতে, যুদ্ধের পর ক্লাইভ যখন নূতন ফোর্ট নির্মাণ করার কাজ হাতে নেন, জয়রামের ছেলে গোবিন্দরামকে নিযুক্ত করা হয় তত্ত্বতদারকীর কাজে। ওদিকে জেমস্ ফাবেল জয়রামের মৃত্যু-তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, ১৭৬২ অব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের ঘটনাবলী এমন কিছু প্রাচীন নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে কাহিনীকারদের মধ্যে এমনি মতভেদ যে সন তারিখ কিংবা ঘটনা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া শক্ত।

সে যাই হোক, জয়রাম স্বয়ং কিংবা তাঁর দুই ছেলের মধ্যে যে-কেউ ফোর্ট নির্মাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকুন অথবা নাই থাকুন, ঠাকুর পরিবার কোম্পানির দৌলতে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ধর্মাধর্ম নিয়ে যাঁরা খুঁতখুঁতে ছিলেন না, সুযোগসুবিধা সন্ধানে যাঁরা তৎপর ছিলেন, তাঁদের তখন রোজগারের পথ খোলা ছিল চতুর্দিকে। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ নিয়ে একবার দুর্ভাবনা যে না হয়েছিল এমন নয়—বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেই যেবার সসৈন্যে কলকাতা প্রবেশ করেছিলেন, সেবার কুঠিবাড়ির লাটসায়েবকে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছেড়ে ভাটি পথে পালাতে হয়েছিল ফলতার দিকে। কিন্তু সে আর কত দিনের জন্যেই বা—নবাবের এই হঠকারিতাই তো ক্লাইভকে এমন ছুতো জোগাল যার ফলে একদিন বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। সওদাগরী কোম্পানী হয়ে গেল দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা। বলা হয় যে-লোক অপরের টাকার থলে নিয়ে চম্পট দেয়—সে চোর, কিন্তু যে রাজার মাথার মুকুট চুরি করতে পারে সে ইতিহাসের চোখে বীরপুরুষ। ক্লাইভ ছিলেন একাধারে চোর ও বীরপুরুষ—এদেশ থেকে বহু টাকার থলে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন সত্য,

কিন্তু এদেশের মুকুটটাও চুরি করেছিলেন স্বদেশের জন্য।

সেই সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। শুরু থেকেই তা যুক্ত হয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে। পরপদানত ভারতের আধুনিক যুগে উদ্‌বর্তন ও রূপান্তরও ঘটে এইভাবে। এইভাবেই ব্যাজস্তুতির ঘুর-পথে কোনো ব্যক্তি বা দেশের অদৃষ্টে উদ্‌বর্তন-পরিবর্তন ঘটে থাকে।

জয়রামের ছিল চার পুত্র ও একটি কন্যা। আনন্দীরাম নামে তাঁর ছেলেটি জয়রাম জীবিত থাকতেই অকালে মারা যায়। বেঁচে থাকলে সে যে কী হত বলা যায় না, কারণ অল্প বয়সেই সে ইংবাজী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিল। অবশিষ্ট তিন ছেলের মধ্যে গোবিন্দরামের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে নবনির্মিত ফোর্ট উইলিয়ম্-এর সূত্রে। অপর দুই ছেলে—নীলমণি ও দর্পনারায়ণ থেকে কলকাতার ঠাকুর পরিবারের দুটি প্রধান শাখার উদ্ভব।[৭]

গঙ্গার তীরে পাথুরিয়াঘাটায় নীলমণি ও দর্পনারায়ণ যুগ্মভাবে একটি বিরাট বসতবাটী নির্মাণ করেন। ১৭৬৫ অব্দ অবধি দু'ভাই ছিলেন একান্নবর্তী। সেবছরেই ক্লাইভ বাংলা-বিহার-ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের জন্য দিল্লি-সম্রাটের সনদ লাভ করেন। ওড়িশার নূতন কলেক্টরেট-এ নীলমণি সেরেস্তাদাররূপে নিযুক্ত হন। দাদার অনুপস্থিতিতে ভাই দর্পনারায়ণই পাথুরিয়াঘাটা পরিবারের দেখাশুনা করতেন ও সেই সঙ্গে বেশ কিছু অর্থোপার্জনও করতেন চন্দননগরস্থিত ফরাসী কুঠিবাড়ীর দেওয়ানরূপে। বলা হয়—ওড়িশা থেকে বদলি হয়ে নীলমণিকে যেতে হয় চট্টগ্রামে।[৮] সে যা-ই হোক না কেন, তিনি বেশ কয়েক বছব ঘরসংসার ছেড়ে নির্বাসিতের জীবনযাপন করছিলেন। নিজের খরচ ছাড়া উদ্বৃত্ত যা-কিছু থাকত সবটা পাঠিয়ে দিতেন দর্পনারায়ণের কাছে।

বহুবছর বিদেশে চাকরি করার পর নীলমণি যখন পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে ফিরলেন, দু'ভাই যখন কপাল ফেরাতে ব্যস্ত, দেখা গেল অলক্ষ্যে শনি প্রবেশ করে উভয়ের মধ্যে বিসম্বাদ সৃষ্টি করে গেছেন, সম্বন্ধে চিড় ধরেছে। নীলমণি বিদেশ থেকে যেসব টাকাকড়ি পাঠাতেন তার হিসাব নিয়েই কলহের সূত্রপাত। রাগে অভিমানে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নীলমণি ভদ্রাসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিন ছেলে ও এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে—তাঁর একহাতে তখন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের[৯] শালগ্রামশিলা অপর হাতে এক লাখ টাকা ভরতি একটি থলে। দর্পনারায়ণ বলে দিলেন নীলমণির ভাগে ওই লক্ষ টাকাই প্রাপ্য—সুতরাং তার বাইরে পাই পয়সাটাও দেবেন না।[১০]

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরূপে নীলমণির সুনাম ছিল, লোকে জানত তিনি ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর বিপদের কথা শুনে জোড়াবাগানের ধনাঢ্য বণিক, বৈষ্ণবদাস শেঠ তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে আমন্ত্রণ করে আনলেন নিজ বাটীতে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁদের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন জীউর নামে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এক খণ্ড জমি দেবত্ররূপে লিখে দিলেন। শেঠ স্বয়ং ছিলেন

নিষ্ঠাবান হিন্দু, পবিত্র গঙ্গাজলের তিনি ছিলেন জিম্মেদার। ঘড়ায় গঙ্গাজল ভরে, তার মুখখানা ঝালাই করে, সীলমোহরে তাঁর স্বাক্ষরসুদ্ধ ঘড়া চালান যেত বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে। আসল জিনিস বলে লোকে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল দাম দিয়ে কিনত।

১৭৮৪ অব্দে[১১] নীলমণি সেই দেবত্র জমির উপর ছোটখাটো একটি বসতবাটী তুললেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, সে বাড়ি ছিল নিতান্তই 'কুঁড়েঘর'—কারণ তখন নীলমণির অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পরিবারবর্গের বসবাসের একটা ব্যবস্থা করার পর নীলমণি পুনরায় ওড়িশায় চাকুরী নিলেন, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের ধারণা, তা হৃত অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য। ইতিমধ্যে লোকমুখে ভ্রাতৃবিরোধের ব্যাপারটা রাষ্ট্র হবার ফলে দর্পনারায়ণ একপ্রকার বাধ্য হয়ে একটু নরম হলেন, এবং নীলমণির অংশের পৈতৃক বিষয়-আশয়ের মূল্য দিয়ে দিলেন। সে টাকায় নীলমণি আরো কিছু জমি কিনে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি ইমারত তুললেন। সে বাড়ি থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদ্ভব—যা নাকি পরে পরিণত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ও নীলমণি বংশের প্রখ্যাত সন্তান রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে। যখন এবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়, জোড়াসাঁকো অঞ্চল নিকটবর্তী মাছের বাজারের নাম অনুসারে মেছুয়াবাজার নামে পরিচিত ছিল।

নীলমণি দেহরক্ষা করেন ১৭৯৩ অব্দে।[১২] তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী ছিলেন চেঙ্গুটিয়া ঘোষাল পরিবারের কন্যা। তাঁর গর্ভে জাত তিন পুত্রের নাম রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ, একমাত্র কন্যা সন্তানের নাম কমলমণি।[১৩] জ্যেষ্ঠ রামলোচন ছিলেন পিতার মতো প্রখর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন। তিনভাই পৈতৃক বিষয়-আশয়ের অংশ সমান তিন ভাগে পেয়ে থাকলেও রামলোচন তাঁর অংশটুকু বাড়িয়ে নিয়েছিলেন জমিজমা বিষয়সম্পত্তি কিনে। যশোহরের রামকান্ত রায়ের কন্যা অলকাসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন রামলোচন। তাঁদের একটি মেয়ে হয়ে শৈশবে মারা যায়, তারপর সন্তানাদি হয়নি।

রামলোচনের পিতা নীলমণি ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ ও গোঁড়া বৈষ্ণব, রামলোচন কিন্তু আদৌ সেরকম ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত উদারপন্থী মানুষ, জীবনটা পুরোপুরি উপভোগ করতে চাইতেন এবং অন্যান্য ধনী লোকের মতো জনপ্রিয় নাচ গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দেশ পুরোপুরি ইংরেজদের দখলে আসার পর, মুর্শিদাবাদের রাজধানী তুলে দিয়ে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হয়। তার ফলে বিত্তশালী অভিজাতবর্গ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। তাঁদের পিছু পিছু চলে আসে তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট বহু নট-নটী, কালোয়াত-তবলচি, বাঈজী, সেতারী, গণিকা-বারাঙ্গনা। তাদের অনেকে আশ্রয় নেয় চিৎপুরে—কারণ চিৎপুর তখন ছিল দিশী পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এইসব গাইয়ে-নাচিয়েদের একজন সমঝদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাবু—রামলোচন। প্রতিদিন বিকালে তাঞ্জাম

চেপে রামলোচন হাওয়া খেতে বেরোতেন; প্রায়ই যেতেন পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানে তাঁর আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ততদিনে আত্মীয়-গুরুজনদের রেষারেষির ব্যাপারটা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত, সকলের সঙ্গে সবার সদ্ভাব।

নীলমণির মেজছেলে রামমণি কাজ করতেন কলকাতার পুলিশ বিভাগে। তাঁর দুই বিবাহ—প্রথমা স্ত্রী মেনকা ছিলেন দাদা রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরীর সহোদরা। মেনকার গর্ভে রামমণির দুই ছেলে—রাধানাথ ও দ্বারকানাথ। দ্বিতীয়া স্ত্রী দুর্গামণির এক ছেলে ও এক মেয়ে—ছেলের নাম ছিল রামনাথ।

নীলমণির ছোট ছেলে রামবল্লভ কটকের আদালতে কাজ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। পরে অবশ্য জমিজমা কিনে তিনিও হয়েছিলেন জমিদার। তবে রামবল্লভ কিংবা তাঁর সন্তানসন্ততি সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

ঠাকুরবাবুদের দুটি প্রধান শাখার বসবাস ছিল জোড়াসাঁকোয় ও পাথুরিয়াঘাটায়। পঞ্চাননের কাকা শুকদেবের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র থেকে তৃতীয় শাখার উদ্ভব। এঁদের তত নামডাক ছিল না—এঁরা চোরবাগানের ঠাকুর বলে খ্যাত।

## টীকা

১. দ্রঃ *The Sabarna Choudhurys of Barisha*. ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯ তারিখে কলকাতার *The Statesman* দৈনিকের পৃ. ৮-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ।

২. কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর *Memoir*-এ জয়রাম প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাস্তবিক পক্ষে তিনিই ছিলেন ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা।' পৃ. ৩।

৩. কয়েক বছর হল ধর্মতলার পুরাতন পরিচিত নাম বদলে নাম দেওয়া হয়েছে—'লেনিন সরণি'।

৪. 'সমকালীন' পত্রিকার পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যার পৃ. ৫৪৩-৫৫০-এ ক্ষীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করেছেন :

(ক) ১৮১৩ অব্দে জয়রামের প্রপৌত্র রাধাবল্লভ ঠাকুর বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেন তা থেকে জানা যায়, জয়রামের বসতবাটি অবস্থিত ছিল ধন্নসই-এ—পরবর্তীকালের ধর্মতলা অঞ্চলে। বসতবাটী সংলগ্ন জমির উপরেই ছিল তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি। তাঁর একটি বাগানবাড়িও ছিল বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ামের সন্নিহিত অঞ্চলে।

(খ) পলাশীযুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বে সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনী যখন কলকাতা আক্রমণ করে, জয়রামের পৈতৃক ভিটা ও গৃহদেবতার মন্দিরের উপর তারা হামলা করেনি, হামলা করেছিল কোম্পানীর সেপাইরা—কলকাতা পুনরধিকারের সময়। শহর অবরুদ্ধ থাকাকালে জয়রামের স্ত্রী গঙ্গাদেবী মানত করেছিলেন—পরিবারবর্গ যদি ধনেপ্রাণে রক্ষা পায়, তিনি গায়ের সমস্ত গহনা উৎসর্গ করে দেবেন লক্ষ্মীজনার্দন জীউ-র সেবার জন্য। পলাশী যুদ্ধে কোম্পানীবাহাদুর জয়লাভ করার পর তিনি একটি দলিল সম্পাদন করে তাঁর ১৩,০০০ টাকা মূল্যের গহনা দেবত্র করে দিয়েছিলেন।

৫. *Memoir*, পৃ. ৩-৪।

৬. 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড।

৭. নীলমণি ও দর্পনারায়ণ দু'ভাইয়ের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ—তাই নিয়ে কাহিনীকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিচ কিশোরীচাঁদ মিত্র ও জেমস্ ফারেল্ উভয়েই মনে করেন, দর্পনারায়ণ বয়সে বড়ো ছিলেন, *Memoir* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের সম্পাদক, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত তাঁর টীকায় নীলমণিকেই জ্যেষ্ঠ বলেছেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-গ্রন্থের লেখকদ্বয় এই মত সমর্থন করেন। মনে হয়, উভয় শাখার উত্তরপুরুষেরা নিজ নিজ পূর্বপুরুষকে জ্যেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেয়ে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮২২ অব্দে এইচ টি. প্রিন্সেপ-এর জন্য রাজা রাধাকান্তদেব কলকাতার দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় যে পাঁচিশটি পরিবারের তালিকা সংকলন করে দিয়েছিলেন, সেই তালিকায় পাথুরিয়াঘাটা এবং জোড়াসাঁকো উভয় শাখার ঠাকুরবাবুদের (তালিকায় পীরালি ব্রাহ্মণ ও ভগ্নকুলীন বলে বর্ণিত) বিষয়ে বলা হয়েছিল 'ফরাসী কুঠিবাড়ির দেওয়ান দর্পনারায়ণের বংশধর।' দ্রঃ Calcutta; Myth and History : Table 4; প্রকাশনা : S. N. Mukherjee, কলিকাতা ১৯৭৭।

৮. অমৃতময় মুখোপাধ্যায় বলেন (দ্রঃ 'সমকালীন' পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৪৩-৫৫০), নীলমণির প্রথম চাকুরীস্থল ছিল চট্টগ্রাম। ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের পর তিনি যখন পৃথক হয়ে জোড়াসাঁকোয় বসবাস পত্তন করেন, তার ঠিক পরবর্তীকালে স্বীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি অপর একটি চাকুরী গ্রহণ করে ওড়িশা যান।

৯. নীলমণি ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর ভাই দর্পনারায়ণ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিলেন শিবের উপাসক। নীলমণি পাথুরিয়াঘাটা থেকে যে লক্ষ্মীজনার্দন-বিগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন, তা এখন আছে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে। এখনো তাঁর নিত্য সেবা হয়।

১০. সাধারণ্যে এই কাহিনীই বহুল প্রচলিত। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন : 'পূজ্যপাদ পিতামহদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গৃহে পরিবারস্থ পুত্রকন্যাদিগকে উপদেশদান কালে বলিয়াছিলেন : আমার প্রপিতামহ নীলমণি ঠাকুর। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত কলহ করিয়া এইস্থানে আমাদের ভদ্রাসন স্থাপিত করিলেন। বিশ্বস্ত হৃদয়ে তিনি দর্পনারায়ণের সহিত কলহ করিয়া এইস্থানে আমাদের ভদ্রাসন স্থাপিত করিলেন। বিশ্বস্ত হৃদয়ে তিনি দর্পনারায়ণের নিকট অনেক মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পরে অস্বীকার করিলেন। তিনি কহিলেন, তুমি আমার নিকট মুদ্রা রাখ নাই। তাহাতে আমার প্রপিতামহ এইমাত্র বলিলেন—তুমি ধর্মসাক্ষী করিয়া বলিলে আমি আর তোমাকে কিছুই বলিব না। তিনি তাহাই করিলেন; সুতরাং ইনি কেবল একটি শালগ্রাম ঠাকুরকে তাঁহাদিগের গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া এই গৃহে স্থাপিত করিলেন।' ধর্মভাবে-প্রণোদিত হলেও এ কাহিনী অ-প্রামাণিক। এই বহু বিতর্কিত পারিবারিক কলহ সম্বন্ধে অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন' পত্রের ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নীলমণি নামমাত্র মূল্যে একখণ্ড জমি খরিদ করেন। 'প্রথম চালাঘরটি বানানো হয়েছিল বর্তমান জোড়াসাঁকো বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে, বারাণসী ঘোষ লেন-এর সন্নিহিত একটি পুকুরের ধারে।...পরে ১৭৮৪ অব্দের জুন মাসে চিৎপুরের দিকে ভদ্রাসন স্থানান্তর করা হয়। যে পুকুরের ধারে চালাঘর তোলা হয়েছিল, সেটি ছিল অন্দর মহলের পুকুর—কেবল মেয়েরাই সে পুকুর ব্যবহার করতেন। কাছাকাছি ছিল আঁতুর ঘর। সেইখানেই কয়েক বছর পরে দ্বারকানাথের জন্ম হয়।'

১১. এটা ছিল এক ঐতিহাসিক বছর—এই বছরেই স্যার উইলিয়ম্ জোনস্ এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন।

১২. 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের লেখকদ্বয় নীলমণির বুদ্ধি, প্রতিভা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মহত্ত্ব, দূরদর্শিতা ও আত্মীয়-বাৎসল্য বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দ্রঃ কিশোরীচাঁদের *Memoir* বঙ্গানুবাদে কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের টিপ্পনী, পৃ. ২৫০-২৫২।

১৩. কমলমণির সঙ্গে কালীঘাটের হরিশ্চন্দ্র হালদারের বিবাহ দিয়ে নীলমণি হরিশ্চন্দ্রকে ঘরজামাই রাখেন। পরবর্তীকালে পরিবারের ইতিহাসে ঘরজামাই-প্রথার নানাবিধ কুফল ফলতে দেখা যায়। □

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# জন্ম ও ছেলেবেলা

নীলমণির দ্বিতীয় পুত্র রামমণি ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী মেনকার দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তানরূপে দ্বারকানাথ ভূমিষ্ঠ হন ১৭৯৪ অব্দে[১]। সেই সময়ে রামলোচনের স্ত্রী ও মেনকার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অলকাসুন্দরীরও একটি কন্যা সন্তান হয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে কন্যাটির শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। মেনকা জানতেন একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য তাঁর দিদির মনে আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন তাঁর শোকে কাতর অবস্থা দেখে মেনকা তাঁর নবজাত পুত্রটিকে অলকার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, 'দিদি, এ-ছেলে তোমার, একে তুমি পোষ্যপুত্র নাও।' পুত্রের জন্মদান করার অল্পকাল পরে মেনকা পরলোক গমন করেন। পরিবারে বলা হত, দ্বারকানাথ তাঁর দত্তক মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রাপ্য স্নেহযত্ন পূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলেন। রামলোচনের বিষয় সম্পত্তি ছিল; পোষ্যরূপে দ্বারকানাথ উত্তমরূপে লালিত পালিত হবে এবং কালে জ্যেষ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী হবে—এইসব কথা ভেবে পিতা রামমণি পুত্রকে দত্তক দিতে ইতস্তত করেন নি। লিখিত-পঠিত মতো দ্বারকানাথ যদিচ ১৭৯৯ অব্দে[২] পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন, একপ্রকার জন্মাবধিই তিনি তাঁর দত্তক-পিতামাতার বাড়িতে তাঁদের আদরে-যত্নে মানুষ হয়েছিলেন।

বাল্য অবস্থায় দ্বারকানাথকে বাংলা ও সংস্কৃতে প্রথম পাঠ নেবার জন্য কোনো প্রাইমারি স্কুলে বা পাঠশালায় পাঠানো হয়েছিল কিনা অথবা গৃহশিক্ষকরূপে তাঁর জন্য কোনো পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা, সেবিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তখনকার দিনে সচরাচর বড়লোকদের বাড়িতেই পাঠশালা বসত। গুরুমশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে পাঠ নিতেন। পাড়ার ছেলেরা পড়তে আসত বাইরে থেকে, কিন্তু বড়লোকের ছেলেকে স্থানান্তরে পড়তে যেতে হত না। সুতরাং জোড়াসাঁকোর নিজবাটীতে দ্বারকানাথের বিদ্যারম্ভ হওয়াটা কিছু বিচিত্র হত না। বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইন-আদালত করতে হলে সেকালে আরবী-ফারসী শেখারও রেওয়াজ ছিল। অনুমান হয় সে উদ্দেশে রামলোচন কোনো মৌলভী নিযুক্ত করে থাকবেন। আইন-আদালতে ইংরেজীর প্রচলন হয় বিশ বছর বাদে।

পুত্রের ধর্ম ও সুনীতি শিক্ষার ভারটা দত্তক-মাতা অলকাসুন্দরী নিজের হাতেই

নিয়েছিলেন। বালক বয়সেই দ্বারকানাথকে তিনি পূজা ও জপ করতে শিখিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে যে দিদিমার কথা উল্লেখ করেছেন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায়—সেই দিদিমা ছিলেন এই অলকাসুন্দরী। দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ধর্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল গভীর। সারাদিন ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিটি খুঁটিনাটি যথানিয়মিত সম্পন্ন করতেন। প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে ফুলের মালা গেঁথে দিতেন। কোনো কোনো দিন ছাদের উপর রৌদ্রে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিতেন। এক এক দিন হরিবাসর করতেন, সমস্ত রাত কথা ও কীর্তন হত। অথচ নিজে সমস্ত সংসারের তত্ত্বাবধান করতেন। ধর্মে তাঁর আস্থা ছিল প্রবল, কিন্তু কুসংস্কার ছিল না, চিত্তের স্বাধীনতা ছিল। বিষয় কর্মে সহজ প্রবণতা ছিল পুত্র দ্বারকানাথের এবং গভীর ধর্মবিশ্বাস ছিল পৌত্র দেবেন্দ্রনাথের সহজাত—উভয়েই কিন্তু একান্তভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন ও তাঁর চারিত্রশক্তি দ্বারা আপন আপন স্বভাব অনুযায়ী প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছিল যে, যেসব পরিবার কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করতে কিংবা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী, তাদের ছেলেদের ইংরেজী ভাষা ভালো করে শিখতে হবে, কারণ ইংরেজী তখন রাজভাষা হতে চলেছে। স্বয়ং রামমোহন, সেই সময়ে তাঁর ত্রিশ বছর বয়সের কাছাকাছি, নিজেই ইংরেজী শিখতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং ১৮০৪ অব্দে যখন দ্বারকানাথের বয়স দশ বছর, তাঁকে চিৎপুর রোড-এ শেরবোর্ণ সায়েবের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখনকার চিৎপুর রোড-এর চেহারা ছিল একেবারে অন্যরকম। স্টকলর-রচিত 'হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে দৈনিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮৪৪ অব্দের ২৩ মে তারিখে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন ঃ 'কলকাতার অন্য কোনো অঞ্চল এতটা আগ্রহ-উদ্দীপক নয়। এখানে য়ুরোপীয় ধাঁচে তৈরি বিরাট বিরাট অট্টালিকার পাশাপাশি দেখা যায় সারি সারি ঘর-বাড়ি, যার সন্মুখভাগের স্থাপত্য পুরোপুরি এশীয় ধাঁচের। তার সঙ্গে রয়েছে দলে দলে ভাগ করা কিছু কিছু দোকান। প্রত্যেক দলের দোকানে একই ধরনের পসরা—দেশীয় লোকেদের প্রয়োজন মেটাবার মতো দৈনন্দিন বস্তু বা বিলাসের সামগ্রী। ভারতের অন্য কোনো শহরে ঠিক এই রকমটি দেখা যায় না।'

শেরবোর্ণ সায়েবকে নিয়ে নানারকম কাহিনী প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, তাঁর বাবা ছিলেন ইংরেজ এবং মা ব্রাহ্মণ-কন্যা। মায়ের কাছেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। নিজেকে তিনি 'বামুনের নাতি' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। বহু ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসত এবং তাদের বেশির ভাগই ছিল বড়লোক বাড়ির। এদের অনেকেই মাস মাহিনা ছাড়াও কিছু কিছু দানসামগ্রী আনত। সায়েব সেসব গুরু-আচায্যির মতো দক্ষিণারূপে গ্রহণ করতেন। দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয়

ছাত্র। বড় হয়ে তিনি যখন বড়লোক হন, যতদিন সায়েব বেঁচেছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁকে মাসোহারা দিতেন।[৩]

দ্বারকানাথ পাঠশালায় বাংলা শেখেন এবং শেরবোর্ণ সায়েবের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষায় প্রথম তালিম নেন। এই স্কুলে দ্বারকানাথ যেসব বই পড়েন তার মধ্যে ছিল 'এনফিলডস্ স্পেলিং', 'রীডিং বুক', 'তুতিনামা' অর্থাৎ তোতাকাহিনী, 'য়ুনিভারসেল লেটার রাইটার', 'কমপ্লিট লেটার বুক' এবং 'রয়্যাল ইংলিশ গ্রামার'।[৪] তখনকার কালে মুখস্তবিদ্যাকে বলা হত সবার সেরা বিদ্যা। দুঃখের বিষয় আজকের দিনেও মুখস্তবিদ্যার কদর কিছু কম নয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পড়ুয়াদের লোভ দেখিয়ে কিংবা উৎসাহ দিয়ে, শক্ত শক্ত শব্দের সুদীর্ঘ তালিকা মুখস্ত করতে শেখানো হত। কোনো কোনো ছাত্র সেই উৎসাহের বশে গোটা অভিধানটাই মুখস্ত করে ফেলত। সুখের বিষয় দ্বারকানাথের কাণ্ডজ্ঞান প্রখর ছিল বলে এবকম উৎকট কাজ করায় তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। প্রথম থেকেই তাঁর ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন—সায়েবদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে তাদের সঙ্গে কাজ-কারবার করা। শেরবোর্ণ-এর স্কুল ছেড়ে যাবার পরেও, রেভাঃ উইলিয়ম এডাম্-এর তত্ত্বাবধানে থাকাকালে, তিনি এ অভ্যাস ছাড়েন নি। রামমোহন রায়ের মতো, শিক্ষিত ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুভাবে আলাপ-পরিচয় করায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

দ্বারকানাথের বয়স যখন প্রায় তেরো, শেরবোর্ণ সায়েবের স্কুলে পড়ুয়া থাকাকালে, ১৮০৭ অব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখে তাঁর দত্তক-পিতার মৃত্যু হয়। রামলোচন বিচক্ষণ লোক ছিলেন, দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন বলে নিজের সব সম্পত্তিই তাঁকে উইল করে দিয়ে যান, তার মধ্যে ছিল শহর কলকাতায় অবস্থিত জমি ও বাড়ি এবং মফঃস্বলের জমিদারি। উইলে দেখা যায়, প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত দ্বারকানাথের বিষয়-সম্পত্তির সবকিছু দেখাশুনার ভার ছিল মাতা অলকাসুন্দরীর উপর।[৫]

বিষয়-সম্পত্তি সংরক্ষণে অলকাসুন্দরীর সহায় হয়েছিলেন দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ। জমিদারির মধ্যে ছিল কুষ্টিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণা এবং কটক জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ও বালিয়া দুইটি মহাল। এছাড়া ছিল কলকাতার কিছু বাড়ি। রামলোচনের মৃত্যুর সময় জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল ত্রিশ হাজারের বেশি নয়।[৬] উপরন্তু বিরাহিমপুরের প্রজাদের বিষয়ে একটা দুর্নাম ছিল এই যে, তারা সহজে খাজনা আদায় দিতে চায় না। সে যাই হোক, ত্রিশ হাজার টাকার বার্ষিক আয় সে যুগে এমন কিছু কম ছিল না, একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দ ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্টই ছিল—বিলাস-ব্যসনের কথা বাদ দিলেও। কিশোরীচাঁদ মিত্র এ বিষয়ে লিখেছেন ঃ 'দ্বারকানাথ লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন নি। যদিও অর্থের অভাব তাঁর ছিল না এবং বলতে কি সে অর্থ সেকালের একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্টই ছিল। তবু তাঁর আরো অর্থের প্রয়োজন ছিল। যে অভাববোধ কষ্টসাধ্য কর্মে প্রবর্তনা

দেয়, দ্বারকানাথ সেই অভাববোধের উর্ধ্বে ছিলেন না। জনৈক লেখক বলেছেন দারিদ্র্য ও বিলাসিতা উভয় প্রান্ত থেকে সমদূরবর্তী অবস্থাকে ভূগোলের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে পৌঁছালে মানসিক বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও দ্রুততর হতে থাকে। দ্বারকানাথের জীবন এই উক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ।'[৭]

যে গৃহ-পরিবারের পরিবেশে দ্বারকানাথ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তার আবহাওয়াও ছিল তাঁর চরিত্রগঠনে অনুকূল। তাঁর দত্তক-পিতামাতা উভয়েই স্ব-স্ব স্বভাবে বিশিষ্ট ছিলেন। রামলোচন ছিলেন উদারমনা দিলদরাজ মানুষ, বিষয়কর্মে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনি ভালো জিনিস উপভোগ করতেও ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি যে দ্বারকানাথকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পণ্ডিত-মৌলভীর আওতা থেকে বের করে নিয়ে শেরবোর্ণ সায়েবের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় রামলোচন তাঁর দূরদৃষ্টিতে নূতন যুগের ভোরের আলো দেখতে পেয়েছিলেন। মাতা অলকাসুন্দরীর চেহারা যেমন সুন্দর ছিল তেমনি স্নেহশীলা ও দয়াবতী ছিলেন তিনি। উদয়াস্ত ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না।[৮] জোড়াসাঁকো গৃহ-সংসারের তাবৎ কর্ম তিনি যেমন নিপুণ হস্তে সম্পন্ন করতেন, তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর খুবই দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রাধানাথের সহায়তায় নাবালক দ্বারকানাথের শিক্ষাদীক্ষা, মফঃস্বলের জমিদারি ও কলকাতার বিষয়-আশয়ের পরিচালনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর প্রতি দ্বারকানাথের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।[৯] ১৮৩৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়, সুতরাং দীর্ঘ একচল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দ্বারকানাথের চরিত্রগঠনে সহায়তা করেছিল।

ষোল বছর বয়সে লেখাপড়ার পাট সাঙ্গ করে ১৮১০ অব্দে মাতা অলকাসুন্দরী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথ স্বয়ং পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে জমিদারি পরিচালনা সহজ ছিল না। ১৭৯২ অব্দে কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী রাজস্বের বন্দোবস্ত করে যে-সব খসড়া আইন বিধিবদ্ধ করেন, সেগুলি জটিল ছিল বলে, রাজস্ব আইন খুব কম লোকই ভালো করে বুঝত। যথাসময়ে খাজনা আদায় দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে চড়ত ও হস্তান্তর হত। বিচার-বিভাগের কাজও কম জটিল ছিল না। উত্তরাধিকার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ক মামলা ইংরেজ জজ নিষ্পত্তি করতেন পণ্ডিত ও মৌলভীদের সহায়তায়। তাঁরা নিজ নিজ ধর্মীয় বিধিবিধান বা লোকাচার বিষয়ে জজ সায়েবদের অবহিত করতেন। আপীল শোনা হত কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে। কোম্পানী সরকারের নিজস্ব বিধিবিধান কিছু ছিল—সেসব মামলার আপীল নিষ্পত্তি হত কলকাতারই সুপ্রীম কোর্ট-এ। সেখানে বলবৎ ছিল ব্রিটিশ আইন। সুতরাং আদালত ছিল দু'টি এবং বিচারের প্রণালী নির্ধারিত

হত হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারে।

খুব কম জমিদারই তখন রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের খুঁটিনাটি অথবা সদর দেওয়ানী আদালত কিংবা সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারপদ্ধতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু আইন না জানার ফলে মামলা মোকদ্দমা যে কিছু কম হত তা নয়। নীলমণি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'এ বেঙ্গল জমিন্দার' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'অধিকাংশ স্থলে মামলা-মোকদ্দমা করে কিছু লাভ না হলেও, গ্রামদেশের লোকেরা মামলা-মোকদ্দমা করতে খুব ভালোবাসত। প্রজাদের এই মামলাবাজ মনোবৃত্তি জমিদারের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর হত, ঠিক তেমনি ক্ষতিকর হত এক শ্রেণী দালালদের কার্যকলাপ। রায়ত ও জমিদারদের মধ্যবর্তী হয়ে এরা কেবলি উশকানি দিত পরস্পরের মধ্যে মামলা বাঁধাতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বহু জমিদারি অল্পকালের ব্যবধানে হাতবদল হবার জন্য গ্রামের মোড়ল শ্রেণীর ব্যক্তিরা গ্রামসমাজে ক্রমেই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। জরিপ-জমা সংক্রান্ত নথিপত্র তাদের হাতে থাকার ফলে তারা জমিদারের গোমস্তাদের সঙ্গে যোগসাজসে জমিদারকে নানাভাবে নাজেহাল করতে পারত।'[১০] তদুপরি ছিল স্থানীয় মহাজন, পুরুত ও মোল্লাদের দল—ঘোঁট পাকাতে এরা সবাই ছিল ওস্তাদ। এইরকম অবস্থায় বেশির ভাগ জমিদার নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চক্রান্ত করে কিংবা ভয় দেখিয়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইনে করা গুণ্ডা-লাঠিয়ালের সাহায্যে, প্রজাদের শায়েস্তা রাখার চেষ্টা করত।

কিন্তু তরুণ দ্বারকানাথ ছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী মানুষ। তখনো তিনি নাবালক, যৎসামান্য লেখাপড়া কিছু করেছেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে তাঁকে দেশের আইনকানুন ও রাজস্ব ব্যবস্থা ভালো করে জেনে নিতে হবে। শহরে মফঃস্বলে নিজের জমিজমা সরেজমিনে তদারকি করার ফাঁকে ফাঁকে, দ্বারকানাথ সেকালের অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার রবার্ট কাট্‌লার ফার্গুসন[১১] সায়েবের কাছে আইনশাস্ত্রের মুখ্য নীতি ও কোর্ট কাছারিতে আইনের প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ বলেন ঃ 'যে দু'জন ব্যক্তি তাঁর প্রথম জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা হলেন রামমোহন রায় এবং মিঃ কাট্‌লার ফার্গুসন। রামমোহন তাঁর মনন শক্তি উদ্বোধনে সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁর আইন বিষয়ক চিন্তাকে জাগ্রত করেছিলেন ফার্গুসন। একজন গুণী চিত্রকরকে দিয়ে দ্বারকানাথ ফার্গুসন সায়েবের একখানি তৈলচিত্র আঁকিয়েছিলেন। তাঁর বৈঠকখানা বাড়ির চিত্রশালায় আজো সেই চিত্র বিরাজ করছে।'[১২]

দ্বারকানাথের যখন সতের বছর বয়স[১৩] যশোহর নরেন্দ্রপুরের পীরালি-পরিবারের কন্যা দিগম্বরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দিগম্বরীর বয়স তখন নয়, পিতার নাম রামতনু রায়, মাতা আনন্দময়ী। দিগম্বরী ছিলেন পরমাসুন্দরী, যেমন তাঁর মুখশ্রী তেমনি অঙ্গ

সৌষ্ঠব। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো তিনি যেখানেই যেতেন সৌভাগ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দ্বারকানাথের গৃহলক্ষ্মীরূপে যেদিন তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পদার্পণ করেন সেদিন থেকে ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরপক্ষে বলা হয়, নরেন্দ্রপুর আগে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, কিন্তু বিবাহের পর দিগম্বরী কলকাতায় চলে আসার পর সে গ্রাম হৃতশ্রী হয়ে যায় এবং বহু লোক গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। এইসব কারণে লোকে বলত, দিগম্বরী ছিলেন লক্ষ্মীর অবতার। বলা হয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির পূজায় যে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়া হত তাঁর মুখমণ্ডল রচিত হত দিগম্বরীর মুখের আদলে।[১৫] পরিবারেব প্রবীণারা তাঁর রূপলাবণ্যের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতেন—বলতেন, দুধে-আলতায় রঙ, চাঁপার কলির মতো আঙুল, সুঠাম দেহভঙ্গিমা ও ঘনকুঞ্চিত কেশ। বয়সে বালিকা হলেও তিনি খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন এবং নীলাম্বরী শাড়ি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

দিগম্বরী পরম নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর সুরূপা শাশুড়ীকেও হার মানাতেন। অলকাসুন্দরী স্বভাবসংযত ছিলেন বলে ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারেও তাঁর কোনো আতিশয্য ছিল না। কিন্তু বধূ দিগম্বরী অধিকাংশ সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন। প্রতিদিন ভোর চারটার সময় উঠে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতেন। স্নানান্তে তিনি বসতেন হরিনাম জপ করতে। তাঁর জপের মালায় ছিল এক লক্ষ গুটি—তার অর্ধেক অংশ প্রাতে সমাপন করে তিনি যৎসামান্য আহার করতেন—দুধ ও ফল। পরান ঠাকুর তাঁর পূজা ও রান্নাবান্নার উপকরণ যোগান দিত। আহারে তিনি ছিলেন গোঁড়া নিরামিষাশী, পেঁয়াজ পর্যন্ত তাঁর হেঁসেলে প্রবেশ করতে পারত না। দুপুরে সামান্য স্বপাক আহারের পর তিনি বাংলায় শাস্ত্রপাঠ করতেন। আবার বিকেলবেলা মুখ হাত ধুয়ে বাদ বাকি পঞ্চাশ হাজার হরিনাম জপ করতেন। অতঃপর দয়া বৈষ্ণবী নামে একটি স্ত্রীলোক এসে প্রায়ই শাস্ত্রপাঠ করে শোনাতেন। তারপর সন্ধ্যা সেরে দিনান্তে তিনি তাঁর অন্নগ্রহণ করতেন। একাদশীতে তিনি কেবল ফলমূল খেয়েই কাটাতেন। বছরের মধ্যে চারটি বিশেষ একাদশীর দিনে তিনি নিরম্বু উপবাস পালন করতেন। বয়োজ্যেষ্ঠারা যদিবা তাঁকে বলতেন যে সধবার একাদশী পালনে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে, তিনি ঘোরতর আপত্তি করতেন। অলকাসুন্দরীকে তিনি বুঝিয়ে দিতেন ও জোর করে বলতেন যে তাঁর উপবাসে স্বামীর কোনো অমঙ্গল ঘটতে পারে না।

স্ত্রী পরমা সুন্দরী হলে কি হয়, যদি তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্তা হন, কী করে তিনি দ্বারকানাথের মতো প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপিত তরুণের যোগ্য সঙ্গিনী হবেন? সৌভাগ্যক্রমে ঘরের বাইরে তাঁর এত শত কাজকর্ম থাকত যে অন্তঃপুরে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় দ্বারকানাথের ছিল না। সেকালে সদর ও অন্দরের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। দ্বারকানাথ-দিগম্বরীর বিবাহিত জীবন কেমন ছিল সেবিষয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। দ্বারকানাথ যে

সুবিবেচক ছিলেন এবং দিগম্বরী সাধ্বী ও পতিব্রতা ছিলেন—সেকথা সর্বস্বীকৃত। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারি মাসে দিগম্বরী পরলোকগমন করেন। তাঁর আটাশ বছরের দাম্পত্য-জীবনে তিনি একটি কন্যা ও চারটি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।[১৫-১৬]

বিবাহের এক বছর পরেই দ্বারকানাথ সাবালক হন এবং একা হাতে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বতদারকি করতে শুরু করেন। তাঁর মনে যেমন সাহস ছিল তেমনি ছিল কল্পনার দৌড়, বৃহৎ কাজ-কারবার গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল তাঁর সহজাত। কেমন করে তাঁর উত্তরাধিকার বহুগুণিত করা যায়—সর্বদা তার সুযোগ-সুবিধা সন্ধান করতেন। পরবর্তী জীবনে বিলাসে ব্যসনে তিনি দু'হাতে খরচ করতেন ও টাকা ওড়াতেন বলে একটা দুর্নাম রটেছিল। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের সূচনায় পারিবারিক সংসার খরচের অতিরিক্ত যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, সে সঞ্চয় বিনিয়োগ করে তিনি উপার্জন বৃদ্ধি করায় যত্নবান ছিলেন। সেই সময়ে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রক্ষার মতো কোনো ব্যাঙ্ক ছিল না। অনেকে জমানো টাকা ধার দিতেন চড়া সুদে এবং তাতে বেশ রোজগার হত। কোম্পানীর য়ুরোপীয় কর্মচারীদের অনেকেই ছিলেন অমিতব্যয়ী, মাসের শেষে তাঁদের টাকায় টান পড়ত যখন, তাঁরা মরীয়া হয়ে ঋণের সন্ধান করে বেড়াতেন। একথা সুবিদিত, রংপুরের চাকুরীতে ইস্তফা দেবার পর রামমোহন রায় যখন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন, তখন তেজারতী কারবার করে তাঁকে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে হত। এভাবে টাকা খাটানোর রেওয়াজ অন্দরেও চালু ছিল। নীলমণি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'এ বেঙ্গল জমিন্‌দার' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'বিষয়কর্মে বিচক্ষণ মহিলারাও সেকালে সংসার খরচের টাকা থেকে পরস্পরের মধ্যে ধারধোর দিয়ে একটা উপরি আয়ের ব্যবস্থা করতেন। শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জননী এইভাবে কিছু রোজগার করতেন।'

দ্বারকানাথ জমানো টাকা কেবল যে তেজারতী কারবারে নিয়োগ করতেন এমন নয়, খাজনার কিস্তি খেলাপের জন্য যখনই কোনো জমিদারি সুবিধামত দরে নীলামে উঠত তিনি অমনি তা কিনে নিতেন। সেই সঙ্গে তিনি জমিজমা সংক্রান্ত আইনকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন। এছাড়াও তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল হিন্দু ও মুসলিম বিধানতন্ত্র, কোম্পানীর বিভিন্ন রেগুলেশন্ এবং সুপ্রীম কোর্ট, সদর ও জেলা আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ ও অন্যান্য আইনের প্রয়োগরীতি। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্রিটিশ আইন এবং ব্রিটিশ আদালতের বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন রবার্ট কাটলার ফার্গুসন-এর কাছ থেকে। আইনে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে, শেরবোর্ণ সায়েবের কাছে শেখা ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞানও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে থাকবে। এ বিষয়ে তাঁকে আর যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়ম এডাম্[১৮], জে. জি. গর্ডন এবং জেমস্ কল্‌ডার। এই শেষোক্ত দুজন ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটোশ এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার। এঁরা বাণিজ্য করতেন আবার দালালিও করতেন। এডাম্

কেবল যে ইংরেজী শিক্ষায় দ্বারকানাথকে সাহায্য করতেন এমন নয়, কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আখেরে সুবিধা হতে পারে, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অমায়িক আচরণের জন্য দ্বারকানাথ য়ুরোপীয় সমাজে বেশ কয়েকজন বন্ধু লাভ করেছিলেন।

দ্বারকানাথ তখনকার বাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় আইনজ্ঞ ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল বলে বড় বড় রাজা জমিদারেরা মামলা-মোকদ্দমায় তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যশোহরের রাজা বরদাকান্ত রায়, ত্রিপুরার মহারাজা, কাশিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়, রানী কাত্যায়নী প্রভৃতি। সুতরাং উকিল না হলেও কার্যত তিনি একপ্রকার ওকালতি ব্যবসা খুলেছিলেন এবং মোটা 'ফী' আদায় করতে পারতেন। আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত দলিল কিংবা দরখাস্ত তিনি সুদক্ষভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিতে পারতেন বলে বহু মক্কেল তাঁর কাছে আসত। তখনকার দিনে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের জন্য 'ফী' ছিল লাইন প্রতি একটি করে ডবল গিনি। প্রপৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমান, এইভাবে দ্বারকানাথ মাসে মাসে বহু সহস্র টাকা উপার্জন করতেন।[১৯]

সুতরাং সাবালক হবার কয়েক বছরের মধ্যে দ্বারকানাথ উপার্জনের একাধিক রাস্তা সন্ধান করে পেয়েছিলেন। তাঁর সুদক্ষ ও ব্যক্তিগত পরিচালনার ফলে পৈতৃক বিষয়-আশয়ের আয় বহুগুণিত তো হয়েই ছিল, উপরন্তু নীলামে সুবিধা দরে কতিপয় লাভজনক জমিদারি ক্রয় করে উপার্জন বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রথম বয়সে মিতব্যয়িতার ফলে তাঁর প্রচুর অর্থ জমত, সেই সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেও তিনি কম লাভবান হননি। ক্ষিতীন্দ্রনাথের আনুমানিক হিসাবে, গড়পড়তা বছরে প্রায় ৫০ হাজার টাকা জমানো তাঁর পক্ষে আশ্চর্য ছিল না। জমিদারির আয় ছাড়াও আইন উপদেষ্টার 'ফী' বাবদ এবং তেজারতী কারবারে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উত্তমর্ণদের কাছ থেকে প্রাপ্য সুদের খাতেও তাঁর আয় কিছু কম হত না।[২০] টাকা পয়সা খাটাতে গিয়ে অনাদায়ের ঝুঁকি নিতে তিনি পেছুপা ছিলেন না সত্য, কিন্তু ফাটকাবাজিতে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না এবং কখনো তিনি একই ঘরে তাঁর সকল ঘুঁটির দান ফেলতে চাননি। বিচক্ষণের মতো অর্থ-বিনিয়োগ করতেন বিচিত্র কাজ-কারবারে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে প্রচুর সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও তিনি ঠাণ্ডা মাথায় কাজকর্ম করে যেতেন।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিক থেকে, সামাজিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে, দ্বারকানাথের বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। যদিও শহব কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে তাঁব বসবাস, মফঃস্বলে তাঁর যথেষ্ট গতায়াত ছিল, নিজের জমিদারি পরিচালনার জন্য অথবা মফঃস্বলস্থিত তাঁর জমিদার-মক্কেলদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য। কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন তো প্রচুর ছিলই, বন্ধুবান্ধব কিংবা একই কাজ-কারবারে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। এই শেষোক্তদের মধ্যে যেমন ভারতীয়েরা ছিলেন তেমনি ছিলেন পার্সি বা য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের লোক। এদের মধ্যে তিনি বেছে বেছে ইংরেজ ব্যবসাদার অথবা রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমাবার জন্য যত্নবান ছিলেন। এই নিকট যোগাযোগের ফলে য়ুরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও পরিচালনা-বিষয়ে তিনি সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন কোথায় তাদের শক্তি, কোথায় দুর্বলতা।

## টীকা

১. তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। এটা খুবই আশ্চর্য বলতে হবে। সচরাচর সম্পন্ন হিন্দু বাড়িতে সন্তান জন্মাবার অব্যবহিত পরে, জন্মের দিনক্ষণ দেখে জ্যোতিষীকে দিয়ে ঠিকুজী প্রস্তুত করানো হত। সেকালে জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা ছিল না।

২. 'আত্মজীবনী'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত : সম্পাদনা : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬২।

৩. শেরবোর্ণ সায়েবের স্কুল ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতার আদি ও একমাত্র স্কুল ছিল বলে মনে করা ভুল। কলকাতায় ইংরেজী শেখার প্রথম স্কুল ছিল ১৭৩১ অব্দে প্রতিষ্ঠিত বেলামী সায়েবের চ্যারিটি স্কুল। শেরবোর্ণ সায়েবের স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১৮১০ অব্দে স্থাপিত হয় ড্রামণ্ড সায়েবের একাডেমি, বলা হত এ স্কুল অন্য স্কুলের চেয়ে ভালো ছিল, এখানে ধর্ম শিক্ষার বালাই ছিল না। ডিরোজিয়ো ছিলেন এই একাডেমির ছাত্র। আরও একাধিক স্কুল ছিল—যেমন আহিরিটোলার মার্টিন বোল-এর স্কুল, আর্মানী সায়েব আরাটুন পেট্রুস-এর স্কুল, বৌবাজারে কামিংস্-এর স্কুল যার নাম ছিল ক্যালকাটা একাডেমি এবং যেখানে রাজা রাধাকান্ত দেব ইংরেজীতে তাঁর প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কলুটোলায় একটি যে ইংরেজী স্কুল ছিল, তাকে বলা হত মদন মাষ্টারের স্কুল। এইসব স্কুলের ইংরেজী পাঠ্যবই ছিল প্রায় একই ধরনের। দ্রঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় : *A Bengal Zamindar*—Joykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times, 1808-1888। প্রকাশনা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৪. *Memoir*, পৃ ৫। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রণীত (এরপর থেকে ক. ম.)।
'জীবনী', পৃ ৪২। ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রণীত (এরপর থেকে ক্ষ. ঠ.)।

৫ মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে রামলোচন যে উইল সম্পাদন করে যান, তার প্রতিলিপি দেখা যাবে *Memoir* (বাং সংস্করণ) পৃ. ২৫৯।

৬. 'জীবনী', পৃ ৪৭।

৭. *Memoir*, পৃ. ৭।

৮. নীলমণির পরিবার ছিল ঘোর বৈষ্ণব। তাঁরা গোস্বামীদের কাছে দীক্ষা নিতেন ও ধর্মশিক্ষা করতেন। রামলোচনের গুরু হরিমোহন গোস্বামীর স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন অলকাসুন্দরীর মা-গোঁসাই। তিনি নিয়মিত জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্তঃপুরে আসতেন।
দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী। মা-গোঁসাই সম্বন্ধে সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর টিপ্পনী।

৯. দ্বারকানাথের উপর তাঁর যতটা না প্রভাব ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ছিল দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চারিত্র্য-গঠনে।

১০. নীলমণি মুখোপাধ্যায় : *A Bengal Zamindar*. পৃ. ৯২।

১১. রামমোহন রায়ের সঙ্গে ফার্গুসন-এর যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকাল-ব্যাপী। রামমোহনের বিরুদ্ধে তাঁর ভাইপো গোবিন্দপ্রসাদ যে মোকদ্দমা আনেন সে-মামলার এটর্নী ছিলেন ফার্গুসন। পরে মানহানির দায়ে রামমোহন-সুহৃদ ও *Calcutta Journal*-এর সম্পাদক জেম্‌স্‌ সিল্‌ক্‌ বাকিংহাম অভিযুক্ত হলে ফার্গুসন হয়েছিলেন প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টর। সুপ্রীম কোর্ট-এর কাছে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিষয়ে রামমোহন, দ্বারকানাথ—প্রভৃতির স্বাক্ষর-সম্বলিত আপীল পেশ করা হয়, সে-আপীল পেশ করেছিলেন ফার্গুসন। ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ফার্গুসন-ই আবেদন পেশ করেছিলেন হাউস অব কমন্স্‌-এর সামনে। আবেদনের বিষয় ছিল ভারতে য়ুরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কিত রামমোহন-দ্বারকানাথের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা।

১২. *Memoir.* পৃ. ৮।

১৩. দ্রঃ 'জীবনী', পৃ. ৭১।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেন, বিবাহ হয়েছিল ১৮০৯ অব্দে যখন দ্বারকানাথের বয়ঃক্রম ছিল পনেরো ও দিগম্বরীর ছয় বছর মাত্র। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ২২ এপ্রিল ১৯৭৮ সংখ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই কথার পুনরুক্তি করেছেন 'বধূ দিগম্বরী ও বাবু দ্বারকানাথ' প্রবন্ধে।

অপর পক্ষে ক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ সংখ্যায় 'দ্বারকানাথের পরিবার'-প্রবন্ধে বলেছেন বিবাহ হয় ১৮১১ অব্দে—যখন কন্যার বয়স ছিল নয়।

১৪. 'জীবনী', পৃ. ৭২।

১৫. দ্রঃ 'সম্বাদপত্রে সেকালের কথা'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রকাশনা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৫৬। ২৬ জানুয়ারী ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' থেকে উদ্ধৃতি।

১৬. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনী'-গ্রন্থে বলেছেন : 'তাঁহার কেবল পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছিল, একটিও কন্যা হয় নাই, এই কারণে লোকে তাঁহাকে বত্নগর্ভা বলিত।' দ্রঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র কথা'। প্রকাশনা : জয়শ্রী পুস্তকালয়, কলিকাতা ১৩৮৪। এই গ্রন্থের পৃ. ২২-২৩-এ লেখক বলেছেন দিগম্বরীর প্রথম সন্তান একটি কন্যা শিশু-অবস্থায় মারা যায়।

১৭. নীলমণি মুখোপাধ্যায় : *A Bengal Zamindar.* পৃ. ৮।

১৮. রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডাম ছিলেন একজন আমেরিকান মিশনারী। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট্‌ মিশনে যোগ দেন। রামমোহন রায়ের প্রভাবে তিনি নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করেন। উপহাস করে শ্রীরামপুরের মিশনারী বন্ধুরা তাঁকে বলত The second fallen Adam। তিনি আজীবন রামমোহন তথা ভারতের বন্ধুরূপে কাজ করে গেছেন। একসময় তিনি *Calcutta Gazette* সম্পাদনা করতেন।

১৯. 'জীবনী', পৃ ৫৮-৫৯।

২০. দ্রঃ Blair B. Kling, *Partner in Empire.* পৃ. ৪০।

দু-হাজার থেকে শুরু করে দ্বারকানাথ কাউকে কাউকে দু-লাখ কিংবা তারও বেশি টাকা ধার দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাদের তিনি ধার দিয়েছেন, সেইসব উত্তমর্ণদের একটি তালিকা দিয়েছেন লেখক।

□

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# দ্বারকানাথ ও রামমোহন

এই উচ্চাভিলাষী, অক্লান্তকর্মা, উদীয়মান তরুণের চরিত্রে একটি বিশেষ যে গুণ লক্ষ্যগোচর হয়েছিল তা হল এই যে, অর্থ-উপার্জনের চিন্তা যতই উত্তেজনাপূর্ণ হোক না কেন, কেবল অর্থবিত্তের পরিধির মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা যতই উঁচু হতে লাগল, ততই একটা প্রশ্ন তাঁর মনে জাগতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, দেশ বা জাতি হিসাবে ভারতের যে-সম্ভাবনা, তা তো কোনো অংশে ব্রিটেন কি ইংরেজদের তুলনায় ন্যূন নয়। তবে কেন এ-দেশ দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে চিরকাল নিমজ্জিত থাকবে? তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা বাস্তববাদী কর্মিষ্ঠ মানুষ ঃ ভারতের অতীত গৌরব নিয়ে কল্পরাজ্যে মশগুল থাকার মতো লোক তিনি ছিলেন না। অতীতে ভারত কী ছিল তা নিয়ে তাঁর ততটা মাথাব্যথা ছিল না, যতটা ছিল ভবিষ্যতে ভারত কী হতে পারে—তাই নিয়ে। রামমোহনের মতো এবং তাঁর সঙ্গে একযোগে তিনি চাইতেন, সমসাময়িক সভ্যসমৃদ্ধ দেশের মতো প্রাচীন ভারতও যেন নূতন যুগে নূতন জন্ম লাভ করে। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের এই নবজন্ম-পরিগ্রহণে ধাত্রীর কাজ করতে পারবে য়ুরোপীয় দেশগুলি এবং বিশেষ করে ইংলণ্ড। এই তীব্র অভীপ্সা আজীবন তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং বহু-বিচিত্র অভিযানে প্রবৃত্ত হবার জন্য তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। (এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি তিনি চেয়েছিলেন কারণ জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য তাঁর মনে বরাবর একটা গভীর আগ্রহ ছিল।) তাঁর এই সব উদ্যোগ যদি সফল হত, তা হলে হয়তো ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বেই হত।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর এই আকুল আগ্রহ এবং কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব বুঝবার মতো সংবেদনশীল মন ছিল বলে, তিনি চুম্বকের মতো রামমোহনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮১৫ অব্দে রামমোহন কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। রামমোহন ছিলেন প্রতিমা পূজার বিরোধী, হিন্দু-সমাজের পৌত্তলিকতাকে তিনি নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করতেন।

এক গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে দ্বারকানাথের জন্ম, এক নিষ্ঠাবতী মায়ের হাতে তিনি মানুষ—তিনি কি কখনো তাঁর ধর্ম পরিহার করতে পারেন? জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল খড়দহ গোস্বামীদের দীক্ষিত শিষ্য। তাঁরা ছিলেন ঘোরতর নিরামিষাশী, পেঁয়াজ পর্যন্ত তাঁদের হেঁশেলে প্রবেশ করতে পারত না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরেরা শৈব ছিলেন বলে জোড়াসাঁকোর নিরামিষাশী আত্মীয়দের বলতেন 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া বোষ্টম'। দ্বারকানাথ তাঁর মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে সৎ ব্রাহ্মণোচিত আচার-অনুষ্ঠানে এমনই অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে বহুকাল নিষ্ঠা-সহকারে এইসব আচার-অনুষ্ঠান তিনি পালন করেছিলেন।[১] এমনকি, ১৮৩১ অব্দের ২২ অক্টোবর তারিখে **চন্দ্রিকা** থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে **সমাচার দর্পণ** লিখেছিল : ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য হলে কিংবা রামমোহন রায়ের অনুরাগী হলে কুলাচার ত্যাগ করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। দ্বারকানাথের উদাহরণ দেখিয়ে **চন্দ্রিকা** লিখেছিল : 'রামমোহন রায়ের অনুরাগী হলে কি হয়, তাঁর বাড়িতে এখনো দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।'[২]

১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যুর চার বছর আগেও **ফিশার্স্ কলোনিয়াল ম্যাগাজিন** তাঁর একটি যে জীবন-আলেখ্য প্রকাশ করেছিলেন তাতে লেখক বলেছিলেন, 'প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে ইতস্তত করেন নি। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সহজ সরল ভাবাদর্শ ও আচার-বিচারের শুদ্ধতা থেকে ব্রাহ্মণেরা কী ভাবে কেমন করে ক্রমেই সরে এসেছেন—এই প্রসঙ্গ নিয়ে রামমোহন যখন বিতর্ক তুলেছিলেন, দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষের দলে। তাঁর ধর্মভাব এমনি প্রবল ছিল যে বেশ কয়েক বছর ধরে রামমোহনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।'[৩] প্রসঙ্গতঃ ভারত-যাত্রার প্রাক্কালে জর্জ টমসন্-কে এডিনবরা-র প্রিন্সেস্ স্ট্রীটে একটি সার্বজনীন প্রাতরাশের ভোজসভায় যখন আপ্যায়ন করা হয়, তিনিও একই ধরণের কথা বলেছিলেন।[৪]

এই ধরণের আখ্যানের কী করে উদ্ভব হয়েছিল সে-কথা বলা শক্ত—যদিচ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উভয় গল্পেরই উৎস নিশ্চয় একই ছিল। দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণোচিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন ও অন্য হিন্দুদের মতো পূজা-আর্চা করতেন বলে, এইসবের উপর রামমোহনের আক্রমণ বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে হয়তো কঠিন ছিল—সম্ভবত এইরকম অনুমানই এই সব গল্প-আখ্যানের ভিত্তি। অপর পক্ষে বলা দরকার যে, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন উজ্জ্বল তেমনি বিচিত্র। ধর্ম ও সমাজের উন্নতিবিধায়ক নানা কাজে তিনি আপন প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন বলে অপৌত্তলিকতার মতো নেতিবাচক লক্ষ্য তাঁর চরিত্রের মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মনে করা ভুল। রামমোহনের প্রতি দ্বারকানাথের গভীর আকর্ষণের প্রধান হেতু ছিল এই নানাবিষয়িনী প্রতিভা। ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে আমরা যা দেখতে পাই তা থেকে

মনে হয় ১৮১৫ অব্দে কলকাতায় স্থিতিবান হবার অব্যবহিত পরে রামমোহনের ভক্তরূপে যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ হন, সেই মিত্র-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। এঁরা প্রতি সপ্তাহে রামমোহনের বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'-য় মিলিত হতেন। সেখানে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে পাঠ ও ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে, রামমোহন ধর্মীয় উদারতা, সমাজ-সংস্কারের নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন। কেশবচন্দ্র সেন-রচিত আত্মীয়-সভা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কলেট বলেছেন, আত্মীয়-সভার এইসব অন্তরঙ্গ সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ।[২] বাস্তব পক্ষে রামমোহন তো হিন্দু ধর্মকে আঘাত করতে কিংবা তার ক্ষতিসাধন করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের অন্তরতর সত্য সন্ধান করতে।

রামমোহন এসে কলকাতায় বসবাস শুরু করার অল্প কিছুদিন পরেই যে দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়—এই অনুমানের স্বপক্ষে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারকানাথের পৌত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতের[৩] লেখকরূপে খগেন্দ্রনাথ একটি ঘটনার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, দ্বারকানাথের প্রথম সন্তানরূপে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার অল্প কিছু দিন পরে এক দৈবজ্ঞ বলেন, দিগম্বরী দেবীর গর্ভজাত কোনো সন্তানই দীর্ঘজীবী হবে না। এই নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণীতে বিচলিত হয়ে দ্বারকানাথ রামমোহনের পরামর্শ নেন এবং তাঁর প্রস্তাবক্রমে রংপুর থেকে একজন তন্ত্রসাধককে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করান।[৪] বলা হয়, তার ফলে অনতিকাল পরে দ্বারকানাথের প্রথম যে পুত্রসন্তান লাভ হয়, সেই দেবেন্দ্রনাথ অষ্ট-আশি বছর বেঁচেছিলেন। যেহেতু দেবেন্দ্রনাথের জন্ম বৎসর ছিল ১৮১৭, অকালমৃতা তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নিশ্চয় ১৮১৫ অব্দে রামমোহনের কলকাতায় স্থিতিবান হবার অল্প কিছু কালের মধ্যে জন্ম নিয়ে থাকবে।

অলকাসুন্দরীর কাছে প্রচলিত ধর্মে সযত্নে লালিত ও পরিবর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বারকানাথ রামমোহনের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। দ্বারকানাথের জীবনীকার ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'লৌহ ও চুম্বক যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রৌঢ় এবং কুড়ি-বাইশ বৎসরের যুবক পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।' উভয়ের মেজাজে ও জীবনযাত্রায় প্রচুর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে পরস্পরের নিকটসান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন তার একমাত্র কারণ এই যে হৃদয়ের গভীরে তাঁরা নিশ্চয় একাত্ম বোধ করে থাকবেন। রামমোহনের মতো 'কুখ্যাত' ধর্মদ্রোহীর সঙ্গে সৌহার্দ্য থাকায় হিন্দু সমাজ দ্বারকানাথকে ভুল বুঝেছিল, ধর্মসভার অনেকেই তাঁর প্রতি কুপিত হয়েছিলেন। আত্মীয়-সভা অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদ পাঠ ও ধর্মসঙ্গীত—অধিকাংশ স্বয়ং রামমোহন-রচিত। কিন্তু তা হলে কী হয়, বিরোধীপক্ষ রটনা করে বেড়াতে লাগল যে গোপনে

গো-বৎসের মাংস আহার করা হয় এইসব অধিবেশনে! সেই মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করার মতো লোকের তখন কোনো অভাব ছিল না।[৮]

আসলে দ্বারকানাথ রামমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর চারিত্র্যগুণে। প্রবল সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল অসাধারণ তেজস্বিতা। গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত এবং ততোধিক গোঁড়া খ্রীস্টান মিশনারীদের শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রামমোহন যা সত্য বলে বুঝতেন তা অকুতোভয়ে প্রচার করতেন। তখনকার প্রথামত পতির মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবাদের জোর করে সহমরণের চিতায় তুলে দেওয়া হত। এইসব হতভাগিনীদের প্রতি রামমোহনের করুণার অন্ত ছিল না। সমাজ-সংস্কারে তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। যুক্তি-বিচারে অনুরাগ ছিল প্রবল। উপরন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। এইসব গুণের একত্র সমাবেশ নিশ্চয় দ্বারকানাথকে মুগ্ধ করে থাকবে।

তাঁর কর্মজীবনের সূচনা থেকে সহজাত বিশ্বাসের মতো তরুণ দ্বাবকানাথের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল দুটি ধারণা। প্রথমত তিনি বুঝেছিলেন, এক প্রকার বিধিনির্দিষ্ট ঘটনারূপে[৯] সমসাময়িক ইতিহাস পরম্পরার তাগিদে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব পত্তন হয়েছিল। উপর থেকে চাপানো শক্ত হাতের শাসন ব্যতিরেকে তখনকার খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য হত। তরুণ জমিদারের চোখে তখনো সমগ্র ভারতের রূপটুকু সুস্পষ্ট ছিল না। খুব কম ভারতবাসীই তখন নিজেদের বাসভূমির সংকীর্ণ পরিধির বাইরে বৃহত্তর দেশটাকে চিনতেন—বড় জোর জানতেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোনো কোনো জায়গা বা তীর্থস্থানাদির নাম। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিয়ে এবং বাংলাদেশে য়ুরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিপদ্ধতি স্বচক্ষে দেখে দ্বারকানাথ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, বিদেশী উদ্যোগের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করতে হলে এই সব রীতিপদ্ধতি আত্মসাৎ করতে হবে, সংগঠন ও প্রযুক্তিতে তাদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করতে হবে আর যে বাষ্পীয় শক্তির বলে বিলাতে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে, দেশেও সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।[১০] কিন্তু তিনি তাঁর নিজের দেশ ও জাতিকে চিনতেন বলে একথাটাও বুঝেছিলেন যে বিধি-নিষেধের নিগড় থেকে তাদের মুক্ত করতে না পারলে, তাদের ধর্মবোধ, নীতিবোধ, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আচার-আচরণে সমূহ পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে—অর্থকরী ব্যাপারে তাদের উদ্যমকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে না। রামমোহন রায়ের মধ্যে তিনি সেই রূপান্তরিত ভারতের অগ্রদূতকে দেখেছিলেন, যিনি দেশকে মোহনিদ্রা থেকে মুক্ত করে প্রগতির পথে আগুয়ান করে দিতে পারেন। এই সমস্ত কারণে—তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, ঐহিক বৈভবে অনুরাগ এবং প্রথাগত হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও—দ্বাবকানাথ এত সহজে এমন প্রসন্ন মনে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রতি ও তাঁর নীতিবাদ-যুক্তিবাদের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামমোহনের

প্রবণতা ছিল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে, দ্বারকানাথের বৈষয়িক দিকে। কিন্তু উভয়েই তাঁরা ছিলেন ইহজগতের মানুষ—পারত্রিক জগতের নয়। তাঁরা যে ফিরদৌস্ চেয়েছিলেন সে ফিরদৌস্ হবে হামিনস্ত্—তা হবে দেশ ও কালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট।

সুতরাং রামমোহনের আদর্শ—অর্থাৎ তাঁর উদার মানবিকতা-বোধ, যুক্তিবিচার-প্রণোদিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বব্যাপী নিরাকার একেশ্বরে তাঁর বিশ্বাস এবং বিশ্বমানবের একতায় তাঁর আস্থা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা দ্বারকানাথের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এক হিসাবে নীতি ও বুদ্ধিবিচারের দিক থেকে রামমোহন ছিলেন তাঁর গুরু। ইংরেজরা দাবি করতেন, মানবিকতা-বোধে তাঁরা উদার, গণতন্ত্রে তাঁদের অটল বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষের মতামত প্রকাশে স্বাধীনতা তাঁরা মানেন এবং তাঁরা মনে করেন যে আইনের চোখে সকলে সমান। রামমোহনের মতো দ্বারকানাথও মনে করতেন ইংরেজদের এইসব দাবি বুঝি সত্য। দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন, ইংরেজদের কাছ থেকে তাঁর দেশ অনেক কিছু শিখতে পারবে। সরল বিশ্বাসে তিনি মনে করেছিলেন, দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে যদি পরস্পরের মধ্যে সহযোগ গড়ে তোলা যায়, উভয় দেশই তবে লাভবান হতে পারবে। তাঁর আশা ছিল, ইংরেজরা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেই, ভারতীয়দের সঙ্গে একযোগে সমানে-সমান হয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি গণমঙ্গল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাইবেন। আখেরে এই আশা ও বিশ্বাস অলীক স্বপ্নে পর্যবসিত হলেও, তাঁদের সময়ে রামমোহন ও দ্বারকানাথ এই উজ্জ্বল একটি সম্ভাবনাকে সর্বথা যুক্তিযুক্ত বলে নিশ্চিত হয়েছিলেন।

স্বদেশ-চিন্তায় বিবর্তন-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ 'ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যটুকু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কেবল দু'জন ভারতীয় যথাযথ ধরতে পেরেছিলেন—এঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। দু'জনই ছিলেন ভারতপ্রেমিক, দেশের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার নিয়ে দু'জনই গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু তাই বলে চোখে তাঁরা ঠুলি পরে থাকেন নি। দেশে-বিদেশে যে-সব শক্তি তখন কার্যকর, তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাঁরা সেসব স্পষ্ট দেখেছেন। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম হবার ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ শক্তি তখন কাজ করছিল, সবই ধরা পড়েছিল তাঁদের পূর্ণ-বিকশিত ইতিহাস-চেতনায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছিল, দু-জনেই তাকে স্বাগত করেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার বুঝেছিলেন, এই বিপ্লবের জের গিয়ে পৌঁছবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের পরস্পর সংঘাতের ফলে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে যার ফল আখেরে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে।'[১১]

রামমোহন রায় কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করার পর কে দ্বারকানাথকে তাঁর

সংস্পর্শে এনেছিলেন নিশ্চিত বলা যায় না। হয়তো রেভাঃ উইলিয়ম এডাম কিম্বা ডেভিড হেয়ার।[১২] কিংবা পাথুরিয়াঘাটার কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়[১৩] উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়ে থাকবেন। আবার এমনও হতে পারে, ভয়ডরের বালাই না রেখে তরুণ দ্বারকানাথ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে রামমোহন সন্দর্শনে নিজেই গিয়ে থাকবেন। দু-জনের আলাপ পরিচয়ে ঘটকালি কেউ যদি করে থাকেন তিনি হয়তো হবেন গোপীমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণের পুত্র। তখন তিনিই ছিলেন ঠাকুর কুলের কুলপতি। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে ম্যাকিন্টস্ কোম্পানীর কাজ কারবার ছিল এবং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ইনিয়স ম্যাকিন্টস্ ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। খুব সম্ভব উইলিয়ম এডাম ও ডেভিড হেয়ার-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের আলাপের সূত্রপাত ঘটে থাকবে রামমোহনেরই মধ্যস্থতায়। সে যাই হোক, কে-যে উভয়ের মধ্যে প্রথম যোগাযোগ ঘটিয়েছিল সেটা তেমন কিছু বড় কথা নয়, যে-কথাটা উল্লেখযোগ্য তা হল, প্রথম আলাপেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন এবং নৈতিক দিক থেকে ও জ্ঞানের দিক থেকে রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে দ্বারকানাথের দেরি হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারে প্রচলিত কুলাচার দ্বারকানাথ কখনো পরিহার করেন নি সত্য, কিন্তু সমাজ-সংস্কার, ধর্মে পরমত-সহিষ্ণুতা ও মননের স্বাধীনতা নিয়ে রামমোহন যখনই যুদ্ধে নেমেছেন, দ্বারকানাথ একটুও দ্বিধা না রেখে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৮১৫ অব্দে রামমোহনের মাণিকতলা বাগানবাড়িতে আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে দ্বারকানাথ নিয়মিত সভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। '১৮ মে ১৮১৯ তারিখের **ইণ্ডিয়া গেজেট** কৃষ্ণমোহন মজুমদারের বাড়িতে আত্মীয়-সভার একটি অধিবেশনের বিবরণ দিয়েছেন। এই অধিবেশনে নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা, আহার ও আহার্য, বালবিধবাদের চিরকুমারী ব্রত পালনের আবশ্যকতা, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি। এই বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যায়, ধর্ম-সংস্কারের নব আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল সমাজ-সংস্কার।'[১৪] আত্মীয়-সভার অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সবাই যে সত্যনিষ্ঠ খাঁটি মানুষ ছিলেন এমনটা মনে করা ভুল। দৃষ্টান্তরূপ জয়কৃষ্ণ সিংহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

জয়কৃষ্ণ ছিলেন সভার প্রারম্ভিক সদস্যদের অন্যতম। কিন্তু অনতিকাল পরে তিনি সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন এবং এই মিথ্যা-অপবাদ রটনা করে বেড়াতে থাকেন যে সদস্যেরা যাতে গোমাংস ভক্ষণ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সভায় গো-বৎস হত্যা করা হয়ে থাকে।[১৫] কেউ কেউ এমনও বলেন যে স্বয়ং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (সভায় যিনি ধর্মোপদেশ দিতেন এবং পরবর্তীকালে যিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-পদে বৃত হয়েছিলেন), 'গভর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা রহিত করার জন্য যে-

আইন করেছিলেন, সেই আইন রদ্ করার জন্য তাঁর কাছে যে আবেদন-পত্র যায় তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন...এজন্য তিনি তাঁর দলপতি রামমোহনের বিরক্তিভাজন হয়েছিলেন।'[১৬] কিন্তু রামমোহনের প্রতি দ্বারকানাথের আনুগত্য কখনো শিথিল হয়নি, রামমোহনের উদার মানবিকতাবোধের আদর্শে তাঁর একান্ত আস্থা কোনোদিন টলে নি, বরঞ্চ যত দিন গেছে সে আস্থা তত গভীরতর হয়েছে। রামমোহনের পরলোক গমনের পরেও সেই আদর্শ দ্বারকানাথ তাঁর গভীর অন্তরে জীইয়ে রেখেছিলেন।

নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও প্রায় চার বছর টিঁকে থাকার পর ১৮২১ অব্দে আত্মীয় সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তার স্থান নেয় ক্যালকাটা যুনিটেরিয়ন্ কমিটি—কলিকাতা একেশ্বরবাদী সমিতি। প্রতি রবিবার এডাম সায়েবের বাড়িতে সমিতির অধিবেশন বসত। খ্রীস্টধর্মের ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করে এডাম সায়েব একেশ্বরবাদী হয়েছিলেন বলেই হয়তো এই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া এডাম ছিলেন সমিতির প্রথম একেশ্বরবাদী যাজক। গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার, ব্যারিস্টর থিওডোর ডিকেন্স, ম্যাকিন্টস্ কোম্পানীর জি. টি. গর্ডন-প্রমুখ সঙ্গীদের নিয়ে দ্বারকানাথ নিয়মিত এই রবিবারের অধিবেশনে যোগ দিতেন।[১৭] পরবর্তীকালে রামমোহন ও এডাম যখন একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন, দ্বারকানাথ তার ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন চাঁদা দিয়েছিলেন ২,৫০০ টাকা।[১৮] খ্রীস্টীয় ধর্মের তত্ত্ব ও মত নিয়ে নিজে তিনি খুব বেশি মাথা ঘামাতেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর প্রবীণ বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত রামমোহনের যে-যে বিষয়ে আগ্রহ ছিল সেইসব বিষয়ে তিনি নিজেও গভীর আগ্রহ নিতেন। বস্তুত রামমোহনের প্রভাবে আসার পর থেকে তিনি এই বিশ্বাসে দৃঢ় হলেন যে, জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে সকল কালের সকল দেশের এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর হলেন পরমেশ্বর। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁর উপর বিচিত্র রূপ ও গুণ আরোপিত করে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে তাঁর পূজা করে মাত্র।

রামমোহনের ব্রহ্মতত্ত্ব মেনে নেওয়া দ্বারকানাথের পক্ষে শক্ত ছিল না। হিন্দুদের ধর্মচিন্তায় বিশ্বের প্রায় সকল ঈশ্বরতত্ত্ব সামিল করে নেওয়া যেতে পারে। আসলে, চিরাভ্যস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে যদিও দ্বারকানাথের মন চাইত না, তবু হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়েও যে বড় একটা আগ্রহ তাঁর ছিল এমন নয়। তাঁর নিজের জীবনযাত্রা ছিল জাগতিক, জীবনটাকে তিনি ভালো করে উপভোগ করতে চাইতেন, এক হিসাবে তাঁকে ভোগবিলাসীও বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি ভোগসুখসর্বস্ব ছিলেন না, পরহিতব্রতীও ছিলেন। বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধও ছিল প্রখর। যদি তাঁর জীবনদর্শন বলতে কিছু থেকে থাকে তা ছিল বাস্তবধর্মীর জীবনদর্শন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যা-কিছু তাঁর বিত্তসম্পদ অথবা দেশের সমৃদ্ধি (তাঁর মনে দুটি সমার্থক না হলেও পরস্পর-যুক্ত ছিল) বৃদ্ধি করে, বিশ্বমানবের সুখ সাধন করে এবং চিত্তকে শৃংখল মুক্ত করে, তাই হল কল্যাণকর। তাঁর গুরু

রামমোহনের মতো অথবা তাঁর পুত্র মহর্ষির মতো তিনি জ্ঞানী বা সাধু ছিলেন না। তাঁর ক্ষেত্র ছিল পৃথক কিন্তু সেখানে তিনিও পথিকৃতের কাজ করে গেছেন। সাহসিকতাপূর্ণ সাধারণ বুদ্ধির শক্তিতে, অনর্থক ঝড় ঝামেলা না তুলে, স্বধর্মীদের বিরুদ্ধতা না উশকিয়ে তিনি নিজের পথে বহু দূর এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আগে হোক বা পরেই হোক, যুগধর্ম শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই, সমাজের উপর জীর্ণপ্রায় সংস্কারগুলির প্রভাব ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো টিঁকে থাকবে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক খোলসটুকু। শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা থেকে প্রমাণ হয় তাঁর দূরদর্শী অনুমান কতখানি সত্য ছিল।

রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগণ (দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম) ১৮২৮ অব্দে স্থির করেন যে ধর্মীয় উপাসনায় যদি কোনো অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, তাহলে এডাম সায়েবের একেশ্বরবাদী উপাসনালয়ে প্রতি রবিবার স্পষ্টত খ্রীস্টীয় ধরণে যে-উপাসনা হত, তা থেকে পৃথক করে মূলত স্বদেশীয় ধরণে তা করা উচিত। প্রয়োজন হলে সে-পদ্ধতির কিছু কিছু উন্নতি সাধনও করা যাবে। এইভাবে ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হয় ২০ আগষ্ট ১৮২৮ তারিখে, বুধবারে, চিৎপুর রোড-এর উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বাড়িতেই বালক দ্বারকানাথ একদা শেরবোর্ণ সায়েবের কাছে ইংরাজীতে তাঁর প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। একবছর বাদে পাশেই একখণ্ড জমি কিনে সমাজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য, এজন্য যে-অর্থব্যয় হয় তার একটা অংশ এসেছিল দ্বারকানাথের কাছ থেকে। ১৮৩০ অব্দে সমাজের যে-ট্রাস্টডীড্ সম্পাদিত হয় সেই ট্রাস্টীদের নামের তালিকায় প্রথম নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের।[১৯]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ কোনো সূত্রে শুনে থাকবেন যে প্রথম প্রথম রামমোহন নাকি চেয়েছিলেন সমাজে ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজদের ধরণে উপাসনা হোক—যাতে এডাম সায়েব ও তাঁর য়ুরোপীয় বন্ধুরা আগের মতোই তাঁদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন।[২০] এমনটা যদি ঘটত তাহলে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ যে কী-প্রকার দাঁড়াত তা অনুমান করা শক্ত নয়। সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে দ্বারকানাথের পরামর্শ গৃহীত হয় এবং স্থির হয়—সমাজে বেদ পাঠ হবে এবং আরাধনা, উপাসনা উপদেশ হবে মাতৃভাষা বাংলায়। রামমোহন স্বয়ং বেদ-পাঠে অনুরাগী ছিলেন, মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। এমত অবস্থায় ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাহিনী কতটা বিশ্বাসযোগ্য সঠিক বলা শক্ত। অপর পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় যে, রামমোহন সমাজকে কেবল হিন্দুধর্ম সংস্কারের কেন্দ্রবিশেষ করে দেখতে চাননি। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ এমন একটা স্থান হোক যেখানে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সকল মানুষের উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা-বন্দনা ধ্যান-ধারণার

জন্য মিলিত হতে পারেন। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ঃ ব্রাহ্মসমাজ থেকে সম্বৎসরে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের প্রথাটি দ্বারকানাথের আগ্রহাতিশয্যে চালু করা হয়ে থাকবে।

যদিচ তখন মুসলিম রাজত্ব অবসিত, তবু তখনো হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের লৌকিক পোশাক ছিল নবাব বাদশাদের দরবারে যাবার পোশাক—চোগা চাপকান ও শামলা পাগড়ি। রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা সপ্তাহান্তে যখন সমাজে যেতেন সকলে এই দরবারী পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে যেতেন। রামমোহন এই পরিধেয়ের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতেন, বলতেন যে, পরমেশ্বর সকল মানুষের রাজা ও প্রভু, সুতরাং রাজরাজেশ্বরের দরবারে উপযুক্তরকম পোশাক পরে যাওয়াই উচিত। রামমোহনের বন্ধুবর্গের মধ্যে কেবল এক দ্বারকানাথ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন, তিনি সমাজে যেতেন বাঙালীদের ধুতি-চাদর পরে। রামমোহন বকাঝকা করলে অজুহাত দিতেন যে সারাদিন আপিসের পোশাকে থাকার পর বাড়ি ফিরে ধুতি-চাদরেই তিনি বেশি আরাম পান। তাই সন্ধ্যার সময় ধুতি-চাদর ছেড়ে আবার পোশাক পরতে তাঁর ভারি আলস্য হয়। সেই সঙ্গে তিনি বলতে ছাড়তেন না যে পরমেশ্বরের পূজায় যেতে হলে দীনহীনের মতো সামান্য পরিচ্ছদেই যাওয়া উচিত।[১১]

এই গল্প থেকেই বুঝতে পারা যায় দুই বন্ধুর ধর্মভাবনায় কী ধরণের পার্থক্য ছিল। রামমোহনের ধর্মান্দোলনের পশ্চাৎপট আলোচনা করতে গিয়ে অমিতাভ মুখোপাধ্যায় একটি বেশ সঙ্গত কথা বলেছেন ঃ 'ভারত-ইতিহাসের মধ্য-যুগে রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্যকে যে-নিরিখে ধর্ম-সংস্কারক বলা হয়, সে-নিরিখে রামমোহনকে খাঁটি ধর্ম-সংস্কারক বলা যায় না। মূলত তিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী মনস্বী—যাঁর সমাজ-চেতনা ছিল প্রখর এবং দেশের সর্বতোমুখী প্রগতির জন্য যাঁর মনে ছিল আকুল আগ্রহ। ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে উপযোগবাদী। তিনি তাঁর **ট্রানস্লেশন্ অব্ এন্ এব্রিজমেন্ট অব্ বেদান্ত** (অনুবাদে সংক্ষিপ্ত বেদান্ত, ১৮১৬ অব্দ) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ 'পৌত্তলিক হিন্দুরা যে-সব অদ্ভুত আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছে, আমার মনে হয় সেগুলি অন্যান্য অ-দার্শনিক প্রকৃতি-উপাসকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। গভীর চিন্তার পর আমি বুঝেছিলাম এসব আচার-অনুষ্ঠান কেবল যে অসুবিধার সৃষ্টি করে এমন নয়, পরন্তু সমাজদেহকে ধ্বংস ক'রে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। আমার এই চিন্তাপ্রসূত বিচার ও স্বদেশীয়দের প্রতি আমার স্বাভাবিক করুণাবশত, সর্বপ্রকার প্রযত্নে তাদের মোহনিদ্রা ঘোচাবার জন্য নিরন্তর মনের মধ্যে একটা তাগিদ অনুভব করেছি।' কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, রামমোহন ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন বেন্থাম-পন্থী। বিভিন্ন ধর্মমতের সত্যাসত্য নিয়ে তিনি ধর্মের উৎকর্ষ বিচার করতেন না। তাঁর ধারণায় যে-কোনো ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হল বাস্তব ক্ষেত্রে তার উপযোগ। যে-ধর্ম অধিকাংশ মানুষের সর্বোচ্চ সুখবিধান করে এবং দুঃখের পরিমাণ ন্যূনতম

করে, রামমোহন মনে করতেন, সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কিশোরীচাঁদ মিত্রের এই ধারণা হয়তো যথার্থ।[২২]

অপর পক্ষে দ্বারকানাথ কুলাচারগত প্রথাসম্মত আচার-অনুষ্ঠান পালন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ধর্মমতের সত্যাসত্য এবং সমাজ-জীবনে ধর্মের উপযোগ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার মতো সময় বা উৎসাহ তাঁর ছিল না। আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল রামমোহনের সাহচর্য। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দেবেন্দ্রনাথের জবানীতে বলেছেন : 'যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন।' বিগ্রহসেবার চেয়ে রামমোহনসান্নিধ্য দ্বারকানাথের অধিকতর কাম্য ছিল নিশ্চয়।

ব্যক্তিগতভাবে বিগ্রহ-সেবা কিংবা হিন্দু-পৌত্তলিকতাকে দ্বারকানাথ দূষণীয় মনে না-করলেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি রামমোহনকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দ্বারকানাথের মতো কর্মঠ ও বদান্য বন্ধুলোক না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ এবং যদিবা হইত, আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।'[২৩] একথা সত্য যে ব্রিস্টল শহরে ১৮৩৩ অব্দে রামমোহনের মৃত্যুর পর সমাজ সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ প্রায় বিলুপ্ত হবার মতো অবস্থা হয়েছিল। সে-সময় দ্বারকানাথ যদি-না এগিয়ে এসে সমাজের কাজ চালাবার সমস্ত খরচ—মায় প্রধান পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মাসোহারা—নিজের পকেট থেকে না দিতেন, তা হলে সাপ্তাহিক উপাসনা কোন্ ছার, সমাজের দরজাই বন্ধ করে দিতে হত। উপরন্তু সম্বৎসরে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের পুরো খরচটাও তিনি নিজেই বহন করতেন।

গোঁড়া হিন্দুদের সকল রকম আচার-অনুষ্ঠানের উপর রামমোহন যেমন খড়্গহস্ত ছিলেন, দ্বারকানাথ সে-রকম ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর মনের বিচার ছিল স্বতন্ত্র এবং সেই কারণেই পৌত্তলিকতাকে কুসংস্কার বলে তিনি নিজে কখনো নিন্দা করেন নি। এই একটি ক্ষেত্রে দু'জনের কিঞ্চিৎ মতানৈক্য থাকলেও, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলনে রামমোহনের মত ও পথ দ্বারকানাথ নির্দ্বিধায় সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দুসমাজ ও ধর্মসভার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে, কোনো কোনো আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও, দ্বারকানাথ রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে

যোগ দিয়েছিলেন। গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের বেশ হৃদ্যতা ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'বেণ্টিঙ্ক দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রবণ করিতেন। দ্বারকানাথ বেণ্টিঙ্ক-এর সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে লাট-ভবনে যাইতেন। বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়কেই যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে একমত দেখিলেন, তখন তাহা উঠাইয়া দিতে আর দ্বিধা করিলেন না।' এ-প্রসঙ্গে বেণ্টিঙ্ক-পত্নী দ্বারকানাথকে যে-পত্র লিখেছিলেন (মূল পত্রটি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ম্যুজিয়ম-এ সংরক্ষিত) তাতে তিনি বলেছিলেন, 'কলকাতার দেশীয় সমাজে যে-দুজন ব্যক্তি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্বর্গত রামমোহন রায় ও আপনি স্বয়ং।' সতীদাহ রহিত করার জন্য অর্ডিনান্স জারী করার পর লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কলকাতা টাউন হল-এর এক সাধারণ সভায় যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়—তাতে রামমোহন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে দ্বারকানাথও স্বাক্ষর করেন।[২৪]

ব্রাহ্মসমাজের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের একটি দল হিন্দুদের প্রাচীন প্রথা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সেকালের সর্বজনমান্য সংস্কৃতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে, ব্রাহ্মসভার প্রতিপক্ষ রূপে ধর্মসভা স্থাপন করেন। তাঁরা সতীদাহ নিবারণের আইন রহিত করার জন্যে বিলাতে হাউস অব্ কমন্স্-এ আপীল করেন। সে সময়ে রামমোহন লণ্ডনে থাকায় এবং যথাসময়ে আপীলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ফলে অনেকটা তাঁরই প্রচেষ্টায় আপীল অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই ঘটনার ফলে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, হিন্দুসভার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং অচিরে সভার বিলুপ্তি ঘটে। এই সব ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে দ্বারকানাথ তাঁর বিলাত-স্থিত বন্ধু জন স্টর্‌ম্-এর কাছ থেকে একটি পত্র পান, পত্রে লেখা ছিল যে বিলাতে ধর্মসভার আপীল পেশ করতে গিয়ে ম্যাকডুগাল নামক এক সায়েব দু-দশ টাকা খরচ করেছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি ধর্মসভার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে পারেন নি! দ্বারকানাথের বদান্য স্বভাবের কথা স্মরণ করে স্টর্‌ম্ তাঁকে লিখলেন তিনি যেন 'নিজের ও দেশের সুনামের খাতিরে' দাবির টাকাটা মিটিয়ে দেন। ১৯ আগাস্ট ১৮৪১ তারিখে দ্বারকানাথ সে-চিঠির চমৎকার একটি জবাব পাঠিয়েছিলেন ঃ 'কী শুনলাম, কী-যেন বললেন, নিজের ও দেশের সুনামের খাতিরে! মুহূর্তেকের জন্যেও আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারেন না যে আমি কিংবা রিফর্মার[২৫] কিংবা মনুষ্যপদবাচ্য অন্য যে-কোন ব্যক্তি সতীদাহের মতো পৈশাচিক প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে আপীল পেশ করার খরচ বাবদ একটা কানাকড়িও দিতে চাইব...'[২৬]

দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার বিষয়ে রামমোহনের গভীর উৎসাহ ছিল। তিনি মনে করতেন দেশের একতা ও উন্নতি সাধনে এই পদক্ষেপ একান্ত আবশ্যক। রামমোহনের এই উদ্যোগে সোৎসাহে ভাগ নিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। তাঁরা

উভয়েই বুঝেছিলেন পূর্ববর্তী প্রজন্মে, মুসলমান শাসকদের অধীনে, দরবার ও আদালতের ভাষারূপে যেমন পারসী ভাষা শিক্ষা করতে হত, তেমনি নূতন যুগের নূতন প্রজন্মে আয়ত্ব করতে হবে নূতন শাসকদের ভাষা। এ ভাষা কেবল রাজভাষা নয় পরন্তু নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও ভাষা। এক হিসাবে এ-কাজে অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দ্বারকানাথের আগ্রহ ছিল রামমোহনের চেয়েও গভীর। তাঁর পিতামহ নীলমণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দীরাম বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় কুশলতা অর্জন করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাছাড়া কোম্পানী-শাসনের সঙ্গে নিকট-যোগাযোগের ফলে ঠাকুর পরিবারে ইংরাজী চর্চার একটি অনুকূল পবিবেশ ছিল। সুতরাং ১৮১৭ অব্দে ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষার প্রথম কেন্দ্ররূপে জনসাধারণের চাঁদা তুলে যখন হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়,[২৭] দ্বারকানাথ ছিলেন তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ অনুমান করেন দ্বারকানাথও অনুরূপ অঙ্কের টাকা দান করে থাকবেন। কলেজের নিয়মাবলী অনুসারে কেউ দশ হাজার টাকা দিলে একটি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াবার জন্য পাঠাতে পারতেন, দ্বারকানাথের সে-অধিকার ছিল।[২৮]

দ্বারকানাথ একদেশদর্শী ছিলেন না, ইংরেজী শিক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২৯] রাজা রাধাকান্ত দেবের সহযোগে ১৮২৩ অব্দে তিনি মাতৃভাষা বাংলার উন্নতি সাধনের জন্য গৌড়ীয় সমাজ স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। ১৮২৩ অব্দের ৮ মার্চ তারিখে এই সভার প্রথম অধিবেশন বসেছিল হিন্দু কলেজে।[৩০]

দেখা যায় কয়েক বৎসর আগে পরে হলেও, হিন্দু কলেজ ও গৌড়ীয় সমাজ সংস্থাপনে হিন্দুদের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় শ্রেণীর লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে পেরেছিল। এ-থেকে প্রমাণ হয় কুলাচারগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাদবিসম্বাদ থাকা সত্ত্বেও, হিন্দুসমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক নেতারা একযোগে ইংরাজী ও মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহ দান করেছিলেন। দ্বারকানাথ এবং গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ছিলেন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র। একটি কথা সুপরিজ্ঞাত—ইংরেজী-শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রথম যাঁরা পদক্ষেপ করেছিলেন, রামমোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাতালিকায় রামমোহনের নাম-সংস্রব হিন্দু কলেজের গোঁড়া হিন্দু পৃষ্ঠপোষকের দল রাখতে দিতে চাননি। কিন্তু শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের অনুগামী ও তাঁরই তরুণ বন্ধু দ্বারকানাথ সম্পর্কে গোঁড়ার দল কোনো আপত্তি তোলেননি, কারণ তাঁরা জানতেন যে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোনো উগ্র হিন্দু-বিরোধিতা ছিল না।

সে যাই হোক, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন তাঁর নিজস্ব আওতায় এংলো-হিন্দু স্কুল পত্তন করলেন, রামমোহনের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্যবশত

দ্বারকানাথ তখন হিন্দু কলেজের সুখ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে ভর্তি করেছিলেন রামমোহনের অর্বাচীন স্কুলে।

আরো একটি জনহিতকর কাজ, জাতি-গঠনে যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং যা ঘটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে দুই বন্ধু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করে গেছেন, তা হল ভারতে সংবাদপত্র স্থাপন ও তার উন্নতি সাধন। প্রথম পথিকৃৎদের মধ্যে সবার আগে তাঁদের মনেই এই সত্যের উদয় হয়েছিল যে জনমত গড়ে তোলার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ও পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব অসাধারণ। বয়সে ও মনস্বিতায় জ্যেষ্ঠ রামমোহন স্বয়ং যেমন সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজেও হাত লাগিয়েছিলেন, দ্বারকানাথ তেমনটা না করে থাকলেও, একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্য ও তাদের উন্নতি বিধানের পিছনে দ্বারকানাথই ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ১৮২১ অব্দে **সাপ্তাহিক সম্বাদ-কৌমুদী** প্রতিষ্ঠা করে রামমোহনের হাতে সম্পাদনা-ভার দ্বারকানাথই দিয়েছিলেন। ১৮৩৩ অব্দে রামমোহনের মৃত্যুর পরেও এই পত্রিকা কিছুকাল বেঁচে ছিল।[৩১] এস. নটরাজন্ লিখেছেন, 'বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকা বহু ভাবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট ঋণী। ইংরাজী সাপ্তাহিক **বেঙ্গল হেরল্ড** এবং বাংলা **বঙ্গদূত** কাগজের সূচনা তিনিই করেছিলেন। উপরন্তু তাঁরই অর্থসাহায্যের বলে **বেঙ্গল হরকরা**, **ইণ্ডিয়া গেজেট** এবং **ইংলিশম্যান** তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।'[৩২]

সূচনায় অর্থাৎ ১৭৯৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে সাপ্তাহিক রূপে **বেঙ্গল হরকরা** প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। **হরকরা**-র পরবর্তী ইতিহাস এই কাগজেরই ১৮৩৬ অব্দে ৩০ জুন তারিখের একটি সংখ্যায় এইভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ '**দৈনিক হরকরা**-র প্রথম সংখ্যা (**হরকরা**-ই ছিল ভারতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রথম দৈনিক) বের হয়েছিল ১৮১৯ অব্দের ২৯ এপ্রিল তারিখে।...কলকাতার একাধিক পত্র-পত্রিকার স্বত্ব ও সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে **বেঙ্গল হরকরা**-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৮৩৪ অব্দের ১ অক্টোবর তারিখে যখন ভারতের প্রাচীনতম কাগজের সমস্ত স্বত্ব ও সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়, জনৈক জনহিতব্রতী এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তি—দ্বারকানাথ ঠাকুর—সে-সমস্ত ক্রয় করে **হরকরা**-ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। ফলে সর্বদিক থেকে **হরকরা** এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয়। অন্য যে-কোনো ভারতীয় পত্র-পত্রিকার চেয়ে এর গ্রাহক সংখ্যা বেশী। **হরকরা**-ই হল পাঁচ কলম-এ প্রকাশিত প্রথম ও একমাত্র দৈনিক। আর প্রাচীনতম কাগজ হল **ইণ্ডিয়া গেজেট** যা এখনো সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হয়।'

মন্টগোমেরি মার্টিন তাঁর **হিস্ট্রি অব দি ব্রিটিশ কলোনিজ**-গ্রন্থে লিখেছেন, 'সম্প্রতি-পরলোকগত রামমোহন রায় এবং বদান্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট ভারতীয় সংবাদপত্র যতখানি ঋণী তেমন আর কারো কাছে নয়।'[৩৩] মন্টগোমেরি মার্টিন কী ভাবে দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচিত হন ও সেই পরিচয়ের সূত্রে স্বয়ং সংবাদপত্র-সেবীর কাজ গ্রহণ করেন,

সে-কাহিনী বেশ কৌতুকপ্রদ। আসলে তিনি ছিলেন অস্ত্রচিকিৎসক, তাঁর শল্য-চিকিৎসার সংস্থা ছিল **বেঙ্গল হরকরা**-র দপ্তরের লাগাও। দ্বারকানাথ তখন **হরকরা**-র তিনজন স্বত্বাধিকারীর অন্যতম এবং সেই সুবাদে প্রায়ই তিনি **হরকরা** দপ্তরে আসা-যাওয়া করতেন। একদিন দপ্তরে যাওয়ার পথে দ্বারকানাথের ঘোড়াগাড়ি উলটে যাবার ফলে তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। দুর্ঘটনা ঘটে মণ্ট্‌গোমেরির সার্জেরি-র ঠিক সামনেই। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্বারকানাথকে তিনি তাঁর সার্জেরিতে নিয়ে আসেন, তাঁর চিকিৎসাতেই ভাঙা পা জোড়া লাগে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ-সূত্রে দ্বারকানাথ জানতে পারেন ডাঃ মার্টিন-এর একান্ত বাসনা সাংবাদিক হওয়া। তখন রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মণ্ট্‌গোমেরি মার্টিন এবং আরো দুজন বন্ধুকে অংশীদার করে দ্বারকানাথ ১৮২৯ অব্দে **বেঙ্গল হেরল্ড**-নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেন। কাগজটি বেরোত চার ভাষায়—ইংরেজী, বাংলা, ফারসী ও নাগরীতে। এই কাগজের জন্য স্বত্বাধিকারীদেরএকাধিকবার মানহানির দায়ে পড়তে হয়েছিল।[২৪] অবশেষে **হরকরা, বেঙ্গল হেরল্ড** কিনে নেন।

মণ্ট্‌গোমেরি মার্টিন সোজা কথার মানুষ ছিলেন, মনে যা আসত মুখে বলতে তাঁর বাধত না। ১৮৩৯ অব্দের ৭ মার্চে **দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** কাগজে ইণ্ডিয়া হাউস-এর এক সভায় ডাঃ মার্টিন-এর প্রদত্ত এক বক্তৃতা সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা বের হয়েছিল। বক্তৃতায় মার্টিন বলেছিলেন ঃ 'আমাদের সরকার তো নামে মাত্র খ্রীস্টান, কার্যত এ-সরকার মুসলমান সরকারের চেয়ে নিকৃষ্ট..। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ভারত থেকে শোষণ করি, বিনিময়ে আমরা কী দিই তাদের। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। মহামারী আর দুর্ভিক্ষ! হাজার হাজার গলিত পচিত শব ভেসে যায় নদীতে, দূষিত বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত, জল পান করলে বমি পায়। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল পরিমাণ অঞ্চলে লোকজন উজাড়!'

সেকালে বিলাতের রক্ষণশীল ও প্রগতি-বিরোধী দলের মুখপত্র ছিল **জন বুল**। ক্রাটেণ্ডেন্ কুঠি এই কাগজ চালাতেন। ১৮৩৪ অব্দে এই কুঠির পতন হবার পর দ্বারকানাথ ১৮,০০০ আঠারো হাজার টাকা দিয়ে জোয়াকিম্ হেওর্ড্ স্টক্‌লার-কে সাহায্য করলেন **জন বুল**-এর ছাপাখানা কিনে নিতে। স্টক্‌লার তখন **ইংলিশম্যান** নাম দিয়ে একটি উদারনৈতিক দৈনিক কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্টক্‌লার ছিলেন বিচিত্র স্বভাবের মানুষ, সাহিত্য ও নাটকের তিনি ছিলেন রসিক সমজদার। গোড়ায় তিনি ১৮২২ অব্দে বোম্বাই এসেছিলেন; সেখানে **আবগাস** নামে একটি কাগজের সম্পাদনা গ্রহণ করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। তিনি তার নূতন নামকরণ করেন **বোম্বে ক্রনিকেল**। পরবর্তীকালে কলকাতার কাজ থেকে অবসর নেবার পর, ১৮৪৪ অব্দে তিনি **দি হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়া**[২৫] নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'যিনি তাঁর মহৎ গুণাবলী ও উদার দাক্ষিণ্যের দৃষ্টান্ত

দিয়ে স্বদেশের সেবা করেছেন এবং সে-দেশকে সকল শ্রেণীর ইংরেজের চোখে মনোজ্ঞ করে তুলেছেন, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের নানা সদয় আচরণের সকৃতজ্ঞ স্মৃতিতে, তাঁর নানা গুণ ও জনহিত-প্রচেষ্টার প্রতি বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় এই সামান্য পুস্তক উৎসর্গিত হল।'

ভারতে ছাপা খবর-কাগজের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। **বেঙ্গল গেজেট** নাম দিয়ে সর্বপ্রথম যে দু-পাতার খবর-কাগজ বের হয়, তা কলকাতা থেকে ১৭৮০ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম জেম্‌স্ অগস্টাস্ হিকি। হিকি বলেছিলেন, '**গেজেট** হবে একটা রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সাপ্তাহিক, এর দ্বার উন্মুক্ত থাকবে সকলের জন্য, কিন্তু **গেজেট** কারো দ্বারা প্রভাবিত হবে না।...' হিকির এই উক্তি সত্ত্বেও লোকের সন্দেহ ছিল জুনিয়স্ ছদ্মনামে গেজেট-এ যে অনামিক লেখক কুখ্যাত **লেটার্স অব্ জুনিয়স্** লিখতেন, তিনি আর কেউ নন, ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর প্রতিপক্ষ ফিলিপ ফ্রান্সিস। হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসা প্রচারের অভিযোগে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ হিকি-র প্রতি বিরূপ হন এবং ১৭৮২ অব্দে **গেজেট** প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[২৬] ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে আরো একটি কাগজ বেরোতে থাকে—এর নাম **ইণ্ডিয়া গেজেট**। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ক্রমে আরো ছয়টি কাগজ বার হয়—প্রত্যেকটিই ইংরেজদের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত ইংরেজী কাগজ। ১৭৯৯ অব্দে ওয়েলেস্‌লি কুঠারাঘাত না করলে আরো কিছু কাগজ বেরোনো বিচিত্র হত না। প্রথম প্রথম যে-সাতটি কাগজ বের হয় তার মধ্যে থেকে বেঁচে থাকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট এক মাত্র **ইণ্ডিয়া গেজেট**। এক বছর আগে ওয়েলেস্‌লি যখন গভর্ণর-জেনারেল হয়ে কলকাতা এলেন তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ। তিনি অত্যন্ত গর্বান্ধ ও উদ্ধতপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন; উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প কিছুদিন পরে এক বন্ধুকে পত্র লিখতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তা থেকেই তাঁর প্রকৃতি বেশ বুঝতে পারা যায়। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'উপায়ান্তর না থাকায় আমার সন্ধ্যেটা কাটে হয় আমার শাসনাধীন প্রজাদের সঙ্গে নতুবা নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।...একান্তে যখন থাকি, আমি রয়েল টাইগার-এর মতো ঘরের মধ্যেই সদর্পে পদচারণা করে থাকি। তখন আমার দুশ্চিন্তার তীব্রতা প্রশমন করার মতো একটা বন্ধুভাবাপন্ন শেয়ালও আমার কাছাকাছি ছোঁক ছোঁক করে না।'[২৭] তাই দেখতে পাই রয়েল টাইগার যখন টিপু সুলতানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-রোধক এমন কতকগুলি আইন পাস হল যে সাতটি কাগজের মধ্যে কেবল একটি বেঁচে রইল—ঘৃণ্য ফেউয়ের মতো ইংরেজের যুদ্ধজয়ের গৌরব ঘোষণা করতে।

ওয়েলেস্‌লি-র তুলনায় মার্কুইস অব হেস্টিংস্-এর শাসন পদ্ধতি ছিল অনেকটা উদারপন্থী। তাঁর সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্র একপ্রকার পুনর্জন্ম লাভ করে। ১৮১৬ অব্দে **বেঙ্গল গেজেট** পুনঃপ্রকাশিত হয় ইংরেজী সাপ্তাহিক রূপে, সম্পাদক হন

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। ইনি এককালে শিক্ষকতা করতেন ও রামমোহনের সহকর্মী ছিলেন। **বেঙ্গল গেজেট**-ই ভারতে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক যার সম্পাদকও ছিলেন ভারতীয়। ১৮১৮ অব্দে বের হল ইংরেজী মাসিক **দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া**—এবং তারই বাংলা পরিপূরকরূপে **সমাচার দর্পণ**। এই দুয়েরই সম্পাদক-প্রকাশক ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের মার্শম্যান ও ওঅর্ড। সেই বছরেই জন পামার-এর নেতৃত্বে কলকাতার কতিপয় ব্যবসায়ী জেমস সিল্‌ক্ বাকিংহামকে সম্পাদক নিযুক্ত করে **ক্যালকাটা জার্নাল** বের করেন; পত্রিকা সপ্তাহে দু-দিন বেরোত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল আট। বাকিংহাম ছিলেন রামমোহনের বন্ধুস্থানীয় এবং সম্ভবত দ্বারকানাথেরও। নানা কারণে তাঁকে একজন বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ মানুষ বলা যায়। তিনি ছিলেন জ্ঞানী মানুষ, তাঁর প্রতিভা ছিল বহু বিচিত্র বিষয়ে। দূর দূর দেশ পর্যটন করে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তিনি করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি সাংবাদিকরূপে ছিলেন স্বাধীনচেতা, রেখে ঢেকে কথা বলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। ইংলণ্ডে ইংরেজের আচরণ আবার সেই ইংরেজ ভারতে এসে রাজপুরুষ হয়ে কেমন ব্যবহার করেন—সে বিষয়ে তিনি যেমন স্পষ্ট কথা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় বাকিংহাম ছিলেন স্পষ্ট কথার মানুষ। তিনি লিখেছেন ঃ 'ইংলণ্ডের সমাজে যিনি বুদ্ধিমান, বিবেচক ও পাঁচজনের হিতসাধকরূপে সম্মানিত হন, এদেশে তাঁকে বলে ভবঘুরে, উড়নচণ্ডী ও প্রায়-আহাম্মক আপদ বিশেষ। ইংলণ্ডে যাঁকে স্বাধীনচেতা বলা হয় এ-দেশে তাঁকে মনে করা হয় দাম্ভিক, দুঃসাহসিক উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ।'[৩৮]

**ক্যালকাটা জার্নাল**-এর স্বাধীন চিন্তা ও স্পষ্টোক্তির প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কলকাতার গোঁড়া আমলাতন্ত্রীরা ডঃ ব্রাইস নামক একজন প্রেস্‌বিটেরিয়ন ধর্ম-যাজককে সম্পাদক নিযুক্ত করে, ১৮২১ অব্দে **জন্ বুল ইন দি ইস্ট** নামে একটি কাগজ বের করলেন। আমলাতন্ত্রের প্রীতির পাত্র ও পোষ্যরূপে সম্পাদক ব্রাইস-কে সরকারের স্টেশনারি দপ্তরে একটি মোটা বেতন ও হালকা কাজের চাকরী জুটিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপার নিয়ে খুবই সংগত কারণে বাকিংহাম যখন তাঁর কাগজে কিঞ্চিৎ হাস্যপরিহাস করেন, তাঁকে রীতিমত গুরু দণ্ড দিতে হয়। ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৮২১ অব্দে রামমোহন বের করলেন তাঁর বাংলা সাপ্তাহিক, **সম্বাদ কৌমুদী**। পরের বছর বের হল ফারসী ভাষায় তাঁর আরো একটি সাপ্তাহিক, **মিরাত-উল-আখবর**।

১৭৯৯ অব্দে ওয়েলেস্‌লি যে সেন্সর প্রথা প্রচলন করেছিলেন ১৮১৮ অব্দে লর্ড হেস্টিংস্ তা রদ করে দেন। কিন্তু ১৮২২ অব্দের শেষদিকে গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল রূপে লর্ড আমহর্স্ট তাঁর পদে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত, জন এডাম্‌স্ গভর্ণর জেনারেল-এর কাজ করে যেতে থাকেন। সেসময় বাকিংহাম দ্বি-সাপ্তাহিক **ক্যালকাটা জার্নাল**-এ বলেন, পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও সম্পাদকের দায়িত্ব 'গভর্ণরদের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া, তাঁদের ভুলত্রুটি বিষয়ে অবিরাম সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা এবং অপ্রিয় হলেও সর্বদা

সত্য কথা বলা।' অপ্রিয় সত্য শুনতে আমলাতন্ত্রীদের ঘোরতর অনীহা থাকায়, ক্ষমতায় আসীন হয়েই ১৮২৩ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এডাম্‌স্ হুকুম জারি করেন যে বাকিংহামকে ভারত থেকে নির্বাসন দিয়ে বিলেতে ফেরৎ পাঠানো হবে—কারণ ডঃ ব্রাইস-এর প্রতি আমলাদের দাক্ষিণ্য ব্যাপারে তিনি স্পর্ধাভরে অপ্রিয় সত্য প্রচার করেছেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে এডাম্‌স্ এক প্রেস অর্ডিনান্স জারি করে বিধিনিষেধের জালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন। বাকিংহাম-এর নির্বাসন ও তারপরেই **ক্যালকাটা জার্নাল** তুলে দেবার ফলে শাসনকার্যে উদারনীতি প্রয়োগের স্বপক্ষে বলবার মতো আর কোনো ইংরেজী কাগজ রইল না—এক **হরকরা** ছাড়া। তখন জেম্‌স্ সাদারল্যাণ্ড ছিলেন **হরকরা**-র সম্পাদক, পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সামুয়েল স্মিথ।

ভারতীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে চারটি পত্র-পত্রিকা এই প্রেস অর্ডিনান্স-এর কোপদৃষ্টিতে পড়েন—তার মধ্যে ছিল রামমোহন রায়ের **সম্বাদ কৌমুদী** এবং **মিরাত-উল-আখবর**। এই ব্যাপারে বিচলিত হওয়াটা স্বাভাবিক। রামমোহন কালবিলম্ব না করে নিজস্ব মুসাবিদায় আবেদন পাঠালেন সরকার ও সুপ্রীম কোর্ট-এর কাছে, একটি আপীলও পাঠালেন স-পার্ষদ ইংলণ্ডেশ্বর-এর দরবারে। এইসব কাগজপত্রে রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সহকর্মীরা স্বাক্ষর করলেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সেই আবেদন-আপীলে না ইংরেজ সরকার না স-পার্ষদ ইংলণ্ডের অধিপতি সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু আবেদন-আপীলে রামমোহন যা লিখেছিলেন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় তিনি যেমন ওজস্বিনী ভাষায় তাতে ব্যক্ত করেছিলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সেই লেখা আজও মহামূল্য দলিলরূপে চিহ্নিত। রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কলেট বলেছেন এই দুটি দলিল 'ভারত-ইতিহাসের আরিওপাগিটিকা'।[১১]

কেবল রামমোহনের উদাত্ত প্রকাশভঙ্গীই যে এই দলিল দুটিকে অসাধারণ করেছে এমন নয়। বলা যেতে পারে যে রামমোহন, দ্বারকানাথ এবং তাঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত যে-কয়জন অগ্রদূত ছিলেন, তাঁদের সকলের রাজনীতিক মত ও বিশ্বাস এই দলিলে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত। পরবর্তীকালে ভারতে যে রাজনীতিক নেতারা এসেছেন, তাঁদের মতোই এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর রাজনীতিক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ছিল ব্রিটিশ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্রিটেন-এর জীবনধারা বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ও ধারণা। তাঁরা যতটুকু জেনেছিলেন বা বুঝেছিলেন তা থেকে তাঁদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন, তেমনি রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যও, চিন্তার স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এখনো পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ হয়নি, কিন্তু অসংখ্য বিপ্লব ঘটেছে সেইসব দেশে যেখানে দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে নালিশ জানাবার মতো স্বাধীন কোনো সংবাদপত্র

নেই।'[৪০] স-পার্ষদ ইংলণ্ডেশ্বরের দরবারে যে আপীল পেশ করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে যদিচ পূর্ববর্তী শাসকদের অধীনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে কোনো দেশীয় ব্যক্তি দেশের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করতে পারত যা বর্তমানে কোম্পানীশাসনের আমলে আর সম্ভবপর হচ্ছে না, তত্রাচ ভারতের জনগণ মনে করেন যে 'করুণাময় বিধাতার বিধানে ব্রিটিশ শাসকেরা এসে পূর্ববর্তী শাসকদের খামখেয়ালিপনা থেকে তাঁদের উদ্ধার করে দেশে সুশৃংখলা এনেছেন, দেশের সকল নাগরিককে সু-বিচার ও সম-ভাবের আওতায় এনে দিয়েছেন। সুতরাং আপনার বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপালনরত প্রজাবৃন্দ ইংরেজদের কখনো বিদেশাগত বিজেতার দলরূপে দেখেনি, দেখেছে উদ্ধারকর্তারূপে এবং আপনার অপার মহিমার প্রতি চক্ষু তুলে আপনাকে দেখেছে কেবল শাসকরূপে নয় পরন্তু পিতারূপে, রক্ষণ পালনের কর্তা রূপে।'[৪১] আজকের দিনে কেউ এমন কথা বলবেন না কিন্তু সেকালে যখন আপীল পেশ করা হয়েছিল এবং তার অনেককাল পরেও, ভারতের মনীষীবর্গের অধিকাংশ রামমোহনের এই ঐকান্তিক আস্থা পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়ে ব্রিটিশ চারিত্র্যগুণের প্রতি, ব্রিটিশদের উদার মানবিকতাবোধের দাবির প্রতি একান্তভাবে আস্থাবান ছিলেন, তাই তাঁরা মনে করেছিলেন ব্রিটিশ শাসন মূলত ভারতের পক্ষে কেবল যে মঙ্গলকর হবে এমন নয় পরন্তু তদানীন্তন অবস্থায় এ শাসন সর্বতো বাঞ্ছনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা যে দেশের জন্য স্বরাজ চাননি বা স্বরাজের আগমন-সম্ভাবনা আশা করেননি, এমন নয়। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাঁরা অবশ্যই দেখেছিলেন, তবে তাঁদের ধারণা হয়েছিল, অর্ধ শতাব্দী কাল ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর, স্বাধীন ভারত নিজের কাজ ভালোভাবে সামলাবার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে। (বস্তুত বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত হতে ভারতের সময় লেগেছিল এক শতাব্দীরও বেশি)। স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁদের মমতা ছিল গভীর, তাদের হিতার্থে তাঁরা যথেষ্ট করতেন, কিন্তু সত্য বলতে কি, স্বদেশী চারিত্র্য বিষয়ে খুব একটা উঁচু ধারণা তাঁদের ছিল না। তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে সংশয় তাঁদের ছিল না, কিন্তু তাঁরা মনে করতেন জাতপাত ও কুসংস্কারের ফলে হিন্দু-সমাজের এমনি ছত্রভঙ্গ অবস্থা যে একযোগে কাজ করার মতো তাগিদ তাদের মধ্যে খুব কম। তাঁরা মনে করতেন দেশীয় চরিত্রের 'অধঃপতিত' অবস্থাটাকে 'উন্নত' করার একমাত্র উপায় 'উচ্চতর' য়ুরোপীয় চরিত্র, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান এবং তাঁদের মূল্যবোধের সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় সাধন। তাঁরা এমন একটা স্বর্ণযুগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যে যুগে ভারত ও ব্রিটেন সমান মর্যাদা ও সম-দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, একটা বৃহত্তর ও মহত্তর সর্বমঙ্গল রাষ্ট্র গড়ে তোলায় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করতে পারবে। স্বদেশের ভাগ্য বিবর্তনে আস্থাহীন, দাসভাবাপন্ন জো-হুকুমের দলে তাঁরা কখনো ছিলেন না; বরঞ্চ বলা যেতে পারে প্রাক্-১৯১৮ পর্বে গান্ধীর মতো, ভারতের

ভাগ্য নিয়ে তাঁরা স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁদের রাজনীতিক মত ও বিশ্বাস-সম্পর্কিত এই মূল কথাটি মনে না রাখলে পরবর্তী জীবনে দ্বারকানাথের অনেক কাজ ও কথার নিহিত তাৎপর্য প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকমত বুঝতে পারব না। ইতিহাসের পটভূমি সরিয়ে দিয়ে যদি তাঁদের আমরা বিচার করতে বসি, তাহলে তাঁদের প্রতি অবিচার করব।

আরো যে-একটি কাজে দুই-বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তা হল ভারতে য়ুরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব সমর্থন। সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, এই ব্যাপারেও তাঁরা স্বদেশবাসী বহু লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তখন পৃথিবী জুড়ে শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্যের হাওয়া বইছে, ইংলণ্ডে ও ভারতে য়ুরোপীয় বণিক সমাজ তখন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ে ঘোরতর ক্ষুব্ধ। এই একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ দিতেন ব্রিটিশ সরকার। ১৮৩৩ অব্দে এই সনদ নবীকরণের অল্প কিছুকাল আগে ফ্রী ট্রেড-সম্পর্কিত আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। দু-দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন যাতে অবাধ হয় সে-প্রস্তাবে রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়েরই পুরোপুরি সমর্থন ছিল। তারই পরিপূরক হিসাবে তাঁরা চেয়েছিলেন য়ুরোপীয়েরা যেন দেশের সর্বত্র শহরে মফঃস্বলে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা স্থায়ী বসবাসের খাতিরে, অবাধে জমিজমা কিনতে পারেন। ১৮২৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাপার নিয়ে কলকাতার টাউন হল-এ একটি সভা বসে।[১২] এই সভার গুরুত্ব কারো অগ্রাহ্য করার জো ছিল না। সম্ভবত সেই প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হয়ে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হয়ে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নাগরিকেরা একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন।[১৩] সভায় দ্বারকানাথ একটি প্রস্তাব আনেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর তা সমর্থন করেন; প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতে য়ুরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে যে-সমস্ত বিধিনিষেধ আছে সেগুলি তুলে নেওয়া হোক। নীল-চাষ থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তার উল্লেখ করে দ্বারকানাথ বলেন এ-থেকে জমিদার ও প্রজাসাধারণ উভয়েই লাভবান হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের, আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবদের জমিদারী কী ভাবে নীলচাষ থেকে উপকৃত হয়েছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ তার বৃত্তান্ত দেন। তিনি আরো বলেন, 'যদি একটিমাত্র পণ্য-উৎপাদনে য়ুরোপীয় দক্ষতা প্রয়োগের ফলে এত উপকার পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে এ-দেশে অন্য নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্রিটিশদের কর্মপটুতা, মূলধন ও অধ্যবসায় বাধাহীন ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে লাভের প্রত্যাশা কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে—ভেবে দেখুন। প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন তো হবেই, সেসব বস্তুর উৎকর্ষও হবে পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের অনুরূপ পণ্যবস্তুর তুলনীয়। কিন্তু এ সব কিছু ঘটিয়ে তুলতে হলে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের স্বাধীনতা প্রয়োজন।'

সব নীলকর সায়েবের ব্যবহার নির্দোষ ছিল না একথা মেনে নিয়েও দ্বারকানাথ

বললেন এ-দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে য়ুরোপীয় উদ্যোগের অসুবিধার চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি। ওই একই অধিবেশনে রামমোহন রায়ও তাঁর বক্তৃতায় অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'ভদ্র শ্রেণীর য়ুরোপীয়দের সঙ্গে যতই মেলা মেশা যায় ততই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।' দ্বারকানাথের মতো তিনিও নীলকর সায়েবদের কাজের প্রশংসা করলেন যদিচ তিনিও মেনে নিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রজাদের উপর অত্যাচার করার জন্য দোষী।'[৭৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, **সমাচার দর্পণ** পত্রের যে-সংখ্যায় (২ জানুয়ারী ১৮৩০) এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাতেই উদ্ধৃত হয়েছিল **সমাচার চন্দ্রিকায়** 'কস্য জমিদারস্য' একটি পত্র—পত্রটি দ্বারকানাথের প্রস্তাব ও তাঁর যুক্তির সমালোচনা। পত্রলেখকের একটি বক্তব্য মহাত্মা গান্ধীকে নিশ্চয় খুশি করত ঃ 'পুরাতন কালে এদেশের গরিব মেয়েরা হীন অবস্থায় থাকলেও চরকায় সুতো কেটে দিন গুজরান করতেন। ইংলণ্ড কলে-কাটা সুতো রপ্তানী করার পর থেকে তাঁরা অর্ধাশনে অনশনে কাল যাপন করে থাকেন। একবার ভেবে দেখুন, সুদূর ইংলণ্ডে বসে সেখানকার শিল্পপতিরা যদি এ-দেশীয়দের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারেন, দেশ ছেড়ে তাঁরা যদি এখন এ-দেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেন, তাহলে দেশের কী অবস্থা হতে পারে।'

**সমাচার চন্দ্রিকা**-র সম্পাদকের মতো বহু গোঁড়া হিন্দু ভীতি প্রকাশ করে বলেছিলেন সায়েবরা এসে যদি মফঃস্বলে বসবাস শুরু করেন, তবে 'দেশীয়দের জাত যাবে'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'য়ুরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের কথা এবং ভারতে অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর য়ুরোপীয়দের আচরণের কথা বিশপ হেবর বিলক্ষণ অবগত ছিলেন বলে তাদের জন্য স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে তোলার বিপক্ষে তো তিনি ছিলেনই, উপরন্তু তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল ভারতে এদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়।'[৭৫] ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত সাপ্তাহিক **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া**-ও এই ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহনের প্রভাব কিছু কম ছিল না। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে জোড়াসাঁকো বাড়ির ঠাকুর পরিবার ছিল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও নিরামিষাশী। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণ হলেও রামমোহন মুসলমানী ধরণের জীবনযাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং মাংসাহারে তাঁর বেশ রুচি ছিল। ইসলামের ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে মুসলমানেরা তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভি' বলে শ্রদ্ধা করত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অশোককুমার মজুমদার বলেন, 'রামমোহনের পূর্ববর্তী কোনো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্মতত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন বলে জানা যায় না।'[৭৬] জাত খুইয়ে ফেলার ভয়ে মুসলমানদের সঙ্গে তিনি খাওয়াদাওয়া করতেন না বটে, কিন্তু বাড়িতে তাঁর একজন মুসলমান বাবুর্চি থাকত। উপরন্তু য়ুরোপীয়দের সঙ্গে

মেলামেশার ফলে তিনি মধ্যে মধ্যে এক গ্লাস শেরী পান করতে ভালোবাসতেন। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে শেরীর গ্লাসে চুমুক দেবার বহু আগেই তিনি হয়তো মদ্যপানের ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত। তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে এবং বিশেষত তাঁর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে রামমোহনের নিকট-যোগাযোগের কথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে যে-ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে এই রকম অনুমান হয়তো অসঙ্গত হবে না।

একবার মথুরায় থাকতে মহর্ষি গিয়েছিলেন এক সাধু সন্দর্শনে; তাঁর ঘরে যে-সব বই ছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ 'দেখলাম অধিকাংশ বই-ই রামমোহন রচনাবলীর হিন্দী অনুবাদ। তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র (রামমোহনের প্রিয় তন্ত্র) থেকে ব্রহ্মের মহিমা-স্তোত্র আবৃত্তি করে বললেন, নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়। আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের উভয়ের ধর্মীয় মতবাদ অনেকটা একই প্রকারের। পথ চলতে পথের ধারে এ-রকম একজন ব্যক্তির দেখা পেয়ে খুবই আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। আমি তাঁকে আমার বোট্-এ আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। তিনি আমার সঙ্গে আহারাদিও করলেন, কেবল খাদ্যের সঙ্গে তাঁকে কিছু পানীয়ও (কারণ-বারি) দিতে হল। কারণ পান করতে গিয়ে তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটি কুলম্ উদ্ধরেৎ।'[৪৭] তাঁর দিল্লি-ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে মহর্ষি লিখেছেন ঃ 'এখানে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য তান্ত্রিক ব্রহ্মবাদী সুখানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পেলাম। রামমোহন রায় এই হরিহরানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কলকাতায় গেলে ইনি রামমোহনের বাগান-বাড়িতে থাকতেন, এঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। দিল্লি পৌঁছনোমাত্র সুখানন্দ স্বামী আমার জন্য কিছু আঙুর ও মিঠাই পাঠিয়ে দেন। আমিও কিছু উপহার-দ্রব্য পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনিও আসেন আমার সাক্ষাতে—এইভাবে আমাদের দুজনের আলাপ-পরিচয় হয়। আলাপ-প্রসঙ্গে সুখানন্দ স্বামী আমায় বলেছিলেন ঃ 'আমি ও রামমোহন রায়—আমরা উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য—তিনিও আমার মতো তন্ত্রসাধক ছিলেন।'[৪৮]

সে যেমনই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় রামমোহনের প্রভাবে আসার ফলে দ্বারকানাথ ও তাঁর ছোট ভাই রমানাথ বহুল পরিমাণে কুলাচারগত বিধিনিষেধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে রমানাথের স্ত্রীর মুখে জানা যায় দুই ভাই-ই মদ মাংস খেতে শেখেন এবং ক্রমে এই নিষিদ্ধ আহারে তাঁদের বেশ রুচিও হয়। রমানাথের স্ত্রী বলেছেন, 'প্রথম যখন এঁনারা মাংস খেতে শুরু করেন এঁদের বমি হয়ে যেত। ক্রমাগত চেষ্টার পর মাংস খাওয়া এঁদের অভ্যেস হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেশ দূরে উঠোনের এক কোণায় মাটির পাত্রে মাংস রাঁধা হত এবং রান্নার পর সে পাত্র বাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়া হত। ক্রমে দুই ভাইয়ের সঙ্গে সায়েবদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা সায়েবদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খানা খেতে শুরু

করলেন। আগে আগে খাবার রাঁধত আনন্দ ও পরমানন্দ নামে দুজন ব্রাহ্মণ পাচক। এখন রামমোহনের সুপারিশে মুসলমান বাবুর্চি রাখা হল। রামমোহনের কথায় দ্বারকানাথ মদ খাওয়াও ধরেছিলেন কিন্তু মদে তাঁর কোনকালে আসক্তি ছিল না, কেবল খানার সময় ছোট এক গ্লাস শেরী পান করতেন। মদ্যপান তাঁর যে ভালো লাগত এমন নয়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে আচার বিচার ভাঙ্গার একটা যে-রেওয়াজ তখন এসেছিল মদ, মাংস ছিল তারই অঙ্গ। যদ্দুর জানা যায় শেষ জীবনে দ্বারকানাথ মদ সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন।'[৪৯] তৎকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা চলে না দ্বারকানাথ শেষ জীবনে মদ সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। বিলাতে আকস্মিক অসুখে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অকাল মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত তিনি নিজে ভোজসভার আয়োজন করতেন অথবা অন্যদের আমন্ত্রণে ভোজসভায় যেতেন। এই সব পার্টিতে মহামূল্য পানীয়ের স্রোত বইত অবাধে। প্রখ্যাত দেশভক্ত ও মদ্যপান-বিরোধী প্রচারক ফাদার থিওবল্ড্ ম্যাথু (যিনি দ্বারকানাথের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং যাঁর তৈলচিত্র তিনি নিজ ব্যয়ে আঁকিয়েছিলেন,) পর্যন্ত মাদক দ্রব্য স্পর্শ না করার প্রতিশ্রুতি তাঁর কাছ্ থেকে আদায় করতে পারেন নি।

মনে হয় বিলেত যাত্রার বহু আগের থেকেই (বিলেতেই ১৮৪৬ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়) এবং সম্ভবত ১৮৩৩ অব্দে রামমোহনের দেহরক্ষা করার অল্প কিছুকাল পরেই, দ্বারকানাথের জীবনযাত্রার ধরণ ক্রমশ পাল্টাতে থাকে। ১৮৩৮ অব্দে মাতা অলকাসুন্দরীর পরলোক যাত্রার পর থেকে বিধিনিষেধের শেষ বন্ধনটুকু খসে যায় এবং তিনি স্পষ্টত ভোগবিলাসের জীবনে অনুরাগী হয়ে পড়েন। কলকাতার শহরতলীতে তাঁর সুরম্য বেলগাছিয়া ভিলা খানাপিনার প্রাচুর্য ও অমিতব্যয়ী বিনোদন ব্যবস্থার কেন্দ্র রূপে বিখ্যাত হয়। জনৈক অভিজাত জর্মন ১৮৪৩ অব্দে কলকাতা ভ্রমণে এসে দ্বারকানাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনযাত্রার ধরণ সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল ও প্রামাণিক বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সেই বর্ণনা থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যায়ঃ[৫০]

'দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল লণ্ডনে, ব্রিটিশ মহারাণীর বসার ঘরে। এই বুদ্ধিমান হিন্দু সেই প্রথম রাণী-সন্দর্শনে এসে, শোভন সংযত মর্যাদায় রাণীকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করলেন। আমি যেমন ভারত পর্যবেক্ষণে রত আছি, তিনিও তেমনি য়ুরোপ-এর আচার-আচরণ, চালচলন, হাব-ভাব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে সে-সব কিছুর নিহিত তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু য়ুরোপে-ই কেটেছে। এ নিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মতভেদ ও বিসম্বাদ দেখা দিলেও, তিনি পুনরায় য়ুরোপে ফিরে গিয়ে ইংলণ্ডে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের[৫১] শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। ভারতে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম, রামমোহন রায়ের পরেই তাঁর স্থান। রামমোহনের মতো তিনিও দেশের লোককে তাদের মোহ ও পাপ থেকে

মুক্ত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছেন—যদিচ চিত্তের দৃঢ়তা ও নৈতিক সাহসের দিক থেকে তিনি তাঁর প্রখ্যাত ও সদ্যপ্রয়াত স্বদেশবাসীর তুলনায় কিঞ্চিৎ ন্যূন। তাঁর বুদ্ধিবিচার ও মনের গতি দেখে আমার মনে হয় তিনি যতটা না হিন্দু তার চেয়ে অনেক বেশি খ্রীস্টান—যদিচ হিন্দু ধর্ম তিনি এখনো পরিহার করেন নি এবং এখনো কিছু কিছু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ঘোরতর পর্দানশীন,[২২] এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার ধর্মীয় মতামত সমর্থন করেন না। আলাপনরত অবস্থায় এই আশ্চর্য মানুষটিকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আকারে ক্ষুদ্র হলেও তাঁর হাতের আঙুলগুলি কোমল ও নমনীয়, আলাপ করতে করতে তিনি তাঁর দাড়িতে হাত বোলান, চারিদিকে যখন চেয়ে দেখেন—তাঁর বড়ো বড়ো চোখে বুদ্ধিমত্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, ত্বরিতগতিতে তাঁর মনে একটির পর একটি যে-সব চিন্তার উদয় হয় তারই প্রতিফলন ঘটে মুখের ভাবে। কর্মপটুতা ও সাহসিক উদ্যোগের ফলে দ্বারকানাথ এখন ভারতে ধনাঢ্য বণিকশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তিনি কেবল ধনীশ্রেষ্ঠ নন, এই আতিথ্যপরায়ণ দেশে তাঁর মতো আতিথ্যপরায়ণ ব্যক্তি খুব অল্পই দেখা যায়। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর ভিলা-তে অনুষ্ঠিত একটি সামাজিক উৎসবে যোগদানের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

'কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ইংলণ্ডের পার্ক ধরণের একটি বাগানে, গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় দৃশ্যশোভার মাঝখানে অবস্থিত এই ভিলা। শান্ত নিরিবিলি এই নিকেতনের চারদিকে তৃণাবৃত ঘন সবুজ জমি, মাঝে মাঝে সযত্ন-বিন্যস্ত ফুলের কেয়ারি, এক ধারে চোখজুড়ানো জলের একটি ধারা চলে গেছে, তার ওপাশে আম্রকুঞ্জ, এক সারি তেঁতুল গাছ আর কলাবাগান। বাগানের চতুর্দিকে নারকেল ও তাল গাছের সারি। এ-ভিলা নববিবাহিতদের বিশেষ প্রিয় স্থান, অনেক সময় আতিথ্যপরায়ণ মালিক মধুচন্দ্র যাপনের জন্য এখানে তাঁদের সাদরে আমন্ত্রণ করে থাকেন। ভিলাটি দ্বিতল, প্রত্যেকটি কামরা য়ুরোপীয় কায়দার আসবাব পত্রে সুসজ্জিত, উপরন্তু কিছু কিছু মার্বেল পাথরের মূর্তি ও তেলরঙের ছবি এর শোভা বর্ধনের জন্য ইতস্তত বিন্যস্ত।

'গৃহস্বামীর ভাইয়েরা এবং একজন ভাগিনেয় একই টেবিলে বসে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেলেন। পানীয়-রূপে ছিল উৎকৃষ্ট সব মদ এবং ভোজ্যের মধ্যে গো-মাংসের রোস্ট্-ও বাদ যায়নি। ডিনার সমাপ্ত হবার পর দু'জন বাঈজী এলেন তাঁদের নিজ নিজ বাজনদারদের নিয়ে। তাঁদের নাচ আমার ততটা ভালো লাগেনি যত ভালো লেগেছে তাঁদের সুগঠিত হাত পায়ের পেলব ভঙ্গী ও মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠব...।'

রামমোহন রায় দ্বারকানাথের মতো ভোগী বা বিলাসী ছিলেন না। তাঁর জীবনযাপনের ধরণ ছিল সহজ ও সরল। তবু তাঁর সেই জীবনযাত্রার মধ্যে একটা সুরুচিপূর্ণ সৌষ্ঠব ছিল। এ দেশে একধরণের গরিবিয়ানা ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে আমরা সাধুপুরুষ কিংবা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলে বাহবা দিয়ে থাকি, রামমোহনের মধ্যে সেরকম ভড়ং

আদৌ ছিল না। তাঁর কলকাতার বাড়িতে রামমোহন প্রায়ই লোকেদের আমন্ত্রণ করতেন, আদব আপ্যায়ন করতেন, তাঁর বিদেশী অতিথিদের কেউ কেউ এইসব আদর-আপ্যায়নের অঙ্গরূপে বাই-নাচের কথাও উল্লেখ করেছেন। লণ্ডনে থাকতে সেখানকার সবচেয়ে উঁচু সারির অভিজাত-বর্গের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেছেন। তাঁকে বেশ কিছু সময় কাটাতে হয়েছে সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্গে কিংবা খ্রীস্টীয় যাজকমণ্ডলীর সঙ্গে। উপরন্তু রাজনীতিক ব্যাপার ও সমাজনীতিক সমস্যা নিয়েও তাঁকে বেশ কিছুটা মাথা ঘামাতে হয়েছে। তাই বলে যে তিনি লণ্ডন শহরের সমাজ-জীবন থেকে স্বেচ্ছায় দূরে সরে থাকতেন—এ অনুমান সর্বৈব ভুল। তিনিও ডিনারে যেতেন, পার্টিতে যেতেন, থিয়েটারে গিয়ে একাধিক অভিনয়ও দেখেছেন। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্বল ১৮৩১ অব্দের ২২ ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, 'সন্ধ্যায় ইসাবেলা নাটক অভিনীত হল। দর্শক খুব কম এসেছিল। আমি বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলাম। ডেভনশায়ারের ডিউক-এর সংরক্ষিত বক্স্-এ বসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আমার অভিনয় দেখে তিনি নাকি অঝোরে চোখের জল ফেলেছেন। আহা, বেচারা!' ১৮৩২ অব্দের ৮ মার্চ তারিখে ডায়রিতে আরো একটি উল্লেখ দেখা যায়, 'মণ্টেগুদের বাড়িতে একটা খোশমেজাজ পার্টিতে রাজার সঙ্গে দেখা। খানিক বাদেই বিষয় প্রসঙ্গের বালাই না রেখেই আমরা বেশ মজা করে একটা আবোল তাবোল আলাপ জুড়ে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে আজ আমাদের গল্পসল্প চলল, ভারি খুশি হয়েছিলাম এইরকম আলাপ করে। রাজার চেহারাটা চোখে পড়ার মতো। ওঁর গায়ের রঙ এবং ওঁর চিত্রবিচিত্র পোশাক পরিচ্ছদ অবশ্য লণ্ডনের যে কোনো বল্‌রুমে ওঁকে বিশিষ্ট করে তুলে ধরে। ওঁর মুখের ভাবে গভীর মনীষার সঙ্গে একটি ভারি মধুর সদাশয়তার সংমিশ্রণ দেখা যায়।' তিন দিন বাদে ফ্যানি লিখলেন, 'একটা ভারি সুন্দর চিঠি এসেছে এবং সেইসঙ্গে এসেছে প্রাচ্য দেশের প্রাজ্ঞ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে মধুর স্বভাবের লোকটির কাছ থেকে—কয়েকটি ভারতীয় বই।'

যদিচ বহু বিষয়ে উভয়ে সমগুণসম্পন্ন ও সমান আগ্রহী থাকায় দুই বন্ধু অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন, মনে মেজাজে ও পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর। ধর্মবিরোধী বলে নিন্দিত হলেও রামমোহনের ধর্মানুরাগ ছিল গভীর। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রেরণা তিনি পেতেন তাঁর অন্তর-নিহিত শুভ বুদ্ধির আবেগ থেকে। অপরপক্ষে দ্বারকানাথের কাছে ধর্মাচরণ ছিল প্রথাসিদ্ধ লৌকিক কৃত্যবিশেষ এবং তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল বস্তু-জগতে সাফল্য লাভ ও আধুনিক য়ুরোপীয় অর্থে উন্নতি বা প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও নৈতিক আদর্শের মুখোমুখি হয়ে রামমোহন তার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন মূলত শিক্ষার মাধ্যমে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধন করে। অপরপক্ষে তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন

একটি অর্থনীতিক সমন্বয় সাধন করে, য়ুরোপ-এর সংগঠন ক্ষমতা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সঙ্গে ভারতীয় উদ্যম ও মূলধনের মিলন ঘটিয়ে।'[৫৪] এইসব মূলগত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও বলা যেতে পারে রামমোহনের সমকালীনদের মধ্যে মনে প্রাণে বিশ্বস্ত যদি এমন কোনো বন্ধু তাঁর থেকে থাকেন, যিনি সর্বদা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ও সকল শক্তিতে তাঁর হয়ে সংগ্রাম করেছেন—তবে তিনি দ্বারকানাথ ছাড়া আর কেউ নন। ১৮৪২ অব্দের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে **ইংলিশম্যান** কাগজের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ 'আমাদের ধারণা, দ্বারকানাথ চরিত্রের অতি উজ্জ্বল একটি দিক হল তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেই রামমোহনের নিকট-সান্নিধ্যে আসা এবং তারপর থেকে দৃঢ়ভাবে তাঁর সকল কাজে যুক্ত থাকা। জয়কৃষ্ণ সিংহ ও অন্য অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বাবুমশায়রা যখন রামমোহনকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তখনো তাঁর সঙ্গে লেগে থাকা খুবই নৈতিক সাহসের পরিচায়ক। দ্বারকানাথ সেই অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে সফল হয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বহুবিস্তৃত প্রভাবের ফলে রামমোহন রায় প্রবর্তিত উদার মতবাদ, ধর্মসভার ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও, কলকাতার অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত ও গৃহীত হয়েছে।'

সমাজের হিত ও সমাজ-সংস্কার রামমোহন তাঁর জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মূলত তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। হিন্দু গোঁড়ামি সম্পর্কে একটা স্পর্ধিত বিরোধের ভাব তাঁর মনে থাকলেও, জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত তিনি এমন কিছু করেননি যাতে বিরোধী পক্ষ মনে করতে পারে তিনি জাত খুইয়েছেন তিনি তাই একই টেবিলে বসে মুসলমান ও য়ুরোপীয়দের সঙ্গে খানাপিনা সযত্নে বর্জন করে চলতেন। বিলেতেও তাঁর বহুসংখ্যক ইংরেজ বন্ধু থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সেই অভ্যাস ছাড়েননি। কিন্তু ১৮৩৩ অব্দের গোড়ায় তাঁর ব্যাঙ্কার ও এজেন্ট ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর পতন হবার পর, তাঁর দীর্ঘ প্রবাস যাপনের একেবারে শেষ পর্বে, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে, তাঁর বন্ধু বাবু নন্দকিশোর বসুর সাক্ষ্যক্রমে জানা যায়, 'ইতিপূর্বে যিনি ইংরেজদের সঙ্গে খানাপিনা সযত্নে পরিহার করে গেছেন, নিতান্ত দায়ে পড়ে কার্পেণ্টর পরিবারের সঙ্গে একই টেবিলে বসে তাঁকে আহারাদি সারতে হত।'[৫৫]

রামমোহন অবশ্যই জানতেন, 'কালাপানি' পেরিয়ে বিদেশ আসার স্পর্ধা গোঁড়া হিন্দুসমাজ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। এটাও তিনি নিশ্চয় জানতেন, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের অবমাননা যদি তিনি না মেনে নিতে পারেন (মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত) তাঁকে 'একঘরে' হতেই হবে, সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করবেই। তবু কেন যে তিনি তাঁর বিদেশী আশ্রয়দাতাদের সঙ্গে একত্র আহারের অর্থহীন বিধিনিষেধ ভাঙতে পারেন নি—ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রে তিনি যে-সব অনুগামীদের নেতৃস্থানীয়, সম্ভবত তাঁদের কথা ভেবেই এ বিষয়ে তিনি এত সাবধানী

হয়েছিলেন। পৌত্তলিকতা পরিহার করে থাকলেও এই সব অনুগামীদের অনেকে তখনো বহু প্রাচীন সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি, তাই এঁদের বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাতে তাঁর মন সরেনি। হয়তো অন্য কিছু কারণ থাকতে পারে—কে জানে। মহাপুরুষদের মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পাওয়া ভার।

কিন্তু দ্বারকানাথ তো ধর্মনেতা ছিলেন না সুতরাং অনুগামীদের মুখরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয় নি কারণ অনুগামী বলতে তাঁর কেউ ছিল না। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র ও নিঃষঙ্গ। তিনি ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের একজন অসম-সাহসিক সংগঠক ও উদ্যোগী পুরুষ। অর্থ বিত্ত বিষয় সম্পত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি নিজের পথ নিজেই করে নিতেন, অপর কারো মুখাপেক্ষী হতেন না। নাগরিক-রূপে তাঁর কর্তব্যাকর্তব্য দায়দায়িত্ব বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সামনে নিজের ধর্মীয় বা নৈতিক কোনো ভাবমূর্তি তুলে ধরার তাগিদ তিনি নিজের মন থেকে কখনো পান নি। তাঁর জীবনযাত্রার ধরণ ছিল তাঁর নিজস্ব। যেমন তাঁর ভালো লাগত তেমনি ভাবে তিনি থাকতেন। বিষয়কর্মের কিসে সুবিধা হতে পারে সেকথা যে ভাবতেন না এমন নয়, কিন্তু ভালো লাগলে খামখেয়ালী করতেও ছাড়তেন না। এসব নিয়ে কারো কাছে জবাবদিহিও করতেন না তিনি। তিনি নিতান্ত খোলাখুলি ভাবে মনেপ্রাণে পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসে অনুরাগী এক বিষয়ী মানুষ ছিলেন, এ নিয়ে তাঁর মনে কোনো লজ্জা বা সংকোচ ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল দৃপ্ত পুরুষকার। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন নানা মানবিক গুণের অধিকারী এক বদান্য মানুষ। তাঁকে যদি তাঁর মতো করে দেখা যায়, দেখতে পাব তিনি ছিলেন সৎ লোক ও খাঁটি লোক—এবং সেই কারণেই শ্রদ্ধার যোগ্য। প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে আসার পর পুরুতের দল তাঁকে শাসিয়েছিল, প্রায়শ্চিত্ত না করলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হবে। তিনি হাসতে হাসতে পুরুতদের বলেছিলেন, 'প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না, আপনারা কী করতে চান করতে পারেন।' পারী থাকতে দ্বারকানাথ-সন্দর্শনে গিয়েছিলেন ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলর, প্রশ্ন করেছিলেন দেশে ফিরলে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে যে একঘরে করতে পারে, এ নিয়ে কি তাঁর ভয়-ভাবনা আছে? অতঃপর কী ঘটল ম্যাক্সমূলর-এর জবানীতেই বলা যাক ঃ 'আমার ভারতীয় বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর সুপণ্ডিত না হলেও খুবই বুদ্ধিমান ও জাগতিক ব্যাপারে বিচক্ষণ ব্যক্তি। ব্রাহ্মণদের তিনি হেয় জ্ঞান করেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ভারতে ফিরে যাবার পর তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'না, না, তা কেন হবে। যদিও বিদেশে আছি, আমার টাকায় দেশে বেশ কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থান হচ্ছে। সেই তো আমার প্রায়শ্চিত্ত।'[৫৬]

দ্বারকানাথ প্রথম যেবার বিলেত যান, তীর্থযাত্রীর মতো ব্রিস্টল গিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের সমাধি দেখতে। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ব্রিস্টল-এর স্টেপল্‌টন্

গ্রোভ্-এ রাজা ছিলেন মিস কাস্ল্-এর অতিথি, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নয় বছর আগে। গৃহসংলগ্ন বাগানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। অনাদরে সমাধির হতশ্রী অবস্থা দেখে আর্নোজ্ ভেল্-এর সার্বজনীন সমাধি-ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ শবাধার স্থানান্তর করেন। নূতন সমাধির উপর ভারতীয় স্থাপত্য-রীতি অনুসারী একটি সুদর্শন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে দেন। আজও বহু দর্শক সেই সমাধি দর্শন করতে ব্রিস্টল যান।[৫৭] নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রয়াত বন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে দ্বারকানাথ হয়তো এ-রকম কাজ নিজের থেকে নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয়, এ প্রস্তাব প্রথম আসে ব্যাপ্‌টিস্ট্ মিশন-এর পত্রিকা **ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া**-র মাথায়। বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারী ১৮৪২ তারিখের অপরাহ্নে বিলাত যাবার প্রাক্‌কালে, কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক দ্বারকানাথকে শুভ-যাত্রার অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি জনসভা আয়োজিত হয়। সেই দিনের **ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া**-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল ঃ

'রামমোহন রায়ের সহৃদয় বন্ধু ও সর্ব-পুরাতন অনুরক্তজনের অন্যতম, আমাদের অতি আদরের দ্বারকানাথ ঠাকুর বিদেশে পাড়ি দেবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে আমরা এই আস্থাই প্রকাশ করতে চাই যে বিলাতে তাঁর সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হবে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির হতাদরে ভগ্নপ্রায় সমাধিটির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তার উপর এমন একটি স্মৃতিসৌধ রচনা যার আকর্ষণে অনাগত কালের ভারতীয় তীর্থযাত্রীরাও ও-দেশে গিয়ে দেখে আসতে পারবেন কোথায় রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ চিরবিশ্রাম লাভ করেছে...। ইংলণ্ডের একটা অজ্ঞাতপ্রায় কবরে রামমোহন শেষনিদ্রায় শয়ান থাকবেন—এটা ভারতের পক্ষে শ্লাঘাজনক হতে পারে না। আমাদের মনোগত ইচ্ছা যদি ব্যক্ত করা সম্ভব হত, আমরা তাহলে বলতাম দ্বারকানাথের সম্মানে আজ যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে যেন এই স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে জনগণ তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এবং যদি সেই প্রখ্যাত ব্যক্তির দেহাবশেষের উপর স্মৃতিসৌধ রচনার জন্য চাঁদা তোলা সম্ভব হয়, তবে সে-অর্থ তাঁর বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে প্রকাশ্য সভায় তাঁকে এই সৌধ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। দ্বারকানাথ যে এ-প্রস্তাবে অকুণ্ঠভাবে সহমত হবেন—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

বলা বাহুল্য সেদিনকার জনসভা **ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া**-র এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে লেখকের মনে, সে-সব প্রশ্নের সন্তোষজনক সদুত্তর এখনো তাঁর মেলেনি।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে রামমোহনের কলকাতাস্থিত ব্যাঙ্কার ও এজেণ্ট ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর পতন হয় ১৮৩৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে। কোম্পানীর লণ্ডন প্রতিনিধিরা কলকাতা থেকে নিয়মিত যে-টাকা পেত তাই দিয়ে রামমোহনের বিলেতের খরচখরচা

চলত। কোম্পানী ফেল্ পড়ায় সে আদায় হঠাৎ বন্ধ হওয়াতে বিদেশ বিভুঁয়ে রামমোহন যেন অথৈ জলে পড়েছিলেন। রামমোহনের মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার অর্থকরী দুশ্চিন্তা ছিল প্রায় লাঞ্ছনার সামিল। বলা হয়, এই কারণেই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে কর্জ হিসাবে কিছু টাকা চেয়েছিলেন, দেশে ফেরার জন্য। কোম্পানী ভালো করেই জানতেন দেশে রামমোহনের বিষয় সম্পত্তির কথা, তৎসত্ত্বেও তাঁরা সোজাসুজি তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর করে দেন। তাঁর নিজের ছেলেরা কেন যে তাঁকে টাকা পাঠাতে পারেন নি তা ঠিক বুঝতে পারা শক্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দ্বারকানাথ তো ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর সঙ্গে নিকটভাবে যোগযুক্ত ছিলেন। এমনকি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর তিনি ছিলেন অন্যতম অংশীদার। কালে এই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 'ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর এক প্রকার ক্যাশ ডিপার্টমেণ্ট-এ পরিণত হয়েছিল।' স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দ্বারকানাথ কি কোম্পানীর সংকট-অবস্থা পূর্ব থেকে আঁচ করতে পারেন নি, আর যদি পেরেই থাকেন, এমন কোনো কি ব্যবস্থা করেছিলেন কোম্পানীর আসন্ন পতনের আগেই তাঁর বন্ধুর গচ্ছিত ধন তুলে নেবার? তিনি কি রামমোহনকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন কিংবা করতে চেয়েছিলেন? তখন তো তাঁর নিজের ধনসম্পত্তির রমরমা অবস্থা, উপরন্তু বিলেতের বহু সায়েব লোকের সঙ্গে দহরম মহরম। হয়তো তিনি যথাসাধ্য করে থাকবেন, কিন্তু কতটুকু কী করেছিলেন বা করতে পেরেছিলেন—তার কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য এ কথাটা মনে রাখা উচিত, তখন দুই দেশের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ—ডাক চলাচলের রাস্তা ছিল জলপথে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। তবু বলতেই হবে দুঃখের সঙ্গে যে, না তাঁর সন্তানসন্ততি না তাঁর স্বদেশের অগণিত বন্ধু বা অনুগামীর দল—যাঁরা তাঁর কাছে নানা ভাবে উপকৃত—তাঁদের কেউই শেষের দিনগুলিতে তাঁর সহায় হবার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন নি। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধায় নম্র হয়ে স্মরণ করতে হয় রামমোহনের ইংরেজ ভক্তদের কথা—যাঁরা অন্তিম সময় অবধি তাঁর পাশে পাশে থেকেছেন—প্রেমে ও মাধুর্যে।

যদিচ ব্রিস্টল-এ রামমোহনের সমাধির উপর দ্বারকানাথ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যে কলকাতা শহরে রামমোহন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, সেখানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো আয়োজন করা হয়নি। ১৮৩৪ অব্দে রামমোহনের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছবার পর একটি সভা ডেকে স্থির করা হয়েছিল: 'প্রয়াত রামমোহন রায়ের গুণ ও কীর্তির স্মরণে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হোক।' কিন্তু ১৮৪২ অব্দে ৭ জুলাই তারিখে প্রকাশিত **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** কাগজের সম্পাদকীয় টিপ্পনী থেকে জানা যায়, দীর্ঘ আট বছর কাল কেটে গেলেও, সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই প্রস্তাব বাস্তবে পরিণত করার মতো কোনো চেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়নি। জুলাই মাসের **বেঙ্গলি স্পেক্‌টেটর** পত্রিকার আলোচনা করতে

গিয়ে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া**-র সম্পাদক মন্তব্য করেছেন ঃ

'প্রথম প্রবন্ধ কলকাতাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আট বছর আগে তাঁরা কত উৎসাহে প্রয়াত রামমোহন রায়ের গুণ ও কীর্তির স্মরণে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন; কেমন করে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ৮০০০ টাকা চাঁদা তোলা হয়েছিল এবং তারপরে কীভাবে সেই চাঁদার টাকা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে সকল প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রাসাদনগরীর পক্ষে এত বড় কলঙ্ক পুষে রাখা কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। ১৮৩৪ অব্দের এপ্রিল মাসে টাউন হল-এর সেই সভায় যে-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল অবিলম্বে তা কার্যে পরিণত করার জন্য একটা কোনো ব্যবস্থা করা দরকার। এটা অতি আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ব্যাপার বলতে হবে, যে-নয় জন ব্যক্তির হাতে চাঁদার টাকা তুলে দেবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল আট বছর আগে, সে-নয় জনের প্রত্যেকটি লোক এতদ্দণ্ডে ভারতেই আছেন, এমন কি এই প্রেসিডেন্সিতেই আছেন। সেইজন্য আমরা আশা করে আছি যে অনতিকাল পরে আমরা জানতে পারব যে তাঁরা টাউন হল-এ সভা ডেকে স্থির করবেন স্মৃতিরক্ষার জন্য কী প্রকার পরিকল্পনা স্থির করা হবে। **স্পেক্‌টেটর** প্রস্তাব করেছেন সংগৃহীত চাঁদা দুটি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হোক ঃ প্রথমতঃ রামমোহনের সমগ্র রচনাবলীর একটি সংকলন প্রকাশ করে এবং দ্বিতীয়ত, সকলের কাজে লাগে এমন সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশে উৎসাহ দান করে। প্রথম প্রস্তাবটি আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আজকের দিনেও রামমোহনের বিভিন্ন রচনা সমগ্র আকারে পাওয়া শক্ত। আশঙ্কা হয়, কিছু কিছু রচনা অচিরে হয়তো লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমগ্র রচনার সংকলন প্রকাশ হবার পর যে টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকবে, আমাদের একান্ত বাসনা সে টাকা যেন হিন্দু কলেজ-এর হল-এ তাঁর স্মৃতিতে একটি সুরুচিপূর্ণ প্রাচীর ফলক নির্মাণে ব্যয় করা হয়। আমাদের ধারণা এ-দেশের উন্নতি-সাধন যাঁদের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছে, উপরোক্ত হল-এর প্রাচীর গাত্রে যদি অল্পে অল্পে তাঁদের নামের স্মৃতিফলক একত্র বিন্যাস করা যায়, তার চেয়ে অধিকতর সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না।'

এই একই প্রশ্ন তুলেছিলেন **বেঙ্গল হেরল্ড** তাঁদের ১৮৪৩ অব্দের ২২ জুলাইয়ের সংখ্যায়। কিন্তু কলকাতার নামকরা পত্রপত্রিকা এভাবে বার বার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যাঁদের অবহিত হবার কথা ছিল তাঁরা যেন কানই দেননি। কলকাতার নামী নাগরিকদের যে নবরত্নের হাতে চাঁদার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের কমিটি স্মৃতিরক্ষাকল্পে কিছু করেছিলেন বলে জানা যায় না। যে-আট হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, খুব সম্ভব তা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক কিংবা কার, ঠাকুর কোম্পানীর হেফাজতে। এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই সঙ্গে দ্বারকানাথ নিকটভাবে যুক্ত ছিলেন। চাঁদা যদি না তোলাও হত এবং কোনো কমিটির হাতে তা যদি গচ্ছিত না-ও থাকত, তাঁর

নিজের বিত্তসম্পদ এমনি প্রচুর ছিল যা থেকে নিজের খরচে তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন। আর রামমোহন কেবল তো তাঁর বন্ধু ছিলেন না—ছিলেন গুরু স্থানীয়। দ্বারকানাথ কেন যে এ-ভাবে হাত গুটিয়ে উদাসীনের মতো বসে রইলেন—তার কারণ ব্যাখ্যা করা শক্ত। ১৮৩৮ অব্দে তাঁর মা অলকাসুন্দরীর মৃত্যুতে তিনি কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটির হাতে লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। সে-যুগে লক্ষ টাকা ছিল প্রচুর টাকা। কেবল তাই নয়, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ব্যয় করেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। পেটে ধরেননি এমন মায়ের স্মৃতিতে তিনি এত যদি করতে পেরে থাকেন, তাহলে ভাবতে বিস্ময় লাগে, বন্ধুর স্মৃতিতে তিনি কিছু করতে পারলেন না কেন! আর রামমোহন তো তাঁর যেমন-তেমন বন্ধু ছিলেন না, জ্ঞান ও নীতির দিক থেকে ছিলেন তাঁর প্রেরণার উৎস, তিনিই ঘটিয়েছিলেন দ্বারকানাথের এক প্রকার জন্মান্তর। অথচ তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁর নিজস্ব স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন ১৮৩৩ অব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিস্টল শহরে রামমোহন দেহত্যাগ করেছেন খবর পেয়ে, 'যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।' মায়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও তিনি এমন করে কাঁদেন নি—শোনা যায়।

দ্বারকানাথের প্রথম জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, ১৮৪৫ অব্দে দ্বারকানাথ যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যান : 'এই সময় দ্বারকানাথ জোসেফ হেয়ার-এর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। এ পত্রালাপের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের দেশীয় লোকদের শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূত ডেভিড হেয়ার-এর একটি জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা। খুবই দুঃখের কথা—এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য দ্বারকানাথ বেঁচে থাকেন নি।'[৫৫] আরও অনেক অধিক দুঃখের কথা যে তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়ের পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনী রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহের কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি, অথচ তাঁর রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল রামমোহনেরই অনুপ্রেরণা ও সযত্ন লালনে। উপরন্তু রামমোহন তাঁর দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যা করে গেছেন তার তুলনা হয়না। দেশে থাকতে বিষয়কর্মের ব্যাপারে তাঁকে নিরন্তর নিমগ্ন থাকতে হত বলে তাঁর অবসর এত কম ছিল যে তিনি স্বয়ং রামমোহনের জীবনী হয়তো লিখে উঠতে পারতেন না। কিন্তু রাজার অনুরাগী কোনো সুদক্ষ লেখককে দিয়ে (এঁদের অনেককেই দ্বারকানাথ চিনতেন) এরকম জীবনী লিখিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু কঠিন হত না। এ কাজে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করা তাঁর পক্ষে কোনো সমস্যাই হত না, কারণ অর্থ সম্পদের অভাব তাঁর কোনো কালেই ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই মহৎ কাজ কোনো প্রকার দক্ষিণার অপেক্ষা না রেখেই একজন শয্যাশায়িনী ইংরেজ মহিলা সুদূর ইংলণ্ডে বসে সম্পন্ন করেছিলেন।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইতিহাসের প্রহসন আজ স্পষ্ট, দেশের লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে আজো রামমোহনের স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরপক্ষে দ্বারকানাথ বিস্মৃতপ্রায়, দেশের লোকের কথা দূরে থাক, তাঁর উত্তর-পুরুষদের মনেও তাঁর স্মৃতি অস্পষ্ট। এমনটা যে ঘটেছে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হবে—কারণ এই দুজন শক্তিশালী পুরুষ এককালে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কেবল বন্ধুরূপে নয় পরন্তু আধুনিক ভারতের আদিতম পথিকৃৎরূপে—রামমোহন যেমন ধর্ম, নীতি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, দ্বারকানাথও তেমনি স্বদেশীয় ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সূচনা করেছিলেন নব যুগের। অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও মনের জড়তা থেকে দেশের লোককে মুক্ত করার জন্য, দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য, কেবল বন্ধুরূপে নয়, বীর সেনানীর মতো পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বহু বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন।

রামমোহনের স্মৃতি জীইয়ে রাখার অন্যতম কারণ হল তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অভেদাত্মা-রূপে কল্পনা করা। এই লোকবিশ্বাস যেমন তাঁর স্মৃতিরক্ষায় সহায়ক হয়েছে তেমনি তাঁর ব্যক্তি-তাৎপর্যকে খর্ব করেছে উত্তর-পুরুষের মানসে। আজ যা আদি, সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ-রূপে পরিচিত তার কোনোটাই তাঁর সৃষ্ট নয়। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন একটি সংস্থা যেখানে সকল ধর্মের মানুষ এসে মিলতে পারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে। একেই বলা চলে সর্বধর্মসমানত্ব অথবা আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় সেক্যুলারিজ্‌ম্ অথবা ধর্মনিরপেক্ষতা। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়ে তাঁদের বাক্যে, কর্মে ও আচরণে আধুনিক কালের এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতীক ছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শে তাঁদের নিষ্ঠা ছিল এবং যা বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন, আজ তা বহুলাংশে স্বীকৃত হলেও, কালের পরিহাসে তার রূপান্তর ঘটেছে। পৃথিবীর সর্বত্র আজ স্বীকার করা হয় যে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা হল সভ্য সমাজের লক্ষণ। কিন্তু সত্যকার ধর্মভাব বা ধর্মনিষ্ঠা, যার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল রামমোহন-চরিত্রে এবং আমাদের কালে গান্ধীজীর চরিত্রে, আজ তার প্রকাশ প্রতিদিন যেন ক্ষীণতর হতে চলেছে। অথচ বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং ক্রমেই এই সব ভড়ং সাংস্কৃতিক তামাশায় পর্যবসিত হচ্ছে। সেদিক থেকে দেখলে সত্যকার রামমোহনকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেমন পাওয়া যাবে না আসল গান্ধীকে, যদিও নানা দলের রাজনীতিকরা এখনো তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছেন। অপরপক্ষে দ্বারকানাথ যে আদর্শ সামনে রেখে যেসব কাজের সূচনা করতে চেয়েছিলেন, তার অনেকটাই এমন বিরাট সাফল্য লাভ করেছে যে তিনি নিজেও নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এতটা সম্ভবপর হতে পারে। দ্বারকানাথ চেয়েছিলেন শিল্প-বাণিজ্যের

ভারতীয়করণ; ভারতীয় মূলধন ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ ও বহুবিস্তৃত বিনিয়োগ; এবং য়ুরোপীয় বা অন্যান্য দেশের বড় বড় শিল্পবিদদের সহযোগে এ-দেশের শিল্পজগতে প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি ও সম্প্রসারণ। আমাদের স্মৃতিপথে না থাকলেও, টাটা, বিড়লা ও তাঁদের সমতুল্য শিল্পপতিদের মধ্যে আজো দ্বারকানাথ জীবিত আছেন। অপরপক্ষে রামমোহন বা গান্ধী বেঁচে আছেন মুষ্টিমেয় কিছু আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে—যাঁরা আধুনিক পরিবেশে খাপ খান না এবং গান্ধী পরিহাস-ছলে যাঁদের নাম দিয়েছিলেন 'খেয়ালী পাগল'। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ আজো সদর্পে বিচরণ করছেন সেইসব ধনকুবেরদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে যাঁদের শক্তি ও ক্ষমতা দোর্দণ্ড।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়ের শেষ জীবনে যবনিকা পড়েছিল দুঃখের গভীর অন্ধকারে। দু'জনেই সে-কালের লণ্ডনের য়ুরোপীয় সমাজ ও মানস জীবনের মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে, তাঁদের প্রবাস-জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও। দেশে তাঁদের জন্য বহু কাজ অপেক্ষা করে ছিল, কিন্তু তাঁদের দীর্ঘসূত্রতা অবসিত হবার পূর্বেই তাঁদের জীবনাবসান ঘটল। আসন্ন নিয়তির একটা ক্ষীণ আঁচ তাঁরা পূর্বাহ্নেই পেয়ে থাকবেন বলে মনে হয়। কিন্তু যে দারুণ ইচ্ছাশক্তির বলে দেশে তাঁরা অসাধ্য সাধন করেছিলেন তা যেন তখন কেমন স্তিমিত। রামমোহনের কথা বলতে গিয়ে হোরেস উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে জানিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে 'তিনি (রামমোহন) বেশ স্থূলকায় হয়েছিলেন, শেষ যেবার তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল তাঁর বদনমণ্ডল যেন স্ফীত ও রক্তাভ।' ইতিপূর্বে লেখা ১৮৩৩ অব্দের ৭ অক্টোবর তারিখে আরেকখানি চিঠিতে উইলসন লিখেছিলেন ঃ 'অবিলম্বে দেশে ফেরার জন্য আদৌ তাঁর ইচ্ছা ছিল না, অদৃষ্টের এমনি বিধান যে দেশে ফেরা তাঁর আর হল না। এমনটা ঘটল বলে আমার ভারি দুঃখ হয়। মনে হয় দেশ ছাড়ার আগে তিনি যেসব ধারণা নিয়ে এসেছিলেন দেশে ফিরতে পারলে সেসব ধারণার কিছু কিছু অদলবদল হতে পারত—তিনি হয়তো মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে আরো একটু যুক্তিবিচার খাটাতে পারতেন, হয়তো আরো একটু নরম হতে পারতেন।'

বর্তমান লেখকের ধারণা, ১৮৩২-এর শেষে তাঁর বিলাতে যাবার উদ্দেশ্য মোটামুটি সাধন ক'রে রামমোহন যদি দেশে ফিরতে পারতেন তবে তিনি নূতন শক্তিতে এবং শান্ত সংযত উৎসাহে, ধর্মীয় বাদানুবাদে ততটা না মন দিয়ে, ভারতীয় নারীর অধিকার বিশেষত তাদের শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ নিয়ে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করতে পারতেন। ইংলণ্ড-এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রামমোহন স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংলণ্ড যাবার পূর্বেও নারীজাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল সহজাত। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'রামমোহন বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর উইল সম্পাদন-কালে তিনি এমন কয়েকটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেন যার ফলে এক স্ত্রী বর্তমান থাকা-কালে তাঁর কোনো পুত্র বা

বংশধর যদি আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন অর্থাৎ ত্যাজ্যপুত্র হবেন—এমন কথা ছিল।' বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ তিনি সমর্থন করতেন। তাঁর জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে রামমোহন বার বার বলতেন বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তন করা উচিত। তাঁর বিলাতে থাকা-কালে সর্বত্র জনশ্রুতি রচিত হয় যে বিলাত থেকে ফিরে এসেই তিনি এ-কাজ হাতে নেবেন। অপরপক্ষে, বাংলায় লেখা তাঁর বিতর্কমূলক একটি পুস্তিকা **পথ্যপ্রদান**-এ রামমোহন লিখেছিলেন, হিন্দু ধর্মের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে থাকায় এর প্রচলন সমীচীন হবে না। শৈব-বিবাহের স্বপক্ষে তিনি যেসব বলিষ্ঠ বিচার উপস্থাপিত করেছিলেন তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মনে প্রাণে তিনি নিশ্চয় অসবর্ণ বিবাহ এমনকি আন্তর্ধর্মীয় বিবাহের সমর্থক ছিলেন।[৮০] সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে তিনি যদি দেশে ফেরার জন্য বেঁচে থাকতেন, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহু বছর আগে বিধবা-বিবাহের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতেন। যা হবার নয় তা হল না।

ও-দেশের প্রখর শীতের মরসুমে শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা না ভেবে, লোক-দেখানো আড়ম্বরের জন্য পারী ও লণ্ডনে লক্ষ লক্ষ টাকা না উড়িয়ে, দ্বারকানাথ যদি ১৮৪৫-এর ঠিক পরেই দেশে ফিরতেন, বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতেন। যথাসময়ে ফিরলে তাঁর কাজ-কারবারের পতন হয়তো ঘটত না, যে-বিরাট বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তা হয়তো টিঁকে থাকত এবং তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হত। কিন্তু যা হবার নয় তা হল না।

দুজনেরই মৃত্যু হল যেন নির্বাসনে। দুজনেই সমাধিস্থ হলেন বিদেশের মাটিতে—ব্রিস্টলে রামমোহন, দ্বারকানাথ লণ্ডনে। সেকালে বিলাতে অগ্নি-সৎকার হত না, খৃস্টীয় চার্চ মৃতের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী বলে সরকার মৃতদেহ দাহ করতে দিতেন না। (মাত্র সেদিন ১৯০২ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সর্বপ্রথম 'ক্রিমেশন্ এ্যাক্ট' জারি করে অগ্নিসৎকার বিধিবদ্ধ করেন।) উপরন্তু মৃত্যুকালে উভয়েই ছিলেন হিন্দু, নিয়মিত ওঁ-নাম জপ করতেন, সুতরাং চার্চ-নির্দিষ্ট পবিত্র জমিতে তাঁদের সমাধিস্থ করা যায়নি। আর্নোজ ভেল্ সমাধিস্থানে রামমোহনের দেহাবশেষ স্থানান্তর করে, তার উপর দ্বারকানাথ একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন বলে, রামমোহনের সমাধির তবু ভাল করে তত্ত্বতদারকি হয়। দর্শন করতে যাঁরা ব্রিস্টল যান, তাঁদের জন্য একটি ভিজিটর্স্ বুক রাখা আছে সমাধিস্থানে প্রবেশের মুখে, তত্ত্বাবধায়কের দপ্তরে। তীর্থযাত্রীর মতো এ পর্যন্ত যাঁরা গেছেন, তাঁরা সকলেই রামমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বইয়ে স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। কিন্তু ১৯৭৬ অব্দের মে মাসে বর্তমান লেখক যেবার লণ্ডনের কেন্সল্ গ্রীণ্ কবরখানায় প্রথম গিয়েছিলেন, দ্বারকানাথের জীর্ণপ্রায় সমাধির দুর্দশা দেখে তাঁর মনে খুব দুঃখ হয়েছিল।[৮১]

হয়তো এরকমটাই ভালো হয়েছে ঃ ইঙ্গভারত মৈত্রীর এই প্রথম উদ্গাতা দু-জন

ইংলণ্ডের মাটিতে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন—এটাই হয়তো ছিল ইতিহাসের বিধান। ছাত্রবন্ধু হেয়ার ও ভারতের দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তো ভারতের মাটিতেই চিরনিদ্রিত। এই সব সমাধি যেন এক-একটা প্রাণপূর্ণ আস্থার স্বাক্ষর।

এই দুই বন্ধুর কথা স্মরণ করে প্রফেসর ম্যাক্সমূলর বলেছিলেন ঃ '...এই রকম মানুষ ছিলেন রামমোহন রায়, আমার মতে তিনি ছিলেন মানুষের মতো মানুষ, মহৎ কাজের মানুষ। যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা অন্যায় না হয়, তাহলে আমি বলব তিনি যে-সব ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন, সেইসব কাজের সহকর্মী বা সহচর-স্থানীয় ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে তাঁর নামও লোকে স্মরণে রাখবে একজন মহা মানব-হিতৈষী রূপে।' দ্বারকানাথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'তিনি যখন পারী শহরে রাজকীয় চালে থাকতেন, তাঁকে আমি ভালো করেই চিনতাম। তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত—কিন্তু তিনি ছিলেন নিতান্তই এ-জগতের মানুষ—অন্য জগতের নয়।

## টীকা

১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী'-গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'আমি সেকালের কোনো তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে শুনিয়াছি যে দ্বারকানাথ অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি দুইটি ঘণ্টা ধরিয়া জপ করিতেন. । এমনকি প্রথম বার বিলাত যাইয়া যে-বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর একটি ঘরে গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপ করিতেন।' 'জীবনী', পৃ ৬৭।
[এই শেষোক্ত উক্তিটি প্রামাণিক বলে বিশ্বাস করা শক্ত।]
দ্বারকানাথের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় (দ্বারকানাথ) স্বহস্তে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নিত্যপূজা করিতেন।...তাহারপর যখন সাহেব মেমদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানে খানা চলিতে লাগিল নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্যের জন্য...বেতনভুক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল।' এই একই বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনী-গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন.. 'তখনও সন্ধ্যাকালে আরতির সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর নিয়মিত দালানে যাইতেন। তখন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।..অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন..প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন।.'

২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৪১।

৩. Fisher's Colonial Magazine, Vol I, 1842 pp. 393-399.

৪. *The Scotsman*, Oct 26, 1842.

৫. *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, by Sophia Dobson Collet Ed. by D K. Biswas and P C. Ganguli Sadharan Brahmo Samaj Calcutta, 1962 p. 62.

৬. দ্রঃ ১৬ নং টীকা—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৭ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে রামমোহন কোকয়েক বছর রংপুরে চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় তান্ত্রিক সাধুদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে খ্যাতনামা পণ্ডিত হরিহরানন্দ

তীর্থস্বামীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। পরে তীর্থস্বামী কলকাতা গিয়েছিলেন রামমোহনের অতিথিরূপে। দ্বারকানাথ যে তান্ত্রিক সাধুর শরণ নিয়েছিলেন হতে পারে তীর্থস্বামীই তাঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন।

দ্রঃ *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, by Collet. p 101.

৮. দ্রঃ 'জীবনী', পৃ ৬৪-৬৫ : 'আমি পিতামহদেবের (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিকট শুনিয়াছি যে তিনি একবার রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার আহার স্থলে একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তৎপুত্রদিগের প্রবেশের অধিকার ছিল। তিনি পিতামহদেবকে বলিলেন—'ব্রাদার, এই দেখিতেছ আমি খাইতেছি রুটি ও মধু; কিন্তু এতক্ষণে হয়তো হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে যে আমি গোমাংস খাইতেছি।'

৯. একশো বছর বাদে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ বছর পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী অনুরূপ বিশ্বাসে মনে করতেন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ।

১০ দ্রঃ *Partner in Empire*, by Blair B Kling, University of California Press, 1976 দ্বারকানাথের বাণিজ্যিক উদ্যোগের এই দিক নিয়ে লেখক সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

১১ দ্রঃ *Studies in Bengal Renaissance*, Ed by Atul Chandra Gupta The National Council of Education Bengal, 1958, p 306

১২ ডেভিড হেয়ার ছিলেন একজন অদ্ভুতকর্মা ইংরেজ। তিনি ঘড়ি তৈরির ব্যবসা করতে কলকাতা এসে এ-দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ও তাঁর সঞ্চিত অর্থবিত্ত এ-দেশের শিক্ষার উন্নতি বিধানে উৎসর্গ করেছিলেন। হেয়ার ছিলেন রামমোহন ও দ্বারকানাথের বন্ধুস্থানীয়। বলা হয়, কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৩ গোপীমোহন ও হরিমোহন ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র। যদিচ তাঁরা ছিলেন গোঁড়া শৈবপন্থী হিন্দু, তাঁরাও উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিবাদী ছিলেন। হরিমোহনের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বিশপ হেবর লিখেছেন, 'এতদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা এখন তাঁদের অট্টালিকার স্থাপত্য শোভা বর্ধন করেন কোরিন্থিয় স্তম্ভ নির্মাণ ক'রে এবং ভিতর-বাড়ি বিলাতী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ক'রে। কলকাতায় সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়ি-ঘোড়া তাঁদেরই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজীতে অনর্গল কথাবার্তা চালাতে পারেন, ইংরেজী সাহিত্যও মোটামুটি তাঁদের পড়া। আমাদের এক দেশীয় বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একদিন দেখলাম তাঁর ছেলেরা ইংরেজী পোশাকে সুসজ্জিত, পরণে কোট-পাৎলুন, মাথায় গোল টুপি, পায়ে মোজা-জুতো।'

হরিমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবারের পীরালি কলঙ্ক বিষয়ে হেবর একটি নূতন আখ্যানের অবতারণা করেছেন। এ-কাহিনী তিনি নিশ্চয় পরিবারের কারো মুখে শুনে থাকবেন। হেবর লিখেছেন : 'এঁরা ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ, এঁদের বংশে কোনো খুঁত ছিল না। কিন্তু চারশো বছর আগে, মুসলমান আক্রমণের সময় বিজয়ী মুসলমানেরা ঠাকুর বংশের কোনো পূর্বপুরুষের অন্তঃপুরে জবরদস্তি প্রবেশ করে পুরস্ত্রীদের শ্লীলতা হানি করে। ফলে তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত হয়। অন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিষিদ্ধ করে দেন এবং তাঁর সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে বসা বন্ধ করে দেন।'

দ্রঃ Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay, 1824-1825 Vol II John Murray, London

১৪. *Reform and Regeneration in Bengal*, 1774-1823, by Amitabha Mukherjee, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968 p 152.

১৫ তদেব। পৃ ১৫৪।

১৬. তদেব।

১৭ *Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* by Collet, p. 131.

১৮. তদেব। পৃ. ১৫৪।

১৯. তদেব। Appendix IV-এ সম্পূর্ণ ট্রাস্ট্ ডীড্ উদ্ধৃত।

২০ 'জীবনী', পৃ. ৬৬।

২১. তদেব। পৃ. ৬৯।

২২. *Reform and Regeneration in Bengal,* 1774-1823. by Amitabha Mukherjee, pp. 139-140.

২৩. 'জীবনী', পৃ. ৭০।

২৪. ১৮৩০ অব্দের ১৮ জানুয়ারী তারিখে Government Gazette-এ এই অভিনন্দন পত্র ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়।

২৫. প্রসন্নকুমার ঠাকুর *Reformer* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন।

২৬. 'জীবনী', পৃ. ৯১।

২৭. পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজ থেকেই উদ্ভব হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

২৮. 'জীবনী', পৃ. ৯৭।

২৯. যেমন মাতৃভাষা চর্চার ব্যাপারে তেমনি সঙ্গীত, নাটক ও কারুকলার অনুরাগে, দ্বারকানাথ তাঁর প্রখ্যাত পৌত্র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পূর্বপুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রানুরাগী ভক্তেরা অনেক সময় একথা ভুলে যেতে চান।

৩০. দ্রঃ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।
অপিচ, *Freedom Movement in Bengal,* 1818-1904, Compiler-Editor, Nirmal Sinha. Government of West Bengal.

৩১. 'জীবনী', পৃ. ২০০।

৩২. *History of the Press in India,* by S Natarajan, Asia Publishing House, Bombay, 1962. p. 47.

৩৩. *History of the British Colonies,* Vol. 1, by Montgomery Martin. p 254
অপিচ : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* by Collet, p. 415.

৩৪ 'সমাচার দর্পণ'। ২৩ মে ১৮২৯ এবং ৮ আগস্ট ১৮২৯।

৩৫ *The Handbook of India,* by J H Stocqueler, W. H Allen & Co , London, 1844 এ-বইয়ে লেখক সেকালের কলকাতার জনসংখ্যা-বিষয়ে একটি শ্রেণীগত বিশ্লেষণ দিয়েছেন : ইংরেজ—৩,১৩৪; য়ুরোপীয়ান—৪,৭৪৬; পোর্তুগীজ—৩,১৮১, ফ্রেঞ্চ—১৬০; চৈনিক—৩৬২, আর্মেনিয়ান—৬৩৬; য়িহুদি—৩০৭, পশ্চিমা মুসলমান—১৩,৬৭৭, বাঙালী মুসলমান—৪৫,০৬৭; পশ্চিমা হিন্দু—১৭,৩৩৩, বাঙালী হিন্দু—১,২০,৩১৮; মোগল—৫২৭, পার্সি—৪০, আরবী—৩৫১, মগ—৬৮৩, মাদ্রাজী—৫৫, নেটিভ খ্রীস্টান—৪৯; নিম্ন জাতি—১৯,০৮৪, সর্বসাকুল্যে—২,২৯,৭১৪।
পরে ১৮৭৩ অব্দে Stocqueler তাঁর অপর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, *Memoirs of a Journalist,* Times of India, Bombay এবং Fleet Street, London। এ-বইয়ে দ্বারকানাথ বিষয়ে একাধিক উল্লেখ দেখা যায়। ১৮২২ অব্দের বোম্বাই শহরের তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন আজকের দিনে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। তিনি লিখেছেন : '১৮২২ অব্দে বোম্বাইয়ের চেহারা যে কেমন ছিল আজকের লোকের পক্ষে তার ধারণা করা শক্ত। তখনকার দিনে কী কী ছিল না তার একটা হদিশ দিলে হয়তো ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝতে পারা যাবে। সেকালে বোম্বাইয়ে

কোনো টাউন হল ছিল না, দেশীয়দের জন্য কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না, বোর্ডিং-জাতীয় কিছু ছিল না, একটি প্রাচীন হোটেল ছিল, কিন্তু সেখানে বড়-একটা কেউ যেতেন না, ব্যাঙ্ক ছিল না একটিও, মেরামতী কারখানা ছিল না, টাঁকশাল ছিল না, দৈনিক কাগজ ছিল না; ভাঁটা না পড়া পর্যন্ত কোলাবার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল না; বাষ্পীয় ইঞ্জিন একটাও ছিল না সুতরাং রেলরাস্তাও ছিল না। তখনো পর্যন্ত এসব ছিল জর্জ স্টিফেনসন-এর মাথায়, বিলাতেও তখন রেল রাস্তা পাতা হয়নি। আমরা যে-অর্থে সভ্যতা কথাটা বর্তমানে প্রয়োগ করে থাকি, বোম্বাইয়ে তার বিশেষ কোনো চিহ্ন ছিল না, সবই যেন ছিল নিশ্চল নিশ্চেষ্ট; বোম্বাইয়ে তখন সুপ্রীম কোর্ট বলতে কিছু ছিল না, আর চার্চ বলতে ছিল একটি ইংরেজদের জন্য এবং একটি স্কচদের।'

৩৬. *History of the Press in India*, by S. Natarajan, p. 13.

৩৭. তদেব। পৃ. ২২।

৩৮ ইতিপূর্বে বাকিংহাম ছিলেন মস্কট-এর ইমামের একজন কর্মচারী। মস্কট্ দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল বলে তিনি সে-কাজে ইস্তফা দেন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে তিনি প্রচুর ঘুরেছিলেন। ইজিপ্ট্-এর মহম্মদ আলি পাশাকে তিনি বলেছিলেন কী ভাবে পশ্চিমের প্রযুক্তি বিদ্যার সুযোগ-সুবিধা তিনি নিজের দেশে আমদানী করতে পারেন। তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে একটি খাল কেটে উভয় সাগরকে যুক্ত করার কথা। আমেরিকা থেকে লম্বা আঁশের তুলোর বীজ আনিয়ে ইজিপ্ট্-এ তার ব্যাপক চাষ প্রবর্তন করার কথাও তিনি বলেছিলেন।

৩৯ *Life and Letters of Rammohun Roy*, by Collet. p. 131

৪০ তদেব। পৃ. ৪৪৩।

৪১. তদেব। আপীলের পুরো পাঠ দেখা যাবে বইটির Appendix 1B-এ (পৃ ৪৩০-৪৫৪)।

৪২ *Bengal Hurkaru* 17 December 1829.

৪৩ *Social Ideas and Social Change in Bengal*, 1818-1835, by A. F. Salahuddin Ahmed.

৪৪ 'সমাচার দর্পণ'। ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯।

৪৫ *Freedom Movement in Bengal 1818-1904* by Nirmal Sinha. Government of West Bengal.

৪৬ *Impact of Sankaracharya on Indian Thought* by A. K. Majumder. Visva-Bharati Quarterly Vol 37.

৪৭ তদেব।

৪৮. তদেব।

৪৯ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় : 'সমকালীন', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ। মূল প্রবন্ধ বাংলায় লেখা।

৫০ *Travels in India* (Tr. from German). 2 Vols., by Captain Leopold von Orlich. Longman, Brown, Green & Longman. 1845, Vol. II. pp. 181 ff.

৫১ দ্বারকানাথ বিলাতে দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় তাঁর তৃতীয় ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে যান—দ্বিতীয় পুত্রকে নয়।

৫২. ঘটনার চার বছর আগেই দ্বারকানাথের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল।

৫৩ *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, by Collet, p. 328

৫৪ *Trade and Finance in the Bengal Presidency*, 1793-1833, by Amalesh Tripathi, Bombay 1956.

৫৫. *Life and Letters of Raja Rammohun Roy* by Collet, p. 356

৫৬. *Auld Lang Syne*, by Fredrick Max Muller. Longman, Green & Co., 1899. Second

Series. Chapter on 'My Indian Freinds'. দ্বারকানাথ-ম্যাক্সমুলর সাক্ষাৎকারের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বিলেত-ফেরৎ তরুণ গান্ধীকে, তাঁর ঘোরতর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোদাবরী নদীর তীরে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল। তাঁকে এটা করতে হয় মায়ের শেষ ইচ্ছার সম্মানে এবং বড় দাদার নির্বন্ধাতিশয়ে।

৫৭. শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহশালায় দর্শকদের সইকরা Visitors' Book-এর ফোটোকপি রক্ষিত আছে।

৫৮. *Partners in Empire*, by Blair B. Kling, p. 42.

৫৯. *Memoir*, p. 114.

৬০. *Reform and Regeneration in Bengal*, 1774-1823, by Amitabha Mukherjee, Rabindra Bharati University, 1968, pp. 287-288.

৬১. দ্রঃ এই পুস্তকের উপসংহারে দ্বারকানাথের সমাধি বিষয়ক টীকা।

৬২. Max Müller : *Biographical Essays*, Longman, Green & Co. London, 1884. রামমোহনের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে ১৮৮৩ অব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ম্যাক্সমূলর ব্রিটিশ মুজিয়ম-এ এই বক্তৃতা দেন।

□

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# জমিদার ও কোম্পানী-কর্মচারী

কেমন জমিদার ছিলেন দ্বারকানাথ? সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া যায় তা-থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন সেকালের অধিকাংশ জমিদারের মতো—তাঁদের চেয়ে বেশি ভালোও না খারাপও নয়। কিন্তু অন্য অনেকের তুলনায় জমিদারি পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অনেক বেশি। মনে হয় জমিদারি-সংক্রান্ত নথিপত্র ব্লেয়ব ক্লিং ভালো করে ঘেঁটে দেখেছেন এবং তার ভিত্তিতে বলেছেন, 'জমিদারি তাঁর কাছে ছিল ব্যবসা—, ব্যবসাদারসুলভ শৃঙ্খলায় তিনি জমিদারি পরিচালনা করতেন। তাঁর সেই পটুতার মধ্যে দয়ামায়া বদান্যতার কোনো স্থান ছিল না।' যে নৈতিক আদর্শে প্রণোদিত হয়ে বিলেতে থাকতে রামমোহন রায় 'রায়তদের উপর খাজনার ভার চাপিয়ে তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবার' জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিলেন, সে নালিশ জমিদার দ্বারকানাথের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল কি না সন্দেহ। যে আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে, দ্বারকানাথের বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন লিও তলস্তয় কিংবা তাঁর বহু পরবর্তী ও তাঁরই পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (একটা সময়ে যাঁকে পিতামহের জমিদারিই সামলাতে হয়েছিল) গরিব প্রজাদের মা-বাপ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, সে আদর্শ দ্বারকানাথকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। তিনি মনে করতেন জমি-জমায় অর্থ বিনিয়োগ অন্যান্য ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের তুল্য। তেজারতি কারবারে যেমন টাকা খাটালে টাকা আসে, তেমনি জমিজমা থেকেও যথোচিত আদায় আসবে বলে তিনি মনে করতেন। দায়ে পড়ে কেউ যদি তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসত, মুক্তহস্তে তিনি তাদের সাহায্য করতেন—সমাজে তাদের স্থান নিয়ে কোন বাছবিচার না করেই। অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাঁর অর্থসাহায্যে চলত। কিন্তু জমিদারিকে তিনি পরহিতব্রতী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন না।

এ বিষয়ে দ্বারকানাথের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল কলকাতার একটি প্রথম সারির সংবাদপত্র, তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে যেসব প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করেছিলেন তা খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক। প্রথম বার বিদেশ-যাত্রা সমাপন করে স্বদেশে প্রত্যাগত দ্বারকানাথকে স্বাগত জানিয়ে তাঁরা নানা কাজে তাঁর উদ্যোগ, তাঁর সংস্কারমুক্ত মন, পরমতসহিষ্ণুতা ও জনহিত-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন

যে, দেশ তাঁর কাছে আরো অনেক কিছু প্রত্যাশা করে ঃ

'এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য দ্বারকানাথ তাঁর দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু আরো অনেক কিছু করা তাঁর বাকি আছে। সকলের সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে চলতে পারেন, তাঁর মতামত উদার, তিনি পরহিতপরায়ণ, গরিব দুঃখীদের জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর দাক্ষিণ্যে পুষ্ট, অনেক প্রতিষ্ঠান তিনি নিজেই গড়ে তুলেছেন। গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার বহুলাংশে পরিহার করে তিনি দেশবাসীর সামনে একটি সু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নানা কাজে এগিয়ে এসেছেন সাহস করে, নানা কাজ করতেও পেরেছেন। ইংলণ্ডের জান-বুঝওয়ালা লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, জমিদার। তিনি রাজকীয় ব্যক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু জমিদার রূপে তিনি এ দেশের অন্য জমিদারদের তুলনায় স্বতন্ত্র বলে আমরা জানি না। জমিদার শ্রেণীর অন্য জমিদার এবং জমিদার দ্বারকানাথের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাত আছে বলে শুনিনি আমরা। তাঁর জমিদারির রায়তেরা কি পাশের জমিদারির রায়তদের চেয়ে সুখী? খেটে-খাওয়া মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি অনেক কিছু কি করেছেন? অন্যায় অত্যাচার, বেগার ও জবরদস্তি আদায়ের হাত থেকে (অধিকাংশ দেশীয় জমিদারিতে যা ক্রমাগত ঘটে থাকে) এদের রক্ষা করার জন্য খুব কিছু কি করেছেন তিনি? সর্বোপরি, রচনা কি করেছেন এমন একটা মধুর পরিবেশ যেখানে সকল প্রজা সুখে ও আনন্দে বসবাস করতে পারে? মনের ক্ষুদ্রতা বশত আমরা এসব প্রশ্ন তুলছি না। আমরা সকল মানুষের বিচার করি তাঁদের সহজাত গুণ দিয়ে। নানা গুণের অধিকারী বলেই দ্বারকানাথ নানা কাজ করতে পেরেছেন। প্রজা-সাধারণের হিতার্থে এই নূতন ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ তাঁর গুণের পরিচয় দেন—এটাই তাঁর কাছে আমাদের প্রস্তাব। জানি এ ক্ষেত্রে বহু বাধা বিঘ্ন আছে, কিন্তু শহরে দশ বারোটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়ে পল্লী-অঞ্চলে বৃহত্তর জনসমাজের উপকারার্থ কিছু করতে পারা বহুগুণে শ্রেয়।'[1]

**বেঙ্গল হরকরা** দ্বারকানাথ নিয়মিত পড়তেন, সূত্রপাত থেকে এই কাগজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়ে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? দুর্ভাগ্যের বিষয় বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যায় তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়, জমিজমার ব্যাপারে মন দেবার মতো অবসর তিনি পাননি। তাছাড়া হরকরার প্রস্তাব মতো 'পল্লী-অঞ্চলে বৃহত্তর জনসমাজের উপকারার্থ' কিছু করবার ইচ্ছা থাকলেও, অতর্কিত মৃত্যু এসে তাতে বাদ সাধল।

সে যাই হোক, জমিদারিকে তিনি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য না করলেও, তিনি তাঁর এস্টেট্-এর ম্যানেজারদের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখতেন, তার সামান্য যে-কয়টি পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, প্রজারা যাতে ন্যায়বিচার পায় তাতে তাঁর কোনো অনাগ্রহ ছিল না। ১৮৩৬ অব্দের ১৪ জানুয়ারি তারিখে সাহাজাদপুর পরগণার

সদ্যনিযুক্ত সায়েব ম্যানেজার জে. সি. মিলারকে তিনি যে-চিঠি লেখেন তা থেকে জানা যায় সাহাজাদপুরে একটি নীলকুঠি পত্তন করতে তাঁর ইচ্ছা ছিল।[৫] সেই প্রসঙ্গে তিনি ম্যানেজারের কর্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট কথায় বিশদভাবে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, মিলার যেন পরগণাভুক্ত তাবৎ জমি জরিপ করে ইতিপূর্বে কি-প্রকার বিলি বন্দোবস্ত ও খাজনা ধার্য হয়েছিল সে-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন। অতঃপর নীলকুঠি ও নীলের চাষের জন্য প্রজাস্বত্বের কিছু কিছু জমি যদি জমিদারের খাস-ভুক্ত করার প্রয়োজন হয় 'তাহলে ইতিপূর্বে যেমনই হয়ে থাকনা কেন, যেন সুবিচারের সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সবকিছু করা হয়—যাতে জমিদারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় অথচ প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার না হয়.. ।' উপরন্তু আছে পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত করে সেখানে প্রজা বসাবার কথা, প্রতিবেশী জমিদারদের জবরদখল থেকে দখলীভুক্ত জমি উদ্ধার করার কথা ইত্যাদি। কিন্তু প্রজারা ও তাদের পরিবারাদি কীভাবে গতর খাটায়, কেমন করে দিন গুজরান করে, কোন্ উপায়ে তাদের অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে—এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে দ্বারকানাথ যে বিশেষ মাথা ঘামিয়েছেন এ-চিঠিতে তার কোনো প্রমাণ নেই। অপর পক্ষে রামমোহন রায় চার বছর আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর সিলেক্ট্ কমিটির কাছে যে-স্মারকলিপি পেশ করেন, অথবা দ্বারকানাথের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর পরে **ছিন্নপত্রাবলী**-র অন্তর্গত যে-সব চিঠি লেখেন—সে-সব লেখায় প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে আকুতি দেখা যায় তা গভীরভাবে আন্তরিক। তুলনায়, জমিদার দ্বারকানাথের উদাসীনতা খুবই বিসদৃশ মনে হয়।

সাহাজাদপুর দ্বারকানাথের স্বোপার্জিত বিষয়। বিরাহিমপুর পরগণা তিনি পেয়েছিলেন পৈতৃক বিষয় রূপে। এই দুটি বিষয়ই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি য়ুরোপীয় ম্যানেজার নিয়োগ করেছিলেন। নিশ্চয় এমন করার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল। সাধারণভাবে বলা যায়, ইংরেজদের দক্ষতা ও সততা বিষয়ে তাঁর যে-আস্থা ছিল দেশীয় কর্মচারী সম্বন্ধে ততটা ছিল না। একথাও তিনি অবশ্য জানতেন যে ব্রিটিশ ম্যানেজারদের কড়া শাসনে প্রজারা যেমন শায়েস্তা থাকে, দেশী নায়েব-গোমস্তাদের অধীনে তেমনটা সম্ভবপর হয় না। কেবল প্রজাদের দমনের জন্য নয়, নীলকর সায়েবদের খামখেয়ালী ও গোঁয়ার্তুমি, অবিচার ও অত্যাচারের কবল থেকে জমিদারি ও নিজের প্রজাদের রক্ষা করার জন্যও সায়েব কর্মচারী রাখার দরকার হয়েছিল। তাঁর এস্টেট্ভুক্ত জমিদারিতে দ্বারকানাথ ক্রমে ক্রমে নীলের সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষ শুরু করলেন, একটি-দুটি করে রেশমের কুঠিও পত্তন করলেন। কেবল খাদ্য শস্য চাষ আবাদ না করে তিনি তাঁর জমিদারিগুলিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন শিল্প-বাণিজ্যের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্ররূপে। এটা করতে হলে সুষ্ঠু সংগঠন ও সুদক্ষ পরিচালনা অত্যাবশ্যক—খানিকটা সেই কারণেও তিনি বেশি বেশি মাইনে দিয়েও য়ুরোপীয় ম্যানেজার বহাল রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকবেন।

দ্বারকানাথ ছিলেন প্রজাদের কাছে জবরদস্ত জমিদার ও কর্মচারীদের কাছে কড়া মনিব। অন্যান্য প্রতিবেশী জমিদার ও নীলকর সায়েবদের সঙ্গেও কাজে কারবারে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পেত। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ যদি তাঁর সাক্ষাতে আসত কিংবা সাহায্য চাইতে আসত, তাঁর ভদ্রতার কোনো ত্রুটি হত না কারণ তিনি উদার স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিন্তু বিষয়কর্মের ব্যাপারে কেউ তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করবে—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কোনো ব্যাপার নিয়ে বিবাদ কিংবা বিরোধ বাধলে, তিনি পূর্ব থেকে সেই ব্যাপারের খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিতেন এবং বর্মে-চর্মে সুসজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেন। হার স্বীকার করা তাঁর ধাতে ছিল না। জমিদারি-চালনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন ও দেওয়ানী আদালতের আইনকানুন বিধিবিধান সম্যক্ অবগত ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠাও শক্ত ছিল। পূর্ববর্তী দু'জন জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১] উভয়েই ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট-বনাম-দ্বারকানাথ বিষয়ে একটি কৌতুককর কাহিনীর অবতারণা করেছেন। পৈতৃক জমিদারি বিরাহিমপুরের প্রজারা একটু দুঁদে-গোছের ছিল, কথায় কথায় নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারের অজুহাত তুলে খাজনা আদায় দিতে চাইত না। একবার আদায় না দেওয়ায় জমিদারি থেকে নালিশ রুজু হল প্রজাদের বিরুদ্ধে। প্রজারা একজোট হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে দরখাস্ত পাঠাল সরেজমিনে তদন্ত করতে। সায়েব এসে গ্রামের মাঝখানে তাঁবু ফেললেন, প্রজাদের মুখে নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারের কাহিনী শুনে একতরফা রায় দিলেন যে প্রজারা নির্যাতিত এবং জমিদার দোষী! প্রজাদের তো পোয়া বারো, পারলে তারা নায়েব-গোমস্তার নাকের সামনে তুড়ি দিতে চায়। খবরটা গেল কলকাতায়, বাবুমশায়ের কাছে। দ্বারকানাথ বেশি কিছু না বলে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোপনে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। কোম্পানী আমলে বেশির ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট-এর কর্মজীবনে নানান খুঁত থাকত। এই ম্যাজিস্ট্রেটও ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। সব তথ্য সংগ্রহ করে দ্বারকানাথ বিরাহিমপুর গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-এর তাঁবুতে গেলেন—সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। অনুরোধ করলেন—রায়তদের বে-আইনী একজোট ভেঙে দিতে, তা না হলে কেবল জমিদারের ক্ষতি হবে না, উপরন্তু ওই অঞ্চলের শান্তিভঙ্গ হতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট মফঃস্বলে আমলাদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। দ্বারকানাথ বোঝালেন, প্রজাদের নালিশ ভিত্তিহীন এবং জমিদারকে খাজনা আদায়ের অধিকার ফিরিয়ে দিলে ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষিত হবে। ম্যাজিস্ট্রেট তখনো ইতস্তত করছেন দেখে দ্বারকানাথ সায়েবকে তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শাসালেন যে বিরাহিমপুরে তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও একতরফা বিচারের জন্য তিনি তাঁকে জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর হাতে তুলে দেবেন। এই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন সে-কালে ম্যাজিস্ট্রেটদের ভীতির পাত্র। সায়েব এবারে একেবারে

নরম হয়ে দ্বারকানাথের কাছে মার্জনা চাইলেন। যদি বলা হয় এটা অন্যায়ভাবে ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি, তা হলে মানতেই হবে দ্বারকানাথ এ-সবের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। যেমন রাজনীতি অথবা যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও, ছলবলকৌশলের সুযোগ নিতে কোনো প্রতিপক্ষ ছাড়ে না।

১৮২২ অব্দে চব্বিশ পরগণার জেলা-কলেক্টর ও নিমকি-এজেণ্ট ট্রেভর প্লাউডেন-এর অধীনে সেরেস্তাদার-রূপে দ্বারকানাথ কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন।[৮] চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার পূর্বে রামমোহন রায়ও ছিলেন রংপুরের কলেক্টর জন ডিগ্‌বি সায়েবের সেরেস্তাদার। সম্ভবত রামমোহনের দৃষ্টান্ত এবং কোম্পানীর চাকুরীর সুখ-সুবিধা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তাঁকে এই চাকুরী সন্ধান করতে অথবা গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত করে থাকবে। ইতিপূর্বে চব্বিশ পরগণা জেলার সেরেস্তাদার-পদে নিযুক্ত ছিলেন রামমোহনের জনৈক আত্মীয় ও বন্ধু, রামতনু রায়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে রামমোহনের পরামর্শে ও তাঁরই তদ্‌বিরে, ওই পদের জন্য কর্তৃপক্ষ দ্বারকানাথকে নির্বাচন করেন এবং দ্বারকানাথও ওই পদ গ্রহণ করেন। মাহিনা ছিল অকিঞ্চিৎকর—মাসান্তে শ-দেড়েক টাকা এবং বৎসরান্তে কমিশন বাবদ গড়পড়তা কিঞ্চিদধিক তিন-শো টাকা।[৮] বিষয়সম্পত্তি ও অন্যান্য কাজ-কারবার থেকে দ্বারকানাথের যা আয় হত তার তুলনায় এ-মাইনে ছিল যৎসামান্য। মাইনে যাই হোক না কেন, পদাধিকার-বলে অন্য অনেক সুযোগসুবিধা থাকায় এই চাকুরী সে-কালে বেশ লোভনীয় ছিল। একালে যেমন সেকালেও তেমনি, সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকলে পাঁচজন প্রার্থী উমেদারকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাহায্য করা যেত, হাতে রাখাও যেত। উপরন্তু জনসংযোগের সুবিধা থাকায় দ্বারকানাথ এমন সব লোকের সংস্পর্শে আসতে পারতেন যাঁরা একদিন কাজে-কারবারে তাঁর সহায়তা করতে পারেন। তাছাড়া সরকারের শাসনযন্ত্রটা ঠিক কী-ভাবে চলে তার অন্ধিসন্ধি জানতে পারাটাও তো কম কথা নয়। উপরন্তু সবচেয়ে বড়ো সুবিধা এই ছিল যে, তখনকার কোম্পানী শাসনের প্রথা-অনুসারে চাকুরী করতে করতে আরো পাঁচটা অর্থকরী কাজে জড়িত থাকলে, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করতেন না। সুতরাং সেরেস্তাদার দ্বারকানাথ অনায়াসে চাকুরী করতে করতে জমিদারি বিষয়-আশয় দেখতে পারতেন, বড় বড় রাজা-জমিদারদের আইন-উপদেষ্টার কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার—কোনো কিছু তাঁর বাদ দেবার দরকার ছিল না। দেখা যায়, চাকুরী করার সময়েই তাঁর বিষয়-আশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৮]

সেরেস্তাদার পদে তাঁর প্রায় ছ-বছরের কার্যকালে লবণ বিভাগের উৎপাদন শতকরা ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পায় এবং বকেয়া পাওনা যা-কিছু ছিল সব আদায় করা সম্ভব হয়। দ্বারকানাথের কর্ম-নৈপুণ্যে ট্রেভর প্লাউডেন খুব খুশি হন এবং এই সূত্রে উভয়ে আজীবন বন্ধু হন। দ্বারকানাথ যখন প্লাউডেন-এর কাছে কাজ করছিলেন, সে-সময়

নিমকি বোর্ড-এর খুবই দুরবস্থা। বোর্ড-এর দেওয়ান অন্যান্য কর্মচারীদের যোগসাজসে একটা মোটা টাকার তহবিল তছরূপ করে; ঘুষ, চুরি তখন অবাধে চলত। এ সব দেখে শুনে শুল্ক, লবণ ও আফিম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেম্বর হেনরি মেরিডিথ পার্কার দ্বারকানাথকে বোর্ড-এর দেওয়ান-রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। পার্কার বুঝেছিলেন, সংগঠন-ক্ষমতার সঙ্গে সততার এমন সংমিশ্রণ আর কারো মধ্যে পাওয়া শক্ত; উপরন্তু বাঙালীদের হাবভাব চালচলন স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে দ্বারকানাথের মতো প্রখর জ্ঞান আর কার থাকবে। পার্কার-এর অনুরোধে দ্বারকানাথ বোর্ড-এর দেওয়ান হন ১৮২৮ অব্দে।

১৮৩৪ অব্দের ১ মার্চ তারিখে আবগারী, লবণ ও আফিম বোর্ড-এর দেওয়ান হিসাবে দ্বারকানাথের কৃতিত্ব বিষয়ে পার্কার তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন ঃ

'দেখেছিলাম লবণ বিভাগে জাল, জোচ্চুরি, ঘুষ, তহবিল-তছরূপ প্রভৃতি উপদ্রব ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করেছে। বিভাগে একজনও কর্মচারী ছিলেন না, যিনি এই যোগসাজস বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। ফলে এই বিভাগ থেকে রাজস্ব আদায় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। যখন লবণ বিভাগের এই প্রকার নিদারুণ দুরবস্থা, সে-সময় দ্বারকানাথ তাঁর কর্মদক্ষতা, শ্রমনিষ্ঠা, উদ্যম এবং সততা (তাঁর সাধুতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতির যোগ্য) দিয়ে যদি আমার সহায়তায় এগিয়ে না আসতেন, তা হলে হয়তো আমার পক্ষে এই বিভাগের সংস্কার সাধন অসম্ভব হত।'[১১]

নানারকম লোকের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে হত বলে দ্বারকানাথ মনুষ্য-চরিত্র বিচারে পারদর্শী ছিলেন। দেওয়ান পদে যোগ দেবার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন বিভাগ জুড়ে যোগসাজসে কার কেমন হাত। চুরি জোচ্চুরি ঘুষ প্রভৃতির বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলতে তাঁকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তা করতে গিয়ে তাঁকে কায়েমী স্বার্থের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে হয়। বিভাগীয় কর্মচারী ও লবণ-সরবরাহকারী মলুঙ্গীরা—যারা এত কালের যোগসাজসে কোম্পানীকে ঠকিয়ে আসছিল—নূতন দেওয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষেপে দাঁড়াল। তাদের উশকানী দেবার মতো লোকের অভাব ছিল না। ধর্মসভার গোঁড়া হিন্দুর দল তখন ঘোরতরভাবে তাঁর বিরোধী—কারণ তিনি রামমোহনের অন্তরঙ্গ ও সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে তাঁর প্রধান সহকর্মী। সে যাই হোক, ঠিক কার প্ররোচনা ছিল জানা না থাকলেও দেখা গেল, মলুঙ্গীরা একজোট হয়ে বোর্ড-এর কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে নালিশ করল যে দ্বারকানাথও কোম্পানীর প্রাপ্য অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন।

এ-নালিশের তদন্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন স্তরে। পার্কার স্বয়ং, স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল এবং শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া আপিস রায় দেন যে দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাঁরা অপবাদের কলঙ্ক থেকে তাঁকে নির্দ্বিধায় মুক্ত করে দেন। জীবনী-লেখক ক্ষিতীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে কেবল আইন-উপদেষ্টারূপে যে-ব্যক্তি মাসিক পনেরো হাজার টাকা উপার্জন করতেন, তিনি তুচ্ছ কয়েক হাজার টাকার জন্য তাঁর মানসম্ভ্রম

বিসর্জন দিতে যাবেন—এটা কল্পনাতীত। তাঁর এই যুক্তির সপক্ষে তিনি দ্বারকানাথকে লেখা পার্কার-এর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ 'দেওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে আপনাকে কাপুরুষোচিত ও প্রতিহিংসা-প্রণোদিত নানা অপবাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যদি আমি আমার পদাধিকার বলে সেইসব আক্রমণের তিক্ততা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পেরে থাকি, আমার বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার রেখে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে আমি তা করেছি সুবিচারের খাতিরে, সরকারী কাজে আপনার অমূল্য সহায়তার কথা ভেবে এবং আপনার সন্দেহাতীত সততার সম্মানে যা সকল পক্ষপাতহীন ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান।'[১১]

পার্কার এ-চিঠি লিখেছিলেন ১৮৩৪ অব্দের ১৪ অক্টোবর তারিখে। দেওয়ান-পদে দ্বারকানাথ ইস্তফা দিয়েছিলেন তার কিঞ্চিদধিক দু-মাস পূর্বে, ১৮৩৪ অব্দের ১ আগস্ট তারিখে। ছ-বছরে কোম্পানীর কাজে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন যথেষ্ট, নূতন-কিছু শিক্ষা করার মতো বিষয় আর ছিল না। তাছাড়া, ইতিমধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তিনি তখন তাঁর নিজের নূতন নূতন উদ্যোগের সূত্রপাত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

## টীকা

১. *Partner in Empire*, by Blair B. Kling. p. 32.
২. *Freedom Movement in Bengal, 1818-1904*, Ed. by Nirmal Sinha. p. xxv.
৩. ১৯৭৮ অব্দের ৪ জুন রবিবাসরীয় *Times of India*-য় প্রকাশিত পি. সি. রায়চৌধুরী-লিখিত প্রবন্ধ : *Tagore as a Benevolent Landlord*.
৪. *Bengal Harkaru*, Jan. 6, 1843.
৫. রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগার, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী। দ্রঃ Docket 10–*Dwarakanath's Correspondence*.
৬ *Memoir* : pp. 16-17, 'জীবনী', পৃ. ৪৭-৪৯।
৭. সচরাচর বলা হয়ে থাকে দ্বারকানাথের কোম্পানীর চাকুরীর মেয়াদ ছিল বারো বছর (১৮২২-১৮৩৪) মাত্র। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথের অনুমান 'রামমোহনের দৃষ্টান্ত ও খুব সম্ভবত তাঁহার পরামর্শের অনুসরণে তাঁহার কলিকাতায় আগমনের (১৮১৪) দুই-চার বৎসরের মধ্যেই' দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণার কলেক্টর-এর অধীনে সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেছিলেন। এ-অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে দ্বারকানাথের কার্যকাল বারো বছরের বেশি হওয়া উচিত। দ্রঃ 'জীবনী' পৃ ৫৫।
৮. *Partner in Empire* by Blair B. Kling. p. 37.
৯. কোম্পানীর অধীনে দ্বারকানাথ যখন চাকুরীরত সেই সময় ১৮৩০ অব্দে তিনি কালীগ্রামের জমিদারি ও ১৮৩৪ অব্দে সাহাজাদপুরের জমিদারি ক্রয় করেন। দ্রঃ 'জীবনী', পৃ. ৫৭।
১০. *Partner in Empire* গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় Blair B. Kling কর্তৃক উদ্ধৃত।
১১. 'জীবনী' গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত।

□

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# ব্যবসাবাণিজ্যে অগ্রনায়ক

বহুবিচিত্র মানুষ ছিলেন দ্বারকানাথ। আর আর যাই গুণ তাঁর থাকুক না কেন, মুখ্যত তিনি ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। যা-কিছু হাতে নিয়েছেন তা-ই পরিণত করেছেন কর্মপ্রচেষ্টার অভিযানে। সে-দিক থেকে তিনি ছিলেন সৃজনশীল বিচিত্র কর্মের কবি। এ-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অজানা পথে পাড়ি দিতে তাঁর কোনো ভয়ডর ছিল না। উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন সুদক্ষ, উপায় সন্ধানে তৎপর, উদ্যোগের বাস্তবায়নে অক্লান্ত-কর্মা। কিন্তু একটা কোনো কাজে সাফল্য লাভ করার পর—সে-কাজ তাঁকে আর ধরে রাখতে পারত না, ফলাফলের নিশ্চয়তার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই নূতন কোনো কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নূতন নূতন কাজে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা পরখ করে নিতে তাঁর এই প্রবণতার ফলে এবং কী হবে আর কী হবে না নিয়ে হিসেব করতে না-বসে—বল্‌গাবিহীন কল্পনাকে উধাও পথে ছোটাতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত তিনি প্রায় সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁকে বলেছেন 'বিচিত্রমনা'। এ নাম দ্বারকানাথকে যতটা না মানিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী মানিয়েছিল তাঁর প্রখ্যাত পৌত্র রবীন্দ্রনাথকে—প্রায় একটা শতাব্দীর ব্যবধানে। ১৯৪০ অব্দের ৭ আগস্ট তারিখে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন-উৎসবে, রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার সময় তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হলেন বিচিত্রমনা কবি ও লেখক—poeta et scriptor 'myrionous'.

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, দ্বারকানাথ সাবালক হয়ে আইনত তাঁর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির অধিকার লাভ করার আগের থেকে জমিদারি-পরিচালনার সমস্ত খুঁটিনাটি মায় তৎসংক্রান্ত আইন কানুন ও রেগুলেশন—সমস্ত কিছুই শিখে নিতে বিধিমত চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জমিদারের ছেলে বলিয়া যে কেবল টাকা গুণিতে এবং অবশিষ্ট সময় আলস্যে কাটাইতে হইবে, তিনি নিজ জীবনে তাহার স্থায়ী প্রতিবাদ স্বরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই অল্প বয়সেও তিনি সময় নষ্ট করিতে জানিতেন না।' জমিদারি-পরিচালনার সূত্র ধরে তিনি অর্থ-উপার্জনের নানা ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত

করেছিলেন। তিনি কেবল যে সঞ্চয় করেছিলেন এমন নয়, সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে প্রচুর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, জমিজমার আয় থেকেই তাঁর তেজারতি ব্যবসার পত্তন। আইন-উপদেষ্টারূপেও তাঁর উপার্জন নগণ্য ছিল না। রপ্তানী কারবারও শুরু করেছিলেন য়ুরোপীয় বন্ধুদের অংশীদার হয়ে। কর্মজীবনের সূচনা থেকেই নিকট-যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন য়ুরোপীয় বণিকসমাজ ও কোম্পানীর সরকারী মহলের সঙ্গে। এদের কারো সংস্পর্শে এসেছিলেন রামমোহন রায়ের অথবা পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিদের মধ্যস্থতায়, কারো কারো সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন নিজের চেষ্টায়।

য়ুরোপীয় কুঠির অর্ডার অনুসারে অথবা য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের অংশীদার হয়ে তিনি রেশম, চিনি, সোডা প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতেন। দুঃখের বিষয়, ব্যবসায়ী-হিসেবে তাঁর প্রারম্ভিক উদ্যোগগুলির, এমনকি শেষজীবনের কোনো কোনো কাজ-কারবারের নথিপত্র আর পাওয়া যায় না।[১] সামান্য যে-সব কাগজপত্র উদ্ধার পেয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে ১৮২১ অব্দে জন লান্‌ড্রিন সেণ্ডার্স-নামক একজন স্থানীয় ব্যবসাদারের অংশীদার রূপে, দ্বারকানাথ জলপথে কিছু পণ্য পাঠিয়েছিলেন বুয়েনোস্ এয়ারেস্-এ। সেই পণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আখের রস থেকে প্রস্তুত মদ, মৌরী ও জায়ফল। রেজোল্যুশন নামধেয় যে ২৬০ টন জাহাজ ভাড়া করে এইসব পণ্য রপ্তানি করা হয়, সেই জাহাজ ফিরতি-পথে ভালপারাইজো থেকে এক-জাহাজ তামার আমদানি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে।[২] সে-যুগের অন্যান্য বড় বড় হিন্দু সওদাগরের তুলনায় তরুণ দ্বারকানাথের সমুদ্রপথে সওদাগরী উদ্যোগ ছিল নিতান্তই নগণ্য, তিনি যেন কেবল পরখ করে দেখছিলেন এক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। সেকালে হিন্দু সওদাগরদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ফেয়ারলি ফারগুসন কোম্পানীর বেনিয়ান, রামদুলাল দে। আমেরিকার ন্যু ইয়র্ক, বস্টন, নিউবেরী পোর্ট এবং ফিলাডেলফিয়ার বহু মার্কিনী সওদাগরের সঙ্গে তাঁর কাজ-কারবার ছিল, এমনকি তাঁদের কেউ কেউ একজোট হয়ে একটি জাহাজ তৈরী করিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন রামদুলাল দে-র নামে।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বাংলা দেশে ব্যাঙ্কিং কারবারের নিতান্তই শৈশব অবস্থা। গুটি-চারেক ব্যাঙ্ক ছিল এবং তাদের কোনোটাই আজকের অর্থে 'পাব্লিক ব্যাঙ্ক' ছিল না অর্থাৎ টাকা-পয়সা লেনদেনের জন্য সেসব সর্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। ১৮০৯ অব্দে স্থাপিত ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল ছিল আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, 'বলতে গেলে এক প্রকার কোম্পানী বাহাদুরের খাজাঞ্চীখানা। ১৮২৪ অব্দে কোম্পানীর ব্রহ্মদেশ অভিযানের সময় এই ব্যাঙ্ক-এর অধিকাংশ মূলধন নিয়োজিত হয়েছিল যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়। কলকাতার বণিক সমাজকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণদান তখন বন্ধ রাখা হয়েছিল।'[৪] অপর যে-তিনটি ব্যাঙ্ক ছিল, সেগুলি ছিল কোনো কুঠি বা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। যথা ঃ ১৭৭০ অব্দে স্থাপিত ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান-এর মালিক ছিলেন আলেকজাণ্ডার এণ্ড

কোম্পানী; ১৮২৪ অব্দে স্থাপিত ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ছিল জন পামার কোম্পানীর সম্পত্তি; ১৮১৯ অব্দে ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোম্পানীর পরিচালনায় স্থাপিত হয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড্ কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ইনিয়স্ ম্যাকিণ্টস্ ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। কোম্পানী রামমোহনের হয়ে তাঁর গচ্ছিত মূলধন খাটাত, রামমোহনও তাঁর টাকা-পয়সার লেনদেন করতেন এই কোম্পানী-মারফত। কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার জি. টি. গর্ডন ছিলেন একেশ্বরবাদী সংস্থার নিয়মিত সদস্য এবং রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়েরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। সম্ভবত এই কারণে দ্বারকানাথ ক্রমেই এই কোম্পানীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর অন্যতম অংশীদার হয়েছিলেন। সে-সময় ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর বিশেষ কোনো তফাত ছিল না।

দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন ব্যাঙ্ক যদি কেবল কোনো কুঠি বা কারবারের অংশবিশেষ হয় অথবা কোম্পানী বাহাদুরের খাজাঞ্চীখানায় পরিণত হয়, তাহলে সমগ্রভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে তা মদত জোগাতে পারবে না। সুতরাং ১৮২৮ অব্দে তিনি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যান্য অংশীদারেরা পৃথক ভাবে একটি এমন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে চাইলেন যা বিশেষ কোনো কুঠি বা কারবার কিংবা কোম্পানী-সরকারের তাঁবেদারিতে নিযুক্ত না থেকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে—যার মূলধন সংগৃহীত হবে যৌথভাবে। এইভাবে ১৮২৮ অব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচশ শেয়ারে বিভক্ত বারো লাখ টাকার মূলধন নিয়ে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক পত্তন করা হয়। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারকানাথ কোম্পানীর কাস্টম্স্ সল্ট্ এণ্ড ওপিয়ম বোর্ড-এর দেওয়ান-পদে নিযুক্ত থাকায় প্রথম প্রথম প্রকাশ্যভাবে এই ব্যাঙ্ক-এ যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু যৌথ মূলধনের একটা মোটা অংশ এসেছিল তাঁর নিজের, আত্মীয় স্বজন ও আশ্রিত বর্গের এবং বন্ধুবান্ধবের নামে কেনা শেয়ারের টাকা থেকে। ব্যাঙ্ক পরিচালনায় তাঁর পরোক্ষ প্রভাবের প্রমাণ দেখা যায় কোষাধ্যক্ষ-রূপে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুরের এবং সেক্রেটারি-রূপে তাঁর বন্ধু উইলিয়ম কার-এর নির্বাচন থেকে। কার তখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন, ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীকালে এই কার-ই দ্বারকানাথের অংশীদার হন এবং উভয়ে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানী। য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রেরণার উৎস ছিলেন দ্বারকানাথ, তিনিই ছিলেন এর পথ-নির্দেশক। প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরবর্তী বিশ বছর ধরে এবং 'দ্বারকানাথের জীবৎকালে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ককে ভিত্তি করেই কলকাতায় গড়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট ও বিচিত্র ইমারত।'[১] /

বিগত শতাব্দীর সূচনায় কলকাতায় ব্যাঙ্কিং ব্যবসার যেমন শৈশব অবস্থা, বীমা ব্যবসার অবস্থাও তেমনি। বীমা তখন যেন সদ্যোজাত। বীমা কোম্পানী বলতে ছিল

একমাত্র ক্যালকাটা লডেব্‌ল্‌ সোসাইটি—এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ এবং একজন পার্সি ব্যবসায়ী, রুস্তমজী কাওয়াসজী। ১৮২২ অব্দে দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠা করলেন ওরিয়েন্টল লাইফ এস্যুরেন্স সোসাইটি। এর মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ নিজে এবং সেকালের শীর্ষস্থানীয় তিনটি কুঠির অংশীদারবৃন্দ—এই তিন কুঠির নাম ঃ ফারগুসন এণ্ড কোম্পানী, ক্রাটেনডেন এণ্ড কোম্পানী ও ম্যাকিণ্টস্‌ এণ্ড কোম্পানী। সোসাইটির প্রাথমিক কাজ ছিল এইসব এজেন্সি হাউস-এর উত্তমর্ণদের জীবন-বীমা করা এবং কাজে-কারবারে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া।

১৮২৮-২৯ অব্দে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করে দ্বারকানাথ যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই শ্লাঘার যোগ্য। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার সামান্য কয়েক মাস পরে কলকাতার বৃহত্তর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, জন পামার এণ্ড কোম্পানী ফেল পড়ে। এর ফলে কলকাতাস্থিত য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী সমাজে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং যাকে বলা হয় ১৮৩০-৩৩ অব্দের সংকট—কলকাতা সেই সংকট-অবস্থায় পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। ব্লেয়র ক্লিং এ-সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'কলকাতার বাণিজ্য জগতে একটা-যে আত্মপ্রত্যয় ও সম্প্রসারণের দরাজ ভাব দেখা দিয়েছিল, তা যেন নিমেষে বাষ্পের মতো উড়ে গেল। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী ফেল পড়ল ১৮৩২-র ডিসেম্বর মাসে এবং ম্যাকিণ্টস্‌ কোম্পানী ১৮৩৩-এর জানুয়ারি মাসে। ১৮৩৪ অব্দের জানুয়ারির শুরুতে অর্থাৎ একটা বছর পার হতে না হতে দেখা গেল বড় বড় এজেন্সি হাউস-এর একটিও আর খাড়া দাঁড়িয়ে নেই—সব ধরাশায়ী। তখনই বুঝতে পারা গেল ব্যবসা-বাণিজ্যের গঠন-প্রণালী আগাগোড়া ঢেলে না সাজালে আর উপায় নেই। এই সংকট-অবস্থার মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথই দাঁড়িয়েছিলেন পর্বতের মতো দৃঢ় হয়ে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর যখন মুমূর্ষু অবস্থা, পরিচালক-মালিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তখন সচ্ছল। ম্যাকিণ্টস্‌ এণ্ড কোম্পানী ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নোটিশ জারি করে বললেন, 'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন।' ওরিয়েণ্টল লাইফ এস্যুরেন্স সোসাইটির ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা করলেন...। ১৮৩৪ অব্দে পুরাতন সোসাইটির প্রারব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নূতন অংশীদার কয়েকজনাকে নিয়ে তিনি স্থাপন করলেন নিউ ওরিয়েন্টল লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানী।'

চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একা তিনি ১৮৩০-৩৩ এর সংকট-কালে দাঁড়িয়ে ছিলেন উত্তুঙ্গ মিনারের মতো। সেই সন্ধিক্ষণে তাঁর প্রত্যয় হল এবার তাঁকে আপন হাতে গড়ে তুলতে হবে দেশীয় উদ্যোগের এমন একটি নূতন ইমারত যা ভারতের বৃহত্তম নগরীর সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবার উপরে নিজের বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পারবে এবং সবার উপরে নেতৃত্ব করতে পারবে। তিনি এবার তাই কোম্পানীর

চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে উইলিয়ম কার-কে অংশীদার করে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রখ্যাত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান—কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানী। কোম্পানীর জন্ম হল শুভ লগ্নে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্রিটিশ সরকারের যে চার্টার অথবা সনদের বলে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল তার মেয়াদ ১৮৩৩ অব্দে শেষ হয়ে যাবার ফলে, কোম্পানী বাহাদুরকে বাধ্য হয়ে ভারতে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাট তুলে দিতে হয়। সুতরাং সেইসময়ে বেসরকারী য়ুরো-ভারতীয় উদ্যোগের পক্ষে শূন্য স্থান অধিকার করায় কোনো বাধা ছিল না। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তখন সরকারী হস্তক্ষেপ তুলে নেওয়া হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত বাঙালী বণিকেরা (তাঁদের কেউ কেউ প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন, কেউ কেউ ছিলেন দ্বারকানাথের চেয়েও ধনী) য়ুরোপীয় কুঠির বেনিয়ান অথবা মুৎসুদ্দি রূপে কাজ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আধুনিক য়ুরোপীয় কায়দায়, য়ুরোপীয় অংশীদারকে সমপর্যায়ে রেখে, প্রথম যে-বাঙালী বণিক একটি স্বাধীন ব্যবসায়িক উদ্যোগের সূত্রপাত করেছিলেন, তিনি দ্বারকানাথ।[৭] অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন ঃ 'স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি সত্যই ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে প্রথম উদ্যোগী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সরকারী চাকুরীর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এ দেশের বুর্জোয়া সমাজ এতদিন আবদ্ধ ছিল—দ্বারকানাথ সেই গণ্ডি থেকে সর্বপ্রথম বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন।'[৮]

ভারতের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তিনি যে নূতন যুগের সূত্রপাত করতে চলেছেন—সে-বিষয়ে সচেতন হয়েই দ্বারকানাথ সেই সময় বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক-কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ 'বাংলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রথম খোলাখুলিভাবে একজন য়ুরোপীয় বণিকের সঙ্গে একজন বাঙালী বণিক পাঁচ জনাকে জানিয়ে-শুনিয়ে পরস্পরের অংশীদার হলেন। মূলধন দেবেন বাঙালী অংশীদার—যাতে অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে এমন উপায়ের উপর নির্ভর করতে না-হয় যার পরিণাম সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মতো শোচনীয় ও সংকটজনক হলেও হতে পারে...।' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথ 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলী'-র উল্লেখ করেছেন কতিপয় এজেন্সি হাউস ও ব্যাঙ্কের ফেল পড়ার কথা স্মরণ করে। এ-চিঠিতে দ্বারকানাথ আরও বলেছেন ঃ 'কলকাতার যে-সব নূতন প্রতিষ্ঠান সততায়, অর্থে, বিত্তে ও অভিজ্ঞতায় য়ুরোপীয়দের সঙ্গে দেশীয়দের সম্মিলিত করবে এবং এ-দেশের পণ্য উৎপাদন-শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করবে, আমাদের এই বাণিজ্যিক উদ্যোগ তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম না হলেও, সমপর্যায়ভুক্ত হবে।'[৯]

পত্রোত্তরে বেণ্টিঙ্ক দ্বারকানাথকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'দেশীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে আপনিই প্রথম কলকাতায় য়ুরোপীয় আদর্শে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পত্তন করলেন।' বেণ্টিঙ্ক নানা দিক থেকে এক অনন্য-সাধারণ মানুষ ছিলেন; পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড হেস্টিংস্-এর মতো নূতন নূতন পরিকল্পনাকে তিনি সানন্দে স্বাগত করতেন

ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, ১৭৯৯ অব্দে ওয়েলেসলি যে-নিয়মের নিগড়ে ভারতের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিলেন, সাহসে নির্ভর করে সে-নাগপাশ মোচন করেছিলেন এই হেস্টিংস্। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ এবং তাঁর নিজের আমলাদের বিরুদ্ধতা ও অসহযোগের ফলে, তিনি সরকারী শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-উদার নীতির প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা বহুলাংশে ব্যর্থ ও বিফল হয়। অবশ্য তাঁর নিজের অনিশ্চয়তা ও ইতস্তত ভাবও এ-জন্য অংশত দায়ী। বেণ্টিঙ্ক যেমন উদারনীতিক ছিলেন তেমনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্নও ছিলেন। কী তিনি করতে চান সে-বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ইচ্ছাশক্তিও ছিল তাঁর যথেষ্ট। ভারতে তিনি সর্বপ্রথম বড়লাট যিনি ভারতীয়দের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের মতামত জানবার জন্য বিধিমতো যত্ন নিতেন।[১০]

ভারতে তাঁর কার্যকাল শেষ হবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি জাহাজ থেকে কলকাতার মিঃ নর্টনকে যে-চিঠি লেখেন,[১১] তা থেকে বেণ্টিঙ্ক-এর মনোগত বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন ঃ 'ভারতে আমাদের শাসন-ব্যবস্থা মূলত এমন হওয়া উচিত যাতে করে ভারতের জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ না হয়। শাসন-ব্যবস্থার মূলে থাকবে দেশের জনগণের গভীর অনুরাগ ও প্রীতি।' চিঠিতে তিনি তাঁর খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, 'এতকাল পর্যন্ত দেশীয়দের সঙ্গে লোক-ব্যবহারে আমরা কট্টর ইংরেজদের মতো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছি। অতঃপর কে বিশ্বাস করবে গত কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অর্থে, বিত্তে, চারিত্র্যে ও পদমর্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ভারতীয়েরা আগাম অনুমতি ব্যতিরেকে ঘোড়া গাড়ি চেপে লাট-ভবনে প্রবেশ করতে পারত না—যদিচ হীনতম য়ুরোপীয়দের সে-অধিকার ছিল? কে বিশ্বাস করবে গত একটা বছরের মধ্যেই এমন এক অঘটন ঘটেছে যার ফলে এই প্রথম জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক সাহস করে (হ্যাঁ, সাহসের কথা বৈ কি!) সর্বসমক্ষে নিজেকে কলকাতার এক বাণিজ্যিক সংস্থার একজন প্রধান অংশীদার বলে ঘোষণা করতে পেরেছেন? অথচ কে না জানে, যে-সব বিত্ত, সম্পত্তি ও মূলধনকে আশ্রয় করে এ-যাবৎ কলকাতার ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছে—তার প্রায় সবটুকুই এসেছে এ-দেশীয়দের কাছ থেকে!'

অরলিআঁ-র ডিউক লুই ফিলিপ—যিনি ফরাসী দেশের দ্বিতীয় বিদ্রোহের পর সে-দেশের প্রথম 'নাগরিক রাজা' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বেণ্টিঙ্ক-এর বন্ধু। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল রূপে বেণ্টিঙ্ক যখন নিযুক্ত হন লুই ফিলিপ তাঁকে লিখেছিলেন ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-পদে আপনি ভারত তথা আপনার মাতৃভূমির যে-সেবা করতে পারবেন তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শাসকবর্গের স্বার্থ-সিদ্ধি ও নিরাপত্তা যে বহুলাংশে নির্ভর করে শাসিতদের মঙ্গলসাধনের উপর, সে-কথা আপনি যতটা ভালো বুঝবেন, খুব কম লোকই ততটা বুঝতে পারবে।'[১২]

কোম্পানী বাহাদুরের কর্মচারী থাকতেও দ্বারকানাথের সঙ্গে বেণ্টিঙ্ক-এর সদ্ভাব ছিল। সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনে রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর নিকট-সাহচর্য, জনহিতকর কাজে তাঁর সুনাম এবং তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততা সম্বন্ধে উপরিতন ইংরেজ আমলাদের উচ্চ ধারণা—এ সব-কিছু বড়লাট বাহাদুরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চাকুরীতে রত থাকতে দ্বারকানাথ একবার লর্ড ও লেডি বেণ্টিঙ্ক-কে তাঁর বেলগাছিয়ার ভিলা-য় আমন্ত্রণ করেছিলেন। 'বেণ্টিঙ্ক নিজে না যাইয়া সহধর্মিনীকে পাঠাইয়াছিলেন। নিজে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ এই বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যখন নিজের কৌন্সিলের মেম্বরদিগেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন না, তখন দ্বারকানাথ নিমকি বোর্ডের দেওয়ানী কর্মে থাকিতে অর্থাৎ অধীনস্থ কর্মচারী থাকিতে স্বাধীনভাবে সকলের সঙ্গে মিলিতে সক্ষম হইবেন না।'[১৩] শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের বাংলা মুখপত্র **সমাচার দর্পণ** তাঁদের ১৮৩০ অব্দের ৯ জানুয়ারি সংখ্যার একটি খবরে বলেছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে গভর্ণর জেনারেল ও লেডি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক লাট-ভবনে একটি ভোজসভা ও বল্‌-নাচের আয়োজন করেছিলেন। তদুপলক্ষে সেই প্রথমবার বাছা বাছা কয়েকজন ভারতীয় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লাট-ভবনে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ, যদিচ তখনো তিনি কেবলমাত্র নিমকি বোর্ড-এর দেওয়ান।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে বিদায়ী গভর্ণর-জেনারেল রূপে বেণ্টিঙ্ককে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। দ্বারকানাথ কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়ে তাঁর নূতন উদ্যোগের কথা একটি যে-চিঠিতে (ইতিপূর্বে অংশত উদ্ধৃত) বেণ্টিঙ্ক-কে জানিয়েছিলেন, কর্মব্যস্ততা-হেতু তিনি সে-চিঠির জবাব যথাসময় দিতে পারেন নি। জাহাজে যাবার পথে তাঁর অবসর মিলেছিল। কুরিয়র কাগজ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ১৮৩৫ অব্দে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে **ফ্রেণ্ড্‌ অব ইণ্ডিয়া** লিখেছিলেন ঃ 'জাহাজ থেকে জুন মাসের তারিখ-দেওয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক-এর একটি চিঠি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তগত হয়েছে। চিঠিতে ভূতপূর্ব বড়লাট বাহাদুর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ভারত ছাড়বার আগে উক্ত বাবুমশায়ের একটি চিঠির উত্তর দিয়ে যেতে পারেন নি ব'লে। সেই সঙ্গে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একত্রযোগে কাজকারবার করার সৎ দৃষ্টান্ত তাঁর দেশবাসীর সামনে স্থাপন করার জন্য, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অভিনন্দিত করেছেন।'

১৮৩৪ অব্দে কোম্পানী বাহাদুরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে, সে-যুগের মুখ্য ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান—কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানীর প্রধান রূপে (উপরন্তু, পদাধিকার-বলে না হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই ছিলেন ক্ষমতাশালী য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের শীর্ষস্থানে) তখন দ্বারকানাথের সামাজিক প্রতিষ্ঠা একেবারে তুঙ্গে। কেবল পদমর্যাদার জোরে তিনি এই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এমন নয়; তাঁর নামডাকের পিছনে আরো

অনেকগুলি কারণ বর্তমান ছিল। ব্যবসায়িক দূরদর্শিতায় তিনি যেমন ছিলেন ধুরন্ধর তেমনি দুঃসাহসিক। তাঁর সততা ছিল সর্বজনবিদিত। লোক-ব্যবহারে তিনি ছিলেন সহৃদয় ও অমায়িক, সকল প্রকার লোকের সঙ্গে তিনি সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। সর্বোপরি সকল প্রকার জনহিতকর কাজে তাঁর উদার বদান্যতা এবং বিপদাপন্ন যে-কোনো ব্যক্তির সাহায্যার্থ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার স্বভাব—তাঁকে সমাজের এমন একটা জায়গায় স্থাপন করেছিল যা অর্থ বিত্ত বা পদমর্যাদার আয়ত্তের বাইরে। পুরাতন সহচর বা বন্ধুদের প্রতি তাঁর বাৎসল্য ছিল গভীর, নিজের লাভক্ষতি বিবেচনা না করেই তিনি অনেক সময় তাঁদের সহায়তা দান করেছেন। এককালে পামার এণ্ড কোম্পানীর নামডাক ছিল খুব, কোম্পানী ফেল পড়বার পর দুঃস্থ আমানতকারীদের অর্থসাহায্য করার দরকার হলেই, জন পামার ধার চাইতেন তাঁর বন্ধু 'ডোয়ার্কি'-র কাছে। এক বিধবা আমানতকারীকে পামার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দ্বারকানাথের নিজের অর্থবিত্ত যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু তিনি অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন—তার সবটাই খাটছে। তা না হলে তাঁর স্বভাবদাক্ষিণ্যকে বাগ মানানো শক্ত হত।' আরো বলেছেন পামার, 'আমার মনে হয় তাঁকে দেনা করতে হয় ধার দেবার জন্য এবং নিজের কাজ-কারবার চালিয়ে যাবার জন্য।'[১১] ১৮৩২ অব্দে এই পামার প্রসঙ্গেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল; পামার একটা মোটা টাকা ধার চাইলেন, দ্বারকানাথের হাতে তখন নগদ টাকার মন্দা। অগত্যা তিনি নিমকি বোর্ড-এর কাছে দরখাস্ত করলেন যে ১৮২৮ অব্দে কোম্পানী বাহাদুরের চাকুরীতে বহাল থাকার সময় তিনি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জামানত রেখেছিলেন সেই জামিনের টাকাটা যেন তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হয়। বোর্ড তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিল।

বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক হওয়ায় দ্বারকানাথের পক্ষে ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রেখে ধারকর্জ নেবার সুবিধা ছিল। অন্যের অসময়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতেন বলে তিনি আশা করতেন অন্যেরাও অসময়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এইভাবে তাঁর কাজ-কারবার অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বিস্তার লাভ করতে থাকে। পয়সার বেলা সেয়ানা ও টাকার বেলা বোকা—তিনি মোটেই সেরকম ছিলেন না, বরঞ্চ বলা চলে, তিনি ছিলেন টাকার বেলা সেয়ানা ও পয়সার ব্যাপারে বোকা। উদার হস্তে দিতেন বলে দু-হাত ভরে নিতেও পারতেন। তাঁর এই বদান্যতার মধ্যে জমা-খরচের বালাই ছিল না, দান-দাক্ষিণ্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—জাগতিক ব্যাপারে বিচক্ষণ ছিলেন বলেই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে তিনি একটা মিলন সাধন করতে পারতেন। যখন কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানীর পত্তন হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ মাত্র—দেহমনের পূর্ণ শক্তিতে তিনি তখন শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, উচ্ছল ছিল তাঁর প্রাণশক্তি। উন্নতির পথ তখন তাঁর কাছে উন্মুক্ত, এগিয়ে যেতে কোথাও কোনো

বাধা নেই। এগিয়ে গেলেনও তিনি পূর্ণ শক্তিতে। তাঁর উদ্দীপনা দেখে বিদেশীয়ের মুগ্ধ। তাঁর সততায় তাঁদের পরিপূর্ণ আস্থা। স্বদেশীয়েরা তাঁকে বরণ করে নিল দেশভক্ত রূপে, জাতিগঠনের অগ্রদূত রূপে। আমূল সংস্কারপন্থী ইয়ং বেঙ্গল-এ মুখপত্র **জ্ঞানান্বেষণ** তাঁদের ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ 'বিদেশীয়েরা এ-দেশে আসার অল্প কিছুকাল পরে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই টাকায় বাকি জীবন আরামে কাটায়। এই দোহন-শোষণের ফলে আমাদের দেশ রিক্ত হতে থাকে। হয়তো এখন থেকে একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিতে পারে। পরপদানত হিন্দুস্থান এখন অন্যান্য ব্যবসাবাণিজারত দেশগুলির সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারবে। ঠাকুরবাবু যে-পথ দেখিয়েছেন আরো অনেকে সেই পথের পথিক হয়ে অনুরূপ প্রচেষ্টায় সাহসের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করছেন। এতে দেশের ও দশের উপকার হতে পারে বলে এ-কাজ সর্বথা শ্লাঘার যোগ্য। অলস ও অজ্ঞান বলে হিন্দুদের যে-বদনাম আছে—এইভাবে তা বিদূরিত হতে পারে।'

১৮৪২ অব্দে প্রকাশিত **ফিশার্স কলোনিয়াল ম্যাগাজিন** তাঁদের প্রথম খণ্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বলেছিলেন ঃ 'দ্বারকানাথ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর জীবনের এই পর্বে সাহসিকতা, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, কর্মদক্ষতা ও স্বাবলম্বনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছিলেন, তেমনটি ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। দ্বারকানাথ এই নূতন পথে পদক্ষেপ করার আগে কোনো হিন্দু সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই।[১৫] ভবিষ্যতে হিন্দু জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যথোচিত লাভ ও সুবিধা অর্জন করুক বলে আমরা যে আশা প্রকট করেছি, তা যদি কখনো বাস্তবে পরিণত হয় তবে সেই সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব, ভারতে এই নবযুগের সূচনা সম্ভবপর হয়েছিল—দ্বারকানাথ অপূর্ব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন ব'লে।'

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আদ্য নাম ছিল 'কার' এবং উইলিয়ম কার ছিলেন ব্যবসায়ের অংশীদার, কিন্তু ব্যবসায়ের মূলধন, প্রবর্তনা ও পরিচালনা সবই ছিল মূলত দ্বারকানাথের। অন্যান্য বিনিয়োগকৃত মূলধন ছাড়াও ১৮৩৪ অব্দে ১ আগস্ট তারিখে অংশীদারিত্বের দলিল সম্পাদনকালে দ্বারকানাথ নগদে কোম্পানীকে শতকরা আট টাকা সুদে কর্জ দিয়েছিলেন দশ লাখ টাকা। এই কর্জের টাকাটার জন্য একটি আলাদা হিসাবের খাতা খোলা হয়েছিল—তাঁর নিজস্ব লাভালাভ ও ডিভিডেণ্ড-এর হিসাব থেকে তা ছিল স্বতন্ত্র। এই কর্জের টাকা থেকে একটি পয়সাও তাঁর জীবৎকালে তোলা হয়নি। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি যে উইল সম্পাদন করে যান তাতে এই কর্জের টাকাটার উল্লেখ ছিল।[১৬] কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানীতে দ্বারকানাথের কর্তৃত্বের প্রভাব এমনই ছিল যে ব্লেয়র ক্লিং বলেছেন ঃ 'কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানীকে অংশীদারী ব্যবসায় না

বলে পিতৃশাসিত প্রতিষ্ঠান বলাটাই ঠিক হত।'

কার ছিলেন দ্বারকানাথের প্রথমতম অংশীদার, পরে তিনি ছাড়া আরও কয়েকজন য়ুরোপীয়কে কোম্পানী অংশীদার রূপে গ্রহণ করেন।[১৭] প্রথমে কোম্পানীর দফতরগুলি ছিল রানী মুদী লেন-এ (পরে নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট), ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট-এর কাছাকাছি। পরে দফতরগুলি উঠে যায় কলভিন ঘাট-এ।[১৮] প্রথম প্রথম কোম্পানীর প্রধান কারবারই ছিল বিদেশে কাঁচা রেশম, রেশমের থান, চিনি, আখ থেকে তৈরী রাম্-মদ, নীল, সোডা, চামড়া, কাঠ ও চাল চালান দেওয়া। কিছু কিছু পণ্য কাঁচা মাল অবস্থায় দ্বারকানাথের জমিদারিতেই উৎপন্ন হত। পণ্য রপ্তানিযোগ্য করবার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হত জমিদারি স্থিত কারখানাতেই। ইতিপূর্বে রপ্তানিযোগ্য অধিকাংশ রেশমদ্রব্য উৎপন্ন হত কোম্পানী বাহাদুরের কারখানায়। ১৮৩৩ অব্দে চার্টার অর্থাৎ সনদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে কোম্পানীকে কাজ-কারবার বন্ধ করে দিতে হয়। তখন দ্বারকানাথ জঙ্গীপুর ও কুমারখালির রেশম কুঠিগুলি কিনে নেন। কিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ দুটি গ্রামই ছিল তাঁর পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুরের অন্তর্গত। রেশমের চাষ ও গুটি উৎপন্ন করত যারা, তারা ছিল তাঁরই প্রজা। রেশমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নীলের উৎপাদনও শুরু করে দিলেন তাঁর জমিদারিগুলিতে— বিরাহিমপুর, সাহাজাদপুর, বড় জঙ্গীপুর, ছোট জঙ্গীপুরে।[১৯]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন যে চীন দেশের রেশম প্রথম ভারতে আমদানি করেছিলেন কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানী এবং দ্বারকানাথ ১৮৪২ অব্দে প্রথম যেবার বিলেত যান অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে বাছাই কয়েক খণ্ড চীনের রেশমও মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দিয়েছিলেন। এই ঘটনার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না কারণ কাগজেপত্রে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ এখন মেলা শক্ত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্ভবত পারিবারিক জনশ্রুতির ভিত্তিতেই এই তথ্য দিয়ে থাকবেন।

কার-টেগোর কোম্পানীর আর একটি কাজ ছিল জমিদারি-পরিচালনা। জমিদারি বলতে ছিল দ্বারকানাথের নিজের ও পৈতৃক বিষয়-আশয়, ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের জমিদারি এবং আরো কিছু জমিদারি, যাতে কোম্পানী মূলধন বিনিয়োগ করতেন অথবা সস্তায় কিনে চড়া দামে বিক্রয় করতেন, এইসব জমিদারি বাবদ কোম্পানীকে খাজনা গুণতে হত মাসিক লক্ষ টাকা। ১৮৬৪ অব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে **বেঙ্গল হরকরা** বলেছিলেন, 'এরকম একটা মোটা টাকার খাজনা দিতে হয় বলে কোম্পানী দাবি করেন যে ঠাকুরবাবুদের মালিকানাভুক্ত জমির পরিমাণ হবে বর্ধমান-রাজের মালিকানার ঠিক নিচে।'[২০]

কার-টেগোর কোম্পানীর আর একটি কারবার ছিল সমুদ্রপথে পাল-তোলা জাহাজে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা। কোম্পানী গঠিত হবার অনেক আগের থেকেই এককভাবে বা যৌথভাবে জাহাজ ক্রয় করে দ্বারকানাথ এই জাহাজী বাণিজ্যে নেমেছিলেন।

১৮৩১ অব্দে ক্যাপ্টেন হেণ্ডারসন ও উইলিয়ম স্টর্মকে অংশীদার করে, খিদিরপু: ডক-এ তিনি **ওয়টরউইচ্** নামে একটি ৩৬৩ টনের দ্রুতগামী পালতোলা জাহাজ তৈরি করান। এ-ছাড়া আরও কয়েকটি জাহাজ তাঁর ছিল চীনের সঙ্গে অহিফেন ব্যবসায়ে: জন্য।[২১] পার্সি ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজীরও জাহাজ ছিল কয়েকটি। ব্লেয়র ক্লিং বলেছেন ঃ 'কলকাতা-ক্যান্টন, ক্যান্টন-কলকাতা দূর পাল্লার দৌড়ে দুজনের মধ্যে কাং জাহাজ জিতবে তাই নিয়ে কলকাতার জনসাধারণ বাজি ধরত। অনুকূল বাতাসে ভর. দিয়ে পালতোলা জাহাজ যখন তরতর করে কলকাতার ঘাটের দিকে ছুটে আসত, ভিড় জমত কাতারে কাতারে আর জনতার উত্তেজনা হত দেখবার মতো। ক্যাণ্টন থেকে কলকাতা অবধি দূরপাল্লার প্রতিযোগিতায় ১৮৩৮ অব্দে **ওয়টরউইচ্** সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিয়ে পঁচিশ দিনের দিন কলকাতা পৌঁছে রেকর্ড স্থাপন করেছিল।'[২২] অহিফেন ব্যবসায়ের জন্য জাহাজ ছাড়াও দ্বারকানাথের আরও কিছু পালতোলা জাহাজ ছিল ভারতের বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য, এমন কি ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের জন্যও। কার-টেগোর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোম্পানীই এ-সব জাহাজের দালালি করত।

এই বিচিত্র ব্যবসায়ের উদ্যোগে দ্বারকানাথকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাল রেখে চলার মতো কোম্পানী-আইন তখনও চালু না থাকায় শেয়ারের মূল্যের হিসাবে অংশীদারদের দায়িত্ব বেঁধে দেবার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যৌথ কারবারে প্রত্যেক অংশীদারকে ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানীর পুরো ঋণের দায় বহন করার জন্য দায়ী করা হত। ফলে যাঁদের অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি থাকত তাঁদের দুরবস্থা হত শোচনীয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর পতন হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছিল দুরবস্থা কী চরমে পৌঁছতে পারে! য়ুরোপীয় অংশীদারদের এদেশে জমিজমা না থাকায় নির্ভয়ে স্বদেশে পালিয়ে গিয়ে দায়মুক্ত হতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু কোনো ভারতীয় যদি ফেল্-পড়া কোনো কোম্পানীর অংশীদার থাকতেন, তাহলে তাঁর বিষয়সম্পত্তি ক্রোক করা হত অথবা বাজেয়াপ্ত হত। অংশীদারদের ধারদেনার দায় সীমিত করার আইন পাশ হয়েছিল ১৮৫০ অব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যুর চার বছর বাদে। সুতরাং নিতান্ত দুঃসাহসিক না হয়ে যৌথ কারবারের ঝুঁকি কেউ বড়ো নিতে চাইতেন না। কিন্তু দ্বারকানাথ ছিলেন অন্য ধাতুর মানুষ, আর পাঁচজন সংসারীর মতো হিসাব করে চলা তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অভিযাত্রী। নূতন পথে চলবার উৎসাহে তিনি বাধাবিপত্তির কথা ঘৃণাক্ষরেও মনে স্থান দিতেন না। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কার-টেগোর কোম্পানী মারফত তিনি কত বিচিত্র উদ্যোগের সূত্রপাত করেছেন, কত অচেনা-অজানা পথে পথিকৃৎরূপে কাজ করে গেছেন, তা নিচের তালিকা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। তিনি যে-সব উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ক্যালকাটা

স্টিম টাগ্ এসোসিয়েশন (বাঙালী নিন্দুকের দল তার নাম দিয়েছিল ঠগ এসোসিয়েশন)[১৩] ফ্লোটিং ব্রিজ প্রজেক্ট, বেঙ্গল বণ্ডেড্ ওয়রহাউস এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানী, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী, স্টিম ফেরী ব্রিজ কোম্পানী, এবং ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী।[১৪]

দ্বারকানাথের ছিল শ্যেন দৃষ্টি—একেবারে অব্যর্থসন্ধানী। দূর থেকে শিকার যদি একবার তাঁর নজরে পড়ত, কালবিলম্ব না করে তিনি সোজা লক্ষ্যস্থলে ছোঁ মারতেন। তাঁব কল্পনার দৌড় ছিল বলে দূরদৃষ্টিও ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন সামুদ্রিক জাহাজ যদি হুগলী নদীর মুখ পর্যন্ত স্টিমারের সাহায্যে টেনে আনা যায়, তাহলে বন্দরে পণ্য নামে তাড়াতাড়ি এবং সকল পক্ষই লাভবান হতে পারে। সমুদ্র থেকে নদী-মুখ আসতে পালতোলা জাহাজের সময় লাগত পক্ষকাল। ওই এক-শো মাইলের মধ্যে কোথাও চর, কোথাও পলি, কোথাও জলের গভীরতা কম বলে ওইটুকু জলপথ ছিল বিপজ্জনক। অথচ স্টিমার জাহাজ টেনে আনত দু-দিনের মধ্যে। ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানী তাদের **'ফর্বস্'** নামক একটি স্টিমার-যোগে এই জাহাজ টানার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩০-৩৩ এর বাণিজ্যসঙ্কটের সময় ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর পতন হওয়ায় দ্বারকানাথ নিলামে **'ফর্বস্'** কিনে নেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য সওদাগরদের আহ্বান জানালেন এই জাহাজ টানার ব্যবসায়ে যোগ দিতে। এইভাবে পত্তন হয় ক্যালকাটা স্টিম টাগ্ এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের অধিকারে কতিপয় জাহাজ-টানা স্টিমার ছিল—তাদের মধ্যে একটিব নাম ছিল 'দ্বারকানাথ'। ব্লেয়ব ক্লিং বলেছেন : 'ভাবতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠনের কাজে এই এসোসিয়েশন-এর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসোসিয়েশন ছিল অংশীদারদের যৌথ কারবার, অথচ তার সমস্ত কাজ পরিচালনা করত একটি মাত্র এজেন্সি হাউস : কাব-টেগোর কোম্পানী। এই বন্দোবস্তের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সির মূল লক্ষণগুলি বর্তমান ছিল।'[১৫]

তেমনি তৎপর হয়ে দ্বারকানাথ কিনেছিলেন রাণীগঞ্জের কয়লার খনি, যা নাকি বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ও সুপ্রচুর জ্বালানীর উৎস। ১৮৩২ অব্দেব ডিসেম্বর মাসে আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানীর পতন হয়, তাঁরাই ছিলেন কয়লাখনির মালিক। এই বিরাট সম্পত্তি কিছুটা দরদস্তুর করার পর দ্বারকানাথ কিনেছিলেন মাত্র সত্তর হাজার টাকায়। কার-টেগোর কোম্পানীর পক্ষে এই কয়লার খনি হয়েছিল সৌভাগ্যের খনি, নিজেদের কাজকারবার বৃদ্ধি করতে ও অন্যদের কাজকারবার পরিচালনা করতে খুবই সহায়ক হয়েছিল এই জ্বালানী। স্টিমারযোগে দেশের অভ্যন্তরীণ পাটোযাবির কাজে এবং রেল চলাচলের কাজে প্রচুর কয়লাব ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। জলপথ স্থলপথে দ্রুত চলাচলের ব্যাপারে দ্বারকানাথ ও তাঁর কার-টেগোব কোম্পানীর আগ্রহও কিছু কম ছিল না। রাণীগঞ্জে এই জ্বালানীর বিরাট উৎস থাকায় এবং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়লার ডিপো স্থাপনের ফলে, দ্বাবকানাথ ও কোম্পানীব অর্থবিত্ত বৃদ্ধি তো পেলই,

উপরন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্বত্র। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে খনিজ কয়লার নূতন স্তর ও গাদা থেকে উৎপাদন বেড়ে গেল প্রচুর। ১৮৪৩ অব্দে প্রথম বিদেশভ্রমণ সেরে দ্বারকানাথ ফিরে এসেই বেঙ্গল কোল কোম্পানী স্থাপন করলেন। এই একটি সংস্থা দ্বারকানাথ ও কার-টেগোর কোম্পানীর অবর্তমানেও বহু বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৩ অব্দে এন্‌ড্রু ইয়ুল এণ্ড কোম্পানী পরিচিত বর্গের মধ্যে বিতরণের জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, সেই পুস্তিকায় তাঁরা লিখেছেন ঃ '১৯০৮ অব্দে এন্‌ড্রু ইয়ুল এণ্ড কোম্পানী বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৩ অব্দে রাণীগঞ্জের নব-আবিষ্কৃত খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য। অনেকের কাছে মনোজ্ঞ লাগবে শুনতে যে, এই কোম্পানী যাঁরা সংগঠন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন খ্যাতনামা কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। খনিজ কয়লা নিয়ে ভারতে যে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে এই কোম্পানী ছিল তার পুরোধা, তার সে-মর্যাদা এখনো অব্যাহত।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে দ্বারকানাথ ক্রমাগত স্বপ্ন দেখতেন কী করে জলপথে কলকাতা ও অন্যান্য ভারতীয় বন্দরের সঙ্গে ব্রিটিশ বন্দরগুলির যোগাযোগ ত্বরান্বিত করা যায়, কী করে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ভারতের সঙ্গে বিলাতের পণ্যদ্রব্য ও চিঠিপত্রাদির আদানপ্রদান সম্ভবপর করা যায়। সেকালে উভয় দেশের মধ্যে জলপথে যোগাযোগের পথ ছিল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাষ্প-চালিত জাহাজ যদি কলকাতা, মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাই বন্দর থেকে রওনা হয়ে লোহিত সাগরের সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত যেতে পারে এবং তাব পরে স্থলপথে সুয়েজ যোজক অতিক্রম করে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছনো যায়, তাহলে পুনরায় জলপথে গিয়ে কোনো ব্রিটিশ বন্দরে নোঙর ফেলা অসম্ভব হবে না। ১৮৬৯ অব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে ভারত থেকে ব্রিটেন অবধি যাবার একটি একটানা জলপথ খোলার আগে পর্যন্ত, দ্বারকানাথের পরিকল্পিত পথটাকেই সকলে প্রশস্ত জ্ঞানে গ্রহণ করেছিল। ১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথ প্রথম যে-বার বিলেত ভ্রমণে যান, তিনি এই পথেই গিয়েছিলেন নিজস্ব স্টিমার '**ইণ্ডিয়া**'-যোগে।

১৮৩৩ অব্দে দ্বারকানাথ কতিপয় ইংরেজ বন্ধুর (পার্কার, টার্টন, প্রিন্সেপ ও গ্রীনল) সহযোগে বেঙ্গল স্টিম ফাণ্ড নাম দিয়ে একটি তহবিল স্থাপন করেছিলেন। এই তহবিলের উদ্দেশ্য ছিল বিলাতে পার্লামেণ্ট ও বণিক মহলে দ্বারকানাথের পরিকল্পনার সমর্থনে প্রচার-কার্য চালানো—যাতে ব্রিটিশ সরকার সে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ৫ জানুয়ারি তারিখের **ইংলিশম্যান** কাগজ কলকাতা টাউন হল-এ তৎপূর্ব দিনে অনুষ্ঠিত একটি নাগরিক সভার রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়, কলকাতার বিশপ-এর একটি প্রস্তাব দ্বারকানাথের সমর্থনে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে

গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্থির হয়, লণ্ডনের পার্লামেন্ট এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের কাছে একটি আবেদন পাঠিয়ে অনুরোধ জানানো হোক যেন কলকাতা ও বিলেতের মধ্যে স্টিমার-যোগাযোগ ত্বরান্বিত করা হয়। পরে একটি ব্যাপক পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়, যাতে দুই কিস্তিতে—ভারতীয় কোনো বন্দর থেকে সুয়েজ অবধি এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কোনো ব্রিটিশ বন্দর অবধি—একটা স্টিমার-লাইন স্থাপন করা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, দ্বারকানাথ ও তাঁর বন্ধুবর্গের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পথে বাধার সৃষ্টি হয় কলকাতার বণিক সমাজ (তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন ইংরেজ) এবং লণ্ডনের বণিক সমাজের মধ্যে রেষারেষির ফলে। এই রেষারেষির মূলে ছিল যতটা-না জাতিগত দ্বন্দ্ব তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আন্তর্দেশিক দ্বন্দ্ব। এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শেষ পর্যন্ত পেনিন্সুলর স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী (এঁরা ইংলণ্ড ও স্পেন-এর মধ্যে জাহাজী কারবার চালাতেন) নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। স্থির হয়, এই কোম্পানীই ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সরকারী ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করবেন পেনিন্সুলর এণ্ড ওরিয়েণ্টল লাইন নামে। দ্বারকানাথের বহুকালের আশা ধূলিসাৎ হয় পি. এণ্ড ও. লাইন চালু হবার ফলে।

উদ্যোগী পুরুষরূপে দ্বারকানাথ তাঁর কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে আরো একটি যে বিরাট স্বপ্ন দেখেছিলেন তা হল, ভারতে রেল-চলাচলের ব্যবস্থা করা। দুঃখের বিষয় তাঁর এই স্বপ্ন সফল হবার আগেই অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে ১৮৪৬ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের একটি সংখ্যায় **ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া** কাগজ একটি সম্পাদকীয় টীকায় বলেছিলেন যে, কলকাতা ও রাজমহলের মধ্যে প্রস্তাবিত গ্রেট ওয়েস্টর্ন রেলওয়ে কোম্পানীর পরিকল্পনা-রচনায় কার-টেগোর কোম্পানী গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুনীলকুমার সেন লিখেছেন, 'সেই দশকে (১৮৩০-১৮৪০) শিল্পপণ্যোৎপাদনের একটি ব্যাপক স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন অসাধারণ বাঙালী—তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর কোনো কোনো কাজকারবারের অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন সরকারকে, উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'দেশীয়দের যা-কিছু আছে—তাদের জ্ঞান মান বিষয়সম্পত্তি—সবকিছুই নির্ভর করছে সরকারের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর'।'[২৩]

দ্বারকানাথের জন্ম হয়েছিল বাষ্পীয় যুগে—ভারতে সেই যুগ প্রবর্তন করায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর কিছু হন বা না হন, তিনি-যে কল্পনাবিহারী ভাবুক ছিলেন ও নূতন পথের পথিকৃৎ ছিলেন—এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁর বহুবিস্তৃত কল্পনাশক্তি, বেপরোয়া দুঃসাহস, নিজের ও দেশের সৌভাগ্য বর্ধনে তাঁর তৃপ্তিবিহীন তৃষ্ণা তাঁকে বিঘ্ন-বিপৎ-সংকুল বিচিত্র অভিযানে ব্রতী করেছিল, তাঁর কোনো কোনো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছিল, কোনোটা বা বিফল হয়েছিল। কিন্তু

দূরদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ-ভারতের একটি যে-ছবি দেখেছিলেন তিনি—শিল্পায়িত, আধুনিকীকৃত, সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমের সঙ্গে প্রতিযোগে সমর্থ একটি যে-ভারত—সে-ছবি তো আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। এটা যে ভালোর জন্য হয়েছে কিংবা মঙ্গলের জন্য হয়েছে—এমন প্রসঙ্গ আজ তুলতে যাওয়া অবান্তর : ইতিহাসের ঘটনা অনিবার্যভাবেই ঘটে থাকে। দ্বারকানাথের নাতিদীর্ঘ জীবনের সাফল্য-অসাফল্যের ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে, কেন জানিনা, গীতাঞ্জলি-র একটি গানের কলি ক্রমাগত মনের মধ্যে গুণ গুণ করে :

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা!

## টীকা

১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনী' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন : 'এই কুঠির কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটি সর্বপ্রধান ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বে এবং তাঁহার আদেশে দগ্ধীভূত হওয়াতে এই কারবার যে কত বিস্তৃত ছিল এবং কিরূপে পরিচালিত হইত, তাহার বিবরণ উদ্ধার করিবার কোন আশা নাই।'

২. দ্রঃ রবীন্দ্রসদন শান্তিনিকেতন 'ডকেট নং ১০—দ্বারকানাথের চিঠিপত্র'। অপিচ ব্লেয়র ক্লিং—পৃ. ৪১।

৩ *Calcutta : Myth and History*, by S. N. Mukherjee. pp. 20-21.

৪. ব্লেয়র ক্লিং—পৃ. ৪২। অপিচ The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900. Cambridge University Press, South Asian Studies

৫. ব্লেয়র ক্লিং : *Partner in Empire* অপিচ 'জীবনী', পৃ. ১৩৫-১৬১, এবং 'সমকালীন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ও প্রবন্ধে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের সম্বন্ধ, ব্যাঙ্ক-এর উন্নতি, অবনতি ও শোচনীয় পতনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

৬. ব্লেয়র ক্লিং—পৃ ৪৩-৪৪।

৭ ইতিপূর্বে জনৈক পার্সি রুস্তমজী কাওয়াসজী কলকাতায় রুস্তমজী, টার্নার এণ্ড কোম্পানী বলে একটি কারবার শুরু করেছিলেন।

৮. দ্রঃ *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833*. Orient Longman, 1956

৯ ১৮৩৪ অব্দের ২০ আগস্ট তারিখের এই চিঠি নটিংহাম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির পোর্টল্যাণ্ড সংগ্রহে বেণ্টিঙ্ক সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও দলিলের অন্তর্ভুক্ত। ক্লিং ও অমলেশ ত্রিপাঠী উভয়েই এই চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১০. *Social Ideas and Social Changes in Bengal, 1818-1835* by A. F. Salahuddin, Leiden, 1965.

১১ ১৮৩৫ অব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের *Friend of India* কাগজে উদ্ধৃত।

১২. তদেব।

১৩ 'জীবনী',—পৃ. ১০১।

১৪ ব্লেয়র ক্লিং—পৃ. ৪৪।

১৫ এই উক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। দ্বারকানাথের পূর্বে রামদুলাল দে প্রভৃতি বেনিয়ানেরা বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্রঃ দিলীপ বসু-রচিত প্রবন্ধ *"The Banian and the British in Calcutta : 1800-1850", Bengal—Past & Present,* December 1973.

১৬ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে এই উইল দেখা যায়।

১৭. ব্লেয়র ক্লিং—পৃ ৭৮-৮৩। এখানে ক্লিং অংশীদারদের নামধাম বিবরণ ও তাঁদের কার্যকাল সম্বন্ধে সকল তথ্য দিয়েছেন।

১৮ 'জীবনী'—পৃ ১০৩।

১৯. ব্লেয়র ক্লিং—পৃ ৮৩-৮৯।

২০ ব্লেয়র ক্লিং—পৃ ৮৯-৯০।

২১ দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'চীনে মরণের ব্যবসায়', ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৯৩-১০০। দ্বারকানাথের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ বছর বয়সে লেখা এই প্রবন্ধে ইংরেজ সরকারের নিন্দা করে বলেছিলেন যে ইংরেজ অহিফেনের হীন ব্যবসায়কে কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে চীনদেশে কায়েমি করে। তিনি কি ঘূণাক্ষরে জানতেন যে তাঁর পিতামহ এই 'হীন ব্যবসায়ের' সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং কলকাতার অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো এই কারবার থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করতেন?

২২ দ্রঃ ব্লেয়র ক্লিং—পৃ ৯১।
১৮৩৯ অব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' একটি খবরে বলেছিলেন : 'ওয়টরউইচ' জাহাজ কলকাতা থেকে বিলেতের ডাক বহন করে হুগলীর মোহনা থেকে এডেন বন্দর গিয়ে পৌঁছেছে মাত্র 'ছত্রিশ' দিনে—একটা দূর পাল্লার জলপথ এত অল্পদিনে অতিক্রম করা খুবই শ্লাঘার বিষয়। অপর পক্ষে বোম্বাই থেকে ডাকবাহী জাহাজের এডেন বন্দর পৌঁছতে লেগেছে একচল্লিশ দিন।'

২৩. ১৮৩৬ অব্দের ১১ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিলেন : 'আমাদিগের বাসনা হয় বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যেন কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করেন। শুনিয়াছি 'ট' স্থলে 'ঠ' আদেশ করতঃ কু-লোকে 'টগ্' এসোসিয়েশনকে 'ঠগ' এসোসিয়েশন অভিহিত করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, কোম্পানীর দ্বারা ক্রীত 'ফর্বস'-নামধেয় বাষ্পীয় পোতখানি কিঞ্চিৎ সত্তর দিবস মাত্র জাহাজ টানার কাজে নিযুক্ত আছে। যাবৎকাল ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর হাতে ছিল এই স্টিমার, নিজস্ব খরচখরচাও সংকুলান করিতে পারিত না, নূতন মালিকানায় উত্তম মুনাফা হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই।'

২৪ এই সব বিচিত্র উদ্যোগের বিশদ বিবরণ এবং তাদের উন্নতি-অবনতির কার্য—কারণ বিশ্লেষণে যদি কোনো পাঠকের আগ্রহ থাকে, তিনি ব্লেয়র ক্লিং-রচিত 'পার্টনার ইন এম্পায়ার' গ্রন্থখানি পাঠ করতে পারেন। দ্বারকানাথের অর্থকরী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন বিষয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এই গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য। বর্তমান লেখক মুক্তকণ্ঠে ক্লিং-এর গবেষণাপ্রসূত গ্রন্থের প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেন। অপিচ দ্রঃ ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সমকালীন' পত্রে দ্বারকানাথের জাহাজী কারবার বিষয়ে অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় লেখা প্রবন্ধ।

২৫. ব্লেয়র ক্লিং : পৃ. ১২৫।

২৬. অতুলচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় বাংলা দেশের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ১৯৫৮ অব্দে *Studies in Bengal Renaissance* শীর্ষক যে-সংকলন প্রকাশ করেন, উক্ত গ্রন্থের Economic Enterprise নামে পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

□

সপ্তম পরিচ্ছেদ

# জনসমাজে দ্বারকানাথ

মানুষরূপে কেমন ছিলেন দ্বারকানাথ? জনসমাজের আর পাঁচজনের অন্যতম মানুষরূপে কেমন ছিলেন তিনি? চেহারা তাঁর কেমন ছিল? ঠাকুর পরিবারের আর পাঁচজন পুরুষের মতো তিনিও ছিলেন সুপুরুষ। যৌতুকের পরিবর্তে পরিবারে সুরূপা-কন্যাদের বধূরূপে ঘরে আনার রেওয়াজ ছিল ঠাকুরবাবুদের। ব্যতিক্রম হয়েছিল একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বেলা। তরুণ বয়সে রূপে গুণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁর বধূরূপে যিনি জোড়াসাঁকো-বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর না ছিল রূপের মহিমা, না পৈতৃক ঐশ্বর্যের গরিমা। সুখের বিষয়, দ্বারকানাথের চেহারা ঠিক কেমন ছিল তার একটা আন্দাজ আমরা পেতে পারি সেকালে বিলাতের প্রখ্যাত আর্টিস্ট এফ. আর. স্যে অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি থেকে। কলকাতার নাগরিকেরা তাঁদের টাউন হল-এ টাঙাবার ইচ্ছায় আর্টিস্টকে এই প্রতিকৃতি আঁকবার জন্য নিযুক্ত করেন। ১৮৪৩ অব্দে লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমী প্রদর্শশালায় প্রদর্শিত হবার পর, এফ. আর. স্যে-অঙ্কিত সেই পোর্ট্রেটটি কলকাতার টাউন হল-এ টাঙানো হয়েছিল। বর্তমানে ছবিটি আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ।[১] ছবিতে দেখা যায়, মাথায় মধ্যমাকৃতি জনৈক সুদর্শন সুপুরুষ, গোঁপজোড়া বেশ জাঁকালো (কিন্তু পুত্র বা পৌত্রের মতো দাড়ি নেই), মুসলমানী ধরণের দরবারী পোশাকে সুসজ্জিত, মখমলের জোব্বার উপর জরিজড়োয়ার কাজ, রেশমের ঢিলে পাজামা, পায়ে জরির কাজ-করা শুঁড়-তোলা নাগরা জুতো, বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে বিন্যস্ত বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল, মাথায় শামলা এবং তার নিচে দেখা যাচ্ছে ঘন কৃষ্ণ থোকা থোকা বাবরী চুল, ঘাড় অবধি লম্বা। ডানহাতের সুগঠিত আঙুলগুলি আলগোছে রাখা আছে টেবিলের উপর একটি খোলা বইয়ের পাতায়। আর আছে টেবিলের উপর একটি জমকালো কাজ-করা আলবোলা।

সমসাময়িকদের মন্তব্য থেকে জানা যায়, দ্বারকানাথের কালো চোখের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, হাত-পায়ের ব্যবহার ছিল চটপটে, শাণিত ছিল তাঁর বুদ্ধিবিচার এবং হাত ও আঙুল ছিল মেয়েদের মতো সুঠাম ও কোমল। ১৮৪২ অব্দে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর একজন লেখক তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আকারে ও উচ্চতায় তিনি মধ্যমাকৃতি। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, তাঁর মতো পেলব হাত পুরুষদের

মধ্যে বিরল। যখন তিনি চুপ করে বসে থাকেন তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত চিন্তাশীল ভাব দেখা যায়। আবার যখন তিনি উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন তাঁর চোখ-মুখের অভিব্যক্তি হয় দেখবার মতো। বিলাতে থাকতে একাধিকবার তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ আমাদের ঘটেছে। আমরা দেখেছি, দশ-বারো জন লোক তাঁকে ঘিরে বসে আছে, প্রত্যেকে নানা প্রশ্ন তুলছে, নানা বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছে, আর তিনি অবলীলায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের গভীরে প্রবেশ করে প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছেন স্বচ্ছন্দে, অদ্ভুত স্বল্প কথায় অথচ যথাযথ জোর দিয়ে। আমরা আরো দেখেছি, একই সময়ে একসঙ্গে তিনি কত বিভিন্ন রকমের চিঠির বয়ান বলে দিচ্ছেন—কোনোটা বা ব্যবসাবাণিজ্য-কাজকারবার সম্পর্কে, কোনোটা নিছক সৌজন্য প্রকাশের খাতিরে। দেখেছি, একই সময়ে এক সঙ্গে তিনি দিনকৃত্য স্থির করছেন, জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন, নবাগতদের অভ্যর্থনা করছেন, পরিচিতদের আপ্যায়ন করছেন, পরিহাসরসিকতা করছেন পাঁচজনের সঙ্গে, চুক্তি সম্পাদন করছেন, দরদস্তুর করছেন—আর এই সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলবোলায় সুখ-টান দিয়ে চলেছেন। যাঁরা তাঁকে অধিককাল ধরে চেনেন বা জানেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, গুজবে বা পরনিন্দা-পরচর্চায় তিনি কান দেন না, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো সৎ লোক যদি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, তেমন লোককে তিনি সর্বদাই এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করেছেন। ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে স্বয়ং তিনি সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় অটল।’[২]

সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায়, সকলেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর বন্ধুবাৎসল্য, তাঁর বদান্যতা এবং সকলকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সদাপ্রস্তুত মনোভাবকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। তাঁর প্রথম জীবনচরিত-রচয়িতা কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন ঃ ‘তিনি কেবল-যে লক্ষ লোকের মধ্যে বিশিষ্ট একজন ছিলেন এমন নয়, তিনি ছিলেন এক বিচিত্রমনা মানুষ, বিবিধ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে তিনি একই সময়ে একা হাতে লড়াই করেছেন, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন, জীবনের বিভিন্ন পর্বে নিজের বিশিষ্টতা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করেছেন।[৩]’ দ্বারকানাথের অনন্যসাধারণ ঔদার্য ও সকলকে বিশ্বাস করার সহজ প্রবণতা বিষয়ে কিশোরীচাঁদ অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের কোনো এক জেলার জজসায়েবের বিষয়ে তিনি একটি কাহিনী বলেছেন। জজসায়েব অসুস্থ হয়ে অল্প কিছুকালের জন্য ছুটি নিয়ে বিলাত পাড়ি দেবার পথে কলকাতায় এসে অবস্থান করছেন। কলকাতায় তাঁর পাওনাদারেরা শাসায়, জজসায়েব যদি তাঁর কর্জের এক লক্ষ টাকা না দিতে পারেন, তাহলে তাঁর বিলেত যাওয়া বন্ধ করে তাঁকে পাঠাবে দেনদারদের কয়েদখানায়। ‘স্বাস্থ্যের সংকটজনক অবস্থায় বায়ু-পরিবর্তনে নিরাময় হবার আশা ত্যাগ করে জেলখানায় পচা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তাঁর এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে কী করে উদ্ধার

পাওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে তিনি বহু উপায়ের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বারকানাথের কথা তাঁর মনে হল; ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তিনি শুনেছিলেন যে বিপন্ন ব্যক্তিদের দ্বারকানাথ সাহায্য করে থাকেন। স্থির করলেন, উদার-হৃদয় দ্বারকানাথের কাছেই তিনি প্রার্থী হবেন। তদনুসারে, নিজের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দ্বারকানাথের সাহায্য ভিক্ষা করে তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন। অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে সাহায্য এসে গেল জজসায়েবের হাতের মুঠোর মধ্যে। চিঠি পেয়েই দ্বারকানাথ খোঁজ নিলেন জজসায়েবের উক্তির সত্যাসত্য নিয়ে—এবং সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ামাত্র পত্রলেখকের পাওনাদারদের প্রাপ্য লক্ষ টাকা পরিশোধ করে তাদের কাছে জজসায়েবের স্বাক্ষরিত মুচলেকা ও অন্যান্য দলিলপত্র ফেরত চেয়ে নিলেন। এই সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এবার তিনি চলে গেলেন ভূতপূর্ব জজসায়েবের সাক্ষাতে। দ্বারকানাথ নিজের পরিচয় দিতেই, তাঁর সহানুভূতি উদ্রেক করার আশায়, সায়েব তাঁর করুণ কাহিনী সবিস্তার বলতে উদ্যত হলেন। তাঁকে বেশি কথা বলতে না দিয়ে দ্বারকানাথ জজসায়েবের হাতে সেইসব কাগজপত্র গুঁজে দিয়ে বললেন তিনি এখন স্বচ্ছন্দে য়ুরোপ যেতে পারেন। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত জজসায়েব ধন্যবাদ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। দ্বারকানাথকে তিনি একটি মুচলেকা-খত দিতে চাইলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ নিতে চাইলেন না। বললেন, 'সায়েব যদি বিলেতে গিয়ে মারা যান তবে এ-মুচলেকা কোনো কাজে লাগবে না, বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে হবে। আর যদি সায়েব বেঁচেবর্তে বিলেতে ছুটি কাটিয়ে ভারতে ফিরে আসেন, তাহলে তো টাকাটা নিশ্চয় তিনি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।'[২]

অক্টারলোনি নামে একজন তরুণ সামরিক অফিসারকে নিয়ে অনুরূপ একটি কাহিনী পারিবারিক মহলে প্রচলিত ছিল। তখন তিনি সদ্য বিলেত থেকে এসে কোম্পানী বাহাদুরের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। প্রখ্যাতনামা স্যর ডেভিড অক্টারলোনি, যিনি হায়দার আলীর সময় থেকে কোম্পানী বাহাদুরের যোদ্ধরূপে প্রত্যেকটি বড় বড় যুদ্ধে নেমেছিলেন এবং যাঁর নামে কলকাতা গড়ের মাঠে অক্টারলোনি মনুমেণ্ট (বর্তমানে যার নাম শহীদ মিনার) স্থাপিত হয়েছিল, তরুণ অফিসারটি তাঁর কোনো আত্মীয় ছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তিনি যে সদ্বংশের ছেলে সবাই তা জানত। কিছুকাল পরে অন্য অফিসার-বন্ধুরা বিশেষ বিচলিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, নবাগত কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত এবং কোন একটা নিগূঢ় মনোবেদনা ঢাকবার জন্য প্রচুর মদ্যপান করতে লেগেছেন। তরুণটি বন্ধুদের কাছে একদিন খোলসা করে তাঁর দুঃখের কথা বললেন ঃ বেচারা বিলাতে তাঁর বাগ্‌দত্তাকে রেখে এসেছেন। ভীষণ ভালোবাসেন তাকে। কোম্পানী বাহাদুরের সামরিক বিভাগে কাজ করতে গিয়ে তাঁর আশা ছিল অল্পকালের মধ্যে তাঁর হয়তো প্রচুর টাকা জমবে, তখন তিনি বাগ্‌দত্তাকে বিলেত থেকে আনিয়ে তাঁকে বিবাহ করে সুখে ঘরসংসার করতে পারবেন। কিন্তু ভারতে

এসে সরেজমিনে সবকিছু দেখে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর সেই আশা দুরাশা মাত্র, তাই তিনি তাঁর হতাশা ঢাকবার জন্য মদে ডুবে থাকেন। বন্ধুরা কিছুটা পরিহাস-রসিকতায়, কিছুটা বা সহবেদনাভরে, যা তাঁকে বললেন তার সারমর্ম এই যে, কলকাতা শহরে ঈপ্সিত সৌভাগ্য লাভ করতে হলে তাঁকে দুটো রাস্তার যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে। প্রথমটা হল কালিঘাটে গিয়ে বিবসনা কালীমাঈকে পূজো দেওয়া (খোদ কোম্পানী বাহাদুরও কালিঘাটে নিয়মিত পূজো দিয়ে থাকেন), আর দ্বিতীয় বিকল্প হল য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এ গিয়ে চোগাচাপকানে সুসজ্জিত নরদেবতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের শরণ নেওয়া। তরুণ অফিসার বুঝলেন, বন্ধুরা হয়তো তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছেন। কিন্তু প্রেমে তখন তিনি এমন হাবুডুবু খাচ্ছেন যে খড়কুটোটা নাগালে পেলে আঁকড়ে ধরেন। একদিন তিনি সত্যি সত্যি গিয়ে হাজির হলেন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর বাড়িতে। ডিরেক্টরের দফতরে গিয়ে দেখলেন কে-একজন বেঞ্চিতে বসে (দ্বারকানাথ গদি-আঁটা কুর্সির চেয়ে শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বসতেই ভালোবাসতেন) দৈনিক **হরকরা** পড়ছেন। জিজ্ঞাসু হয়ে অফিসার-এর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করতে পারেন তার জন্য। অফিসারটি নিজের পরিচয় দেবার পর, একজন দেশীয় ব্যক্তির কাছে তাঁর হৃদয়ের গোপন কথাটি বলা ঠিক হবে কি হবে না ভেবে একটু ইতস্তত করার পর, কোনো প্রকারে তড়বড় করে সমস্ত কাহিনীটাই বলে ফেললেন। মানবচরিত্র খুব ভালো বুঝতেন বলে দ্বারকানাথের বুঝতে বেগ পেতে হল না যে ছোকরা যা বলছে তা সত্যি কথা। তাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে দ্বারকানাথ **হরকরা**-র পাশ থেকে একটুকরো শাদা কাগজ ছিঁড়ে তার উপর ইংরেজীতে লিখে দিলেন, 'Pay Rs. 10,000/-.DT.' এবং অফিসারকে বললেন, নিচের তলায় গিয়ে কাগজের টুকরোটা ব্যাঙ্ক-এর ক্যাশিয়র-এর হাতে দিতে। পরক্ষণে তিনি আবার খবরকাগজের পাতায় মনোনিবেশ করলেন। তরুণ অফিসার-এর কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল, তিনি ভাবলেন তাঁকে নিয়ে বেঞ্চিতে-বসা লোকটা রগড় করছে। তাকে গরম গরম দু-কথা শুনিয়ে দেবেন ভাবছেন এমন সময় দেশীয় লোকটা কাগজ থেকে মুখ তুলে ভাবতে লাগল, নিচের তলায় ক্যাশিয়র-এর কাছে না গিয়ে অফিসার ছোকরা তখনো কেন দাঁড়িয়ে আছে, বোধ করি কোথায় যেতে হবে জানে না। একজন বেয়ারাকে ডেকে দ্বারকানাথ বলে দিলেন অফিসারকে নিচে ক্যাশিয়র-এর দফতরে নিয়ে যেতে। একটু ইতস্তত করে অক্টারলোনি বেয়ারার পিছু পিছু গিয়ে চিরকুটটা দিল ক্যাশিয়র-এর হাতে। চিরকুটের দিকে এক পলক তাকিয়ে ক্যাশিয়র জিজ্ঞাসা করলেন, 'নোট না টাকা?' হতভম্ব অফিসার অস্ফুট জবাবে বললেন, 'কারেন্সি নোট হলেই সুবিধা।' হাতে একতাড়া নোট পেয়ে অফিসার যেন নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না—এইরকম অবস্থা। ব্যাঙ্ক-এর বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল সেই অবিশ্বাস্য দাতা ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদও তিনি জানিয়ে আসেননি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলেন ভদ্রলোক

তখনো খবরকাগজে মশগুল। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অফিসার সবিনয়ে বললেন, কর্জের টাকাটার জন্য তিনি একটা প্রমিসরি নোট লিখে দিতে ইচ্ছুক। দ্বারকানাথ কাগজ থেকে চোখ তুলে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখো হে বাপু, তুমি যদি ভদ্রলোক হও (তুমি যে ভদ্রলোক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই,) তোমার কাছ থেকে হাতচিঠা নেবার দরকার নেই, কারণ তুমি তোমার ঋণ নিশ্চয়ই শোধ করবে। আর তুমি যদি হীনমন্য হও, তোমার হাতচিঠার কী-ই বা মূল্য!' বলা বাহুল্য, অফিসার ভদ্রলোক কিছুকালের মধ্যে সব টাকাটাই পরিশোধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এ এবং বন্ধুদের বলতেন তাঁর সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে ছিলেন সদয় ও সহৃদয় দ্বারকানাথ।[৫]

উপরের দুটি কাহিনীরই নায়ক যদিচ ইংরেজ, দেখা যায়, দ্বারকানাথের দয়াদাক্ষিণ্য জাতি বর্ণ বা ধর্ম-বৈষম্যের বেড়া ডিঙিয়ে সকল মানুষের প্রতি সমভাবে ধাবিত হত। কিশোরীচাঁদ মিত্র একাধিক আরও উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঃ 'এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কত য়ুরোপীয় ও দেশীয় মানুষকে, সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীকে তিনি সাহায্য করেছেন ধারকর্জ দিয়ে কিংবা অন্য উপায়ে, কত লোককে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন—তার হিসাব দেওয়া শক্ত। তাঁর তদ্‌বির ও সুপারিশক্রমে অসংখ্য লোক সরকারী দফতরে, ব্যাঙ্কে কিংবা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়েছিল। অসংখ্য মানুষকে তিনি হাতে ধরে জীবিকার্জনের পথে নিয়ে গেছেন—তাদের কেউ আজ ব্যবসা করছে, কেউ করছে কেনাবেচার কাজ, কেউবা আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দালাল। এদের মধ্যে অনেকেই এখনো পর্যন্ত (*Memoir* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০ অব্দে) জীবিত এবং রক্ষক, পালক ও পিতারূপে এখনো দ্বারকানাথের স্মৃতির প্রতি নিত্য তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।[৬]

লণ্ডনের **টাইম্‌স্** কাগজ তাঁদের ১৮৪৬ অব্দের ৩ আগস্ট তারিখে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পুরো এক কলমব্যাপী যে-শোকবার্তা প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন দ্বারকানাথের এই পরোপচিকীর্ষার কথা। বলেছিলেন ঃ 'পদমর্যাদা-নির্বিশেষে ভারতে এমন আর একজন ব্যক্তিকে দেখা যায় না যিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুলোকের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধির সূচনা করে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, ভারতে ও ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পরমুখাপেক্ষা না রেখে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনে সাফল্য লাভ করেছেন কেবল দ্বারকানাথের সাহায্য ও অনুপ্রেরণার ফলে।'

যাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও কীর্তিকলাপ সমসাময়িকদের এত প্রশংসা অর্জন করেছিল, যিনি আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে একাধিক ও অভিনব ব্যবসাবাণিজ্য পত্তন করে কলকাতার বাণিজ্যজগতে য়ুরোপের একচেটিয়া প্রভাবকে কষে নাড়া দিতে পেরেছিলেন, যাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মসংস্কারক ঋষিরূপে সর্বত্র পূজিত হয়েছিলেন, যাঁর

পৌত্র তাঁর **গীতাঞ্জলি** গ্রন্থে ভক্তিমূলক কবিতার চরম উৎকর্ষের স্বীকৃতিতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সাহিত্য-সম্মান লাভ করেছিলেন—স্বতঃই মনে হতে পারে, এমন লোক নিশ্চয় গুরুগম্ভীর হবেন, সমাজ-জীবনের অতি তুচ্ছ ও অসার বিষয় নিয়ে নিশ্চয় ইনি মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু দ্বারকানাথের বহুমুখিনতা এমনই বিচিত্রগামী ছিল যে এক এক সময় তাঁর হাবভাব আচরণে এক ধরণের অদ্ভুত লঘু চপলতা লক্ষ্যগোচর হত। তাঁর সেই লঘু স্বভাবের নমুনা-স্বরূপ তাঁর পত্রের নিম্নলিখিত অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। চিঠিটা কলকাতা থেকে ১৮৩৫ অব্দের ২০ নভেম্বর তারিখে গাজিপুরের জনৈক লেফটেনাণ্ট ক্যামেরনকে লেখা। চিঠির প্রথম অর্ধে কয়েকটি কাজের কথা বলার পর দ্বারকানাথ লিখছেন ঃ

'এ-বছর শীতের মরশুম শুরু হয়েছে বেশ একটু আগে-ভাগে—প্রায় অক্টোবরের শুরুতেই, খুব এক পশলা বৃষ্টি শেষ হতেই। এখন আবহাওয়া চমৎকার। বাগান বাড়িতে[১] এখন মেরামতী চলছে বলে এত ভালো আবহাওয়া সত্ত্বেও দিনের বেলা পার্টি দেওয়া আমায় স্থগিত রাখতে হয়েছে, শীতের রোদ্দুরে অপ্সরীদের সঙ্গে পদচারণার আনন্দটাও আপাতত বন্ধ। তবে শহরে আমার বৈঠকখানা বাড়ির তেতলায় সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে যতখানি আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করা যায় তা আমি করেছি। সচরাচর আমায় সঙ্গ দান করে থাকেন নিকলসন ভগ্নীরা। বড়ো দুজন পিৎসোন্নির কাছে গান গাইবার তালিম নিচ্ছেন এবং ক্রমেই তাঁদের গানের গলার জোর বাড়ছে। আমি তোমার চিঠি থেকে সেই—যেখানে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছো—সেইটুকু পড়ে শোনানোতে তাঁরা খুবই খুশি হলেন। তোমায় তাঁদের কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছেন। বেচারা হাণ্টার এখনো পায়ে হেঁটে রাস্তাঘাট চলাফেরা করেন, কিন্তু তাঁর লেডিটি প্রতি সন্ধ্যায় স্ট্রাণ্ড-এ গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে বের হন। এমন করে বসে থাকেন যাতে তাঁর মুখখানা ঠিক আমাদের নজরে পড়ে। সত্যি, তাঁর সৌন্দর্য চিরকাল অক্ষয় থাকার মতো। যাঁদের স্বামীরা কেবল দূর থেকে তাঁদের স্ত্রীদের দেখেন, সেই সব রমণী ভাগ্যবতী—তাঁদের সুবিধা অনেক। এই মন্তব্যটা, তোমার চিঠিতে নব-পরিণীতদের বিষয়ে যে ইঙ্গিত করেছো, তাদের সম্বন্ধেও খাটে। তুমি যদি তোমার ৯৫-বছর বয়স্কা বেগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়-সম্পত্তিটুকুও পেয়ে যাও, দেখবে তোমার শরীরের তন্দুরস্তি তো ঠিকই থাকবে, উপরন্তু গাল দুটোও লাল থাকবে স্বামী-পরিব্রতা নবোঢ়া বধূদের মতো। তোমার বর্ধমানের বান্ধবী এখন আছেন তাঁর পিতৃগৃহে, সম্ভবত তাঁর কাছে সিভিল আইনকানুন সব শিখে নিচ্ছেন কারণ ডিনার টেবিলে তাঁর আলাপ-আলোচনার দৌড় আইনকানুনের বড় বেশি বাইরে যায় না। হায়! হায়! একবার তাঁকে বরফের দেশে নিয়ে যেতে পারলে তুমি কী খুশিটাই না হতে! এককালে তো সে লাফাতে ঝাঁপাতে খুব ভালোবাসত। গাজীপুর থেকে ঘোড়ায় চেপে মীরাট অবধি যেতে তাঁর ভালো লাগত ভীষণ। সম্প্রতি সমাগতাদের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে কয়েকজন

নূতন নূতন রূপসীর আমদানি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন জনৈক ক্যাপটেন-এর বিধবা পত্নী মিসেস শ এবং তাঁর যমজ মেয়ে। এই দুটি তরুণী সকল রকম কলাবিদ্যায় পারঙ্গমা—ছবি আঁকায়, গান গাওয়ায়, নাচে, অভিনয়ে—এক কথায়, কলার সর্বক্ষেত্রে। আর তাঁদের আদবকায়দার কথা কী বলব! মানুষ হয়েছে গুরুগাম্ভীর ইংলণ্ডে নয়, প্রাণোচ্ছল ফরাসী দেশে—এবং য়ুরোপ-এর সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাঁদের দুটিকে দেখতে অবিকল একই রকম, একটিকে অন্যেব থেকে তফাত করা মুশকিল; কাল যাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া গেল আজ দেখা গেল তিনি হলেন অন্যটি! ইংলণ্ডে যাঁদের সঙ্গে তোমার কাজ-কারবার, তাঁরা সুপারিশ করেছেন যেন তাঁদের দেখাশোনা করি। সুতরাং তাঁদের এজেন্ট হিসাবে এঁদের যথোচিত যত্ন করা এখন আমার কর্তব্যবিশেষ। এঁরা উত্তরাঞ্চলে যাবার কথা চিন্তা করছেন, সুতরাং মীরাট অবধি সফর করা যদি তোমার ভাগ্যে থাকে, নিশ্চয় এঁদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে। যাক, আর বাজে বকে লাভ নেই। আবাব অবসর-মতো তোমায় এ-রকম আজে-বাজে চিঠি লেখা যাবে...’[৮]

চিঠিতে যে-পিৎসোন্নির উল্লেখ আছে তিনি ছিলেন ইটালিয়ান গাইয়ে, এসেছিলেন এদেশে এক ভ্রামামান ইটালিয়ান অপেরা কোম্পানীর সঙ্গে। তখন কলকাতায় তাঁদের অপেবা হচ্ছিল। দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও পাশ্চাত্য কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নিতেন এবং ইটালীর অপেরা সঙ্গীত ভালোই গাইতেন। প্রাচ্যবিদ ম্যাক্সমূলার প্যারিসে তাঁর গলায় অপেরাব গান শুনে সুখ্যাতি করেছিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে কেবল পিৎসোন্নি নয় উপরন্তু তাঁর বাগ্‌দত্তা শার্লৎ-এর কাছেও তিনি গান শিখতেন এবং প্রেমিকযুগলকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। শার্লৎ-এব প্রতি তাঁর যে বেশ বন্ধু-ভাব ছিল সেটা বুঝতে পাবি তাঁকে লেখা শার্লৎ-এর একটি চিঠি পড়ে। চিঠির তারিখ ১৮৩৭ অব্দের ২৫ অক্টোবর ঃ

‘প্রিয়তম দ্বারকানাথ,

গতকাল সন্ধ্যায় তুমি বলেছিলে আজ যদি কাউকে তোমার কাছে পাঠাই তুমি তার হাতে দিয়ে, তোমার কাছ থেকে টাকা ধাব নেবাব দরুণ সিনব পিৎসোন্নি ও আমি যে-রসিদ লিখে দিয়েছিলাম, তা ফেরৎ পাঠাবে। নিজের মাথাব ওপর সেধে আনি যে-বিপদ ডেকে এনেছিলাম এবং যা আমার মনের উপব ভাব হয়ে চেপে বসেছিল—সেই সঙ্কট থেকে আমায় উদ্ধার করে আমার প্রতি তুমি যে-অনুগ্রহ দেখালে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশের মতো ভাষা আমার নেই। আমি আশা করি বিয়ের পব আমি যখন নিজেব বাড়িতে বসবাস শুরু করব, তোমায় তখন তোমার যত ইচ্ছা গান শিক্ষায় তালিম দিতে পাবব। আশা কবি আমায় যে তোমার বজরাটা দেবে বলেছিলে, সেকথা ভুলে যাও নি। মনে হচ্ছে ১৬ নভেম্ববে আমাব বিয়ে এক প্রকার ঠিক। আশা করি অনুষ্ঠান দেখবার জন্য গির্জায় তোমাব দেখা পাব। আমার মনে হচ্ছে, বিয়েব আগে একদিন আমরা দুজনে ডিনারে মিলিত হতে পারব। ইতি। তোমার চিরকালের মতো একান্ত আন্তরিক. .আর কিছু বলার সাহস হয় না আমার—শার্লৎ ই. হার্ভে।’[৯]

দ্বারকানাথ কলকাতার থিয়েটর-এর একজন ভক্ত ছিলেন, পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। মনে করতে ভালো লাগে কলকাতায় প্রথম মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন ১৭৯৫ অব্দে লেবেডেভ্-নামে একজন ভাগ্যান্বেষী প্রাচ্যবিদ। রিচার্ড জোরডেল-লিখিত প্রায় অখ্যাত **দি ডিস্‌গাইজ** (ছদ্মবেশ) নামে একটি কৌতুক নাটকের ভিত্তিতে লেবেডেভ্ তাঁর মঞ্চাভিনয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করেছিলেন। সংলাপের ভাষা মূলত বাংলা হলেও কলকাতার নানা ভাষাভাষীদের মুখ চেয়ে, কিছু কিছু ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী সংলাপও ঢুকিয়েছিলেন লেবেডেভ্। কলকাতার থিয়েটর তার পর থেকে এমন একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে যে এই সর্বজনীন শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আজকের দিনে অনস্বীকার্য। শহরের অন্যান্য সংস্কৃতির প্রকাশের মাধ্যমের মতো থিয়েটর-শিল্পেরও প্রাথমিক উদ্দীপনার উৎস ছিল য়ুরোপীয়—এবং মূলতঃ ইংলণ্ডীয় দৃষ্টান্ত। নাট্যাভিনয়ের পীঠস্থান ছিল পুরাতন চৌরঙ্গী থিয়েটর যার আর এক নাম ছিল প্রাইভেট সাব্‌স্ক্রিপ্‌শন্ থিয়েটর। রাস্তার নাম এই সেদিন পর্যন্ত ছিল থিয়েটর রোড, সম্প্রতি নাম বদল করে নাম হয়েছে সেক্সপীয়র সরণি। ১৮৩৩ অব্দে একটি ইটালিয়ান কোম্পানী এবং তারপর এক ফ্রেঞ্চ্ কোম্পানী এই থিয়েটরের ইজারা নেয়। অনেকদিন ধরে জমতে-দেওয়া ধার দেনা মেটাতে না পেরে চৌরঙ্গী থিয়েটর-এর মালিকরা নিলামে থিয়েটর বেচে দেন ১৮৩৫ অব্দের ১৫ আগস্টে। দ্বারকানাথ কাপড়-চোপড় সিন-সিনারি ও থিয়েটর-এর অন্তর্ভুক্ত আর সব সামগ্রী সহ থিয়েটর-বাড়িটি নীলামে ডেকে নেন।'

জে. এইচ. স্টকলার ১৮৪৪ অব্দে প্রকাশিত তাঁর Handbook of India গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'ফাটকাবাজি করবেন বলে প্রিন্স নিজে থিয়েটর কিনেছিলেন এমন নয়। পুরাতন মালিকদের নামেই থিয়েটর-এর যাতে উন্নতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ দাম দিয়ে শেয়ার কিনে তিনি তাঁদেব অংশীদার হয়েছিলেন। দ্বিগুণ দামে শেয়ার কিনে জনৈক দেশীয় ব্যক্তি কিছু ত্যাগ স্বীকার যদি না কবতেন তবে কলকাতায় য়ুরোপীয় থিয়েটর-এর অকালমৃত্যু ছিল অবধারিত।'

টাকা-পয়সার ব্যাপারে ভূতপূর্ব য়ুরোপীয় মালিকদের দায়দায়িত্ব যে নিতান্ত নামমাত্র ছিল, চট্টগ্রামস্থিত ইংরেজ বন্ধু ডব্লু ডেমপিয়র্সকে লিখিত দ্বারকানাথের একটি চিঠি থেকে তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

'আপনি কলকাতায় যদি থাকতেন ও অনুগ্রহ করে আমাদের থিয়েটর-এ পায়ের ধুলো দিতেন, বেশ হত। থিয়েটর এখন প্রায় সম্পূর্ণত আমার একার সম্পত্তি। সুতরাং আগেকার মতো একজন শেযারহোল্ডার পিছু দুশো টিকিট মাগ্‌না দেবার ব্যাপারটা এখন একেবারে বন্ধ। পার্কার, পামার ও আরো কয়েকজন চোদ্দ দিন অন্তর অন্তর থিয়েটর-এ হাজির থাকতে বদ্ধপরিকর। মার্চ মাসে প্রয়োজনীয় মেরামতীর কাজে হাত দেওয়া হবে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যতটা আরামদায়ক করা

সম্ভব, আমরা সেইভাবে থিয়েটর ঢেলে সাজাতে লেগেছি। অতঃপর যখন কলকাতা আসবেন সবকিছু দেখে শুনে আপনি নিশ্চয় খুব খুশি হবেন।'[১১]

কলকাতার বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই থিয়েটর-এর আনুকূল্য করতেন, মঞ্চাভিনয়ের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসন (এঁর পত্নী ছিলেন স্বনামধন্যা ইংরেজ অভিনেত্রী মিসেস সিডন্স্-এর নাতনী), বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-এর হেনরী মেরেডিথ পার্কার (নিজে অভিনয় করতেন ভালো এবং দ্বারকানাথের বন্ধুস্থানীয়) এবং জে. এইচ. স্টকলার যিনি সেক্সপীয়র-এর স্যার জন ফলস্টাফ, মলিয়ের-এর তার্তুফ্ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভূমিকায় নামতেন।'[১২] কিন্তু চৌরঙ্গী থিয়েটর-এর কৃতিত্বের মূলে ছিলেন এক সাধারণ ইংরেজ সৈনিকের মেয়ে এস্থার লীচ। ইনি লেখাপড়া সবকিছু শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। সেক্সপীয়র-নাটকের নায়িকারূপে এস্থার এত চমৎকার অভিনয় করতেন যে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'ভারতের মিসেস সিডন্স্'। স্টকলার বলেছেন, 'রূপে ও গুণে বিলাতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার, যেমন সুন্দরী দেখতে, তেমনি তাঁর শাণিত বুদ্ধি, স্বভাবে নম্র ও আচরণে অমায়িক, ওঁর কণ্ঠস্বর যেন সুরে বাঁধা, আর ছিল তাঁর মার্জিত রুচি। নায়িকার ভূমিকায় যা-কিছু প্রয়োজন, সব তিনি স্বচ্ছন্দে মেটাতে পারতেন।'[১৩]

দ্বারকানাথের মানসিক গঠন ছিল যেমন সু-সমঞ্জস তেমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক— সেদিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর সমধর্মী ও সমসাময়িকদের মধ্যে অসাধারণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, অর্থবিত্তের এমন একটি সৌভাগ্য তিনি কামনা করেছিলেন যা উপকথাতেই সম্ভব। লোকব্যবহারে তিনি যেমন কিছুতেই তাঁর কথার খেলাপ করতেন না—তেমনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বেলা প্রতিশ্রুতি-পালনে তিনি নিয়ত যত্নবান ছিলেন। আর ছিল তাঁর রামমোহন রায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি। ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রত্যেকটি আন্দোলনে তিনি তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছিলেন। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় তিনি যখনি যা করতে চেয়েছেন, সে-কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। প্রাণ ধারণের আনন্দ ও জীবনকে পুরোপুরি সম্ভোগের ক্ষেত্রেও তিনি যা চাইতেন পূর্ণ প্রাণে চাইতেন—সেখানে তাঁর সামাজিক বা নৈতিক সংকোচ থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি নিঃসংকোচে মিশতেন। পরিবারের কিংবা স্বজাতির লোকেরা চোখ রাঙিয়েছে, তাঁকে একঘরে করবে বলে শাসিয়েছে, কিন্তু তাতে তিনি কখনো পরোয়া করেন নি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে তিনি অবাধে মিশেছেন, তারা নিষিদ্ধ মাংস খায় বা মদ্য পান করে বলে ম্লেচ্ছ সংসর্গ থেকে তিনি কখনো নিজেকে বিরত করেন নি।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনের বাংলা সাপ্তাহিক **সমাচার দর্পণ** তাঁদের ১৮২৩ অব্দের

২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের নূতন গৃহসঞ্চারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'সন্ধ্যার পর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণ অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো-বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বনাদি করিল।' নৃত্য-বাদ্য, ভাঁড় ও সঙ নিয়ে যিনি সায়েব-বিবিদের মনোরঞ্জনের বিচিত্র ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই একই মানুষকে দেখি, ওই একই বছরের গোড়ার দিকে, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অতি বড়ো চাঁইদের নিয়ে 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থ' গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করতে। ছয় বছর আগে ১৮১৭ অব্দে যখন হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয় তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বয়স সবেমাত্র ২৩ বছর। সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষার এই আদিতম কেন্দ্র কালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৯ অব্দের মার্চ মাসে **সমাচার দর্পণ**-এর একটি সংখ্যা থেকে জানা যায়, স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যার পুরোধা প্রতিষ্ঠান এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে দ্বারকানাথ সে-বছর নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই বছরের শেষ দিকে কলকাতা টাউন হল-এর এক সভায় উপস্থিত ছিলেন দ্বারকানাথ। **সমাচার দর্পণ**-এর রিপোর্টে বলা হয়, 'শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্য কার্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষি ব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলিন সওদাগর ইংরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংলণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থির নিমিত্ত গত ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবারে টাউন হলে এক সভা করিয়াছিলেন...এতদ্দেশীয়ের দিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর...।'[১৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে ১৮২২ অব্দ থেকে ১৮৩৪ অব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বৎসর কাল দ্বারকানাথ কোম্পানী বাহাদুরের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা কালেও তিনি নানারকম অর্থকরী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিষয়-আশয় কিনেছিলেন, বড় বড় জমিদারের আইন-উপদেষ্টার কাজ করেছিলেন, জাহাজ ভাড়া করে বিদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য করেছিলেন, য়ুরোপীয় কুঠি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে অংশীদার-সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। এইসব বিচিত্র উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে তিনি ছিলেন বিচিত্রমনা ও নানাবিষয়িণী প্রতিভার অধিকারী এবং তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য ছিল অনন্যসাধারণ।

ব্যক্তিগতভাবে যদিও তিনি বিধিনিষেধের বড়ো একটা ধার ধারতেন না, সামাজিক

জীব হিসাবে ও পরিবারের কর্তারূপে তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ছিল প্রখর এবং তেমন তেমন ক্ষেত্রে তাঁর দত্তক মাতা অলকাসুন্দরীর প্রতি ভক্তিবশত তিনি স্বেচ্ছায় অনেক বিধিনিষেধ স্বীকার করে নিতেন। অলকাসুন্দরী ছিলেন নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণব, এবং পুত্র কুলধর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করুক বা যদৃচ্ছ আচারবিচার লঙঘন করুক, এমনটি তিনি চাননি। কিন্তু প্রবীণ বয়সে সংসার-বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ফলে দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরীর তুলনায় তিনি অনেক বেশি বুঝদার ও পরমতসহিষ্ণু হতে পারতেন। তিনি বুঝেছিলেন, ব্যবসাবাণিজ্যের খাতিরে দ্বারকানাথকে য়ুরোপীয়দেব সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে হত ও বন্ধুস্থানীয়দের খানাপিনায় আপ্যায়ন করতে হত। তিনি শুধু চেয়েছিলেন দ্বারকানাথ যেন এক টেবিলে বসে সায়েব-মেমদেব সঙ্গে অখাদ্য (গোমাংস) না খান, যেন কেবল দু-এক পাত্র পান করে গৃহকর্তার কর্তব্য পালন করেন। অলকাসুন্দরী যতদিন জীবিত ছিলেন, মায়ের ইচ্ছাকে আদেশ জ্ঞান করে দ্বারকানাথ তাঁর য়ুরোপীয় অতিথিদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কখনো খানা খাননি। অতিথিদেব বিদায় করে গঙ্গাজলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কাচা কাপড় পরে তিনি একাই তাঁর নৈশ-ভোজন সারতেন। ১৮৩৮ অব্দেব মার্চ মাসে তাঁর মায়ের মৃত্যু অবধি নাকি দ্বারকানাথ স্বেচ্ছাক্রমে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এই বিধিনিষেধের বেড়া অতিক্রম করেননি।[১৫] দ্বারকানাথ যখন ভারতেব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সফররত, তখন আগ্রায় খবর এসে পৌঁছয় যে অলকাসুন্দরী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত এবং তাঁর বাঁচবার আর কোনো আশা নেই। খবর পেযেই তিনি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু সেকালে যানবাহন বলতে ছিল কেবল ঘোড়াব গাড়ি বা বজরা নৌকো—দুটোর কোনোটাই দ্রুতগামী বলা যেত না। দ্বারকানাথের বজরা যখন কলকাতার ঘাটে গিয়ে লাগল তার আগেই তাঁর মাযেব মৃত্যু ঘটেছে।[১৬]

সারা রাস্তা এসেছেন দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বহন করে, বাড়িতে পা দিয়েই পেলেন মৃত্যুশোকের আঘাত। শেষ সময়ে মায়ের শয্যাপার্শ্বে থাকতে পারেন নি বলে শোকে মূহ্যমান হলেন; শোকের মধ্যেও রাগে বিরক্তিতে জ্বলে উঠলেন যখন শুনলেন মৃত্যুর তিন দিন আগে অলকাসুন্দরী যখন যন্ত্রণায় খুবই কাতর, তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। পৌত্র দেবেন্দ্রনাথকে অলকাসুন্দরী প্রাণের অধিক ভালোবাসতেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স একুশ। দিদিমার মৃত্যু-বিষয়ে তিনি তাঁর **আত্মচরিত**-এ লিখেছেন, 'বৈদ্য আসিয়া কহিল, 'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।' অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহাব মত নাই। তিনি বলিলেন যে, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।'[১৭] কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে

গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন...' অলকাসুন্দরী দ্বারকানাথের মানসিক গঠন ঠিকই বুঝেছিলেন। পরের বছরের শুরুতে দিগম্বরী যখন মৃত্যুশয্যায়, কারো দুঃসাহস হয়নি গঙ্গাযাত্রার কথা বলতে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বারকানাথ কলকাতার শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ও ডাক্তার ডাকিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়েছিলেন।

মায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সূত্রে দ্বারকানাথ অনেক কিছু করেছিলেন। ১৮৩৮ অব্দের **এসিয়াটিক জার্নাল** লিখেছিলেন : '২৩ মার্চ তারিখে বাবু দ্বাবকানাথ ঠাকুব কাঙালী-বিদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন—সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে আট আনা পেয়েছিলেন আর বাকি সকলে জাতি-বর্ণ-বয়ঃক্রম নির্বিশেষে মাথা পিছু চার আনা করে পেয়েছিল। কাঙালী-বিদায় হয়েছিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরের দিন।' অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁর নামে দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে অন্ধ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকা এককালীন দান রূপে দিয়েছিলেন। সে-কালে অর্থাৎ দেড়শত বছর আগে লক্ষ টাকাব মূল্য কিছু কম ছিল না। পূজা আর্চা বাহ্যিক আড়ম্বরে টাকা নষ্ট না করে দ্বারকানাথ যে অন্ধ আতুরদের সেবায় এতগুলি টাকা দিয়েছিলেন—তাঁর অভূতপূর্ব বদান্যতা সেদিন সকলের মনে সশ্রদ্ধ প্রশংসার সঞ্চার করেছিল। সমসাময়িক কতিপয় পত্র-পত্রিকা এ-বিষয়ে লিখেছিলেনও। দানের টাকা স্বতন্ত্র জমা রাখাব সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় তহবিলের নাম হবে 'দ্বারকানাথ ফণ্ড'। অলকাসুন্দরীর জীবৎকালে দ্বাবকানাথ এক লাখ টাকার উপর শতকরা আট টাকা হারে সোসাইটিকে সুদ দেবেন বলে স্থির হয়। মৃত্যুর পর ফণ্ড-এর সমস্ত টাকা সোসাইটির হাতে আসবে এবং তখন সোসাইটি-ই স্থির করবেন কী ভাবে সে টাকা বিনিয়োগ করা যাবে।[১]

এ-বিষয়ে ১৮৩৮ অব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে **ইংলিশম্যান** তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন, 'আমরা ভেবেছিলাম দ্বারকানাথ ঠাকুর এমন কিছু করতে পারেন না যার দরুণ তাঁর চরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং তাঁর বহু-বিস্তৃত বদান্যতার প্রতি আমাদের আস্থা আরো কিছু পরিমাণে বর্ধিত হতে পারে। তিনি কলকাতা নগরের নাগরিক হবার দায়িত্ব এমনি আত্মসম্মানের সঙ্গে পালন করে এসেছেন যে তার কোনো তুলনা হয় না। কেউ যদি আমাদের প্রশ্ন করত, শহরের তাবৎ সৎ লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হতে তিনি কি কোনো কৃত্য অসম্পূর্ণ রেখেছেন, আমরা একবাক্যে বলতাম কোনো কাজই অসম্পূর্ণ রাখেননি তিনি। কিন্তু স্বয়ং দ্বারকানাথ হয়তো তা বলতেন না। তিনি নিশ্চয় ভেবে থাকবেন যা-কিছু ভালো কাজ তিনি করেছেন, সবই নশ্বর—সকলই ক্ষণস্থায়ী, এমন কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি যা তাঁর আজীবন

সাধনার পরহিতব্রতে একটি শাশ্বত কীর্তিরূপে বিরাজ করতে পারে। পাঠক কি বিশ্বাস করবেন (দ্বারকানাথকে যাঁরা চেনেন তাঁদের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হবে না) যে গতকাল তিনি ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি-র হাতে এক লক্ষ টাকার একটি বিরাট দান সমর্পন করে দিয়েছেন। যাতে ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন লোকের উপকার হয় তদর্থে সোসাইটিকে এই টাকা উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। গতকাল আমরা তাঁর নিত্যধারা বদান্যতার প্রশংসা করতে গিয়ে সানন্দে যে-সব কথা বলেছি সেইসব কথার সঙ্গে আর একটি কথা যুক্ত করে দিতে চাই ঃ 'যশোগাথা-উৎকীর্ণ শবাধার কিংবা স্মৃতিরক্ষক আবক্ষ মূর্তি ধূলায় মিশে ধূলিতে পরিণত' হয়ে যাবার পরেও, দ্বারকানাথের নাম শত শত দুর্গত ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজ করবে।'

পারিবারিক স্মৃতিকথায় দ্বারকানাথের মাতৃভক্তির আরো একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী প্রচলিত আছে। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ঊষাকীর্তন করে অলকাসুন্দরীর ঘুম ভাঙাত। তাঁর অবর্তমানে ব্রাহ্মণ যেন অভাব অনটনে না পড়ে, তিনি একবার এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে দ্বারকানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, বাকী জীবনটা স্বাচ্ছন্দে কাটাতে হলে তাঁর কত টাকা প্রয়োজন। জবাবে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমার মতো গরীব ব্রাহ্মণের কত টাকাই বা দরকার। বাবুমশায় একটা দিনে যা রোজগার করেন তাইতে আমার বাকি জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।' দ্বারকানাথ বললেন, 'বেশ তো, আজ যা আমি রোজগার করব তার সবটুকু আপনার।' ব্রাহ্মণের বরাত ভালো বলতে হবে, কারণ সেই দিনই দ্বারকানাথ আপিস পাড়ায় একটি বাড়ি বিক্রী করে প্রচুর টাকা লাভ করেন। যেমন কথা তেমনি কাজ করলেন দ্বারকানাথ। লাভের একটা টাকাও নিজের জন্য না রেখে তিনি সেই টাকায় বৈষ্ণবদের আরাধ্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একটি মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্য উপযুক্ত মাসিক দক্ষিণায় সেই ব্রাহ্মণকে সেবায়েত নিযুক্ত করে দিলেন।'[১৯]

কেবল পুত্র-রূপে নয়, স্বামী-রূপেও তিনি ছিলেন স্নেহশীল ও হৃদয়বান মানুষ। দিগম্বরী তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যখন বধূরূপে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয়। তিনি অসাধারণ রূপসী ছিলেন। পরিবারের বর্ষিয়সীরা বলতেন 'সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী'। সহবাসের বয়সে না আসা পর্যন্ত দ্বারকানাথের সঙ্গে ক্বচিৎ তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হত। প্রথম সন্তান শিশু-কন্যাটির অকালমৃত্যুর পর তিনি পর পর পাঁচ জন পুত্র-সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন ঃ দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), নরেন্দ্রনাথ (১৮১৮ কিম্বা ১৮১৯, তিন বছর বয়সে মৃত্যু হয়), গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-১৮৫৮), ভূপেন্দ্রনাথ (১৮২৬-১৮৩৯) এবং নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-১৮৫৮)। কেবল পুত্রসন্তান লাভ হয়েছিল বলে যদিও দিগম্বরীকে লোকে রত্নগর্ভা বলত, তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য থেকে দ্বারকানাথ দাম্পত্য-সুখ সামান্যই পেয়েছিলেন। পূজা-আর্চা, ব্রত-উপবাস, ঘর-সংসার

ও সন্তান-পালনেই দিগম্বরীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত। উপরন্তু তিনি ছিলেন রাশভারী মানুষ। প্রাচীন ধরণের চালচলন পরিহার করে দ্বারকানাথ যখন ম্লেচ্ছ-সংসর্গ শুরু করলেন, দিগম্বরীই হয়েছিলেন স্বামীর সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটত ধর্মানুষ্ঠানে ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছিলেন যে স্বামী যদি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে একত্র পান-ভোজন করেন তবে তাঁর সঙ্গে একত্র সহবাস অকর্তব্য। সুতরাং স্বামীসেবা ব্যতীত দ্বারকানাথের সঙ্গে আর সকল প্রকার সম্পর্ক দিগম্বরী ত্যাগ করেছিলেন। বাধ্য হয়ে যখন তাঁকে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হত, তিনি নাকি সাত ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতেন।

ধর্মের নামে দিগম্বরীর শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি দ্বারকানাথ তবু যেন খানিকটা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দিগম্বরী স্বয়ং স্বামীর 'অনাচার' তত সহজে সহ্য করে নিতে পারেন নি। কথিত আছে যে ম্লেচ্ছ-সংসর্গ থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য দিগম্বরী তিনদিন নিরম্বু উপবাস পালন করেছিলেন। তাতেও যখন কিছু হল না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধানক্রমে তিনি স্বামী-সহবাস পরিত্যাগ করলেন। এটা সম্ভবত ঘটে থাকবে ১৮২৯ অব্দে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের অনতিকাল পরে। কিন্তু স্বামীসেবা তাঁর অব্যাহত রইল, প্রত্যহ প্রত্যূষে নিদ্রিত স্বামীর শয্যাতলে গিয়ে তিনি প্রণাম করে আসতেন। বাইরের লোকেরা তো ভিতরের কথা জানত না, তাদের আত্মীয়েরা অন্দরমহলে এসে মা-ঠাকরুণের দ্বারস্থ হয়ে দ্বারকানাথের কোনো কাজে-কারবারে চাকুরীর উমেদারী করত। তখন বাধ্য হয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁকে এসব বিষয়ে কথা কইতে হত। দ্বারকানাথ ধৈর্য ধরে সব কথা শুনতেন ও তাঁর সকল অনুরোধ রক্ষা করতেন। হয়তো ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ কৌতুকও অনুভব করতেন এই কথা ভেবে যে, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে পর দিগম্বরী হয়তো অন্দরে গিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবেন। এ-বিষয়ে তাঁর দিন-রাতের কিংবা শীত-গ্রীষ্মের বাছবিচার ছিল না। পর পর পাঁচটি সন্তান গর্ভে ধারণের পর নিত্য ব্রত-উপবাসের ফলে তাঁর শরীরে তেমন শক্তি ছিল না। শীতকালে সবস্ত্রে স্নান করার পর তাঁর জ্বরবিকার হয় এবং তাইতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারি মাসে—তখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়সও পূর্ণ হয়নি। মৃত্যুর পূর্বদিন তাঁর চতুর্থ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের তেরো বছর বয়সে অকালমৃত্যু হওয়ায় তাঁর নিজের আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল না। ১৮৩৯ অব্দের ২৪ জানুয়ারি তারিখে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** এই দুটি মর্মন্তুদ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'দ্বারকানাথের পরিবারে দুটি শোকাবহ ঘটনা পর পর ঘটে যাবার ফলে তিনি খুবই কাতর হয়েছেন। তাঁর মধুর স্বভাবের প্রতিশ্রুতিমান তেরো বছরের পুত্রটি গত শনিবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। পরবর্তী দিবসেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় দ্বারকানাথের শোক গভীরতর হয়েছে।'

দাম্পত্য জীবনের শেষ দশ বৎসরে কিছু পরিমাণে পরস্পর-বিরোধিতা প্রকাশ পেলেও দিগম্বরীর মৃত্যু দ্বারকানাথের পক্ষে গভীর শোকাবহ হয়েছিল সন্দেহ নেই। একই সময়ে পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটায় তিনি নিশ্চয় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। শোকাভিভূত অবস্থায় একান্তে বসে থাকতে কত ছবিই না তাঁর মনের পটে ভেসে থাকবে—বিবাহরাত্রে সেই লাল চেলি পরা বালিকা বধূ, প্রথম যৌবনের সেই সব মিলনমধুর দিন। যদিচ তখনো তিনি চল্লিশের কোঠায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ও বিষয়-বৈভবে যদিচ তিনি অনেকের কাছে বহু-আকাঙ্খিত সুপাত্র—তিনি দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেন নি। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন, তখনকার হিন্দু সমাজে এমন কোনো কন্যা ছিল না, যিনি তাঁর যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হতে পারেন। তখন তাঁর জীবনচর্যার ধরণ এবং তাঁর সামাজিক পরিবেশ এমনই ছিল যে নারী-সংসর্গ তাঁর পক্ষে দুর্লভ ছিল না। দেশী-বিদেশী উভয় পর্যায়ের মেয়েদের সঙ্গে তিনি অবাধে মেলামেশা করতে পারতেন। অবশ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ তখন আদৌ ছিল না। দেশীয় মেয়েদের মধ্যে যারা অবাধে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারত তারা পেশাদার শ্রেণীর বাঈজী, নর্তকী, গণিকা বা বেশ্যা। বাঈজীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল মুসলমান—তাদের কেউ কেউ হত রূপসী, গুণবতী ও সমঝদারদের মনোরঞ্জন পটীয়সী। মুর্শিদাবাদ নবাবশাহীর যখন ভগ্নদশা, এদের অনেকে নূতন পৃষ্ঠপোষকদের সন্ধানে কলকাতা এসে চিৎপুর অঞ্চলে ডেরা বাঁধে। দ্বারকানাথ এইসব ডেরায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন কিনা জানা নেই, তবে তিনি বন্ধু-সজ্জনদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে বাঈজী নাচিয়ে মজলিস করতেন নিশ্চয়। সেকালে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই অতিথি সজ্জনদের এইভাবে আপ্যায়ন করতেন। সেকালের সংবাদপত্রে দেখা যায়, রামমোহন রায় নিকী বাঈজীকে আনিয়ে মজলিসে নাচগানের আয়োজন করেছেন। সেকালের অপর একটি রেওয়াজ ছিল এই যে ধনী জমিদারেরা বসত বাড়ি থেকে বহু দূরে শহরের উপকণ্ঠে বাগান বাড়ি তৈরি করে সেখানে তাঁদের বেশ্যা রাখতেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর **সেকাল ও একাল** গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'সেকালে লোকে প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত।'[২০]

জর্মন পরিব্রাজক ক্যাপ্টেন লেওপোল্ড ফন্ ওরলিশ্—যিনি দ্বারকানাথের আমন্ত্রণক্রমে বেলগাছিয়া ভিলা বেড়াতে গিয়েছিলেন—ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে দু'চার কথা বলা হয়েছে। ফন্ ওরলিশ্ ভিলার প্রদর্শনী-কক্ষে একটি প্রতিকৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ 'অতিশয় মনোজ্ঞ ছিল এই প্রতিকৃতি—পরমা সুন্দরী এক ভারতীয় মহিলা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। দ্বারকানাথ একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন, মহিলাটি কেবল সুন্দরী নন—অশেষ গুণবতী। মনে হল, মহিলার প্রতি তাঁর বেশ একটু অনুরাগ আছে।'[২১] এই সুন্দরী গুণবতী যে কে, কে যে তাঁর

প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন এবং এখন সে প্রতিকৃতি কোথায়—এই সব প্রশ্নের জবাব মেলে না। হয়তো তিনি ছিলেন আভিজাত্য-গৌরবে গরবিনী কোনো মুসলমান বাঈজী ও দ্বারকানাথের প্রিয়পাত্রী। প্রতিকৃতির মহিলা যে দ্বারকানাথের নিজস্ব পরিবারের কিংবা অন্য কোনো হিন্দু বা মুসলমান 'সম্ভ্রান্ত' পরিবারের মেয়ে হবেন না—সে তো সহজেই অনুমান করা যায়। সেকালে মহিলারা তাঁদের অন্তঃপুরের বাইরে বড়ো একটা বেরোতেন না, আর্টিস্ট-এর কাছে বসে প্রতিকৃতি আঁকানো তো দূরের কথা। য়ুরোপীয় মহিলাদের মধ্যেও শিল্পীশ্রেণীর যারা, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে—যথা অপেরা গায়িকা শার্লৎ ই. হার্ভে এবং অভিনেত্রী এসথার লীচ্-এর সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্য সম্বন্ধ ছিল।

গোঁড়া হিন্দুদের উগ্র নীতিবোধের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা কিছু যে ছিল তার একটি নমুনা এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। জমিদার কিংবা সম্পন্ন হিন্দু-পরিবারের মহিলারা একপ্রকার ধরেই নিতেন যে তাঁদের 'বাবুদের' এক কিম্বা একাধিক মুসলমান রক্ষিতা থাকবে। কিন্তু যদি শোনা যেত রক্ষিতার হাতের রান্না তাঁরা কেউ ভক্ষণ করেছেন, তাহলে 'বাবুকে' প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। যদি কোনো মুসলমান রক্ষিতা অথবা য়ুরোপীয় প্রণয়িনীর সঙ্গে দ্বারকানাথের কিছু সম্পর্ক ঘটেও থাকে—সে ঘটনা নিশ্চয় পরিবারমহলে হাসি-ঠাট্টা বা গুজব রূপে জোড়াসাঁকো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে থাকবে।

উপার্জন ও সঞ্চয়ের কাজে দ্বারকানাথ অক্লান্তকর্মা ছিলেন, তেমনি অক্লান্ত ছিলেন তিনি জীবন-সম্ভোগে। গোঁড়ামির বিধিনিষেধ তিনি বড় একটা না মেনে নিলেও, তাঁর নিজের মধ্যেই একটা নৈতিক সংযম ছিল। তাছাড়া অপরের অনুভূতি অযৌক্তিক হলেও তিনি তাকে সম্মান দিতেন, কারো মনে আঘাত দিতে চাইতেন না। সুতরাং তাঁর নিজস্ব জীবনচর্যার স্বাধীনতা থাকে অথচ তা থেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবার মনোকষ্ট না পান—সেই উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি একটা সময়ে শহর কলকাতার উত্তরাঞ্চলে দমদম যাবার পথে বেলগাছিয়ায় বিস্তীর্ণ বাগানসমেত বিরাট একটি ভিলা তিনি ক্রয় করেন। কিন্তু সেখানে তিনি যেতে পারতেন কালেভদ্রে। কাজকারবার প্রধানত কলকাতা শহরেই ছিল বলে তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসনের পাশে এক বিরাট ত্রিতল বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করালেন। বেলগাছিয়া ভিলা ও জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানা বাড়ির স্থপতি ছিলেন ইংরেজ। বাড়ির মহিলারা ও পরিবারের জ্ঞাতিগণ ভ্রষ্টাচারের জন্য তাঁকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন জানতে পেরে দ্বারকানাথ নবনির্মিত বৈঠকখানা বাড়িতেই উঠে যান।

পরে দ্বারকানাথের উইল-অনুসারে বৈঠকখানা বাড়ি তাঁর মেজো ছেলে গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে এবং পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি বলে পরিচিত হয়। এ-বাড়ি বহুকাল ছিল গিরীন্দ্রনাথের পৌত্রদের দখলে—তাঁদের মধ্যে দুই ভাই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিলেন

এই পাঁচ নম্বর থেকেই। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান এই ঐতিহ্যময় বাড়িটির পরবর্তী ইতিহাস বড়ই করুণ। বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি, বাঙালীর ইতিহাসচেতনা বলতে যে কিছু নেই, বাঙালী যে কালাপাহাড়ী নির্মমতায় নিজের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে উদ্যত—তার প্রমাণ মেলে পাঁচ নম্বরের পরবর্তী ইতিহাস থেকে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বাড়ির ইতিহাস দিতে গিয়ে বলেছেন (*The House of Tagores,* Rabindra Bharati, ১৯৬৫) 'বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশ দশকের কোঠায় বন্ধকী সম্পত্তিরূপে বৈঠকখানা বাড়ি বেহাত হয়ে যায়। তারই কাছাকাছি একটা সময়ে ব্রিটিশ সরকার ডিফেন্স্ অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে এ-বাড়ি দখল করেন বিদেশী সৈনিকদের আবাসস্থল রূপে। অতঃপর এ-বাড়ি ব্যবহৃত হয় খাদ্যশস্যের গুদাম রূপে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ মেমোরিয়ল কমিটি এই সম্পত্তি সরকারের সহায়তায় সংগ্রহ করে নেন এবং যুদ্ধ-বিভাগ দখল ছেড়ে দিতেই বৈঠকখানা বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দেন। কমিটি নিশ্চয় কোনো সংগত কারণে এই ধ্বংসের কাজ করে থাকবেন। সুতরাং বর্তমানে বৈঠকখানা বাড়ি নিশ্চিহ্ন।' সৌভাগ্যের বিষয়, এই হঠকারিতা সত্ত্বেও পাঁচ নম্বরের স্মৃতি আজো অনেকের মনে উজ্জ্বল।

দ্বারকানাথের ধর্মভাবের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তাঁর ধর্মভাবে দুটি বিপরীতধর্মী শক্তির সমাবেশ দেখা যায়। গোঁড়া বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি মানুষ অথচ অ-পৌত্তলিক রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর নিত্য-সংসর্গ। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর গ্রন্থে দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুরের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন দ্বারকানাথের ধর্মমত প্রসঙ্গে ঃ 'জীবনের প্রারম্ভে আমার ভ্রাতা ছিলেন একজন বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁর ধর্ম-সম্পর্কীয় মতামত চিরদিনই ছিল অত্যন্ত উদার। রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর ধর্মমত পরিবর্তিত হয়েছিল এবং যতদূর আমি দেখেছি প্রাচীন হিন্দুধর্ম-সংগত যথার্থ আস্তিকাবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ও জন্মান্তর বিশ্বাসী।' মিত্র নিজে মন্তব্য করেছেন ঃ 'তিনি প্রার্থনা করতে ভালোবাসতেন এবং প্রার্থনার উপযোগিতায় বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেক দিন প্রাতে স্নানের পর তিনি প্রার্থনায় বসতেন। প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।'[১১]

দ্বারকানাথের ধর্মমতের ব্যাপারে রামমোহনের প্রভাব গভীর হলেও অনেকটা সীমিত ছিল। দ্বারকানাথ প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ করতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মতো স্বহস্তে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্য পূজা করতেন। মধ্যবয়সে রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি একেশ্বরবাদে শ্রদ্ধায়িত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেবদেবী পূজায় বা জপতপে তাঁর ভক্তি কিছুমাত্র কমে নি। গোঁড়া ধর্মসভার একটি মুখপত্র তখন লিখেছিলেন যে, ভালো ইংরেজী শিখলেই কুলাচার ত্যাগ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিংবা রামমোহন রায়ের নিকটসান্নিধ্যে এলেই যে হিন্দুদের পূজা

পার্বণ বাদ দিতে হবে—এমন কিছুতে হতে পারে না। 'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই কি রহিত করাইতে পারিয়াছেন? তাহা কখনই পারিবেন না। ঐ বাবুর বাটীতে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎকর্ম হইয়া থাকে।' তবে যখন থেকে পরিবারস্থ মহিলারা ও জ্ঞাতিবর্গ, সায়েবদের সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে তাঁকে আচারভ্রষ্ট বলে সাব্যস্ত করলেন, 'সেই দিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্যের জন্য অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্যের জন্য বেতনভুক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শুনা যায় এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল।'

বেলগাছিয়া ভিলা ছিল বাগানবাড়ি—যখন এলাহী ধরনের ভোজ বা বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হত তার আয়োজন হত এই ভিলায়। সমসাময়িক কতিপয় সংবাদপত্রে এইসব ভোজ বা বিনোদনের বর্ণাঢ্য বিবরণ দেখা যায়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড-এর কার্যকালে (১৮৩৬-১৮৪২) তাঁর ভগ্নী এমিলি ইডেন দেশের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের যে-সব চিঠিপত্র লিখতেন, তার বেশ কয়েকটি চিঠিতে বেলগাছিয়া ভিলায় বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গ আছে।[২৩]

১৮৩৬ অব্দের ৮ আগস্ট তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি প্রথমবার ভিলা-সন্দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর নামে একজন ধনাঢ্য এ-দেশী ব্যক্তি আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর ভিলা দেখবার জন্য। ইনি রামমোহন রায়ের অনুগামী, ইংরাজী বেশ ভালোই বলেন। খাঁটি ইংরাজী ধরনে তাঁর ভিলাটি নির্মিত; বিলিয়র্ড রুম আছে; প্রদর্শনী-কক্ষে বেশ কিছু চিত্রী ও ভাস্করের কাজের নমুনা দেখা যায়; তাছাড়াও আছে কিছু কোপলে, ফিল্ডিংদের ও প্রাউটদের কাজ এবং ফরাসী সেরামিক। দ্বারকানাথ বলেছিলেন কোন্ দিন আমাদের দেখতে যাবার সুবিধা জানাতে। নিমন্ত্রণ পেয়ে জর্জ (লর্ড অকল্যাণ্ড) তো মহাখুশি, বলে দিলেন 'আমরা সোমবারেই যাবো।' সে-খবর মুখে মুখে রটে গেল সারা কলকাতায়, চারিদিকে প্রচণ্ড উত্তেজনা—কারণ বড়লাট বাহাদুর একজন নেটিভের সঙ্গে এক টেবিলে বসে ডিনার খাবেন। আসলে একজন নেটিভ যে বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবেন—সেই ঘটনাটা আরো বেশি উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ নিতান্ত মুষ্টিমেয় নেটিভদের মধ্যে একজন যাঁরা আমাদের ডিনারের সময় একসঙ্গে খানাপিনা না করলেও আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে থাকেন...। দ্বারকানাথ ইংরাজী বলেন চমৎকার। তিনি অতিথিদের আপ্যায়নের ভার দিয়েছিলেন স্থানীয় ইংরেজদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও রসিক মানুষ মিঃ পার্কারকে। সবুজ ময়দানে ছিল কয়েকটা হাতি, পুষ্করিণীতে ছিল একাধিক বোট, লতাপাতায় আচ্ছাদিত গ্রীষ্মাবাসে বরফ-দেওয়া সরবত ও কুলফী পরিবেশিত হচ্ছিল, এদিক ওদিকে ছড়ানো ছিল প্রচুর ছবির এলবাম ও বই। অপরাপর

দিনের তুলনায় সেদিন গরমটা ছিল একটু যেন কম, সুতরাং সবকিছু মিলে সময়টা আমাদের ভালোই কাটল। বেলগাছিয়া থেকে বড়লাট ভবনে ফিরে এলাম সারাটা রাস্তা প্রচুর শোরগোল তুলে। বাড়ি ফিরে ডিনার সারলাম, কিন্তু আমরা শুনেছি দ্বারকানাথ নাকি আর সব অতিথিকে নানারকম সুখাদ্য খাইয়ে তৃপ্ত করেছিলেন।'

এই প্রথম বারের পর আরো কয়েকবার বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ও তাঁর ভগ্নী এমিলি একাধিক পার্টি ও ডিনারে গিয়েছিলেন বেলগাছিয়া ভিলায়। সমসাময়িক কাগজে তার বিবরণ পড়া যায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সেরা সবরকম আহারের সঙ্গে পরিবেশিত হত নানারকম মদ। পানাহার ব্যতীত এইসব পার্টির অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিচিত্র বিনোদন-ব্যবস্থা—জমকালো আতশবাজি, নাচ, গান, মূকাভিনয় এবং আরো কত কী।

১৮৩৬ অব্দে ৩০ নভেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে এমিলি লিখেছেন, 'এত চমৎকার উৎসব ইতিপূর্বে আমি অল্পই দেখেছি। দেখে মনে পড়ছিল বিলেতে লর্ড হার্টফোর্ড অনুষ্ঠিত উৎসবের কথা। ভারি সুন্দর আতশ বাজির খেলা। একটি কামরায় বসে ছিল ফরাসী অভিনেতা ও গাইয়েরা। অপর একটি কামরায় চলছিল নাচ। বিনোদন ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক ছিল না, একটি শেষ হতেই অন্যটি শুরু হচ্ছিল। দ্বারকানাথের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন জমকালো পোষাক-আশাকে সেজেগুজে। তাঁরা ছাড়া নেটিভদের মধ্যে বড় একটা কেউ ছিলেন না।' ইতিপূর্বে ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে এমিলি বলেছেন, 'ক্যাপ্টেন গিয়েছিলেন দিনটা কাটাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভিলায়। এঁকেই কিছুদিন আগে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। এ-দেশে উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি উপভোগ্য পার্টির আয়োজন করতে পারেন। সে-দিন তিনি অতিথিদের বলেছিলেন নিজেদের সঙ্গে হয় ছবি আঁকার সরঞ্জাম, নয়তো তাঁদের প্রিয় য়ুরোপীয় সংগীতের স্বরলিপি পুস্তক আনতে। দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের সবচেয়ে সেরা ছবি বের করে দিয়েছিলেন, চিত্রকরেরা যাতে কপি করতে পারেন। আর ছিল সব রকম বাদ্যযন্ত্র সংগীত-প্রেমীদের জন্য। একজন করে পেশাদার চিত্রকর ও সংগীত শিল্পী হাজির ছিলেন অতিথিদের নিজ নিজ পছন্দসই কাজ চালু করায় মদত দিতে। অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ কেউ গান গাইলেন, কেউ বাজালেন বাঁশি, কেউবা বেহালা ইত্যাদি। ক্যাপ্টেন স্বয়ং প্রাউট-এর একটি ছবির নিপুণ নকল খাড়া করেছিলেন। বরফ-শীতল সরবত ও কুলফির সঙ্গে সঙ্গে ছিল নানান উপাদেয় জলখাবার। ক্যাপ্টেন যখন ভিলা ছেড়ে চলে এলেন, দেখলেন এক-এক করে মহিলারা আসছেন তাঁদের নিজ নিজ যানে—ভিলায় কর্তা-গিন্নীতে ডিনার সারবেন, গৃহকর্তার আমন্ত্রণক্রমে। এ-দেশে মুক্ত আকাশের তলায় বিচরণ করা এত শক্ত বলে বেলগাছিয়া ভিলায় দিন-যাপনের এই নূতন উপায় নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।'

জর্জ ডবু. জনসন তাঁর **দি স্ট্রেঞ্জার ইন ইণ্ডিয়া**[১৩] গ্রন্থে ১৮৪০ অব্দের একটি পরবর্তী উৎসবের কথা বলেছেন ঃ 'দেশীয় সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা আমাদের সমাজের

নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাবার পর থেকে দেখা গেছে তাঁরা ক্রমেই অধিক পরিমাণে সামাজিক ব্যাপারে আমাদের কেতা-কায়দা গ্রহণ করতে লেগেছেন। আজকাল তাঁরা পার্টি দেন, বল্ নাচের ব্যবস্থা করেন, উত্তম পানীয় সহযোগে আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করেন। এই সব পার্টির সাজসজ্জা জাঁকজমক দেখবার মতো। হিন্দুদের মধ্যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, পার্সীদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী এবং মুসলমানদের মধ্যে টিপু সায়েবের নাতি প্রিন্স গোলাম এই ধরনের পার্টি দেবার ব্যাপারে সবার সেরা। কাশীপুরের নিকটবর্তী তাঁর বাগানবাড়িতে ১৮৪০ অব্দের গোড়ায় লর্ড অকল্যাণ্ড-এর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দ্বারকানাথ যে-পার্টি দিয়েছিলেন তার তুল্য পার্টি আগে কখনো দেখা যায় নি। সবাইকে তিনি যেন টেক্কা দিয়েছিলেন। আর খরচও করেছিলেন দেদার। এইসব তামাশায় কত যে টাকা খরচ হয় তার হিসাব কে রাখে। মার্বেল পাথরে মোড়া দ্বারকানাথের ভিলার ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কেউ যদি গোলাপী ও শাদা ধবধবে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে এক নজর দেখেন, বুঝতে পারবেন স্বর্গীয় শোভা কাকে বলে. এমন সুন্দর দৃশ্য শহরে আর কোথাও দেখা যায় না। বাগানের রাস্তার দু-ধারে কিছু দূর অন্তর-অন্তর আলোক-মালায় সজ্জিত তোরণ, তোরণের নীচে জলাধারে প্রতিবিম্বিত সেই আলোকসজ্জা, পথের শেষ প্রান্তে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবীদের মন্দির—আলোয় ঝলমলে। সেই মন্দির পার হয়ে আরো কিছু দূরে সারি সারি নারিকেল গাছের পিছনে ভিলার চৌহদ্দি চিহ্নিত করার জন্য যেসব পাতায় ঢাকা তরুশ্রেণী রয়েছে—তারই মাথার উপর আলোর অক্ষরে উজ্জ্বল করে লেখা God save the Queen. এই নানা বর্ণের আলোয় আলোকিত বাগানে, আপাদলম্বিত শাদা জোব্বা ও ঢিলে পাজামা-পরিহিত দেশীয় অতিথিরা ধীর পদক্ষেপে পদচারণা করছেন—দেখে মনে হল নূতন কোনো আরবা উপন্যাসের দৃশ্য দেখছি। বাইরের এই শোভার সঙ্গে সংগতি দেখলাম 'বণিক-রাজা'র এই প্রাসাদোপম ভিলার প্রতিটি কক্ষের পরিসজ্জায় ও অলংকরণে। কোথাও একটু বাহুল্য নেই, রুচির বিকার নেই, এমন কোনো আড়ম্বর নেই যাতে আরামের ব্যাঘাত ঘটে, সবই ছিল যেন যথাযথ। 'ছিল'—কথাটা ব্যবহার করলাম এই জন্য যে বিলাত যাত্রার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে দ্বারকানাথ ভিলার সমস্ত ছবি, ভাস্কর্য-মূর্তি ও আসবাবপত্র বিক্রয় করে গেছেন।'

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখা যায়, জনসন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে-সময়টার কথা লিখেছিলেন সে-সময়টা ছিল সন্ধিক্ষণ, অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসার আগে আলো-আঁধারী প্রদোষ। বেলগাছিয়া ভিলায় তিনি যে নেটিভ ঐশ্বর্য-গৌরবের আলোকসজ্জা দেখেছিলেন তা ছিল নিতান্তই মাটির প্রদীপের নিবন্ত শিখা। তার চারিদিকে ছিল ঘনায়মান অন্ধকার। গর্বান্ধ উপনিবেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের বর্ণগত ও জাতিগত দম্ভ তখন ক্রমে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে

শাসন-ব্যবস্থায় অন্যায় ও অবিচার। ১৮৫৭ অব্দের মহাবিপ্লবের পর থেকে ভারতে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে-বৈরীভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, অলক্ষ্যে তারই প্রস্তুতি যেন চলছিল দেশের সর্বত্র। এমনকি এমিলি ইডেন-ও চিঠিতে লিখছেন যে নেটিভরা যে-ভাষায় 'আগড়ম-বাগড়ম' বকে, সে-ভাষা লিখতে তাঁর আদৌ আগ্রহ নেই, এ-দেশ তাঁর 'অসহ্য' বলে মনে হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁর এমনি 'ধৈর্যচ্যুতি' ঘটে (বিশেষত যখন তিনি বড়লাট-প্রাসাদ ছেড়ে গাড়ি চড়ে বাইরে সফর করেন) যে তাঁর মনে হয় তিনি যেন আধুনিক যুগ থেকে তিন হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে অসভ্য বর্বরদের মধ্যে বসবাস করছেন।

১৮৪১ অব্দেব ২১ জুন তারিখের একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ 'প্রতি দিন জর্জ-এর মনে হয় এ-দেশ আমরা সপ্তাহ-কালের বেশি ধরে রাখতে পারব না। সূর্যোদয়ের সময় আমি যখন বারান্দায় এসে বসে থাকি, বেশ কযেক দিন দেখেছি একটি প্রকাণ্ড বুলডগ নেটিভদের তাড়া করছে। নেটিভদের তো জুতো মোজার বালাই নেই—একেবারে নাঙ্গা পা, তাই তারা কুকুর পিছু নিয়েছে দেখলেই ভীষণ ভয় পায়। সেদিন ডাঃ—আমায় বললেন একদিন সকালে তিনিও দেখেছেন বুলডগটা ভিস্তিকে খুব জ্বালাতন করছে। তিনি তখন লাঠি ঘোরাতেই কুকুরটা চলে গেল। খানিক বাদে তিনি দেখলেন কুকুর ছুটছে তার মনিবের পিছু পিছু। মনিব ইংরেজ ছোকরা, রোজ সকালে ঘোড়া চেপে বেড়াতে বোরোয়। ছোকরাটিকে ডাঃ চেনেন না, তৎসত্ত্বেও তিনি ঘোড়া থামাতে বলে জানালেন—বুলডগটা কীভাবে ভিস্তিকে তাড়া করেছিল এবং তিনি যদি লাঠি না ঘোরাতেন তা হলে ভিস্তি বেচারাব কী দশা হতে পারত। ছোকরাটি হাসতে হাসতে বলল, 'ও তাই না কি? আপনিই তাহলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার কুকুরকে? আমি কেবল একটা নয় দুটো বুলডগ নিয়ে রোজ সকালে নেটিভদের শিকার করি, আজ সকালে একটু আগে একটিকে ধরাশায়ী করেছি। কী ছোটাটাই ছুটিয়েছি তাকে।' এই সব দেখে শুনে নেটিভরা আমাদের খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে কী যে মনে করে জানি না। সেদিন তো এক নীলকর সায়েব তার যোলো বছরের বর্ণসঙ্কর-বৌকে মারতে মারতে মেরেই ফেলল। বীভৎস ব্যাপার! কিন্তু মেয়েটা তো ট্যাস-ফিরিঙ্গি, তাই ধারে কাছে অন্য যেসব নীলকর সায়েব ছিলেন সবাই একজোট হয়ে খুনীকে ঝটপট সরিয়ে দিল। কাগজে লেখালেখি না হওয়া পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবও চোখ বুজে রইলেন। সরকার যখন এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য নড়েচড়ে বসলেন, ততদিনে খুনে নীলকর ফ্রান্সে তার নিজের দেশে নিরাপদে ফিরে গেছে।'

দ্বারকানাথ আমোদ-প্রমোদ ভালোবাসতেন, জীবনটাকে সম্ভোগ করতে জানতেন বহু বিচিত্রভাবে, তাই বলে আমোদ-প্রমোদে মেতে তাঁর অন্যান্য কৃত্য-কর্তব্যে কখনো অবহেলা করতেন না। ব্যবসাবাণিজ্য, বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধান নিয়মিত করতেন নিপুণভাবে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকরূপে কিংবা সামাজিক দিক থেকে

তাঁর ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনে, তিনি নিয়ত তৎপর ছিলেন। উপরন্তু ছিল তাঁর জোড়াসাঁকোর নিজস্ব যৌথ পরিবারের দায়দায়িত্ব—ছেলেদের লেখাপড়া ও তাদের মানুষ করে তোলা। দু-বার তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন, প্রতিবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এক-একজন ভাগনে-কে আর শেষবার তো ছোটছেলে নগেন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। নগেন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নানারকম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকে দু-বারের কোনো বারই সঙ্গে নিতে পারেন নি, তার কারণ সে-সময় ঐহিক ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির মোহ পরিহার করে তিনি তখন ধর্ম-সংস্কারে মন দিয়েছেন, তখন তাঁর 'মহর্ষি' পদবাচ্য হবার প্রস্তুতি চলেছে। পারত্রিক জীবনে পুত্রের এই অনুরাগ তাঁর কাছে প্রীতিকর মনে না-হলেও দ্বারকানাথ পুত্রকে কোনো বাধা দেন নি, সকলরকম আতিশয্য কেবল-যে সহ্য করেছেন এমন নয়, টাকা-পয়সা দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

দেবেন্দ্র যখন বালক, দ্বারকানাথ তাঁকে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এংলো-হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। রামমোহন কখনো কখনো নিজেব স্কুলে ক্লাশ নিতেন। এইভাবে বাল্যবয়সেই পিতৃবন্ধু রামমোহনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উপজাত হয়। পরবর্তীকালে তিনি যে ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রে রামমোহনের সত্যকার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন—তার সূচনা হয়েছিল এই ভাবেই। পুত্রকে ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গদান করা দ্বারকানাথের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর না-হলেও, তাঁব শিক্ষাদীক্ষার জন্য এবং তাঁকে মানুষ করে তোলার জন্য দ্বারকানাথ অর্থ ব্যয় করেছেন বিস্তর, চেষ্টারও ত্রুটি করেননি। তিনি নানা কাজে-কারবারে ব্যস্ত থাকতেন ও নানা কাজে তাঁকে সময় দিতে হত। তাছাড়া সেকালে শৈশব অবস্থায় বাড়ির ছেলে-মেয়েরা কর্তামশায়ের সংস্পর্শে আসত কালেভদ্রে, তাদের বেশির ভাগ সময় কাটত অন্তঃপুরে মা-ঠাকুমার কাছে অথবা ঝি-চাকরের হেফাজতে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথ শৈশবে তাঁর পিতামহী অলকাসুন্দরীকে খুবই ভালোবাসতেন, আত্মচরিতে লিখেছিলেন ঃ 'দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন উপবেশন ভোজন—সকলই তাঁহার নিকট হইত।' বেশীর ভাগ সময় অন্দরমহলে কাটাবার ফলে দেবেন্দ্র কালেভদ্রে পিতার সাক্ষাৎ পেতেন। বহির্বাটীতে দ্বারকানাথ যখন থাকতেন, হয় তিনি অতিথি-সজ্জনদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকতেন নয়তো থাকতেন মোসাহেব-উমেদার পরিবৃত হয়ে। বৃদ্ধ বয়সে শৈশব-স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মহর্ষি একবার নাকি বলেছিলেন, ছেলেবেলায় তাঁর অন্যতম অভিলাষ ছিল পিতার বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকে সব জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখা। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে তাঁর সাহসে কুলোত না। একদিন স্কুল-ফেরৎ দেবেন্দ্র বৈঠকখানার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটু উঁকি মেরে দেখবারও ভরসা পাচ্ছেন না—এমন অবস্থায় পিতা

তাঁকে দেখতে পেয়ে সস্নেহে বললেন ঃ 'দরজার কাছে ঘুরঘুর করছ কেন? এসে দেখো না একবার ঘরের ভিতরে।' এই বলে হাতে ধরে তাকে নিয়ে এলেন। কী সুন্দর আসবাবপত্র—সব কিছু কী সুন্দর সাজানো গোছানো! তারপর থেকে প্রায়ই বালক কোনো এক ফাঁকে বৈঠকখানায় ঢুকে, চুপচাপ এক কোণায় বসে তার বাড়ির কাজ করত আর চোখ কান খোলা রেখে সব কিছু দেখত শুনত।'[২৭]

পিতা-পুত্রের মানসিক মেজাজ ও প্রবণতায় ব্যবধান ছিল দুস্তর। বাল্যকালে পুণ্যবতী পিতামহী ও আচারনিষ্ঠ মায়ের কাছে পূজা-ব্রত আচার-অনুষ্ঠানেব আবহাওয়ায় দেবেন্দ্র মানুষ হয়েছিলেন। কর্তামশায়ের অনাচার ও ম্লেচ্ছসংসর্গের যেসব মেয়েলী গল্পগুজব অন্দরমহলে প্রচলিত ছিল, তার কিছু কিছু বালকের কানে যে প্রবেশ না করত তা নয়। এইসব নানা কারণের সমবায়ে এবং পিতা-পুত্রের প্রতিভা বিপরীতমুখী হওয়ায় দেবেন্দ্র পিতাকে খুব অল্পই বুঝতে পেরেছিলেন, পিতার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা তাঁকে সামান্যই প্রভাবিত করে থাকবে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'তিনি তাঁর পিতার উদার ও সংস্কারবর্জিত মতামত দ্বারা যতটা না প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বাল্যবয়সে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়িব অন্দবমহলে প্রবীণাদের কাছে শোনা পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত সম্পর্কিত কথা ও কাহিনী শুনে।'[২৮]

যে-বয়সে বাইরে থেকে শোনা মতামত ও ভাবভাবনা মনের উপর গভীর ছাপ ফেলে, সে-বয়সে দেবেন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতা নিজস্ব কোনো মতামত চাপাতে চাননি। তিনি দরাজ হাতে ছেলেকে মাসোহারা দিতেন এবং ছেলে যে কীভাবে মানুষ হয়ে উঠবে—সেটা তার হাতেই ছেড়ে দিতেন। সূচনায় অন্যান্য ধনী অভিজাত পরিবারের তরুণ বংশধরদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথেব জীবনযাপনেব ধরনে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। একটা সময়ে তিনিও বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন। যে-বয়সে দ্বারকানাথ স্বয়ং নিজেকে সবদিক দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, পৈতৃক বিষয়-আশয় বহুগুণিত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই বয়সে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলস্যবিলাসে কালক্ষেপ করুক এ নিশ্চয় তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি ছেলেকে কিছু বলতে পারেন নি। তিনি আশা করেছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হবে এবং দেবেন্দ্রনাথ সংযতচিত্ত হয়ে পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেবেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁকে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার-টেগোর কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী মানুষ। তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পিতামহী অলকাসুন্দরীর গঙ্গাযাত্রার পর শ্মশান-বৈরাগ্যের অভিঘাতে তাঁর অধ্যাত্ম জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আসে। ভোগ-বিলাসের চরম থেকে তিনি এক মুহূর্তে যেন উৎক্রান্ত হলেন ত্যাগের চরমে, পার্থিব আমোদ-

আহ্লাদ ও ঐহিক ঐশ্বর্যের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি মানবজন্মের গূঢ় অর্থ সন্ধান করতে লাগলেন উপনিষদে ও দর্শন শাস্ত্রে। কালে, অন্তরের একান্ত তাগিদে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-সংস্কারের পথ বেছে নিলেন জীবনের লক্ষ্যরূপে। তাঁরই মতো ধর্মপিপাসু কতিপয় ব্যক্তি তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন—এইভাবেই তত্ত্ববোধিনী-সভার সূত্রপাত হল। পরে রূপান্তরিত হল আদি ব্রাহ্ম-সমাজ রূপে। দেবেন্দ্রনাথ যেন রামমোহনের প্রারব্ধ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তত্ত্ববোধিনী-সভার অনুষঙ্গ রূপে প্রকাশিত হল **তত্ত্ববোধিনী** পত্রিকা, স্থাপিত হল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

পুত্রের এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে পিতা দ্বারকানাথ কিছুটা হতাশ হলেও কোনো বাধা দেননি, বরঞ্চ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ও আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন দুটো দিনের খামখেয়াল চরিতার্থ হয়ে গেলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাজে-কারবারে আবার নূতন উৎসাহে যোগ দেবেন। হয়তো মনের গোপনে তিনি কিঞ্চিৎ খুশীও হয়ে থাকবেন, গর্বও অনুভব করে থাকবেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর দক্ষিণ হস্ত হবার জন্য এগিয়ে আসবেন, তাঁর গুরুভার কিছু লাঘব করবেন—এমন আকাঙক্ষা নিতান্ত স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সে-আশা পূরণ করতে পারেন নি বলে তিনি নিশ্চয় কিছুটা হতাশা অনুভব করে থাকবেন। তাঁর হতাশার যুক্তিসংগত কারণও কিছু নিশ্চয় ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কেবল-যে ঐশ্বর্যবৈভবে বীতরাগ ছিলেন এমন নয়, পিতার বিষয়বুদ্ধি, সূক্ষ্ম যুক্তিবিচার, ক্ষিপ্রগতি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা—তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না। অল্পকালের মধ্যে প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে দ্বারকানাথ ব্যবসাবাণিজ্যের যে-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পত্তন করেছিলেন, পুত্রের হাতে তার সুচারু পরিচালনা আদৌ সম্ভবপর হবে কি না—এ বিষয়ে দ্বারকানাথ তখন থেকেই সন্দিহান হয়েছিলেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে কৃতকার্য হতে হলে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ও শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে একটা সুনাম অর্জন করতে হয়। এই ধরনের মেলামেশার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের অনীহা তো ছিলই, পটুতাও ছিল অল্প। লর্ড অকল্যাণ্ড ও তাঁর ভগ্নী এমিলি-র সম্মানে একবার দ্বারকানাথ বেলগাছিয়া ভিলায় এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে কলকাতার য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রায় প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন অতিথি-সজ্জনদের আপ্যায়ন করার ভার নিতে। কিন্তু কোথায় দেবেন্দ্র? পরে খোঁজ নিয়ে দ্বারকানাথ জানতে পারলেন, ভিলায় পার্টি যখন চলছে দেবেন্দ্রনাথ তখন তত্ত্ববোধিনী-সভার একটি অধিবেশন পরিচালনায় ব্যস্ত। দ্বারকানাথ তখন কিছু বলেননি, পরেও পুত্রকে তিরস্কার করেন নি। কিন্তু শোনা যায়, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের আচরণে তিনি কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সূচনায় রামমোহন রায় বিদ্যাবাগীশকে ব্রহ্মসভার প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ তাঁকে নিয়মিত মাসোহারা দিতেন। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী-সভা স্থাপন করেন ও ব্রাহ্ম-সমাজের

পুনরুজ্জীবন ঘটান, বিদ্যাবাগীশই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। বেলগাছিয়া ভিলার সেই পার্টির কথা স্মরণ করে মহর্ষি তাঁর **আত্মচরিত**-এ লিখেছিলেন যে বিদ্যাবাগীশ সম্পর্কে দ্বারকানাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি তো বরাবর মনে করতাম বিদ্যাবাগীশ মানুষটা ভালো। এখন দেখছি ক্রমাগত ব্রহ্মমন্ত্র শুনিয়ে দেবেন্দ্রের মাথাটা খাচ্ছেন। একে তো ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে ওঁর মাথাটা তেমন খেলে না, এখন ব্যবসাবাণিজ্য একেবারে মাথায় উঠেছে—এখন সারা দিন কেবল ব্রহ্ম, ব্রহ্ম।'

একালের তুলনায় সেকালে ফ্রান্স ও য়ুরোপ-এর অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে মদ আমদানি হত এ-দেশে। বেলগাছিয়া ভিলায় দ্বারকানাথ যখন পার্টি দিতেন মদের স্রোত বইত অবাধে। সেকালের সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন জাহাজ-যোগে আমদানিকৃত মদের বিজ্ঞাপন বের হত একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়। সেইসব বিজ্ঞাপন-দৃষ্টে মনে হয় যে-সব কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে মদ আমদানি কবত কার-টেগোর কোম্পানী ছিল তাদের অন্যতম। ঘন ঘন পার্টি দিতেন বলে প্রতি মাসে দ্বারকানাথ মদ কিনতেন প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু নিজেদের কোম্পানী থেকে পাইকারী দরের উপর বাটা চাপিয়ে মদ তিনি কিনতেন না। য়ুরোপীয় মদের দোকান থেকেও কিনতেন না—যদিচ মদের ব্যবসা তখন ছিল য়ুরোপীয়দের একচেটিয়া। সেই একচেটিয়া বাবসা ভাঙবার জন্য এবং মদ বিক্রয়ের মোটা লভ্যাংশ যাতে দেশের লোক পায়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর একজন অনুগত বাঙালী বাবসায়ীকে দিয়ে তখনকার ধর্মতলা স্ট্রীট-এ একটি মদের দোকান খুলিয়েছিলেন। মাসে মাসে যত মদ তাঁর দরকার হত তিনি খুচরো দরে সেই দোকান থেকে আনিয়ে নিতেন। এই বাবস্থার শেষ পরিণাম হয়েছিল বেশ কৌতুকাবহ। দ্বারকানাথের একটা দুর্নাম রটেছিল যে কলকাতায় তিনিই নাকি মদের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষী ছড়া কেটে বলত ঃ

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয়  
ছুরি কাঁটার ঝনঝনি,  
খানা খাওয়ার কত মজা,  
    আমরা তার কি জানি?  
মদের কত গুণাগুণ  
    আমরা তার কি জানি?  
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'[২৭]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে শুনেছিলেন যে রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর দ্বারকানাথ সায়ংকালীন আহারের পর কেবল এক গ্লাস শেবি পান করতেন। সেই মিতাচারী দ্বারকানাথ মদের স্রোতে সারা কলকাতা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—এই কুৎসা ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। কথাটা তুলতেই বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন ঃ 'আমি তাঁকে

বিলক্ষণ জানি—এসব কথা নিন্দুকের কথা। প্রকৃত কথা এই যে তিনি দেখলেন যে দেশে মদের আমদানি তো বেড়েই চলল, তবে তার লভ্যাংশ য়ুরোপীয়রা সবটুকু উপভোগ না ক'রে আমাদের দেশের লোক যতটুকু উপভোগ করতে পারেন, তাতেই দেশের লাভ। এইজন্য তিনি তাঁর অনুগত বিশ্বনাথ লাহাকে খুচরা মদ বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।'

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে মনস্বিতা ও নৈতিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন শীর্ষস্থানের অধিকারী। তাঁর বিষয়ে বলতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন, 'তিনি তো কেবল বিদ্যার সাগর নন, দয়ারও সাগর।' ঈর্ষা অসূয়া মানুষকে কুৎসা ও পরনিন্দায় প্ররোচনা দেয়; কিন্তু নিন্দুকের দলের নিন্দা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ যে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, রামমোহন রায়ের মতো প্রখ্যাত সমসাময়িকের স্নেহ-সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তা থেকে স্পষ্ট প্রতীতি হয় দ্বারকানাথ ছিলেন মহদন্তঃকরণের লোক, তাঁর মধ্যে কোনো ক্ষুদ্রতা ছিল না। শোনা যায়, এক সময় বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথের জীবনী রচনায় হাত দিতে চেয়েছিলেন।[১৮] তিনি যে হাত দিতে পারেন নি—এটা খুবই দুঃখের কথা।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেকালের কথা পড়লেই দেখা যায়, তখন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দুর্গোৎসবের সময় সায়েব-সুবোদের নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করতেন। এই সব নিমন্ত্রিতদের মদ্য মাংস পরিবেশন করা হত দরাজ হাতে। ধর্মানুষ্ঠানের সূত্রে গোঁড়াদের এই আতিশয্য নিয়ে কেউ কিন্তু গান বাঁধেনি, ছড়া কাটেনি। অথচ নিছক সামাজিক ভোজের বেলা দ্বারকানাথকে নিয়ে এত শত কুৎসা রটনার হেতু কী হতে পারে? অনুমান হয়, এর কারণ কেবল ঈর্ষা-অসূয়া নয় পরন্তু দ্বারকানাথের প্রতি রক্ষণশীলদের বিদ্বেষ। তিনি যে খোলাখুলিভাবে উদারনীতির সমর্থক ছিলেন, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি তিনি যে উপহসনীয় মনে করতেন—গোঁড়ারা তাঁর এই 'লঘুচিত্ততা' কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। প্রথমবার বিদেশ সফর সেরে তিনি যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্রতী হতে চেয়েছিলেন, যদি তা সত্যই সম্ভব হত, তাহলে সারা দেশ নিশ্চয় নিন্দায় ফেটে পড়ত। বিলেতে থাকতেই তিনি কলকাতার ক্যাথলিক আর্চবিশপ ফাদার ক্যারু-কে পত্র লিখে প্রস্তাব করেছিলেন, যেন তাঁর টাকায় স্ত্রী-শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং ফাদার ক্যারু যেন সেই বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত য়ুরোপীয় শিক্ষিকা নিয়োগে সাহায্য করেন। কোনো অজ্ঞাতকারণে সে প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

যদিচ দ্বারকানাথের নিজের শিক্ষার দৌড় ছিল সামান্য, দেশের লোকের শিক্ষায় তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল জীবনের শেষপর্যন্ত। **চেস্‌কা ব'চেলা** নামে একটি চেক পত্রিকা ১৮৫৪ অব্দে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতে শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদকীয় মন্তব্যে

বলা হয়েছিল ঃ 'যে-দেশে শিক্ষার উন্নতি ঘটে সে-দেশ সুখী দেশ। যদিচ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটা উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, অপরাপর দেশের সন্তানেরা নিজেদের দেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি মমতাবশত নিজেদের শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী উন্নতি বিধান করতে চাইছেন, তা আমাদের জানা উচিত ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যে-দেশে দ্বাবকানাথেব মতো মানুষেরা আছেন সে-দেশ প্রকৃতই সুখী দেশ।'[২৯]

১৮৩৫ অব্দে কলকাতায় যে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতে পাশ্চাত্যমতে চিকিৎসা-শিক্ষার সেটাই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই মেডিকেল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন তাঁদের ১৮৩৫ অব্দের বার্ষিক রিপোর্ট-এ উল্লেখ করেছিলেন যে নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদের জন্য বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উদার হাতে পারিতোষিক প্রদান করেছেন।[৩০] দ্বারকানাথ জানতেন, গোঁড়া হিন্দু পরিবারেব ছেলেরা শব-ব্যবচ্ছেদ কবলে জাতি নষ্ট হবার ভয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাইত না। তাদের প্রোৎসাহিত করার জন্য তিনি বাৎসরিক দু-হাজাব টাকার অনুদান দিয়ে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শব-ব্যবচ্ছেদেব প্রতি ভারতীয়দেব ঘৃণা ও জাতি-নাশেব ভয় দূর করার জন্য তিনি স্বয়ং অবসর পেলেই কলেজে ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতেন।[৩১]

১৮৪৪ অব্দে দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রাকালে তিনি সরকারেব কাছে প্রস্তাব করেন, মেডিকেল কলেজের দু-জন ছাত্র যদি উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর সঙ্গে লণ্ডন যেতে ইচ্ছা করে, তাদের যাতায়াত বাবদ রাহাখরচ এবং লণ্ডনে থাকা খাওয়া ও শিক্ষার জন্য যা-কিছু ব্যয় হতে পাবে, সবটাই তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। সরকাব ও জনসাধারণ এই দরাজ প্রস্তাব খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন। জাতিনাশের ভয় উপেক্ষা করে তিনজন ছাত্র এগিয়ে এল—ভোলানাথ বসু, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ দাস বসু। তাদের শিক্ষক ডঃ গুডিভ তিন জনের একজনেব সমস্ত খরচ বহন করবেন বলে স্বীকার করলেন। গোপালচন্দ্র শীল নামে চতুর্থ একজন ছাত্র উচ্চশিক্ষার্থ লণ্ডনে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তার দরুণ খরচপত্র সংগৃহীত হয় চাঁদা তুলে। বাংলাব নবাব-নাজিম এজন্য চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ও গুডিভ-এব সঙ্গে একই জাহাজে এই চারজন ছাত্র লণ্ডনে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বিভাগে ভর্তি হন। দু-বছর পবে তাঁরা কলেজ অব সার্জন্স্ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন; তিনজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. ডিগ্রী পেয়েছিলেন।

১৮৪৬ অব্দের ৭ মে তারিখে **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** কাগজ ২৪ মার্চ তারিখের **লণ্ডন মেল** প্রদত্ত একটি সংবাদের ভিত্তিতে লেখেন ঃ 'ভারতের বিদ্যোৎসাহী বন্ধুরা জেনে খুশি হবেন যে কয়েক মাস পূর্বে যে-চারজন স্বদেশীয় ভদ্রলোক ডঃ গুডিভ-এর তত্ত্বাবধানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত এসেছিলেন, তাঁদেব

সকলেই স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রভূত উন্নতি দেখিয়েছেন। বিদ্যাগ্রহণে তাঁদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিয়ে তাঁরা প্রত্যেক অধ্যাপকের কাছ থেকে সপ্রশংস সুনাম অর্জন করেছেন। দু'জন তাঁদের মধ্যে বিশেষ পারিতোষিক লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন—গত আগস্ট মাসে ভোলানাথ বসু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং সম্প্রতি তুলনামূলক শরীর-সংস্থান-বিদ্যা অর্থাৎ অ্যানাটমি পরীক্ষায় সূর্যকুমার চক্রবর্তী স্বর্ণপদক পেয়ে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছেন।'

লণ্ডনে দ্বারকানাথের অকালমৃত্যুর সাত সপ্তাহ পরে ১৮৪৬ অব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের **হরকরা** সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'জনহিত ও দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দ্বারকানাথ ইহলোক থেকে অবসৃত হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হয়তো জেনে গিয়ে থাকবেন, তিনি উদার হস্তে অর্থানুকূল্য করে একটি যে মহৎ পরীক্ষার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন তা সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হবার মুখে। বলা যেতে পারে এটি তাঁর জীবনের চরমতম মুহূর্তের পরমতম ঘটনা। বিলাত থেকে শেষ যে ডাক আমাদের হস্তগত হয়েছে তা থেকে আমরা জেনেছি দ্বারকানাথের প্রস্তাবক্রমে যে চারজন মেডিকেল ছাত্রকে কলকাতা থেকে বিলাতে উচ্চশিক্ষার্থ পাঠানো হয়েছিল (তাঁদের দু-জনের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করেছিলেন), তাঁদের মধ্যে থেকে তিনজন এম. আর. সি. এস. অর্থাৎ মেম্বর অব দি রয়েল কলেজ অব সার্জন্‌স্—ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। এই তিনজন যুবক হলেন ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ দাস বসু ও গোপালচন্দ্র শীল—এঁরা এমন কৃতিত্বের সঙ্গে এঁদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন যে পরীক্ষকমণ্ডলী এঁদের প্রশংসা করেছেন বিশেষভাবে। চতুর্থ সূর্যকান্ত চক্রবর্তীর বয়ঃক্রম কম থাকায় ডিপ্লোমা পরীক্ষায় বসতে পারেন নি, কিন্তু তিনি পড়াশুনায় অপর তিনজনের চেয়ে কোনো অংশে কম কৃতিত্ব দেখান নি। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রাণীবিদ্যার পরীক্ষায় তিনি এমন উৎকর্ষ দেখিয়েছেন যে রৌপ্য-পদকের পরিবর্তে তাঁকে স্বর্ণপদক দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এইসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারি বিলাতে শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রদের মধ্য থেকে যাঁরা এই চারজনকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এই তরুণ ছাত্রদের ও তাঁদের অধ্যাপকদেরও ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়।' সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরো বলা হয়, 'বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এইসব কৃতী ছাত্রদের যেন উত্তম হারের মাহিনায় সরকারী কাজে বহাল করা হয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই চারজন ছাত্রই পরে ভারতের প্রথম এফ. আর. সি. এস. এবং এম. ডি. হয়েছিলেন।

১৮৩৫ অব্দে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরের ১৮ জুন তারিখে কলকাতার টাউন হল-এ এক বৈঠক হয় তাতে 'অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাতে...নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন।' জলা জায়গায় শহর কলকাতার

পত্তন হবার ফলে নানারকম জ্বরজ্বালা লেগেই থাকত, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল সাংঘাতিক। তখনো শহরের দরিদ্র সাধারণের জন্য কোনোরকম হাসপাতাল ছিল না। ১৮৩৫ অব্দের ১৯ জুন সংখ্যায় **হরকরা** উপরোক্ত টাউন হল-এর বৈঠক বিষয়ে রিপোর্ট দিতে গিয়ে লিখেছিলেন যে 'ফিভার হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠায় মুক্তহস্তে দান করার জন্য দ্বারকানাথ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে খুবই আবেগের সঙ্গে আবেদন করে বলেছিলেন, 'য়ুরোপীয়রা এজন্য যদি অর্থদান করেন সে হবে জনহিতের জন্য দান, কিন্তু এই কাজের জন্য দান করা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে কর্তব্য বিশেষ।' যে-টাকাটা উঠেছিল তার অনেকটা তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। এই 'ফিভার হাসপাতাল' পরে পটলডাঙ্গা হাসপাতালরূপে পরিচিত হয়। এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করেই কালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সূচনা। কলেজের সন্নিহিত জমি ছিল মতিলাল শীলের—তিনি শুরুতে 'ফিভার হাসপাতাল'-এর জন্য সেই জমি দান করেন। পটলডাঙ্গার 'ফিভার হাসপাতাল' যখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়—নূতন হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন লর্ড ডালহৌসি, ১৮৪৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ হাসপাতাল নিজে দেখে যেতে পারেন নি, কারণ ভিত্তি স্থাপিত হয় তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরে।[৩২] শুধু এই হাসপাতাল কেন—এই রকম বহু প্রচেষ্টার সূচনা তিনি করেছিলেন যা ছিল তাঁর জীবৎকালের স্বপ্ন এবং যা তাঁর মৃত্যুর আগে বাস্তব সত্যে পরিণত হতে পারেনি।

কুষ্ঠ হাসপাতালের সঙ্গেও দ্বারকানাথ যুক্ত ছিলেন হাসপাতাল কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে। **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** কাগজ তাঁদের ১৮৩৫ অব্দের ২ জুলাই তারিখের সংখ্যায় সে-কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরূপে ১৮৩৫ অব্দ ছিল দ্বারকানাথের জীবনের উল্লেখযোগ্য বৎসর। ওই বছর ৩১ আগস্ট তারিখে টাউন হল-এর একটি সভায় (**ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** ৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তার রিপোর্ট প্রকাশ করেন) সর্বসম্মত প্রস্তাবক্রমে স্থির হয়, কলকাতায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হবে এবং সেখানে বসে বই পড়া যাবে আবার সেখান থেকে বই ধার নেওয়াও যাবে। পরের বছর প্রধানত দ্বারকানাথের আনুকূল্যে (তিনি টাকা দিয়ে এবং বই দিয়ে সাহায্য করেছিলেন) এই লাইব্রেরির কাজ চালু করা হয়। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির সরকারী ইতিহাসে বলা হয়েছে ঃ

'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। গ্রন্থাগার স্থাপনে তাঁ পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের কথা স্মরণ করে কলকাতার নাগরিকেরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে উইক্স্-কৃত দ্বারকানাথের একটি আবক্ষ মূর্তি কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরিতে স্থাপন করেন। সেই আবক্ষ মূর্তি আজও বেলভিডিয়ের-এ ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রবেশ-পথে শোভা পাচ্ছে।'[৩৩]

ওই ১৮৩৫ অব্দেই আগস্ট মাসে দ্বারকানাথ জাস্টিস্ অব্ দি পীস্-পদে নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ ব্যবহার-শাস্ত্র এবং ব্রিটিশ আদালতে আইনকানুনের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে দ্বারকানাথ সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার রবার্ট কাটলার ফার্গুসন-এর ছাত্ররূপে। উপরন্তু বহু ধনাঢ্য রাজা ও জমিদারের আইন-উপদেষ্টারূপে কাজ করতে গিয়ে তিনি কোম্পানী বাহাদুরের আমলে বিচার-বিভাগের কাজকর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। একাধিকবার দ্বারকানাথ ইংরেজদের সুবিচার বোধের সুখ্যাতি করেছেন পঞ্চমুখে, বলেছেন, মুসলমান আমলে বিচারের নামে যে-স্বেচ্ছাচার চলত তা থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রিটিশ সুশাসনে প্রজারা বহুল পরিমাণে নিজেদের নিরাপদ মনে করে। কিন্তু মুখে ব্রিটিশ-বিচারের যতই প্রশংসা করুন না কেন, তাঁর সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে এই বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করতেন মফস্বলে এবং শহর-কলকাতাতেও। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়, তাঁর ভগ্নী এমিলি ইডেন-এর সঙ্গেও তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এমিলি-র মুখেই তিনি নিম্নোদ্ধৃত ঘটনার বিবরণ (যার কথা এমিলি লিখেছিলেন দেশে পাঠানো এক চিঠিতে) শুনে থাকবেন ঃ

'পশুর মতো লোকটার কাজ ছিল পথঘাট তৈরীর কাজ তদারকি করা। তার বাড়িতে একটা চুরির ঘটনা হলে পর তার সন্দেহ হয় যে-সব মজুর রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের কেউ কেউ এই চুরি করে থাকবে। আট-দশ ফুট উঁচুতে লোকটা একটা ভারা বেঁধে ষোলোজন মজুরের প্রত্যেকের দু-হাত ভারার সঙ্গে বেঁধে এমনভাবে লটকে দিল যাতে কারো পা মাটি না ছোঁয়। তারপরে শুরু হল বেত্রাঘাত, পায়ের নীচে শুকনো খড় গাদা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেওয়া হল। এইভাবে তাদের কাউকে কাউকে চোদ্দ থেকে আঠারো ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। একটি লোক তো মারাই গেল, একাধিক লোক মূর্ছিত অবস্থায় ঝুলে রইল। প্রমাণ পাওয়া গেছে এ সমস্তই ঘটেছে সেই রোড-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সায়েবের বাংলো-বাড়ির মধ্যে। সায়েব তার ডিনার-টেবিল ঘর থেকে বের করে ঘটনাস্থলের ছয় গজের মধ্যে বসে ডিনার খেতে খেতে এই নৃশংস ব্যাপার উপভোগ করছিল। লোকটা সাফাই দিতে গিয়ে বলেছিল নিজের হাতে সে তো কিছু করেনি। যা করবার সব তার হুকুম-মত করেছিল তার ওভারসিয়র। স্যর হেন্‌রী জুরিদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কেবল ইংগিত করেছিলেন যে ঘটনাটাকে ইচ্ছাকৃত খুন না বলে হয়তো বলা চলে নরহত্যা। এ-দেশে খুনের দায়ে ফাঁসী দেওয়াটা এমনই ভয়াবহ যে জজ চেয়েছিলেন জুরিরা যাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সুপারিশ করে। কিন্তু তাঁকে ভীষণ আশ্চর্য করে জুরিরা রায় দিল আসামী নির্দোষ! স্যর ই. রায়ান—যিনি এদেশে বহুকাল জজিয়তী করেছেন—বলেছিলেন যে সর্বক্ষেত্রে এই রকমটাই ঘটে, নীচু স্তরের যে-সব য়ুরোপীয়কে জুরিরূপে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, তারা নেটিভকে খুন করার অপরাধে

অভিযুক্ত যে-কোনো য়ুরোপীয়কে বেকসুর খালাস বলে রেহাই দিয়ে থাকে।[১৩৪]

শহর কলকাতায় যেখানে স্বয়ং বড়লাট অধিষ্ঠিত, সেখানেই যদি আইন-শৃংখলার এই রকম অবস্থা ছিল, অনুমান করা যায়, তাহলে মফস্বলের কী দুরবস্থা। সে-সব অঞ্চলে যে-কোনো শ্বেতাঙ্গ বা নেটিভ সরকারী কর্মচারী যে-কোনো আইনগত অপরাধ করা সত্ত্বেও বেকসুর খালাস হওয়া অসম্ভব ছিল না। দণ্ডার্হ অপরাধের তত্ত্বতালাশী করত দারোগা—তার বেতন সামান্য, আইনের জ্ঞান ততোধিক সামান্য, তার একমাত্র গুণ সবলের ভক্ত, নরমের যম, এবং সে জানে কিভাবে উপরিপাওনা আদায় করতে হয়। বে-আইনী কাজের বিষয়ে নালিশ এল তো তার পোয়া বারো। সে তখন তার পুলিশ চৌকিদার পরিবৃত হয়ে ঘেরাও করত অভিযুক্তের বাড়ি শাসাত, ঘরবাড়ী সব তালাশ করবে—অন্দরমহলও বাদ দেবে না। মেয়েছেলেদের হেনস্তা হবে—এই ভয়ে অভিযুক্ত বেচাবা অর্থদণ্ড অর্থাৎ ঘুষ কবুল করে রেহাই পেতে চাইত। দ্বারকানাথ কিছুকাল ধরে আন্দোলন চালালেন সদ্বংশজাত শিক্ষিত যুবকদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে নিযুক্ত করে মফস্বলে পাঠানো হোক। ১৮৩৭ অব্দে সরকার মফস্বলের পুলিশ-সংস্কার নিয়ে এক কমিটি বসান, ডব্লু. ডব্লু. বার্ড হন তার চেয়ারম্যান। দ্বারকানাথ তাঁর সাক্ষ্যে প্রচলিত পুলিশ-শাসনের গলদ সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে প্রস্তাব করলেন, মফস্বলে দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা দরকার এবং তাঁরা যেন ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবক হন। যদি য়ুরোপীয় অথবা য়ুরেশীয় নিয়োগ করতে হয়, তাঁরা যেন দেশের ভাষায় এতটা ব্যুৎপন্ন হন যে দেশীয় ভাষায় নালিশ, ফরিয়াদ, জেরা প্রভৃতি দোভাষীর সহায়তা ছাড়াই বুঝতে পারেন। তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকার প্রথম যে কয়েকজনকে ডেপুটি নিযুক্ত করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ভদ্রঘরের সন্তান ও হিন্দু-কলেজের কৃতী ছাত্র। যেখানে অপরাধের সংখ্যা অধিক সেইসব জায়গায় এইসব শিক্ষিত যুবক ডেপুটি হয়ে নিযুক্ত হবার ফলে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং বিচার-ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। এঁদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মফস্বলে স্কুল, ডিসপেনসারি, লাইব্রেরি প্রভৃতি সর্বজনহিতকর প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দ্বারকানাথ তথাকথিত 'কালা আইন'-এর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। এতে তাঁর মর্যাদার হানি হয়েছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৮৩৬ অব্দের ১১ নং আইনের (Act XI) বলে, মফস্বল-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার জন্য ইংরেজ প্রজাদের যে বিশেষ অধিকার ছিল, তা রহিত করে দেন। অর্থাৎ আইনের চোখে ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রজাদের সমান বলে ঘোষণা করা হয়। একটা বিশেষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজার জাতের লোকেরা খুব হৈ চৈ শুরু করল। এই আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করবার জন্য কলকাতাবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে টাউন হল-এ শেরিফ এক সভা আহ্বান করলেন।

১৮৩৬ অব্দের ১৮ জুন এই সভায় স্থির হয় ঃ 'কোম্পানী বাহাদুরের কোর্ট অব ডিরেকটর্স এবং বোর্ড অব কণ্ট্রোল-এর কাছে এ আইন বাতিল করার জন্য আবেদন করা হোক।'[৩৫] ব্যারিস্টার টার্টন-এর এই প্রস্তাব সমর্থন করে দ্বারকানাথ একটি ওজস্বিনী বক্তৃতায় মফস্বল-আদালত এবং সুপ্রীম কোর্ট-এর তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করে বলেন কী কারণে তাঁর মতে সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচার অনেক বেশি ন্যায়সংগত ও পক্ষপাতশূন্য। বাগ্মিতার তোড়ে এমন অনেক কিছু বলেছিলেন যা নিয়ে তাঁকে পরে কথা শুনতে হয় ও জবাবদিহি করতে হয়। বক্তৃতার একটি অংশ ছিল এই প্রকার ঃ

'শুনেছি সরকার নাকি ইংরেজদের ও ভারতীয়দের সমান মর্যাদা দিতে চান। কিন্তু কার্যত এই সমানীকরণ তাঁরা কিভাবে সম্পাদন করেন? দেশীয় লোকেরা এই সেদিন পর্যন্ত দাসত্বের জীবন যাপন করছিল। তবে কি ইংরেজদেরও দাসে পরিণত করতে হবে? সরকার কি এই ধরনের সমানীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে চান? দেশীয় লোকেদের যা-কিছু ছিল—তাদের প্রাণ ধারণের উপায়, তাদের স্বাধীনতা, তাদের ধনসম্পত্তি—সকলই তো সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন, তারা যতটুকু যা পাচ্ছে সবই তো সরকারের দাক্ষিণ্যরূপে পাচ্ছে। সবকার কি এখন এ দেশের ইংরেজ অধিবাসীদেরও ওই একই পর্যায়ে এনে ফেলতে ইচ্ছা করেন? তাঁরা এ-দেশবাসীদের য়ুরোপীয়দের স্তরে উন্নীত করতে চাইছেন না, পরন্তু চাইছেন য়ুরোপীয়দের নামিয়ে দিতে দেশীয় অধিবাসীদেব পর্যায়ে। [সাধু সাধু]'

কিশোরীচাঁদ মিত্রের **দ্বারকানাথ স্মারণিক গ্রন্থ** এক ভক্তজন-বিরচিত জীবন চরিত। কিন্তু তিনিও দ্বারকানাথের এই প্রসঙ্গে সমালোচনা না করে পারেন নি। তিনি লিখেছেন ঃ 'শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারকানাথের এই বক্তৃতার সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা চলে তাঁর এই বক্তৃতায় মফস্বলের আদালত ও তাদের কর্মপদ্ধতির একটি জীবন্ত ও যথাযথ ছবি তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সময়ে মফস্বল-আদালতগুলির অবস্থা-ব্যবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ন্যায়বিচারের মন্দির তাদের বলা যেত না, বরঞ্চ বলা যেত অন্যায় বিচারের আড্ডাস্থল। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায্য অধিকার ন্যায়াধিকরণে সুরক্ষিত থাকার কথা। কিন্তু এসব আদালত ছিল বাজার-বিশেষ, নীলামে চড়া দাম হাঁকলে যেমন বাঞ্ছিত জিনিস পাওয়া যায়, এখানেও তেমনি আদালতের ডিক্রী কেনাবেচা হত সর্বোচ্চ দরে। মফস্বল-আদালতের কাজকর্মের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় ছিল অন্তরঙ্গ, বহুবার তাঁকে হাকিমের অজ্ঞতা কিংবা ঘুষখোর আমলাদের লোলুপতা থেকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যে তাদের নিন্দা করতে ভয় পেতেন না। তবে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে যে তিনি এত বিচক্ষণতা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে কালা-আইনের নিহিত তাৎপর্য ও ন্যায়পরায়ণতা ঠিক বুঝতে পারেন নি। ব্যবহারশাস্ত্রে সুনীতি তাকেই বলে যখন প্রত্যেক অপরাধীকে আইনের চোখে সমান করে দেখা হয়, ন্যায়পীঠের ধরনধারণ ও শাসনপদ্ধতিতে যখন সকল

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়। কোনো ব্যক্তি বিলাতে জন্মেছে বলে মফস্বলের সাধারণ আদালতের আওতা থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হবে—এটা সংবিধান-বিরুদ্ধ তো বটেই; নীতিগতভাবে এটা অন্যায় এবং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা নানা অত্যাচার উৎপীড়ণের উৎস।' (*Memoir*—p. 58)

টমাস বেবিংটন মেকলে তখন ছিলেন বড়লাটের সুপ্রীম কাউন্সিল-এর ল' মেম্বর। তথাকথিত 'কালা আইন' প্রবর্তন করার উপদেশ তিনিই দিয়েছিলেন। সুতরাং এ-বিষয়ে তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর একটি খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৬ অব্দের ১৭ নভেম্বর তারিখে **বেঙ্গল হরকরা** কাগজে। চিঠিতে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি মনে করি বিচারবিভাগীয় আমলাদের কেউ কেউ দুষ্ট ও অসৎ বলে, মফস্বল-আদালতের আওতার বাইরে এক শ্রেণীর লোককে আলাদা করে রাখার প্রস্তাব যেমন অযৌক্তিক তেমনি ক্ষতিকর। এই বিশেষ শ্রেণীর লোকদেব ভয়ডর কম, এরা জাল জোচ্চুরি ঘৃণা করে, অত্যাচার-অবিচারের কাছে মাথা নোয়াতে চায় না, এরা সুবিচার পেতে অভ্যস্ত, ক্ষমতাবানের ভ্রূকুটিকে এরা থোড়াই পরোয়া করে। এদের প্রতি অন্যায় কিছু হলে এরা নালিশ না করে বসে থাকার পাত্র নয় এবং এরা যদি নালিশ করে আমলাতন্ত্রের সাধ্য নেই এদের নালিশে কান না দেয়। মফস্বল-আদালতের আওতা থেকে এদের যদি বের করে দেওয়া হয়, তা হলে কারা থাকবে এই সব আদালতের অধীনে? থাকবে একটা বিরাট জনসংখ্যা যার অধিকাংশ হল শান্ত গোবেচারী ভীরু প্রকৃতির মানুষ, যারা বলপ্রয়োগে আদায়কারীদের সহজ শিকার, যারা দুষ্কৃতকারী অত্যাচারীদের কাছে ক্রীতদাসতুল্য। আমার মনে হয় এ রকমটা হতে দেওয়া খুবই দূষণীয় হবে।...কোম্পানী বাহাদুরের আদালতগুলিতে নিঃসন্দেহে প্রচুর অন্যায় ঘটে থাকে। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই যে মফস্বলে বসবাসকারী ইংরেজরা স্থানীয় নেটিভদের সঙ্গে যেন একযোগে এই সব অন্যায় উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করেন।'

মেদিনীপুর ও হিজলি মফস্বল-আদালতের জজ এবারক্রম্‌বি ডিক-ও আমলাদের পক্ষ অবলম্বন করে দ্বারকানাথকে তিরস্কার করে ১৮৩৮ অব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখে **ইংলিশম্যান** কাগজে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। অন্য নানা প্রসঙ্গ তুলে সে-পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশবাসী য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের সমর্থনে যে সহৃদয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও উদারতার পরিচায়ক—সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কোনো প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন না করে তিনি নিজের স্বদেশবাসীদের যে-ভাবে নিন্দিত করেছেন তাতে কি তিনি একই রকম উদারতার পরিচয় দিয়েছেন?'

এই কঠোর তিরস্কারে দ্বারকানাথের আঁতে ঘা লাগে এবং ডিক-এর দীর্ঘ পত্রের উত্তরে তিনিও একটি দীর্ঘ পত্র লিখে **ইংলিশম্যান** পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠান। ১৮৩৮ অব্দের ৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত এই পত্রে দ্বারকানাথ নিজের সাফাই

দিতে গিয়ে বলেন যে, সত্যের খাতিরে ও জনসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সাধনের তাগিদে, তিনি তাঁর দেশবাসীর ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারেন নি। 'যে মহৎ উদ্দেশ্য আমার সামনে আমি সতত রাখি তা হল আমার দেশবাসীর মধ্যে নবজন্মের উদ্‌বোধন। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এ-উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় হল তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি খোলাখুলিভাবে নির্ভয়ে তুলে ধরা, তাদের কার্যকারণ খুঁজে বের করা এবং সেগুলির সম্যক নিরাকরণ করার জন্য উপায় নির্ধারণ। টাউন হল-এ আমি যা-কিছু বলেছি এবং পুলিশ কমিটির কাছে যে-সব কথা আমি আরো বিশদভাবে বলেছি—সবই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছি কারণ সেগুলি আমার সুদৃঢ় মতামত যার পুনরাবৃত্তি করতেও আমাব কোনো কুণ্ঠা নেই। যদি মিস্টার ডিক স্পষ্টত জানতে চান আমার মতে বর্তমানে এ-দেশবাসীর চরিত্রগত বিশেষ দোষত্রুটি কী, আমি বলব সত্যবাদিতাব অভাব, সততার অভাব ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত বিচারের অভাব।' অতঃপর তিনি বললেন, এ-সব ত্রুটিবিচ্যুতি ভারতীয় চরিত্রেব অঙ্গাঙ্গী ছিল না। এগুলি বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলিম বিজয় ও মুসলিম কু-শাসনের অবশ্যম্ভাবী কুফল। 'মুসলমান শাসকসম্প্রদায় ছিল মূলত অশিক্ষিত পরধর্ম-অসহিষ্ণু অসৎ-চরিত্র যোদ্ধৃ জাতি। বিজিতেরা অস্ত্রের সাহায্যে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধনপ্রাণ মানসম্মান রক্ষা করতে অসমর্থ হবার ফলে নিতান্ত হীনমন্যতার সঙ্গে বিজেতাদের কাছে হয় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল নতুবা আশ্রয় নিল শঠতা ও তঞ্চকতার।' ভারতের দুর্দশা ও দেশবাসীব চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য মুসলিম কুশাসনকে সম্পূর্ণ দায়ী ক'রে, পত্রের শেষ অংশে, দ্বারকানাথ আশা প্রকট করলেন যে দেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার ফলে, নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এবং ইংরেজদের ভাষা, আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে চালু করার ফলে, অচিরেই হয়তো সুফল ফলবে।

আজকের দিনে মনে হতে পারে দ্বারকানাথের এই আশা-ভরসার মূলে ছিল নিতান্তই সাদামাটা দাসমনোবৃত্তি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না উনিশ শতকে এই রাজভক্তি দেখা যেত দেশের সর্বত্র। কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাতবর্গে নয় পরন্তু সারা দেশের অধিকাংশ জনগণের চোখে তখন ব্রিটিশ শাসক ছিলেন 'মা-বাপ'।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ 'সেকালের রাজনীতিক নেতাদের গরিষ্ঠসংখ্যক ছিলেন রাজা রামমোহনের সহচর বা অনুগামী। ব্রিটিশ সরকারের শাসনে তাঁদের আস্থা ছিল অবিচল।' প্রফুল্লকুমার ঠাকুর লিখেছিলেন 'কেউ যদি আমাদের প্রশ্ন করে, কোন্ সরকারের শাসন আমাদের অধিকতর পছন্দ—ইংরেজদের কিংবা অন্য কারো—আমরা সকলে একযোগে বলব নিঃসন্দেহে ইংরেজ-শাসন, এমনকি হিন্দু-রাজ্যের চেয়েও আমাদের কাছে অধিকতর কাম্য হবে ইংরেজ-রাজ।' দ্বারকানাথও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'ভারতের সুখসমৃদ্ধি সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় হল ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সংরক্ষণ করা।' **হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী**

পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষের মতে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের হাতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য তখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারণ করার মতো শক্তি যদিবা আমাদের থাকত, তা যদি আমরা করতে যাই, তাহলে অপর কোনো বিদেশী শাসনের গুরুভার বহন করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'[৮৮] ১৮৫২ অব্দের ২৬ আগস্ট তারিখে বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটুশন-এর একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে দাদাভাই নৌরোজি একইরকম মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। নৌরোজি তখন ছিলেন এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক এবং ইয়ং বোম্বে পার্টির আশাভরসাস্থল। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আমাদের বেশী কিছু জুলুম সইতে হয় না। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় আমরা যতটা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছি তেমনটা অপর কোনো সরকারের অধীনে হতে পারত কিনা সন্দেহ।'

ব্যবসা-বাণিজ্যে, সামাজিক তথা রাজনীতিক ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ নানা উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, বহু প্রচেষ্টা তাঁর আনুকূল্যে লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছিল। তাঁর এই বিচিত্র কাজের মধ্যে দিয়ে একটা যে আবেগ ও উৎসাহের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, তার পিছনে ছিল তাঁর এই রাজভক্তি-প্রসূত প্রত্যয় যে, ভারত একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়ে উঠবে। আধুনিক ভারতের উদ্যোগ-পর্বে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। শিল্প-বাণিজ্যের জগতে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, যে-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন ও বড় হয়ে উঠেছিলেন তার ভিত্তি ছিল জমিদারি-প্রথা। শ্রেণী-হিসাবে সেকালে জমিদারদের মতো প্রভাবশালী শ্রেণী আর দ্বিতীয় ছিল না। রাজার জাতির উপর তাদের যেমন প্রভাব ছিল, প্রজাদের উপরেও তেমনি। তার ফলে বহুজনকে একত্র করে একটা কোনো সংগঠন গড়ে তোলা জমিদারদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, 'অভিজাত ভূস্বামীদের প্রভাব যাঁরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন এবং দেশের সু-শাসনের কাজে সেই প্রভাবকে কার্যকর করার কথা যাঁরা সর্বাগ্রে চিন্তা করেছিলেন, দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৮৩৮ অব্দে তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাসগৃহের পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে এই সোসাইটির অধিবেশন বসত।'[৮৮] ১৮৩৮ অব্দের ২২ মার্চ তারিখে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** কাগজের একটি রিপোর্টে বলা হয়, 'গতকাল বিকেলে টাউন হল-এর এক সভায় দেশীয় ও অন্যান্য জমিদারেরা একত্রিত হয়ে স্থির করেন যে আইনসম্মত উপায়ে ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি সোসাইটি স্থাপিত হবে। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভার সভাপতিত্ব করেন।' (কোনো অজ্ঞাত কারণে উপস্থিত জমিদারমণ্ডলীর তালিকা থেকে দ্বারকানাথের নাম বাদ পড়েছিল)। এই সোসাইটির অভ্যুদয়কে স্বাগত করে ১৮৩৮ অব্দের ২০ মার্চ তারিখে **ইংলিশম্যান** কাগজ মন্তব্য করেন : 'এতকাল

পরে হিন্দুরা আবিষ্কার করেছেন যে একতাই বল। আমাদের মতে এই এসোসিয়েশন-এর ভিত্তি বহুবিস্তৃত ও উদারনীতিক হলেও, আসলে এটি একটি রাজনীতিক সংস্থা। এই এসোসিয়েশন-এ ইংরেজ, মুসলমান, খ্রীস্টান ও হিন্দু—অর্থাৎ সকল জাতির ভূস্বামীই প্রবেশ লাভ করতে পারেন।'

বাস্তবপক্ষে প্রজাসাধারণের অথবা তাদের মধ্যেকার বাঙ্ময় গোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ আইনসম্মতভাবে সরকারের সামনে উপস্থাপিত করার সর্বপ্রথম রাজনীতিক সংস্থা ছিল এই ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। পরে এই সোসাইটি থেকে জন্মগ্রহণ করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং এসোসিয়েশন থেকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।

রাজনীতিক শিক্ষায় দ্বারকানাথের হাতেখড়ি হয়েছিল রামমোহনের তত্ত্বাবধানে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জুরী-প্রথা প্রবর্তনের আন্দোলনে তিনি ছিলেন রামমোহনের পার্শ্বচর। তাঁরা দুজনে মিলে সূত্রপাত করেছিলেন 'রাজভক্ত বিরোধীদল'-এর। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ঐতিহ্য বহুকাল ধরে কার্যকব ছিল। তৎকালীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা ছিলেন সেই ভূস্বামীদের স্বার্থে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল, একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভূস্বামী ছিলেন এই সোসাইটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো গোঁড়া হিন্দুসমাজের নেতারাও ছিলেন, আবার দ্বারকানাথ এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো উদারপন্থী হিন্দুরাও ছিলেন, আর ছিলেন থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ প্রভৃতি য়ুরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি যাঁরা সরকারী কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না।

জমিদারদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও তাঁদের সমস্যার সমাধানই ছিল সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎকালিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল জমিদারদের লাখেরাজ স্বত্ব সরকার কর্তৃক পুনর্গ্রহণের প্রশ্ন। ১৮৩৮ অব্দের ২২ মার্চ তারিখে **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** সরকারের পুনর্গ্রহণ নীতি সমর্থন করে বলেন, সোসাইটির বিরোধিতা নিতান্তই একপেশে ও স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত। তাঁরা বলেন—'দীর্ঘকাল ধরে এ-দেশের লোকেদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত মত হল এই যে, জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যে-সব ন্যায্য অভিযোগ আছে তার তুলনায় সরকারের বিরুদ্ধে জমিদারদের অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর। আশা করা অন্যায় হবে না যে এখন যেমন জমিদারেরা সংঘবদ্ধভাবে সরকারের কাছে তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার চাইছেন, তেমনি একজোট হয়ে তাঁরা প্রজাদের অভিযোগ-অসুবিধা দূরীকরণে যত্নবান হবেন।'

**ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া**-র এই সমালোচনায় দ্বারকানাথ বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। ১৮৩৯ অব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখে টাউন হল-এ একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল লাখেরাজদারদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং সরকারের পুনর্গ্রহণ-নীতির বিরোধিতা করে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা। সভাপতিত্ব

করেছিলেন ব্যারিস্টার ডিকেন্স। এই সভায় **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া**-র প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথ একটি জোরালো বক্তৃতায় বলেন যে তিনি স্বয়ং কিংবা ডিকেন্স কিংবা সোসাইটির গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যদের মধ্যে কেউই লাখেরাজদার নন। 'তাহলে আমার জিজ্ঞাসা, পুনর্গ্রহণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় আমরা স্বার্থপর হলাম কীভাবে?'[৭৩] তিনি বিশদভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন সরকার যে-ভাবে পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব কার্যকর করে চলেছেন, তার ফলে লাখেরাজদারদের রাজস্বমুক্ত স্বত্ব ভোগ করতে গিয়ে প্রচুর কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়া সোসাইটি কেবল যে পুনর্গ্রহণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এমন তো নয়; আদালতে মাতৃভাষার প্রচলন, মামলায় সাক্ষ্যদানকারী গরিব লোকেদের জন্য দৈনিক ভাতা দেবার ব্যবস্থা, সরকারী দলিলপত্রে স্ট্যাম্প-শুল্ক হ্রাস করা ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে সোসাইটি আলোচনা করে থাকেন।

টাউন হল-এর এই বক্তৃতার পর ১৮৩৯ অব্দের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** সোসাইটির পুনর্গ্রহণনীতির বিরোধিতা-বিষয়ে তাঁদের পূর্ব-মত বহাল রেখেও, দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত নানা গুণের সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, 'দ্বারকানাথ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কোনো উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন এমন অপবাদ আমরা কোনোক্রমেই দিতে পারি না। আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খারাপ হয়—এমনটা কিছুতেই আমাদের অভিপ্রেত হতে পারে না। আমরা কি সেই মহৎ ঘটনার কথা ভুলতে পারি যেদিন ব্রিটিশ শাসন এ-দেশে পরম কারুণিক বলে অভিহিত হয়েছিল? সে-ঘটনার সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িত ছিল দ্বারকানাথ তাঁদের অন্যতম। তিনিও নিশ্চয় বিস্মৃত হননি যখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল আমরাই সাহস করে দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর পাশে। উপরন্তু লোকে ভোলেনি, আমরাও ভুলতে পারি না, কীরকম রাজকীয় দাক্ষিণ্যে তিনি কলকাতার দরিদ্রসাধারণের সাহায্যকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন।' অতঃপর সম্পাদক মন্তব্য করেন, 'এক ধরনের স্বার্থসিদ্ধি আছে যাকে ঠিক নীচ বলা চলে না। সর্বজনের হিত যেখানে লক্ষ্য নয়, সেইরকম গোষ্ঠীগত বা দলগত কোনো প্রকার সুবিধার দাবি, আর্থিক দিক থেকে না হলেও নৈতিক দিক থেকে স্বার্থদোষযুক্ত।'

লর্ড বেন্টিঙ্ক বড়লাট পদ থেকে অবসর নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান ১৮৩৫ অব্দের প্রথম দিকে। সতীদাহ নিবারণ নিয়েই যদিচ তাঁর বহুল পরিচয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর শাসনকালে এমন অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল যার জের এসে পৌঁছেছিল আধুনিক কালের ভারতেও। তিনি ছিলেন সত্যকার উদারপন্থী মানুষ এবং তিনি মনে করতেন যে ইঙ্গ-ভারত সহযোগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। য়ুরোপীয় অংশীদার নিয়ে দ্বারকানাথ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের নূতন উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, বেন্টিঙ্ক সে-উদ্যোগকে কেবল স্বাগত করেছিলেন এমন নয়—সক্রিয়ভাবে উৎসাহও দিয়েছিলেন। ১৮৪২ অব্দে প্রকাশিত **ফিশার্স কলোনিয়াল ম্যাগাজিন** দৃষ্টে জানা যায়,

বেণ্টিঙ্ক দ্বারকানাথকে 'রাজা' উপাধি নেবার জন্য পীড়াপীড়ী করেছিলেন, দ্বারকানাথই অনাগ্রহ দেখান। বেণ্টিঙ্ক-এর পর বড়লাট হয়ে এসেছিলেন মেটকাফ ও অকল্যাণ্ড। এঁরা দুজনেও বেণ্টিঙ্ক-এর মতো ভারতীয় আশা-আকাঙক্ষার সমর্থনে সদয় ছিলেন। পর পর তিনজন গভর্ণর-জেনারেলের এই সদয় বন্ধুভাব দেখে দ্বারকানাথের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা মনে-প্রাণে উদারপন্থী এবং তিনি একটি যে কমনওয়েলথ বা সর্বমঙ্গল-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন সফল হতে পারে যদি দুই দেশের শীর্ষস্থানীয়েরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক সংবাদপত্র বিষয়ক অনেক বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নিলেও কার্যত মেটকাফ-ই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৮২৩ অব্দে কুখ্যাত প্রেস রেগুলেশন প্রবর্তনের পর থেকে দ্বারকানাথ ও আরো অনেকে তার বিরোধিতা করে দীর্ঘকাল আন্দোলন চালিয়েছিলেন। মেটকাফ এই আইন প্রত্যাহার করে নেবার পর ১৮৩৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রী প্রেস-এর তৃতীয় বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে টাউন হল-এ একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয়। দ্বারকানাথ তখন পশ্চিমভারতে সফর-রত। ভোজসভায় যোগ দিতে না পেরে দ্বারকানাথ তাঁর অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটির জন্য মাপ চেয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন, সে-চিঠি ভোজসভায় পঠিত হয়। তখন দ্বারকানাথের নামে টোস্ট্ প্রস্তাব করে এইচ. এম. পার্কার একটি স্মরণযোগ্য বক্তৃতায় বলেন ঃ

'এই ভোজ-সভায় যে মাননীয় ব্যক্তির গুণকীর্তন করতে আমি উদ্যত হয়েছি তাঁর সম্মানের ভিত্তি এমনই দৃঢ় যে আমার দুর্বল ভাষায় তা আমি যথাযথ প্রকাশ করতে পারব না। এ-নাম সর্বাগ্রগণ্যদের মধ্যেও সবার আগে গণ্য, ব্যবসাবাণিজ্যে উদারতা ও উদ্যোগ দেখিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। কর্মিষ্ঠ, সমর্থ ও বদান্য যে-সব নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের কাছে সমস্ত জাতি ঋণী, তাঁদের নামের তালিকায় এঁর নাম শীর্ষস্থানীয় নাও যদি হয়, সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। সদুপদেশ দিয়ে কিংবা মুক্তহস্তে সহায়তা করে তিনি যাঁদের বিপদমুক্ত করেছেন কিংবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর নাম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। তাঁর অফুরন্ত দাক্ষিণ্যের ভাগ পেয়েছেন এমন অজস্র লোকের অন্তরে তাঁর নাম গাঁথা হয়ে গেছে। জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে যাঁরা তাঁর অন্তবিহীন করুণার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছেন তাঁরা দুহাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সামাজিকতা ও অতিথিপরায়ণতার ক্ষেত্রে নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠারূপে, সহৃদয়তা ও শিষ্টাচারের অনন্য উদাহরণরূপে তাঁর নাম তাঁর অগণিত অতিথিদের স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকটি কলেজের সম্মেলনকক্ষ কিংবা তাঁর আনুকূল্যপুষ্ট প্রতিটি সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অলিন্দ তাঁর সুনামে মুখরিত। তাঁর সাম্প্রতিক কীর্তির মধ্যে যে-রাজকীয় ঔদার্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার তুলনা আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে আমি খুঁজে পাই না, সেখানেও তাঁর নাম দেদীপ্যমান। সর্বোপরি যে-প্রচেষ্টার সাফল্য-গৌরব উদ্যাপনের

জন্য আজ রাত্রে আমরা এখানে সমবেত, তার সঙ্গে এই সর্বতঃ শ্লাঘার যোগ্য নাগরিকপ্রবরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। ভদ্রমহোদয়গণ! এর পরেও কি আমার বলা প্রয়োজন যে সে-নামটি হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম।' (তুমুল হর্ষধ্বনি)

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দ্বারকানাথ ছিলেন ব্রিটিশ রাজের একান্ত রাজভক্ত প্রজা। তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন কেবল তাঁর দেশের সুশাসন নয়, পরন্তু শিল্পবাণিজ্যে প্রাগ্রসর, প্রগতিশীল ও আধুনিক জাতিরূপে ভবিষ্যতে এ-দেশের বিবর্তন নির্ভর করছে ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগের উপর। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুর অনুগত জো-হুকুম মোসাহেব তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। যেমন তাঁর স্বভাবে কার্পণ্য বা অনুদারতা একেবারেই ছিল না, তেমনি ছিল না দাসমনোভাব। কর্মজীবনের সূচনাতেই তিনি রামমোহন রায়ের নিকট-সংস্পর্শে আসেন এবং তখন থেকেই একযোগে বা এককভাবে তিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি বা সাধ্য অনুসারে দেশহিতের কথা বলেছেন, শাসকসম্প্রদায় দেশহিতের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করলে নির্ভয়ে তাদের সঙ্গে লড়েছেন। তাঁর বহু য়ুরোপীয় বন্ধু তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর নৈতিক সাহস, সততা, বদান্যতা, আত্মনির্ভরতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অন্যায়ের বিরোধিতা ও সংস্কারযুক্ত মানসিকতার জন্য। টাউন হল-এর ভোজসভায় পার্কার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এই গুণাবলীর তালিকা ছিল তার অন্তর্ভুক্ত।

য়ুরোপীয়দের বিরাগের ফলে স্বদেশীয়দের অনুভূতি বা অধিকার ব্যাহত হলে তিনি যথাশক্তি প্রতিরোধ করতেন। একবার ১৮৩৩ অব্দে য়ুরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন যে তাঁদের কাজকারবারের সুবিধার জন্য সরকারী দফতরে হিন্দুদের পালনীয় কিছু পূজাপার্বণের ছুটি যেন ছাঁটাই করা হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সরকার এক শ্রেণীর লোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন, এটা দ্বারকানাথ বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই তিনি হিন্দুদের হয়ে লড়েছিলেন। পরের বছর কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট শহরের রাস্তায় রাস্তায় নগরকীর্তন তুলে দেবার জন্য আদেশ জারি করেন। রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে একযোগে দ্বারকানাথ এই আদেশের বিরোধিতা করেন, ফলে এটা বাতিল হয়ে যায়।

কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, 'য়ুরোপ-এর ও স্বদেশের উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরের লোকেদের রাগ, বিরাগ ও সংস্কারের সঙ্গে দ্বারকানাথ একমত না হতে পারলে তিনি বিনা পক্ষপাতে উভয়েরই বিরোধিতা করেছেন। আবার উভয় সমাজের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য সেতুস্বরূপও হতে চেয়েছেন।' উভয় সমাজের উপর তাঁর প্রভূত প্রভাবের কথা উল্লেখ করে জীবনীকার বলেছেন, 'শুধুমাত্র ব্যবসায়ী বা জমিদাররূপে তাঁর যে মর্যাদা ছিল, তাঁর এই প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল সেই মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁর মতো ব্যবসায়ী-জমিদার আরো অনেকে ছিলেন, যাঁরা ঠিক এই ধরনের প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর চরিত্রে চাটুকারবৃত্তি একেবারেই ছিল না, ছিল উচ্চ আভিজাত্যবোধ, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাজ্ঞান, নৈতিক সাহস ও চিত্তের স্বাধীনতা। এই সমস্ত

মহৎ গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে হয়েছিল বলেই তিনি যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন তেমনি তা রক্ষাও করতে পেরেছিলেন। এ প্রতিপত্তি তিনি কখনো অসৎ পথে চালনা করেন নি, অপব্যবহার করেন নি, বরঞ্চ প্রয়োগ করেছেন স্বদেশের উন্নতিকল্পে। দ্বারকানাথ ছিলেন মধুরস্বভাব মার্জিতরুচি মানুষ—আচরণে শিষ্ট হলে কি হয়, খুবই স্পষ্টবক্তা মানুষ ছিলেন তিনি। য়ুরোপীয় বন্ধুদের কাছেও মতামত প্রকাশ করতেন দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায়, প্রয়োজন হলে তিরস্কার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একজন তরুণ সিভিলিয়ান একবার তাঁর কাছে অভিযোগ করেন যে মিঃ (পরে স্যর) ফ্রেডরিক হ্যালিডে তাঁর সঙ্গে ভারি কঠোর আচরণ করতে লেগেছেন। তখন দ্বারকানাথ তাঁর হয়ে হ্যালিডে-র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, বন্ধুদের মধ্যে প্রচলিত তাঁর ডাকনামে হ্যালিডেকে সম্বোধন করে লিখলেন, 'শুনছি রাজা ফ্রেডরিক, আপনি নাকি আপনার বিভাগের জনৈক তরুণ অফিসর-এর উপর অত্যাচার কবতে লেগেছেন। খবরটা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে।' হ্যালিডে অজুহাত দিলেন যে তাঁর বিভাগের কাজকর্ম ঠিকমতো চালনার জন্য কিঞ্চিৎ শাসন দরকার। দ্বারকানাথ পুনরায় তাঁর আপত্তি জানালে পর হ্যালিডে কথা দেন যে তরুণ অফিসারটিকে তিনি আর জ্বালাতন করবেন না। আর একবার তিনি তাঁর নিজের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের একজন সম্পন্ন সহকারীর আচরণে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করেন। লোকটি বিলাতে তার মায়ের কাছে টাকাপয়সা কিছু পাঠাচ্ছিল না। দ্বারকানাথের ধমক খেয়ে সে কথা দেয় অতঃপর সে তার আচরণ শুধরে নেবে। তারপর থেকে সে নিয়মিত মায়ের কাছে অর্থসাহায্য পাঠাত।'[৭১]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে দ্বারকানাথের মতো স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক সমালোচক তদানীন্তন বিদেশী সরকার তথা য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হতে পেরেছিলেন। অথচ সেকালের ইংরেজ আমলা এবং সাধারণভাবে অধিকাংশ য়ুরোপীয় সম্বন্ধে বলা হত যে তারা ছিল জাতিবর্ণের ব্যাপারে দাম্ভিক ও দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে-আচরণে উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী। আজকের দিনে ভাবতে অদ্ভুত লাগে, এক সময়ে এ-দেশের সাধাবণ মানুষ মনে করত যে কলকাতায় সরকারী কর্তৃত্ব ও সামাজিক মর্যাদার আসন ছিল দুইটি—বড়লাট-ভবন ও বেলগাছিয়া-ভিলা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিতুলনীয়।

১৮৩৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে ফ্যানি পার্কস কলকাতায় ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে পারিতোষক-রূপে প্রদত্ত দুটি রূপোর কাপ-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'মিস ইডেন-এর নকশা অনুসারে নির্মিত অকল্যাণ্ড কাপটি আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। তার পাশে ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর নামে একজন ধনাঢ্য বাঙালীর দেওয়া সূক্ষ্ম কাজকরা আর একটি কাপ। কাপটির কারিগরি ভালো কিন্তু উৎকীর্ণ নকশার রুচি খুবই নিকৃষ্ট স্তরের—বাঙালীবাবু ছাড়া আর কেউ এমন নকশা অনুমোদন করতে পারত না।'[৭২] দ্বারকানাথ-প্রদত্ত এই কাপ সম্বন্ধে ব্যাপটিস্ট মিশন-এর মুখপত্র **সমাচার দর্পণ**-এর

অভিমত কিন্তু অন্যরূপ। ১৮৩৭ অব্দের ৭ জানুয়ারি সংখ্যায় **দর্পণ** লিখেছেন ঃ 'মহিমার্ণব লর্ড অকল্যাণ্ড-এর বাসভবনে তৃতীয় দফা নৈশ সমাগমে বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রমহোদয়ের সমাগম হয়েছিল। সেখানে বহু সুদৃশ্য সামগ্রী প্রদর্শিত হয়—তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল দুটি সুপরিকল্পিত রৌপ্যাধার বা কাপ। একটি নির্মাণ করেছেন বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থব্যয়ে হ্যামিলটন কোম্পানী। এই বস্তুটির ওজন প্রায় হাজার তোলার কম নয়। এটির কারিগরি বিস্ময়করভাবে সুন্দর, হ্যামিলটন কোম্পানীর দেশীয় স্বর্ণকারেরা এজন্য প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। এই দুটি কাপই আগামী ঘোড়দৌড়ে পারিতোষিক-রূপে প্রদত্ত হবে।'[২২]

দ্বারকানাথ যদি চল্লিশ বছর পরে জন্মাতেন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রীরা হয়তো তাঁকে অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রাখতেন। গভর্ণর-জেনারেল হয়তো তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন রাজায়-প্রজায় তফাৎ অনেক। দ্বারকানাথের জীবৎকালে কেন এমনটা ঘটে নি তার ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ব্লেয়র ক্লিং। দ্বারকানাথের এই সর্বশেষ জীবনীকার বলেছেন ঃ

'এমনটা যে ঘটেছিল তার অন্যতম কারণ হল এই যে তখনো ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশেরা তাদের প্রভুত্ব সর্বত্র বিস্তার করতে পারে নি। মারাঠা-বিজয় তখন সবে সমাপ্ত হয়েছে, শিখেরা তখনো স্বাধীন ও শক্তিশালী। উত্তর-পশ্চিমের অ-রক্ষিত গিরিপথ অতিক্রম করে রাশিয়া যে-কোনো দিন হানা দিতে পারত। এই প্রকার পরিস্থিতিতে রাজভক্ত, বশম্বদ ও একান্ত নির্ভরযোগ্য বাঙালী ভূস্বামীরা যে কোম্পানী-রাজের স্তম্ভরূপে পরিগণিত হবেন—এ তো স্বতঃসিদ্ধ। বাঙালী-ভূস্বামীদের প্রতিভূরূপে দ্বারকানাথ সরকারের সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি তো ঘরের লোক, গভর্ণর-জেনারেলদের তিনি বিশ্বাসভাজন, তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও অর্থবিত্তের সৌভাগ্য—সমস্ত কিছুই তো নির্ভর করছে ব্রিটিশ-প্রভুদের মর্জির উপর। সেইসঙ্গে এটাও সত্য যে তাঁর মতো লোকের সদিচ্ছা ও সমর্থন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা ভারত সরকারের পক্ষে একান্তভাবে কাম্য। সে-যুগটা ছিল পরহিতব্রতের নাম করে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের যুগ, সে-যুগে ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপকে নৈতিক মুখোশ পরিয়ে সোচ্চারে প্রচার করতে হত ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শুভাগমন হয়েছে সভ্যতার বাহনরূপে। দ্বারকানাথ ছিলেন কোম্পানী-শাসনতন্ত্রের সাফল্যের প্রতীক। তিনি ছিলেন এমন একজন 'নেটিভ' যিনি কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন সভ্যতার আলোকে, যিনি উত্তমরূপে ইংরাজী ভাষা বলতে কইতে লিখতে পারেন, যিনি ইংরাজী আদবকায়দা আচার-আচরণের ভক্ত এবং যিনি স্বদেশের তথা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের হিতসাধনে একব্রত। এমন লোককে প্রোৎসাহিত করতে হবে সর্বভাবে, রাজভক্তির পরাকাষ্ঠারূপে, দেশকে পাশ্চাত্যীকরণের অগ্রদূতরূপে এঁকে তুলে ধরতে হবে অন্য ভারতীয়দের দৃষ্টান্তস্থল ক'রে। কোনো কোনো ইংরেজ বললেন এঁকে 'নাইট' খেতাব দেওয়া হোক, কেউ

বললেন দ্বারকানাথ ও তাঁর সংস্কারক-বন্ধুরা জাত খুইয়েছেন বলে রোমান ধরনে ক্ষতিপূরণ করা হোক তাঁদের পুরো ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার দিয়ে। এই সব প্রস্তাবিত মানসম্মান বাস্তবে পরিণত না হয়ে থাকলেও অনতিকালের মধ্যে দ্বারকানাথকে ব্রিটিশরা যেভাবে গণ্যমান্য করেছে তেমন আর কোনো ভারতীয়কে করে নি—না তাঁর পূর্বে, না পরে।'[৪৪]

১৮৩৪ অব্দের পর থেকে দ্বারকানাথ তাঁর একক প্রচেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোগী হয়ে কার-টেগোর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন। বিচিত্র কাজ-কারবার তাঁকে পরিচালনা করতে হত, কাঁচা মালকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত করতে গিয়ে একটি কারবারের সঙ্গে যুক্ত করতে হত অন্য কারবারকে। সেই সঙ্গে জনহিতকর কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য অথবা যুক্ত থাকার জন্য, ক্রমাগত তাঁর উপর অত্যধিক চাপ পড়তে লাগল। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। বাইরে থেকে তাঁকে দেখে মনে হত বিশ্রাম কাকে বলে তিনি জানতেন না, অক্লান্ত শক্তিতে তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করে যেতেন। কিন্তু আসলে তিনি তো শক্তসমর্থ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ ছিলেন না, হালকা পাতলা দোহারা ধরনের ছিল তাঁর দেহের গড়ন। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার ফলে তিনি স্থির করলেন পরের বছর (১৮৩৫) পশ্চিম-ভারত সফর করবেন জলহাওয়া বদলের জন্য। সেখানকার আবহাওয়া শুকনো ও স্বাস্থ্যকর, বাংলাদেশের মতো স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভ্যাপ্সা নয়। তাছাড়া ওসব অঞ্চলে আছে হিন্দুদের বহু পবিত্র তীর্থস্থান এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় নানা জায়গা, বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। কিছুকাল আগে মাতা অলকাসুন্দরীকে পাঠিয়েছিলেন পশ্চিম-অঞ্চলে তীর্থযাত্রায়।

দ্বারকানাথ নিছক স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য পশ্চিম-সফরে বেরিয়েছিলেন বলে মনে হয় না; হ্যাঁ, হাওয়াবদলের প্রয়োজন ছিল বৈকি, তাছাড়া, গোঁড়া হিন্দু না হলেও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব তো তিনি ছিলেন, সুতরাং তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল তাঁর মনে। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগের জন্মদাতা, কাজেই তিনি নিশ্চয় ঘুরে ঘুরে বাজার দেখতেও চেয়ে থাকবেন, নূতন কোনো কাজকারবারে মূলধন নিয়োগ করা যায় কিনা সে-ভাবনাও হয়তো তাঁর মনে ছিল। সেই প্রাক্-রেলওয়ে যুগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া ছিল বিস্তর সময়সাপেক্ষ, তাছাড়া, বিপদও ঘটতে পারত বিলক্ষণ, কারণ বনজঙ্গল ছিল শ্বাপদসংকুল, আর চোর-ডাকাতের উপদ্রব তো লেগেই থাকত। অবশ্য স্থলপথে না গিয়ে জলপথেও যাওয়া যেত, কিন্তু জলপথে নৌকা-বজরায় চলাচল ছিল খুবই মন্থরগতি। বেণ্টিঙ্ক স্টিমার-সার্ভিস প্রবর্তন করার পর অবশ্য জলপথে ভ্রমণের সুখসুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ ভ্রমণ করেছিলেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-বরাবর, ঘোড়াগাড়ি চেপে, সঙ্গে ছিল সশস্ত্র পাইক বরকন্দাজের বৃহৎ একটি দল, প্রচুর চাকর নফর বেয়ারা খানসামা হালুইকর রসুইকর। আর ছিল দুজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক—একজন ইংরেজ ডাক্তার

এবং দ্বারকানাথ গুপ্ত নামে একজন বাঙালী কবিরাজ—যিনি বৈদ্য হয়েও নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। যে-সব ভারতীয়েরা প্রথম পাশ্চাত্য ধরনের চিকিৎসায় ব্রতী হন, গুপ্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম, তিনি জ্বরের একটি মিক্‌শ্চার তাঁর নিজের নামে পেটেন্ট করিয়েছিলেন। তাঁর চিৎপুরের ওষুধের দোকান থেকে এই মিক্‌শ্চারের বোতল বিক্রয় হত প্রচুর পরিমাণে।'[৩৫]

দ্বারকানাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল সরেজমিনে রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখবার। উইলিয়ম জোনস নামে এক উদ্যোগী ইংরেজ তাঁর একক চেষ্টায় ১৮১৫ অব্দে রানীগঞ্জে কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু করেন। পরে এই খনিই ভারতের 'প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম' কয়লাখনিরূপে স্বীকৃত হয়। জোনস-এর মৃত্যুর পর কয়লাখনির স্বত্ব কিনে নিয়ে কয়লা তোলার কাজ করত আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী। ১৮৩২ অব্দে এই কোম্পানী ফেল পড়ার পর, দু-বছর বাদে (১৮৩৪) রানীগঞ্জ কয়লাখনি বাজারে বিক্রয়ের জন্য ওঠে। খনি ক্রয় করার আগে দ্বারকানাথ রানীগঞ্জ এসে স্বচক্ষে সব কিছু দেখেছিলেন। ১৮৩৬ অব্দের ৯ জানুয়ারী সংখ্যা **সমাচার দর্পণ** থেকে জানা যায়, সেই বছরেই মাত্র সত্তর হাজার টাকায় দ্বারকানাথ রানীগঞ্জ কয়লাখনি কিনে নেন। ব্লেয়র ক্লিং-এর মতে, দ্বারকানাথের কারবারী জীবনের বৃহত্তম ঘটনা হল রানীগঞ্জ কয়লাখনি ক্রয়। হাতবদল হওয়া সত্ত্বেও এই কয়লাখনি এখনো চালু এবং জ্বালানীর উৎসরূপে এর সমৃদ্ধি ও প্রাধান্য এখনো সর্বস্বীকৃত। ১৯৭৬ অব্দের ১৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় কলকাতার বাংলা দৈনিক **যুগান্তর** একটি কৌতূহল-উদ্দীপক ফোটোচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। ফোটোটি ছিল রানীগঞ্জ অঞ্চলের নারাণকুড়িতে অবস্থিত নুনিয়া নদীর তীরবর্তী একটি বাংলো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কলকাতা থেকে ১৩০ মাইল পশ্চিমে দ্বারকানাথ নিজ বসবাসের জন্য রানীগঞ্জে এই বাংলো বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলো বাড়ির সংলগ্ন জমিতে একটি ইট-বাঁধানো বেদী রয়েছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ঘিরে। শোনা যায়, সন্ধ্যাবেলা এই বেদীর উপর বসে দ্বারকানাথ আপন মনে গান গাইতেন।

ভারতে তখনো রেলওয়ে আসে নি, সুতরাং কয়লার উপযোগ হত প্রধানত গঙ্গায় যেসব ফেরী-স্টিমার চলাচল করত তাদের জ্বালানীরূপে। গঙ্গার ধারে যে-সব স্টেশন আছে তাদের ধারে-কাছে কয়লার ডিপো বসালে কেমন হয় একবার ভেবে দেখা দরকার। এই সব কথা ভাবতে গিয়ে দ্বারকানাথের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত—তিনি যেন স্বপ্নে দেখতেন কেবল কয়লাখনি নয়, কয়লাব ডিপো নয়, পরন্তু তিনি যেন নিজের স্টিমার-সার্ভিস চালু করেছেন গঙ্গাতীরবর্তী বহু ঘাটে, বহু শহরে, বন্দরে। তাঁর এই স্বপ্ন সত্য হয়েছিল অনতিদূরবর্তী কালে।

বর্ধমান জেলায় অবস্থিত রানীগঞ্জ থেকে দ্বারকানাথ রওনা হয়ে গেলেন কাশী অভিমুখে—ধর্মপ্রাণ সকল হিন্দুর সর্বতীর্থসার হল কাশী, খ্রীস্টানদের কাছে রোম

যেমন শাশ্বত শহর, হিন্দুদের কাছে কাশী তেমনি। বেশ অনুমান করা যায় পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগাহন করে সকল পাপের মলিনতা স্খালন করে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা দিয়ে থাকবেন, দক্ষিণা দিয়ে থাকবেন পাণ্ডা পুরোহিত সাধু সন্ন্যাসীদের। আশাতীত মোটা হারে দক্ষিণা পেয়ে তারা দু-হাত তুলে কলকাতার কুবেরকে নিশ্চয় প্রভূত আশীর্বাদ ও সাধুবাদ দিয়ে থাকবে এবং দ্বারকানাথ নিশ্চয় একটু বাঁকা হাসি হেসে তাদের এইসব স্তুতিবাক্য শুনে থাকবেন। কিন্তু পুণ্যতোয়া গঙ্গা তো কাশীর একমাত্র মহিমা নয়, ব্যবসায়ীদের চোখে কাশীর আরো এক মহিমা হল সাচ্চা জরি-দার রেশম বা কিংখাব যার সুনাম ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। কার-টেগোর কোম্পানী রেশম আমদানি করত চীন দেশ থেকে। দ্বারকানাথ কাশীর বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দরদস্তুর স্থির করে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে কাশীর জরি-দার কিংখাব ও অন্যান্য বিলাস-সামগ্রী নিয়মিত কলকাতার কুঠিতে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে রপ্তানি হয়ে যায় বিলাতে ও পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য দেশে। প্রথম যে-বার তিনি বিলাত যান, দ্বারকানাথ ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন কাশীর কিংখাব ও কাশ্মীরের শাল। কাশী থেকে তিনি গেলেন প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদে; সেখানকার গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণীসংগমে প্রিয়জনের চিতাভস্ম বিসর্জন দিলে তাদের আত্মা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। দ্বারকানাথ নিশ্চয় সেই সংগমে হিন্দুদের অতি-পরিচিত মন্ত্রাদি পাঠ করে স্নানান্তে শুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বুভুক্ষু ব্রাহ্মণদের ভুরিভোজনে তৃপ্ত করেছিলেন। বাহ্যিক দিক থেকে সায়েবসুবোদের ধরনধারণ তাঁর পছন্দ ছিল, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের নানারকম কার্যকলাপ হয়তো তাঁর মনে হত হাস্যকর বাড়াবাড়ি। কিন্তু গর্ভজাত না হলেও তিনি ছিলেন অলকাসুন্দরীর পুত্র—আশৈশব তাঁরই হাতে মানুষ। মায়ের ধর্মভাব নিশ্চয় তাঁর মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়ে থাকবে।

দুঃখের বিষয়, দ্বারকানাথ এই পশ্চিমভারত ভ্রমণের কোনো দিনলিপি রেখে যান নি, রেখে গিয়ে থাকলেও তাঁর অন্যান্য কাগজপত্রের মত এগুলিও হারিয়ে গিয়ে থাকবে। তিনি চিঠিপত্র লিখতেন ভালো, নিশ্চয় ভ্রমণ-কালে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনোজ্ঞ করে লিখে থাকবেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁর সহকারীদের কাছে। সে-সব চিঠিপত্রের চিহ্নমাত্র নেই। সুতরাং পশ্চিমভারতে তাঁর এই ভ্রমণের যথাযথ ভ্রমণপঞ্জী পাওয়া যায় না—জানা যায় না কোন্ কোন্ জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন, কোথায় কী করেছিলেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকার খবরাখবর একত্র করে যতটুকু জানা যায় তা থেকে মনে হয় পশ্চিমভারতে তিনি চার বার ভ্রমণ করেছিলেন ১৮৩৫, ১৮৩৮, ১৮৪১ ও ১৮৪৩ অব্দে। পূর্ববর্তী জীবনীকারেরা এই সব ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে সন তারিখ গুলিয়ে ফেলেছেন—বিশেষত ১৮৩৫ অব্দের কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন ১৮৩৮ অব্দের কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর দেখাদেখি ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের

দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় (আশা করা যায় যে **সমকালীন** পত্রিকায় এঁর লেখা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধমালা অনতিদূরকালে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-আকারে গ্রথিত হবে।) লিখেছেন যে এলাহাবাদ থেকে দ্বারকানাথ যান আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবনে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাতার দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটিল।' এই ঘটনা নিশ্চয় ঘটে থাকবে ১৮৩৮ অব্দে দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সফরের সময়, কারণ অলকাসুন্দরীর দেহান্তর-প্রাপ্তি হয় সেই বছরের মার্চ মাসে। ১৮৩৮ অব্দের ১৭ মার্চ সংখ্যায় **সমাচার দর্পণ**-এর রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে মাতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পেয়ে দ্বারকানাথ সত্বর কলকাতা ফেরবার উদ্দেশ্যে স্থলপথে না এসে গঙ্গার ভাটি-পথে স্টিমারযোগে রওনা হয়েছিলেন। **দর্পণ**-এর সংবাদদাতা লিখেছিলেন যে সকলেই আশা করে বসেছিলেন যে-কোনো দিন তাঁকে নিয়ে বোট এসে কলকাতা পৌঁছবে। ২১ মার্চ তারিখের **ইংলিশম্যান** খবর দিলেন ঃ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর গতকাল কলকাতা ফিরে এসেছেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হাওয়া বদলের ফলে তাঁর শরীরস্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল। জানা গেল, স্টিমারের কেবিনে বেশ কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ থাকবার পর, যখন তিনি জলপথ ছেড়ে স্থলপথে সফর করার জন্য সদ্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছয় যে তাঁর মাতার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। যে-পারিবারিক চিকিৎসক চিঠি লিখে তাঁকে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন, তিনি দ্বারকানাথকে নিশ্চিতি দিয়ে বলেছিলেন যে মাতার রোগ নিরাময়ের জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টিত আছেন, সুতরাং দ্বারকানাথ মনে কোনো আশঙ্কা যেন পোষণ না করেন। কিন্তু পুত্র কি চিকিৎসকের এই নিশ্চিতি পেয়ে প্রবোধ মানতে পারেন? সুতরাং দেশপর্যটনের মায়া পরিত্যাগ করে, বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে জেনেশুনেও, তিনি কালবিলম্ব না করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থির করেন। এত করেও কিন্তু মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তিনি পৌঁছতে পারেন নি, পাঠকেরা নিশ্চয় এ-খবর ইতিপূর্বে পেয়ে থাকবেন...।'

সে যাই হোক, যে-বছরেই তিনি আগ্রা-ভ্রমণে যান না কেন, মোগল-স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও মহিমা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্য তখনো কোনো প্রত্নবিভাগ সংগঠিত হয়নি; প্রাসাদ, সমাধি, মসজিদ, মিনার তখন অনাদরে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, কালাপাহড়ের দল সুবিধা পেলেই এইসব পুরাকীর্তির মহামূল্য সামগ্রী লুটপাট করে নিত। তৎসত্ত্বেও যতটুকু তিনি দেখতে পেলেন তাতে চমৎকৃত হলেন। তাজমহলের শ্বেতশুভ্র মর্মর, সূক্ষ্ম জালির কাজ, নানাবর্ণ পাথরের তৈরি মিনে-করা নক্‌শা প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে হল তাজমহল হল 'স্থাপত্য-শিল্পের কোহিনুর'। আগ্রার কেল্লাও তিনি খুব ভালো করে দেখেছিলেন। কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বছর আগে, ১৮০৩ অব্দে, এই আগ্রা কেল্লাকে ঘিরেই তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে।

ইংরেজ সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল লেক এবং সিন্ধিয়া-মারাঠীদের অধিনায়ক ছিলেন ফরাসী সেনাপতি পেরোঁ। দ্বারকানাথ যখন ফোর্ট দেখতে যান তখনো সেখানে একদল বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। দরবারী পোশাকে সুসজ্জিত এই সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে দেখে তারা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল—ইনি কে হবেন, ফোর্ট-এর সিবিলিয়ান কর্মচারীরা কেন এঁকে এত খাতিরযত্ন করছে, ইনি দেখছি অনর্গল ইংরেজীতে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। তারা কোনো সূত্রে জানতে পারল এই 'বাঙালী বাবুটি' স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলের পেয়ারের লোক, কলকাতায় এঁর খুব নাম ডাক। তখন একদল রোমান ক্যাথলিক আইরিশ সৈন্য নিজেদের মধ্যে স্থির করে যে সেই বাঙালী বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ফোর্ট-এর দুটি কক্ষে খ্রীস্টধর্মী অ্যাঙ্গলিকান ও রোমান ক্যাথলিকদের জন্য দুটি পৃথক ভজনালয় ছিল। দুটিই জীর্ণদশাগ্রস্ত। ক্যাথলিক ভজনালয়ের অবস্থা একটু বেশি খারাপ। আইরিশ সেনারা দ্বারকানাথের কাছে নিজেদের দুঃখ জানিয়ে বলল সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে সংস্কারের অভাবে তাদের ভজনালয়ের অবস্থা পতনোন্মুখ, বাবু কি কিছু সাহায্য দেবেন? দ্বারকানাথ খোঁজখবর নিয়ে আইরিশ ক্যাথলিকদের অভিযোগ সত্য বলে জানতে পেরে ভজনালয় সংস্কারের জন্য তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা দান করেছিলেন।

এই আগ্রা ফোর্ট-সম্পর্কিত আরো একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায়। পারিবারিক কিংবদন্তী পরম্পরায় তিনি শুনেছেন যে দুর্গ-পরিক্রমাকালে প্রহরীদের চমক লাগিয়ে দ্বারকানাথ গ্যাটগ্যাট করে ঢুকে পড়েছিলেন খোদ ডেপুটি গভর্ণর টমসনের খাস-কামরায়। কলকাতায় থাকতে টমসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। টমসন তখন দরজার দিকে পিঠ করে টেবিলে বসে কীসব লিখতে ব্যস্ত। দ্বারকানাথ তখন পা টিপে টিপে সায়েবের ঘাড়ের উপর সুড়সুড়ি দিতে সায়েব তো গাঁক্ গাঁক্ করে উঠলেন, পিছন ফিরে অনধিকার-প্রবেশকারীকে একনজর দেখেই তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দু-হাতে করমর্দন করে বললেন ঃ 'ও হো, এ যে তুমি, ডোয়ার্কি!' শাস্ত্রীর দল তো ব্যাপার দেখে অবাক!

আগ্রা থেকে দ্বারকানাথ গেলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা ও তাঁর বাল্যলীলার বৃন্দাবনে। ভক্ত বৈষ্ণবদের (নিষ্ঠাবন বৈষ্ণব পরিবারে দ্বারকানাথের জন্ম) চোখে মথুরা-বৃন্দাবন মহাতীর্থ। মথুরা-বৃন্দাবন দেখে দ্বারকানাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানবার উপায় নেই। দিনলিপি নেই, চিঠিপত্র নেই, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কিছু লিখে যাননি। কিশোরীচাঁদ মিত্র-লিখিত জীবনী থেকে কেবল বৃন্দাবনে একটি ঘটনার কথা জানা যায় ঃ 'সেখানে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করে চৌবেদের একটি ভোজ দিলেন। চৌবেরা ছিলেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবনের মন্দিরে তাঁরা পাণ্ডা-পুরোহিত। যে-তমাল বনের ছায়ানিবিড় কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা হত বলে

লোকশ্রুতি, ভোজের আয়োজন হয়েছিল সেইখানে। চৌবেরা ভোজনবীর বলে এখনো বিখ্যাত। তাঁরা নিজেদের লোটা ভরে ভাঙ এনেছিলেন এবং ভোজনের পূর্বে ক্ষুধা বাড়িয়ে নেবার জন্য ভাঙ খেয়েছিলেন প্রচুর, ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই তিন-চার সেরের মতো পুরী ও মেঠাই পরম তৃপ্তিতে গলাধঃকরণ করেছিলেন। ভরপেট ভোজ খেয়ে হাঁশফাঁস করতে করতেও তাঁরা সমস্বরে হর্ষ প্রকাশ করে চেঁচিয়েছিলেন, শ্রীরাধামাঈ কী জয়, দোয়ারকানাথবাবু কী জয়!' শোনা যায়, বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাবার আগে যমুনা নদীর কেশীঘাটের কাছে সাধু ও গরিবদের জন্য একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এককালীন একটি মোটা অঙ্কের টাকা দ্বারকানাথ দান করে গিয়েছিলেন, সে-তহবিলের পরে কী দশা হয়েছিল জানা যায় না।[৪৭]

১৮৩৫ এবং ১৮৩৮—এই দুই বছরেরই সফরকালে দ্বারকানাথ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত, জমির স্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তন্ন তন্ন খোঁজখবর নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওই সব অঞ্চলের জমিদার-তালুকদারদের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চাইবেন—এতে আর আশ্চর্য কি। কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে বাংলাদেশের জমিদারেরা যে-সব সুখ-সুবিধার অধিকারী হয়েছেন, দ্বারকানাথ চেয়েছিলেন ওই সমস্ত দেশের ভূস্বামীরাও অনুরূপ সুখ-সুবিধা লাভ করুন। রামমোহন রায় রায়তদের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন, দ্বারকানাথের আগ্রহ ছিল কিসে জমিদারদের লাভ হয়, সুবিধা হয়—স্বকীয় শ্রেণী সম্বন্ধেই তিনি ছিলেন শ্রেণী-সচেতন।

১৮৪০-৪১ অব্দে শীতের মরশুমে মুখ্যত স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য দ্বারকানাথ তৃতীয় বার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সফরে বের হন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে এক কলঙ্কময় সঙ্কট থেকে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ককে উদ্ধার করতে হয়; তিনি যদি তা না করতে পারতেন তাহলে আমানতকারীরা কাতার দিয়ে দাঁড়াত ব্যাঙ্ক থেকে তাদের গচ্ছিত অর্থ তুলে নেবার জন্য। ১৮৪০ অব্দের ২৭ আগস্ট সংখ্যায় **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** এই সঙ্কটের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন যে আগের দিন ব্যাঙ্ক-এর পরিচালক-মণ্ডলীর সভায় জানানো হয় যে ব্যাঙ্ক-এর একাউন্টেন্ট এ. এইচ. সিম তহবিল তছরূপ করে ব্যাঙ্ক থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যে দ্বারকানাথ সভ্যদের বললেন, ঘটনাটার যদি লোক-জানাজানি না হয় তাহলে তিনি নিজের পকেট থেকে ব্যাঙ্ক-এর ঘাটতি টাকা পূরণ করে দিতে প্রস্তুত আছেন। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দ্বারকানাথ টাকাটা দিতে ইতস্তত করেননি। লংভিল ক্লার্ক ছিলেন সেকালে প্রথম সারির ব্যারিস্টার—অপিচ তিনি ছিলেন দ্বারকানাথের সুহৃদ ও সহচর। ২৫ আগস্ট তারিখে **ইংলিশম্যান** কাগজে প্রকাশিত তাঁর একটি চিঠিতে ক্লার্ক ঘটনাটি বিশদ করার জন্য বলেছিলেন: 'ঘাটতি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে ঘটনাটা লোকগোচর করা হবে না। কিন্তু খবরটা চেপে রাখা যায়নি,

জানাজানি হয়েছিল এবং সেই জানাজানি হবার ফলে প্রতিশ্রুতি যিনি দিয়েছিলেন তাঁর আর-কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা সর্বাংশে সফল হয়েছে—ব্যাঙ্ক থেকে গচ্ছিত টাকা তুলে নেবার জন্য আমানতকারীরা কাতার দেননি, ব্যাঙ্ক-এর সুনাম টলে নি, শেয়ার-মূল্য হ্রাস তো পায়ইনি বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাঙ্ক-এর একটি টাকাও লোকসান হবে না, কারণ সিম সায়েবের জামিন জামানত দায়দায়িত্ব সমস্ত দ্বারকানাথ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন—শর্তাধীন প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত হয়েও তিনি স্বেচ্ছায় সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।'

১৮৪১ অব্দের ২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় **ফ্রেন্ড অব্ ইণ্ডিয়া** তাঁদের সাপ্তাহিক ঘটনাবলীর নির্ঘণ্টে লিখেছিলেন ঃ 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্থান-পরিবর্তন ও বায়ু-পরিবর্তনের ফলে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের শরীর ও স্বাস্থ্য প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে।' ১৮৪১ অব্দের ২৮ জানুয়ারী তারিখে ওই একই কাগজে 'জনৈক নেটিভ সংবাদদাতা'র রিপোর্টটি অনেক বেশি কৌতূহল-উদ্দীপক। ইনি লিখছেন ঃ '**প্রভাকর** জানিয়েছেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পর্যটনের অবসরে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর হিন্দু-শাস্ত্রাদির কঠোর বিধান অনুসারে গয়া-বারাণসী উভয় তীর্থেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান সমাপন করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতায় পুরোহিতদের সকলকে বহুমূল্য সোনারূপার তৈজসপত্র দক্ষিণা দিয়েছেন। এই সংবাদ শুনে কলকাতার গোঁড়া হিন্দুদলের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে উক্ত বাবু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ করেছেন তদ্বিষয়ে তাঁর মনে চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি এতকাল বাদে তাঁর শেষ বয়েসে যথাযথভাবে প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন যাতে মৃত্যুর পর তাঁর বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ হিন্দুদের স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার হয়। ধর্মসভার সদস্যেরা হয়তো এতদ্দণ্ডে উল্লসিত হয়ে ভাবছেন যে বিশিষ্ট ও একনিষ্ঠ একজন বেদান্তবাদী—যিনি এতকাল হিন্দুধর্মাশ্রিত রীতিনীতির বিরোধিতা করে এসেছেন—বিধাতার জ্ঞানময় বিধানে তিনি পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। একাধিক ব্যক্তি বলছেন যে প্রায়শ্চিত্তের ফলে বাবুর ধমনীতে এখন নূতন রক্তের সঞ্চার হয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রায় প্রত্যেক গোষ্ঠীই এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লেগেছেন যে অতঃপর উক্ত বাবু এরূপ আচার-আচরণ করবেন যা নাকি শাস্ত্রসম্মত এবং যা হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও অনুশাসনের বিরোধী নয়। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই প্রায়শ্চিত্ত সত্যকার ধর্মভাব-প্রণোদিত অথবা নিতান্তই পাণ্ডা-পুরোহিতদের নীতি-বিধানের জন্য কিনা—সে-কথা নিশ্চিত বলা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে আমরা বলতে বাধ্য, এই কর্মের নৈতিক প্রতিক্রিয়া কলকাতায় যে সমাজসংস্কার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল তাকে ব্যাহত করবে, কারণ এর ফলে বহুলোকের ধারণা হবে অদ্ভুত অযৌক্তিক ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মই হল শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তাবৎ দেশীয় জনসাধারণের পক্ষে শেষ অবলম্বন ও পরম আশ্রয়। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে উক্ত বাবু মীর্জাপুর শহরে তাঁর য়ুরোপীয় বন্ধুদের একটি বল্‌নাচ

ও নৈশ-ভোজনে আপ্যায়ন করেছেন। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতেই হবে মীর্জাপুরের এই ঘটনা এবং গয়া-বারাণসীর প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম—এই দুই ঘটনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিস্তর। দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা-পুরোহিতদের উল্লাস এবং গয়া-বারাণসী নিয়ে শ্রীরামপুর মিশনরিদের বিলাপ এই উভয় ব্যাপারেই দ্বারকানাথ নিশ্চয় আড়ালে খুব একচোট হেসে থাকবেন।'

সেকালে দেশভ্রমণ ছিল যেমন কষ্টকর তেমনি বিপজ্জনক। পাইক বরকন্দাজ লোকলস্কর বাবদ খরচও হত দেদার। এসব সত্ত্বেও দেশভ্রমণ ছিল দ্বারকানাথের পক্ষে পরম আনন্দের ব্যাপার। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথও দেশভ্রমণ থেকে প্রচুর আনন্দ পেতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার কাছ থেকে সম্ভবত এই একটি নেশাই পেয়ে থাকবেন। বরঞ্চ বলা যায়, দ্বারকানাথের সর্বকনিষ্ঠ পৌত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের অজ্ঞাতে পিতামহের অনেক অনুরাগের বিষয় আত্মস্থ করেছিলেন, তার মধ্যে দেশভ্রমণ অন্যতম। দুঃখের বিষয়, দ্বারকানাথ তৃতীয় ও চতুর্থবার যখন পুনরায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, তাঁর সে-দুটি সফর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনা থেকে চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনচর্যা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সেইটুকু সময়সীমার মধ্যেও নথিপত্র বা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ কত-যে বিরল ভাবতেও অবাক লাগে। কী করে বা কেমন করে এমনটা ঘটে সে আমাদের বোধের অগম্য।

বরঞ্চ, তাঁর বেলগাছিয়া ভিলার বাগানবাড়িতে কলকাতার য়ুরোপীয় কিংবা এতদ্দেশীয় অভিজাতবর্গকে আপ্যায়নের জন্য দ্বারকানাথ যেসব আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, রঙ্গরস ও সঙ-তামাশার ব্যবস্থা করতেন সেইসব ঘটনা নিয়ে সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। পশ্চিম-ভারতে তাঁর তৃতীয় সফরের পর ১৮৪১ অব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বারকানাথ বেলগাছিয়ায় যে-ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে **ক্যালকাটা কুরিয়র** তাঁদের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ 'গত রাত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ওখানে যে-সমাবেশ হয়েছিল সেরকম জমজমাট সমাবেশ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন মাননীয়া মিস ইডেন, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান এবং কলকাতা অভিজাত-সমাজের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আসবাবপত্রে, পর্দায়, গালিচায় ভিলার প্রত্যেকটি কক্ষ ছিল নূতন ধরনের ও সুরুচিসম্মতভাবে সুসজ্জিত ও আলোকোদ্ভাসিত। সেদিনের রাত্রির মতো এত চমৎকার বাজি-পোড়ানো আমরা ইতিপূর্বে ভারতের অন্য কোনোখানে দেখিনি। গৃহকর্তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সঙ্গে সকল অতিথির পরিচর্যা করেছেন, কীসে তাঁদের আরাম ও তৃপ্তি হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন। অতিথিরাও যে এ-সমাবেশ খুবই উপভোগ করেছেন তার প্রমাণ এই যে বহু রাত অবধি তাঁরা ভিলাতেই ছিলেন, বাড়ি ফিরেছেন খুবই দেরি ক'রে।' সে-যুগে যারা লোকগীত বা ছড়া-চুটকি

বাঁধত সেইসব বাঙালী রসিক-প্রবরেরা, বেলগাছিয়ার আনন্দরসে বঞ্চিত হয়ে নিজেদের প্রবোধ দেবার জন্য মজার মজার ছড়া কাটত। একটি ছড়ার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

কিছুদিন পরে দেশীয় ভদ্রলোকদের জন্য আর-একটি ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে। দ্বারকানাথ ক্রমেই চেষ্টা করে চলেছিলেন কী উপায়ে এইরকম ভোজসভার মধ্য দিয়ে এতদ্দেশীয়দের সঙ্গে য়ুরোপীয়দের সামাজিক মেলামেশার পথ প্রশস্ততর করা যায়। এটাও তিনি জানতেন যে উভয়ের মধ্যে জোড় মেলানো ভারি শক্ত। তাই তিনি এ-বিষয়ে এগোতেন বিশেষ সাবধানে-সন্তর্পণে।

## টীকা

১. *Calcutta Old and New*, by H. E A. Cotton. W. Newman & Co.. Calcutta 1907 এছাড়াও অন্য প্রতিকৃতি আছে—এঁকেছেন স্যর মার্টিন শী. ব্যারন দা সোযাইতের এবং কাউন্ট দ্যোবসে। তাছাড়া কিছু স্কেচ ও কার্টুনও আছে।

২. *Fisher's Colonial Magazine*, Vol. I. 1842

৩. *Memoir*. P. 122.

৪. তদেব, পৃ. ১৮-১৯।

৫ কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী ম্যুজিয়ম-এ রক্ষিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাগজপত্রের মধ্যে এই কাহিনী দেখা যায়। দ্বারকানাথের মৃত্যু ও য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার সময় অক্টারলোনি জীবিত ছিলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বামীর সঞ্চিত ধন সবটাই হারান।

৬. *Memoir*, ক. ম., p. 20.

৭. বেলগাছিয়ায় তাঁর প্রখ্যাত বাগানবাড়ি বা ভিলা সম্পর্কে এই উল্লেখ।

৮ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে রক্ষিত *Our Family Correspondence* · 1835-57 থেকে উদ্ধৃত। এই বাঁধানো গ্রন্থে মূলত আছে কিছু চিঠির টাইপ-কপি। মূল চিঠি পাওয়া যায় না।

৯. তদেব।

১০. *The Indian Stage*, by Hemendra Nath Dasgupta, Four Volumes, Calcutta. 1934.

১১. *Our Family Correspondence* : 1835-57.

১২. *The Indian Stage*. Vol. I

১৩. *The Handbook of India, by Stocqueler.* ক্লিং তাঁর *Partner in Empire* পুস্তকের ১৮২ পৃষ্ঠায় জানেট হেয়ারকে লিখিত রাজারাম রায়ের একটি পত্র (১৩৭৯ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা 'বেহালা' থেকে পুনর্মুদ্রিত) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে এস্থার লীচ্ ও তাঁর কন্যাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য দ্বারকানাথ অশোভন উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এ-কাহিনী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মনে হয়। চিঠির ভাবে ও ভাষায় পত্রলেখকের অসূয়া স্পষ্ট, মনে হয় বাজার-গুজবের ভিত্তিতে রাজারাম এই অভিযোগ খাড়া করেছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কিছু দেননি।

১৪. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড।

১৫. দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ দিদিমার শয্যাপার্শ্বে থাকা সত্ত্বেও ভুল করে বলেছেন অলকাসুন্দরীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩৫ অব্দে। দ্রঃ 'আত্মজীবনী'।

১৬. *Englishman*, March 21, 1838.

১৭. দ্বারকানাথের বয়োকনিষ্ঠ জ্ঞাতিভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'রিফর্মার' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'রিফর্মার' গঙ্গাযাত্রার প্রথাকে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, মুমূর্ষু রোগীকে নদীতীরে খোলা আকাশের তলায় ফেলে রাখার ফলে বহু লোকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হয়। ১৮৩৫ অব্দের ৩০ এপ্রিল তারিখে *Friend of India* এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ পুরোপুরি পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন।

১৮. *Calcutta Courier*, March 12, 1838

১৯. 'সমকালীন', পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ : অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

২০. 'জীবনী', পৃ ৩৩ (উদ্ধৃতি)।

২১ *Travels in India*, by Leopold von Orlich.

২২. *Memoir*, p. 124.

২৩ *Letters from India*, by Hon'ble Emily Eden, Richard Bentley & Son London, 1872, 2 Vols

২৪. *The Stranger in India*, by George W Johnson, Henry Colburn, London, 1843. Vol I.

২৫. অমৃতময় মুখোপাধ্যায় : 'সমকালীন', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

২৬. *Ramtanu Lahiri, Brahmin and Reformer*, by Sivnath Sastri : Roper Lethbridge, London, 1907

২৭. দ্বারকানাথের নামে একাধিক ছড়া ও গান কলকাতায় তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরত। 'জীবনী', পৃ ১১৯-১২০-তে ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই ধরনের কতিপয় মৌখিক রচনা উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রভারতী অভিলেখাগারে রক্ষিত ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাগজপত্রে আরো কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায়।

২৮. *Dwarkanath Tagore . A 19th Century Pioneer* by Kalyan Kumar Das Gupta. *Indo-Asian Culture* Vol. XX, No. 3, July 1971

২৯. *Mainstream*, 20 December, 1973 (উদ্ধৃতি)।

৩০ কোম্পানী বাহাদুরের সরকার ১৮২২ অব্দে সর্বপ্রথম চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি 'স্কুল ফর নেটিভ ডকটরস' স্থাপন করেন। পরে এর নাম হয় ডাক্তার টাইটলার-এর স্কুল। ১৮২৭ অব্দে কলকাতা মাদ্রাসায় য়ুনানী পদ্ধতির চিকিৎসা শিক্ষার জন্য এবং সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাস খোলা হয়। ১৮৩৩ অব্দে দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে অবহিত হবার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ডাক্তার টাইটলার-এর স্কুল এবং মাদ্রাসার য়ুনানী ক্লাস ও সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ ক্লাস তুলে দেওয়া হয় ১৮৩৫ অব্দের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই সবের বিকল্পে স্থির হয় 'সর্বস্বীকৃত য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে' একটি নূতন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। ১৮৩৫ অব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় সরকার প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির সাহায্যে পাঠগ্রহণ করার জন্য উনপঞ্চাশ জন ছাত্র নির্বাচিত হন। সরকারের মাসিক বৃত্তি তহবিলে দ্বারকানাথ উপর্য্যুপরি প্রথম তিন বছর মোটা টাকার অনুদান দিয়েছিলেন। ডাক্তার ব্রামলি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ডাক্তার গুডিভ ও ডাক্তার ওশানেসি তাঁর সহকারী অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন।

দ্রঃ *Hundred Years of the University of Calcutta*, University of Calcutta, 1957.

৩১. প্রসিদ্ধি আছে যে সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ শ্রেণীর ভূতপূর্ব ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে যোগ দেবার পর সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। অধ্যাপক ব্রামলি ছাত্রদের দ্বারা প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের যে-রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু বলা হয়েছিল : 'গত ২৮ অক্টোবর

তারিখে চারজন স্বদেশীয় বিশেষ বুদ্ধিমান ছাত্র নিজ উৎসাহেই, সকল অধ্যাপক ও তাদের চোদ্দ জন সহপাঠীর উপস্থিতিতে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন এবং যথাযথভাবে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ প্রধান প্রধান অংশগুলি সনাক্ত করে দেখান।' এই প্রথম ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা হাতে-কলমে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় দ্বারকানাথ মেডিকেল কলেজে উপস্থিত ছিলেন কি না ব্রামলি-রিপোর্টে তার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ কিশোরীচাঁদ মিত্র-প্রমুখ যাঁরাই দ্বারকানাথের জীবনকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে শব-স্পর্শে জাতিনাশের ভয় ও ঘৃণা হিন্দু ছাত্রদের মন থেকে দূর করার জন্য এবং মানব-শরীর নীরোগ করার জন্যই যে শরীরের অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে তন্ন তন্ন জানা দরকার—এই কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য, প্রথম প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের সময় দ্বারকানাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। এ-থেকে অনুমান হয় যে প্রথম প্রথম ছাত্রেরা যখন নিজেরা শব-ব্যবচ্ছেদ না করে অধ্যাপকদের কৃত শব-ব্যবচ্ছেদ লক্ষ্য করত, ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য দ্বারকানাথ তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। মেডিকেল কালেজ খুলিবার পরেও তাঁহাকে এই কলেজের পণ্ডিত করিয়া রাখা হইল। দ্বারকানাথের উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে বল পাইয়া এই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তই অতি গোপনে কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত এক গৃহে সর্বপ্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার একখানি প্রতিমূর্তি এই কারণে কলেজ-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।' ('জীবনী'—পৃ. ১৬৮)

৩২. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত *Memoir* গ্রন্থের বাংলা সংস্করণে (সম্বোধি পাবলিকেশনস, কলকাতা) সম্পাদকীয় মন্তব্য। পৃ ২৮৪-৮৬।

৩৩. *Indian National Library*, Ed. B S. Kesavan National Library, Calcutta.

৩৪ *Letters from India*, by Emily Eden ১৮৪০ অব্দের ২৬ এপ্রিল তারিখে এমিলি এই পত্র লিখেছিলেন রেভাঃ রবার্ট ইডেনকে।

৩৫. *Bengal Harkaru*, June 21, 1836.

৩৬. *Glimpses of Bengal in the 19th Century*, by R. C. Majumder, Firma K L Mukhopadhyay, Calcutta, 1960

৩৭ *The Emergence of the Indian National Congress*, by S R Mehrotra, Vikas Publications, Delhi, 1971, p. 60.

৩৮. *Memoir*, p 29

৩৯. তদেব। পরিশিষ্টে পুরো বক্তৃতা উদ্ধৃত।

৪০. *Englishman*, 12 February, 1838

৪১. *Memoir* pp 66-68.

৪২. *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque during four and twenty years in the East*, by Fanny Parks, Pelham Richardson, London, 1850, Vol II, p. 104.

৪৩. 'সমাচার দর্পণ'। ৭ জানুয়ারি, ১৮৩৭।

৪৪. *Partner in Empire*, by Blair Kling, p. 167

৪৫ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ঃ 'সমকালীন', আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

৪৬. *Memoir*, p 37.

৪৭. তদেব, পৃ ৩৬; 'জীবনী', পৃ. ১৮৬। □

অষ্টম পরিচ্ছেদ

# প্রথম সমুদ্রযাত্রা

কিছুকাল ধরেই দ্বারকানাথ য়ুরোপ ও ইংলণ্ডে পর্যটনের কথা চিন্তা করছিলেন। লণ্ডনে পা দেবার পর তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এদেশে আসাটা আমার বিশ বছরের গভীর চিন্তার ফল।' ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পরিভ্রমণের মতো তাঁর বিদেশ-যাত্রার কারণ ছিল পাঁচমিশেলী ঃ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাওয়া-বদল, ঠাঁই-বদল, অভিনব দৃশ্যাদি দেখা, তীর্থ-ভ্রমণ (পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থানগুলি দেখা তো তাঁর পক্ষে তীর্থদর্শনেরই সামিল) এবং তাঁর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ। স্বদেশে দেশভ্রমণ করতে গিয়ে একমাত্র ভয় ছিল বন্য প্রাণী কিংবা ডাকাতের। কিন্তু কালাপানি পেরোবার ভয় ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি। ধনসম্পত্তি লুটপাট হল কিংবা অঙ্গহানি হল—সে-ক্ষতির চেয়ে অনেক বড়ো ক্ষতি যদি মানুষ জাতিভ্রষ্ট সমাজভ্রষ্ট হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাড়ির মাইনে-করা দৈবজ্ঞ-পুরোহিতের দল যেন একজোট হয়ে দ্বারকানাথকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, জাতিভ্রষ্ট সমাজভ্রষ্ট হওয়াটা অনন্ত নরকযন্ত্রণার তুল্য। কালাপানি পেরোবার ফলে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধেয় রামমোহন রায়ের কী দুর্দশা হয়েছিল, সে-কথাটা তো একবার ভাবা দরকার। শাস্ত্রের নিষেধ অমান্য করার ফলে কী দণ্ডটাই না তিনি পেলেন—বিদেশে বিভুঁয়ে বেঘোরে তাঁর মৃত্যু হল, অগ্নিসংকার তো হলই না, কবর দেওয়া হল 'অ-পবিত্র' জমিতে—যেন তিনি ম্লেচ্ছদেরও অধম। এমন অভিশাপ কেউ কি সাধ করে কুড়োতে চায়? দ্বারকানাথ সকলের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন, গোঁফের তলায় যেন মৃদু একটা হাসি খেলল, একটি কথাও বললেন না জবাবে। বোঝা গেল কালাপানি পার হবার সংকল্পে তিনি স্থির, বিপদ-আপদ যাই আসুক না কেন তাঁকে টলানো যাবে না।

বিদেশ পাড়ি দিতে তাঁর ভয়ডর ছিল না, কুসংস্কারও ছিল না। কিন্তু তিনি ঠিকই জানতেন কার কখন কী-যে হতে পারে কেউ বলতে পারে না। বিশেষ করে তাঁর ব্যবসাবাণিজ্যের বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কী-দশা হতে পারে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ছেলেদের ও অংশীদারদের তত্ত্বাবধানে—সে-বিষয়ে তিনি একেবারেই সুনিশ্চিত ছিলেন না। তখনো লিমিটেড কোম্পানীর প্রবর্তন হয়নি—অংশীদারদের দায়দায়িত্ব কার

কতখানি তখনো আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়নি। লোকসান হলে কিংবা কারবার ফেল পড়লে প্রত্যেক অংশীদার সবটুকু লোকসানের ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য ছিলেন। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যখন ফেল পড়ে, ক্ষতিপূরণের সমগ্র দায়িত্ব একা দ্বারকানাথকে বহন করতে হয়েছিল। দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন তাঁর বংশধরদের ব্যবসাবুদ্ধি কম, উপায় সংগতি সন্ধানে তারা তৎপর নয়। দৈবাৎ যদি সংকট উপস্থিত হয় সমগ্র কার-টেগোর কোম্পানী ফেল পড়তে পারে—সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে ১৮৪০ অব্দের ২০ আগস্ট তারিখে তিনি একটি ট্রাস্ট সম্পাদন করে পৈতৃক দুটি জমিদারি এবং তাঁর স্বোপার্জিত আরো দুটি জমিদারি পুত্র-পৌত্রদের নামে লিখে দেন।[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর **আত্ম-জীবনী** গ্রন্থে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর পিতা প্রখর-বুদ্ধি বলে বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে পুত্রদের হাতে বহু-বিস্তৃত কাজ-কারবার পরিচালনার ভার যদি ন্যস্ত হয় তারা তা সামাল দিতে পেরে উঠবে না।[২]

১৮৪১ অব্দের ২ অক্টোবর তারিখের **বোম্বাই টাইমস** এবং ওই বছরেরই ২১ অক্টোবর তারিখের **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া**—দুটি কাগজই খবর দেয়, এটা এখন নিশ্চিত যে কিছুদিনের মধ্যেই দ্বারকানাথ বিলাত পাড়ি দেবেন এবং তাঁর সঙ্গে যাবেন দেশীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম বিলাতযাত্রা করেছিলেন সেই রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়। পরের বছর জানুয়ারি মাসে যখন দ্বারকানাথ সত্যই বিলাতযাত্রা করলেন তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে রাধাপ্রসাদ ছিলেন না যদিচ তিনি দ্বারকানাথকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

মনে হয়, বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে বেলগাছিয়া ভিলা ও তার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় সামগ্রী বিক্রয় করে দেবার কথা দ্বারকানাথের মনে একবার উদয় হয়ে থাকবে। ১৮৪১ অব্দের ২৫ ডিসেম্বর তারিখের **ইংলিশম্যান** দুঃখ করে লিখেছিলেন ঃ 'গৃহসম্পত্তি বিক্রয় করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সম্প্রতি বহু বিজ্ঞাপন খবর কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করে কলিকাতা বাসিন্দাদের একটি বৃহৎ অংশ এবং যে-সব মফঃস্বলবাসী কলিকাতার আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য কালেভদ্রে এই প্রেসিডেন্সি শহরে অবতরণ করে, তাঁদের অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। দমদম রোড-এর উপর দ্বারকানাথের যে-সুবমা গৃহপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেটি ভেঙে দেবার ঘোষণার বিষয় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। কত নববিবাহিত দম্পতি এই সুন্দর ভিলায় নিরিবিলি তাঁদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছেন, এখানকার সুন্দর পরিবেশে শিল্পশালায় ছবি ও ভাস্কর্য ও তাবৎ সামগ্রী দেখে, মধুর আবেশে বিভোর হয়ে ভেবেছেন, এই মধুর সুন্দর ভুবনে তাদের দুজনা ছাড়া আর বুঝি কেউ নেই। বিবাহিত অবিবাহিত কত শত লোকই এই ভিলায় এসেছেন গেছেন, হাইকোর্ট-এর জজ এসেছেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সিভিলিয়ন এসেছেন, আবার এসেছেন এটর্নি অফিসের নিম্নতম কেরাণী কিংবা কোনো কুঠির চাকুরে—সকলে শনিবারের রাত্রে এসে সহৃদয় ও অমায়িক

গৃহকর্তার উদার আতিথ্যগ্রহণে তৃপ্ত হয়েছেন। এইসব আমোদ-প্রমোদের মেলা কি অতীতের হাসিখেলা হিসেবে গণ্য হবে? যেসব মহামূল্য সামগ্রী এই একটি মনোরম স্থানে—এই পরীদের রাজ্যে দ্বারকানাথ সমাহৃত করেছেন, সে-সমস্তই কি বাকপটু নীলামদারের হাতুড়ির ঘায়ে বিকিয়ে যাবে, সর্বোচ্চ দাম যে হাঁকবে তার কাছে, জলের দরে?'

**ইংলিশম্যান**-এর সম্পাদক হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন যে বিদেশ থেকে দ্বারকানাথ হয়তো আর দেশে ফিরবেন না, হয়তো ভারতে তাঁর জীবন-পর্ব সমাপ্তির মুখে। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধের শেষ অংশে সম্পাদক যা লিখেছিলেন পড়ে মনে হয় তা যেন দ্বারকানাথের মরণান্তিক গুণগান :

'যে-হেতু জনগণের একটা বিশিষ্ট অংশ যে-রুচিকর আমোদ-প্রমোদে মাঝে মাঝে যোগ দিতে পারত তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে, কেবল সেই কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহসম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন-দৃষ্টে আমরা খেদ প্রকাশ করছি এমন নয়। এই বিজ্ঞাপন হয়তো বা এমন একজন ব্যক্তির জীবনেতিহাসের অন্তিম পৃষ্ঠা—যিনি তাঁর স্বদেশের মহত্তম হিতকারী, যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে নিজের জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছেন, সুবিচারপূর্বক জনহিতে নিজের অর্থবিত্ত বণ্টন করেছেন, যিনি ক্ষমতাবানের কৃপা বা ভ্রূকুটি অবলীলায় উপেক্ষা করে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন, হিন্দু-সমাজের সর্বোচ্চ জাতিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের উগ্র-সংস্কার অবজ্ঞেয় জ্ঞান করেছেন—যিনি দেশবাসীকে মহত্ত্ব ও সুখসমৃদ্ধির পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র সমাজ-জীবন সাহসিকতা ও উদারতা দ্বারা চিহ্নিত। এইসব গুণের সমবায়ে তিনি বৃহৎ জনসমাজের তথা সমগ্র ভারতের সেবায় যে-সব কাজ করেছেন, কেবলমাত্র তার তালিকা দিতে গেলে এ-কাগজের অনেকগুলি কলাম ভরে যাবে। দেশের বর্তমান অবস্থা যখন দেখি এবং যখন ভাবি দ্বারকানাথকে সহায় করে রামমোহন রায় এ-দেশবাসীর সামনে আলোকবর্তিকা তুলে ধরবার আগে দেশের অবস্থা কী ছিল, তখন মনে হয়, সমাজসংস্কার বলে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব করে তোলার পিছনে কতখানি ছিল দ্বারকানাথের প্রভাব, কতটা কাজ করেছিল তাঁর সহজ সরল অথচ কার্যকর বাগ্মিতা, কী পরিমাণ ছিল তাঁর স্বার্থত্যাগ এবং অকৃপণ বদান্যতা—তার যথাযথ মূল্যায়ন আমরা আদৌ করতে সমর্থ হব কিনা সন্দেহ। এমন কোনো সাফল্যমণ্ডিত জনহিতকর প্রচেষ্টা নেই, যার অস্তিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে এবং অনেক সময় সবার চেয়ে বেশিভাবে, আমাদের এই মহৎ ও সহৃদয় বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর যুক্ত নেই। জনকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যথা—শিক্ষার উন্নতি, দরিদ্রের উপকার, কৃষির উন্নতি, জলপথে ভ্রমণের সুবিধার জন্য স্টিমার-সার্ভিস প্রবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, জুরিপ্রথা-প্রবর্তন, পূর্তকর্মাদি সংগঠন, নাট্যাভিনয়ের সুযোগ-সুবিধা, জমিদারি স্বত্ব-সংরক্ষণ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন ইত্যাদি

ইত্যাদি। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। কত বিধবা স্ত্রীলোক, অনাথ বালকবালিকা তাঁর দয়ায় চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার লাভ করেছে, যথাসময়ে তাঁর সাহায্য ও উপদেশ লাভ করে কত কপর্দকশূন্য অথচ উদ্যোগী ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাববশত কিংবা অত্যধিক অপব্যয়ের ফলে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও যখন লাঞ্ছনা অথবা তার চেয়ে ঢের বেশি সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়েছেন, তখন দ্বারকানাথ বন্ধুভাবে মধ্যস্থতা করায় কতো যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উদ্ধার পেয়েছেন তার হিসাব দেওয়া শক্ত। অথচ এই সমস্তই তিনি করতেন একেবারে দম্ভ-অহমিকার বালাই না রেখে এবং এ-সব কাজ থেকে এমন ফলের আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনো করেন নি যা অপর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে না-নেওয়া যায়।

'আমাদের এই লেখা পড়ে অনেকে হয়তো বলবেন এ হল আতিশয্য—নিছক বাড়িয়ে বলা, হয়তো সমাজের অপর সাধারণের সঙ্গে আমরা দ্বারকানাথের কাজকর্ম থেকে যেসব সুখসুবিধা লাভ করেছি তারই স্বীকৃতিতে আমরা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত। এটা ঠিক আমরা আদৌ যে এই বিষয়ের অবতারণা করেছি, তা হয়েতো কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের হৃদয়ের অনুরাগবশত। কিন্তু একথা আমরা মানতে রাজি নই যে আমরা অথবা আমাদের চেয়ে ঢের বাকপটু ব্যক্তিরা দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যত উচ্চ-প্রশংসাই করি না কেন, সেই প্রশংসাবাক্য থেকে একটি কোনো শব্দ বা শব্দাংশ বাহুল্য বিবেচিত হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশংসা-বাক্যের পিছনে হাজারো ঘটনার নথিপত্র-ভুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়ে গেছে—যার সত্যাসত্য প্রত্যেক কলকাতাবাসী সহজেই যাচাই করে নিতে পারেন।'

ব্যাপটিস্ট মিশনের সাপ্তাহিক মুখপত্র **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** অনেক সময় খোলাখুলিভাবে দ্বারকানাথের কাজকর্মের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছেন। দ্বারকানাথের বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে ১৮৪২ অব্দের ৬ জানুয়ারি তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁরা লিখলেন ঃ

'আমাদের দেশ থেকে দ্বারকানাথ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর যাত্রার আগে তিনি এই দেশের জন্য যত জনহিতকর প্রচেষ্টা করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের সবিনয় ধন্যবাদ জানাব না—এরকমটা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। দেশের শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামতের তফাৎ হয়েছে বিস্তর। শোনা যাচ্ছে, বিলাতে গিয়েও কতিপয় বিধিব্যবস্থার অনুকূলে ওকালতি করার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হয়েছেন। তেমন যদি হয়, আবার হয়তো তাঁর সঙ্গে আমাদের মতদ্বৈধ হতে পারে। কিন্তু এই অবসরে জননেতারূপে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাপ্রকাশে যদি আমরা বিরত থাকি, তাহলে নিজেদেরই আন্তরিক অনুভূতির প্রতি অবিচার করব। রাজধানী থেকে কিঞ্চিৎ দূরে আমরা অবস্থান করি বলে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে প্রধানত তাঁর সেইসব জনহিতকর

কাজ থেকে যার জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞ থাকার কারণ রয়েছে যথেষ্ট...

'মহান সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায় যখন তাঁর দেশবাসীর কুসংস্কারের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন সেইসময় রামমোহনের সঙ্গে একত্রযুক্ত থাকায় দ্বারকানাথ প্রথম লোকচক্ষুর গোচরে আসেন। সেইসময় তিনি যে সৎসাহস ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, গত বিশ বছর ধরে নিয়ত জনসমাজের পুরোভাগে থেকে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি সর্বতোভাবে পালন করেছেন। তাঁর যে-সব কাজের জন্য ভারত তাঁর নাম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে আমাদের হিসাবে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল, সতীদাহ-নিবারণের মতো মহামানবিক কৃত্য সুসম্পন্ন করাব জন্য দৃপ্ত পৌরুষে রামমোহন রায়কে তাঁর উদার সহায়তা দান। যখন গোঁড়া হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় বিত্তবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন, যখন তাঁদের আপোষহীন ঘৃণা অ-সহযোগীদের পিছু তাড়া করছিল, দ্বারকানাথ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন মানবিক করুণার সমর্থনে, বিরুদ্ধ পক্ষের ভর্ৎসনা বা গালিগালাজে তিনি তখন একটুও বিচলিত হননি।

'জনসাধারণের সাহায্যকল্পে দ্বারকানাথের দানদাক্ষিণ্যের কথা যদি বলতে হয় তাহলে কলকাতার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের একটিকেও বাদ দেওয়া চলে না, কারণ এদের কোনোটিকেই তিনি তাঁর মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করেননি। সর্বতোগামী জলস্রোতের মতো তাঁর দাক্ষিণ্যের ধারা এমনি অবারিতভাবে অবিরাম প্রবাহিত হত যে কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তিনি যখন লক্ষ টাকা (দশ হাজার পাউণ্ড) দান করলেন, তখনও এমন বৃহৎ অঙ্কের অনুপাতে তেমন কোনো বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়নি, কারণ লোকে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়েছিল এই কথা ভাবতে যে দান করাটাই দ্বারকানাথের স্বভাবসিদ্ধ এবং তিনি দান করেন মুক্তহস্তে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই স্বদেশের উন্নতিকল্পে যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির (সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম হল খ্রীস্টান মিশনসমূহ) সংস্থান ও সংগঠনে তিনি নেতৃত্ব করেছেন। শিক্ষার উন্নতিসাধনে এবং বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের লালন-পালন বর্ধনে (কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করে) তাঁর অবদান সর্বাগ্রগণ্য। তিনি কেবল দু-হাতে দিয়েছেন এমন নয়, দিয়েছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে।'

সেইদিনই (১৮৪২ অব্দের ৬ জানুয়ারি তারিখে) কলকাতার য়ুরোপীয় ও ভারতীয় নাগরিকেরা টাউন হল-এর এক বিরাট সভায় সমবেত হয়ে রাজধানীর নাগারিকপ্রবরকে বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মহামান্য শেরিফ এবং তাঁর হাত দিয়েই দ্বারকানাথকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়।[৮] মানপত্রে জনস্বার্থে তাঁর বহু ও প্রভূত দানের কথা, শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার কথার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে 'গ্রেটব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে স্টিমার যোগাযোগ-স্থাপনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়' করেছেন। মানপত্রের শেষ অংশে আশা

প্রকাশ করা হয় ঃ 'তোমার অবিরাম দাক্ষিণ্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমার ঋজু ন্যায়পরায়ণতা' যেমন সমস্ত কলকাতাবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছে, 'আমরা আশা করে থাকব যে তেমনি শ্রদ্ধার সুর ইংলণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।' টাউন হল-এর এই সভায় দ্বারকানাথকে মানপত্র দান ও তদুত্তরে দ্বারকানাথের সুমধুর ভাষণের[৪] কথা বলতে গিয়ে **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** ১৮৪২ অব্দের ১৩ জানুয়ারি তারিখে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিলেন ঃ 'গত বৃহস্পতিবার দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মানে টাউন হল-এ যে-সভা হয়ে গেল তাতে যেমন বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তেমনটা বহুকাল ঘটেনি বলে এই সভার কথা লোকে অনেক দিন মনে রাখবে। সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিরা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরকারের বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট কর্মচারিবৃন্দ, কতিপয় ব্যারিস্টার, বণিক ও ব্যাপারী, য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বাবুবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ছাত্রেরা। এ-সভা ছিল কলকাতা জনসমাজের অনুভূতির প্রতিধ্বনি। আমাদের টাউন হল-এ এই ধরনের সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না।'

সভায় সম্মানিত অতিথির কাছে দুটি বিশেষ অনুরোধ পেশ করা হয় ঃ বিলেতে থাকতে তিনি যেন রামমোহন রায়ের অবহেলিত সমাধিটি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন (সেদিন প্রাতে **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই সমাধির শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় লোকগোচর করেছিলেন।) এবং তিনি যেন তাঁর নিজের পূর্ণাবয়ব তেলরঙা প্রতিমূর্তি ও মার্বেল পাথরে খোদাই করে তাঁর আবক্ষ ভাস্কর্যমূর্তি, বিলাতের উৎকৃষ্ট শিল্পীদের হাতে রচনা করিয়ে পাঠিয়ে দেন উত্তরপুরুষদের উদ্দেশে। এই দুটি অনুরোধই বহুজনসমর্থিত হবার ফলে সভাস্থলেই এ-জন্য চাঁদা তোলা হয়েছিল।[৫]

১৮৪২ অব্দের ৯ জানুয়ারি তারিখে দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব জাহাজ '**ইণ্ডিয়া**'-যোগে যাত্রা করলেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়[৬], তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর ম্যাকগাওনান, তাঁর একান্ত সচিব পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু ভৃত্য ও একজন মুসলমান বাবুর্চি। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, এই 'শেষোক্ত ব্যক্তিটি ছিল এক ওস্তাদ পাচক। লণ্ডনের ভোজনরসিকেরা তার হাতের তৈরি পোলাও ও মাংসের কোর্মা-কালিয়ার খুবই তারিফ করত, বলত 'দ্বারকানাথ ডিশেস্'। এমনকি শোনা যায় যে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-পরিবারের প্রধান পাচককে এই খানসামা 'কারি' রাঁধার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে এসেছিল।[৭] অপর সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, দ্বারকানাথের পরম সুহৃদ এইচ. এম. পার্কার, রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ ফাদার ক্যারু ও আরো কয়েকজন। দ্বারকানাথের ভাই রমানাথ, রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ (পূর্বে স্থির হয়েছিল ইনি দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলেত যাবেন) এবং কতিপয় য়ুরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুবান্ধব সঙ্গে গিয়েছিলেন হুগলির মোহানা অবধি। সেখান থেকে তাঁরা কলকাতা

ফিরে যান 'দ্বারকানাথ' নামক আর একটি স্টিমার-যোগে।'

সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর য়ুরোপযাত্রা সম্পর্কে দ্বারকানাথ একটি ডায়ারি রেখে গেছেন, সে-ডায়ারি তাঁর প্রথম জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্রের হস্তগত হয়েছিল এবং তা-থেকে তিনি প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পরে এই ডায়ারির কী গতি হয়েছিল তা কেউ জানে না। অনুমান হয় দ্বারকানাথের জীবন ও কাজকর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক মূল্যবান দলিলের মতো এটিও লুপ্ত হয়ে থাকবে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্যসূচনা যিনি করেছিলেন তাঁর বিষয়ে উত্তর-পুরুষদের উদাসীন নির্লিপ্ততাই এই সব কাগজপত্র হারিয়ে যাবার মুখ্য কারণ। সুখের বিষয় তিনি কিছু চিঠিপত্রও লিখেছিলেন দেশে—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁর অংশীদারদের কাছে। এইসব চিঠির কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** কাগজে। তাঁর ডায়ারি ও চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি থেকেই আমরা জানতে পারি যাত্রাপথে কোন্ কোন্ জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন এবং সেসব জায়গা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কেমন হয়েছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে খুবই আনন্দ পেতেন এবং সে-আনন্দ বর্ণনাও করতেন পরম উৎসাহের সঙ্গে। সেকালে সমুদ্রপথে চিঠিপত্র আসতে খুবই বিলম্ব হত—তাঁর চিঠিপত্র থেকে সর্বপ্রথম উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪২ অব্দের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে অর্থাৎ কলকাতা ছাড়বার প্রায় নয় মাস পরে। এই সব উদ্ধৃতি প্রকাশের ভূমিকাস্বরূপ **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া**-র সম্পাদক লিখেছিলেন ঃ

'বিলাতের পথে ইজিপ্ট ও য়ুরোপ-এর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দ্বারকানাথ যে-পত্রাবলী পাঠিয়েছেন সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেগুলি দেখেছি এবং সেগুলি থেকে যে-সব অংশ আমাদের পাঠকদের কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে, উদ্ধৃতি-আকারে সেসব প্রকাশের সানুগ্রহ অনুমতিও পেয়েছি। এই বিশেষ অধিকারের বহুলপরিমাণে সুযোগ গ্রহণ করতে আমরা মনস্থ করেছি এবং বর্তমান সংখ্যায় উদ্ধৃতির প্রথম কিস্তি প্রকাশে উদ্যত হয়েছি। দ্বারকানাথ প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রথম এতদ্দেশীয় ব্যক্তি যিনি বিদেশে এমনসব জিনিস দেখেছেন যা তাঁর নিজের দেশে তিনি দেখেননি অথবা যার সঙ্গে দেশের জিনিসের তফাত বিস্তর। এসব দেখে শুনে তাঁর মনে যে ভাবনাচিন্তার উদয় হয়েছে এবং এ-সম্বন্ধে তিনি যেসব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন—সে সমস্তই অধিকাংশ পাঠকের মনোরঞ্জক না হয়ে পারে না। আমাদের কাগজের কিছুটা জায়গা যদি এ-সব পত্রাংশ প্রকাশের জন্য বরাদ্দ করি, তাহলে হয়তো এতদতিরিক্ত কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন হবে না।'

প্রথম চিঠি অথবা তার অংশবিশেষ লেখা হয়েছিল পয়েণ্ট দ্য গালে থেকে, তারিখ ১৮৪২ অব্দের ১৯ জানুয়ারি ঃ 'এই কিছুক্ষণ আগে এখানে এসে পৌঁছেছি। যেহেতু এখানে আমাদের স্থিতি খুব অল্প সময়ের জন্য এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে এই সুন্দর দ্বীপের যতটা সম্ভব দেখাব ইচ্ছা, এ-চিঠি ছোট হতে বাধ্য। মাদ্রাজ ছাড়বার

পর থেকে আবহাওয়ার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাহাজের দোল খেয়ে এখনো যখন শরীর খারাপ হয়নি, মনে হচ্ছে সমুদ্র-যাত্রার ওই উপসর্গ থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছি। গতকাল সকালে ১০টার সময় সর্বপ্রথম সিংহল আমাদের নজরে এল। তারপর থেকে আমরা সিংহলের তীর বরাবর ভেসে চলেছি—তীরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের কিনারা ধরে চলেছে সারি সারি নারকেল গাছ, নারকেল-শ্রেণীর ওদিকে উঁচু-নীচু নানা আকারের পাহাড় পর্বত ও তরুশ্রেণী শোভিত উপত্যকা। আমি এতাবৎকাল ধরে এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিনি।'—' কে বোলো, সে-যে কেবল বই পড়ে দেশবিদেশ সম্বন্ধে সব কথা জানতে চায়, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। আমি এই অতি সুন্দর সিংহল দ্বীপ নিজের চোখে দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, পাঁচশোটা বইয়ের বিচিত্র ও প্রাঞ্জল বর্ণনা পাঠ করে কিছুতেই তা পেতাম না। প্রকৃতির স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি থেকে যে যথাযথ ছবিটা পাওয়া যায় তা কি অপরের লেখা বর্ণনা থেকে পাওয়া সম্ভব? ক্রমেই * আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে রামায়ণে যে-স্বর্ণলঙ্কার কথা বলা হয়েছে তা কেবল কল্পনা নয়—সম্পূর্ণ বাস্তব। সিংহলের ভূখণ্ড সোনার পাত দিয়ে মোড়া নয়—সেকথা সত্য, কিন্তু চোখের দেখাতেই বুঝতে পারা যায় যে এখানকার জমি এমনি উর্বর যে এক-এক বিঘা এক-একটি সোনার খনি বিশেষ।'

বাষ্পীয় শক্তি সত্ত্বেও সেকালের সমুদ্রযাত্রা কত-যে ধীরগতি ছিল, দ্বারকানাথের জাহাজের গতি থেকে তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। জানুয়ারি ৯ তারিখে কলকাতা ছাড়ার পর সমুদ্রের মোহনায় পৌঁছতেই সময় লেগেছিল এক দিনের বেশি, জাহাজ মাদ্রাজের বন্দরে ভিড়েছিল ১৫ তারিখে অর্থাৎ কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে লেগেছিল পুরো ছয় দিন। মাদ্রাজে কয়লা নিতে সময় লাগল একটা পুরো দিনের চেয়েও বেশি, সিংহলের তীর প্রথম চোখে পড়ল ১৮ তারিখে।

পরের চিঠিটি দ্বারকানাথ লিখেছিলেন **ইণ্ডিয়া** জাহাজেই বসে, তারিখ ১৮৪২ অব্দের ২৭ জানুয়ারি ঃ 'সিংহল থেকে লেখা আমার শেষ চিঠিতে বলেছিলাম আমাদের জাহাজ কীভাবে এগিয়ে চলেছে, সে-কথা আরও বিস্তারিতভাবে তোমাকে লিখব। সেই উদ্দেশ্যেই এই চিঠি লিখতে শুরু করলাম। এডেন পৌঁছবার আগেই আশা করি এ-চিঠি শেষ করতে পারব, তাহলে বোম্বাই-ফিরতি জাহাজের ডাকে এ-চিঠি পাঠাতে পারব। ইতিপূর্বে জানিয়েছি প্রথম সিংহলের তীর আমাদের নজরে আসে ১৮ তারিখে সকাল ১০টার সময়। তারপর তীর ঘেঁষে চলতে চলতে আনন্দিতচিত্তে লক্ষ্য করলাম কত সুন্দর বিচিত্র আকারের পাহাড় পর্বত, ঘন সবুজে ঢাকা কত উপত্যকা, সারি সারি কত নারকেল-বীথি নেমে এসেছে একেবারে তীর ঘেঁষে। ১৯ তারিখে নোঙর ফেলা হল পয়েন্ট দ্য গালে-তে রাত একটার সময়। এখানে একটি উঁচু পাহাড় আমরা দেখলাম—বলা হয় সমুদ্র থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়। এর নাম 'আদমের

শিখর'—লোকে বলে পাহাড়ের চূড়ায় আদমের ২০ ফুট লম্বা পায়ের চিহ্ন আছে। আমার মনে হয় আমাদের হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসারে বীর হনুমান লঙ্কায় ঝাঁপ দেবার আগে এই গিরিশিখরেই প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন। গালে-দুর্গের সম্মুখভাগ সমুদ্রতীরবর্তী একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপিত। পোতাশ্রয়টি ভারি সুদৃশ্য, প্রকৃতি যেন স্বহস্তে বড় বড় পাথর বিছিয়ে বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন পোতাশ্রয়কে সুরক্ষিত করার জন্য। বাঁধ সমুদ্রের অনেকটা দূর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। বাঁধের উপর ঢেউগুলো যখন আছড়ে পড়ে, দেখলে ভয় লাগে—মনে হয়, শক্ত মজবুত জাহাজও যদি ওই ঢেউয়ের তোড়ে পড়ে, ভেঙে শতখান হয়ে যাবে। কিন্তু বাঁধ থাকাতে সহজে ও নিরাপদে পোতাশ্রয়ে পৌঁছনো যায়। আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলতেই এক পাল নৌকা ছুটে এসে চারিদিক ঘিরে ফেলল, নৌকায় সিংহলের ফলমূল ও নানারকম পণ্যদ্রব্য। নৌকাগুলির আকার ও গঠন ভারি অদ্ভুত—চেহারা যে কেমন তোমায় ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয় না।

'কিন্তু তীরে পা দিতে সর্বপ্রথম যা আমার নজরে এল সে হল ও দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘাট—নৌকা সেখানে আমাদের কলকাতার ঘাটের তুলনায় কত স্বচ্ছন্দে ভিড়ানো যায়। রাস্তাঘাটও চমৎকার। হোটেল ও বসবাসের বাসগৃহগুলি সবই একতলা, দেখতে জমকালো না হলেও সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুর্গদ্বারে দুর্গ-প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া আছে ১৬৬৮, কিন্তু নিয়মিত মেরামতি প্রভৃতি হয়ে থাকে বলে মনে হয় যেন তৈরি হয়েছে সেদিনমাত্র। সমস্ত শহরটার চারিদিকেই দুর্গপ্রাকার। কলম্বো হল সিংহলের রাজধানী, গালে বন্দর থেকে কলম্বোর দূরত্ব হবে প্রায় ৭০ মাইল, ঘোড়াগাড়ি চড়ে যাবার মতো রাস্তা আছে বরাবর, রাস্তার দু-ধারেই ঘন নারকেলের বাগান। এখানকার ফলমূল আমাদের বাংলাদেশেরই মতো—প্রচুর আম ফলে; কাঁচা আম কিছু পাওয়া গেল, পাকতে লাগবে আরো একটা মাস। এখানকার কলা, কাঁঠাল, আনারস বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি বড় ও রসালো। এখানেই আমি সর্বপ্রথম দেখলাম ব্রেড ফ্রুট গাছ কিন্তু তখনো ফলবার সময় হয়নি বলে ফল আমি দেখিনি। এ-দেশের ফুলও আমাদের দেশেরই মতো, কিন্তু রঙ এত উজ্জ্বল ও সুন্দর যে আমার পক্ষে যথাযথ বর্ণনা করা কঠিন—বিশেষত এ দেশের জবাফুল ভারি চমৎকার দেখতে। বাজার বসে ভিতরকার পোতাশ্রয়ে—ভারি সুবিন্যস্ত ও পরিষ্কার।

'কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমান ও ক্যাথলিক বাদ দিলে এ-দেশের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। কিছু সম্ভ্রান্ত ওলন্দাজ পরিবারও এখানে বসবাস করেন। ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য এখানে দুটি সু-পরিচালিত স্কুল আছে, আমার সহযাত্রীদের কেউ কেউ দুটি স্কুলের সাহায্যকল্পে কিছু কিছু দান করলেন। সাধারণভাবে বলা চলে এ দেশের লোকেদের শরীরের গঠন ভালো, এরা বেশির ভাগ লোকই কর্মঠ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মুখের ভাবে মালয় দেশবাসীর সঙ্গে কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়।

বাড়ির পুরুষ ভৃত্য-পাচকেরা খোঁপার আকারে চুল বাঁধে এবং ইংরেজ মহিলাদের মতো খোঁপাতে কচ্ছপের খোলা থেকে তৈরী মত চিরুনি গোঁজে। এ-দেশ দেখে আমি কত যে খুশি হয়েছি চিঠি লিখে তার বর্ণনা দেওয়া শক্ত।'

কিশোরীচাঁদ মিত্রের দেওয়া উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় দ্বারকানাথ বলেছিলেন সিংহলের লাল মাছ 'কাৎলা মাছের মতো বড়ো, সমুদ্রের জলে গিজ্‌গিজ্‌ করছে কচ্ছপ—তাদের কোনো কোনোটা আকারে ছোট হাতির মতো।'[৮]

১১ তারিখে **ইণ্ডিয়া** জাহাজ সুয়েজ বন্দরে ভিড়লে পর দ্বারকানাথ ও সহযাত্রীরা জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন, স্টিমার ফিরে গেল কলকাতা। জাহাজ ত্যাগ করে দলবলসহ দ্বারকানাথ 'হিল্‌স্‌ হোটেল' নামক হোটেলে আশ্রয় নিলেন। এ হোটেলটিকে দ্বারকানাথ তাঁর ডায়ারিতে 'অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তাঁর যাত্রাপথ সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'এ পথ গয়া যাওয়ার রাস্তার চাইতে সুগম, এমনকি দমদম রোড ধরে আমার বাগান-বাড়িতে যাবার রাস্তার চাইতে অনেক ভালো।' বলা বাহুল্য এ তুলনামূলক সমালোচনা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে শ্রদ্ধাজনক নয়। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথে প্রথম তিনি মরীচিকার দৃশ্য দেখে বললেন ঃ 'এ দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর।' ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁরা কায়রো পৌঁছলেন।

তৃতীয় কিস্তিতে প্রকাশিত তাঁর চিঠিপত্রে দ্বারকানাথ লিখলেন ঃ 'সুয়েজ পৌঁছলাম আমরা ১১ তারিখে। কিন্তু মালপত্র গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে এমনি ব্যস্ত ছিলাম, চিঠি লেখার মতো সময় করে উঠতে পারিনি। সুয়েজ ছাড়লাম ১২ তারিখে, চারটি আরবী ঘোড়ায় টানা একটি ঢাকা গাড়িতে। সেদিন আমরা প্রায় চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করলাম—এই দূরপাল্লা ভ্রমণ করে সকলেই একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম। তাই পরের দুটো দিন আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট পাল্লার রাস্তা, দৈনিক ত্রিশ মাইল হিসাবে, অতিক্রম করেছিলাম। এই দুটো দিন আমরা বেশ আরামেই রাস্তা চললাম এবং যদিও লোকে বলে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা খুবই অসুবিধাজনক, আমরা কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইনি। রাস্তা চলতে যেসব পান্থনিবাসে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেইসব বাংলোগুলি নিঃসন্দেহে উত্তরপশ্চিম ভারতের ডাকবাংলোগুলির চেয়ে অনেকগুণেই ভালো ও আরামপ্রদ।

'প্রাতরাশের পর আমাদের যাত্রা শুরু হয়, সারাটা দিন ধরে আমরা চলি—কিছু পথ পায়ে হেঁটে কিছুটা গাড়িতে। যে সব অদ্ভুত আশ্চর্য দৃশ্য এরই মধ্যে আমাদের নজরে এসেছে, আমার সাধ্য নেই লিখে তার বর্ণনা দিই। হাটবাজার, দুর্গপ্রাকার বেষ্টিত শহর, নগর, মসজিদ, প্রাসাদ, উদ্যান, হামাম, পিরামিড—আরো কত শত জিনিস যে চোখে পড়ছে, মাথার মধ্যে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সুব্রায় দেখলাম পাশা-র উদ্যান ও তার মধ্যেকার ইমারত, পাদচারণার পথ, কমলালেবুর কুঞ্জ, অগণিত পুষ্পসম্ভার ও জলের ফোয়ারা—সবটুকু মিলে যেমন সুন্দর তেমনি

চমৎকার। কায়রোর দৃশ্যাবলীর মধ্যে আমি যেন খুঁজে পেলাম আরব্য রজনীর গল্পের জগৎ। আমি এখন সব কিছু এক পলক দেখতেই ব্যস্ত। এই মুহূর্তে আমি যে তোমাকে সব কিছুর বর্ণনা দিতে পারব সে আশা সুদূর-পরাহত। মাল্টা না পৌঁছনো অবধি সব কিছু আমার মুলতবী রাখতে হবে। সেখানে গিয়ে হাতে বেশ খানিকটা সময় পাব, তখন দেখব এখানকার দৃশ্যাবলীর রেখাচিত্র গোছের মতো কিছু তোমাকে পাঠাতে পারি কিনা।'

২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বারকানাথ ও তাঁর দলবল একটি স্টিমারযোগে কায়রো ছেড়ে রওনা হয়ে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে। নীল নদের মধ্য দিয়ে স্টিমার চলতে লাগল। দ্বারকানাথ লিখলেন, 'ভারি চমৎকার এই নীল নদ, চওড়ায় হবে গঙ্গার অর্ধেক, খুবই পরিষ্কার নদীর জল।' পরের দিন আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে চিঠিতে লিখলেন ঃ

'এখানকার হোটেলে খুবই আরাম—য়ুরোপীয় হোটেলের মতো। অভাবের মধ্যে এখানকার কামরাগুলিতে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা নেই। চতুর্ভুজ যে অঞ্চলটিতে য়ুরোপীয়দের বসবাস, তার চারিদিকেই ভারি সুন্দর সব তিনতলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি ঘর। কায়রোর সব অপ্রশস্ত রাস্তাঘাটের পর এই সব খোলামেলা স্কোয়ার দেখতে ভারি ভালো লাগে। দেশীয় ব্যক্তিদের মহল্লাগুলি অবশ্য অন্যান্য জায়গার মতো ঘিঞ্জি ও নোংরা।

'এই তো কিছুক্ষণ আগে আমি পাশার নতুন প্রাসাদ দেখে এলাম। প্রাসাদটি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের ফারোস উপদ্বীপের উপর অবস্থিত। দুই পাশেই সমুদ্র। প্রাসাদটি সৌষ্ঠব ও আড়ম্বরে অতুলনীয়—এর স্থাপত্য ও অভ্যন্তরীণ পরিসজ্জার ভার ছিল ফরাসীদের উপর। কায়রোতে যেসব প্রাসাদ দেখেছি এর সঙ্গে তুলনাই হয় না। পাশার সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসা হয়, যদি সম্ভব হত গোটা প্রাসাদ তুলে নিয়ে ফেলতাম আমার বেলগাছিয়ার বাগানে। প্রাসাদের খুব কাছেই সমুদ্রতীরে একটি চমৎকার স্নানের জায়গা আছে। যে-ঘরটার মধ্যে এই স্নানাগার অবস্থিত, সেই ঘরটা প্রায় ষাট ফুট ঢুকে গেছে সমুদ্রের মধ্যে; চার ফুট গভীর সমচতুর্ভুজ একটি চল্লিশ ফুট চৌবাচ্চায় সর্বক্ষণ টাটকা জল এসে পড়ছে তিন দিক থেকে। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সমস্ত দৃশ্যাবলী অধিকতর আশ্চর্য ও মনোরম ঠেকছে—আজ যা দেখছি তা কালকের দেখা জিনিসকে যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে।'

ছত্রিশ বছর বাদে ১৮৭৮ অব্দে, দ্বারকানাথের সর্বকনিষ্ঠ পৌত্র সপ্তদশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ও তাঁর অভিভাবকত্বে, পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই একই সমুদ্রপথে আলেকজান্দ্রিয়া অবধি গিয়েছিলেন, কেবল তাঁদের জাহাজ ছিল অনেক বড় একটি পি. এণ্ড ও. জাহাজ এবং পিতামহের সেই অনেক ছোট **ইণ্ডিয়া** জাহাজের সুয়েজ পৌঁছতে যত সময় লেগেছিল তার চাইতে

অনেক কম সময়ে তাঁরা সুয়েজ পৌঁছেছিলেন। ঘোড়ায়-টানা বাক্সগাড়িতে চেপে তাঁদের মরুভূমি পার হতে হয়নি, কারণ ততদিনে সুয়েজ থেকে কায়রো অবধি রেল-যোগাযোগের লাইন পাতা হয়ে গেছে। পৌত্রেরা হয়তো জানতেন না যে এই রেল-লাইন পাতাবার জন্য তাঁদের পিতামহ তাঁর দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরের সময় মহম্মদ আলি পাশাকে রাজি করাবার জন্য বিধিমত চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন। বারো বছর বাদে, ১৮৯০ অব্দে, আবার একবার এই দুই পৌত্র বিলাত যাবার পথে বোম্বাই থেকে সুয়েজ পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু এতদিনে সুয়েজখাল কাটা হয়ে গেছে বলে জাহাজ থেকে তাঁদের নামতে হয়নি। তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেবার বিলাত যান, দেশে বাড়ির লোকদের কাছে কতিপয় চিঠি লিখেছিলেন—ঘরোয়া চিঠি প্রকাশ করার কথা ভাবেননি। পরে সে-সব চিঠি **য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র** নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সফরের সময় তিনি দিনলিপি লিখে রাখতেন, পরে তা **য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি** নামে ছাপা হয়। প্রথম দর্শনে য়ুরোপ তাঁদের কেমন লেগেছিল, চিঠিপত্রে-ডায়ারিতে তাঁরা কী মন্তব্য রেখে গেছেন—এই বিষয় নিয়ে পৌত্র-পিতামহে তুলনা খুবই মনোজ্ঞ হতে পারে, তা থেকে তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়তে পারে। পিতামহ ছিলেন প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সমৃদ্ধ সওদাগর, কাজকারবার কিংবা সামাজিক দায়িত্বপালন ভিন্ন অপর কোনো ব্যাপারে তাঁকে কলম ধরতে হয়নি। পৌত্রের হাতে লেখনী এসেছিল তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বাহন হয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় এবং অভিনব কিংবা অভাবনীয় সম্পর্কে সোৎসাহ উপলব্ধির ক্ষমতায় উভয়ে উভয়ের প্রতিতুলনীয়, সেখানে পৌত্র-পিতামহে ব্যবধান দুস্তর নয়।[৯]

সে যাই হোক, আপাতত আবার দ্বারকানাথের ভ্রমণ-কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** কাগজে তাঁর চতুর্থ কিস্তির চিঠিটির তারিখ ছিল ১৯ মার্চ, লিখেছিলেন মাল্টা থেকে। চিঠিখানি নিচে তুলে দেওয়া হল ঃ

'কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া যতটুকু দেখতে পারার মতো ছিল দেখেশুনে আমরা এখন মাল্টার কোরনটিন-এ আটক পড়ে আছি। আমরা আছি যে-জায়গায় (তিনি ছিলেন ডান্সফোর্ড-এর রয়েল হোটেলে) সেখানে বেশ আরামেই থাকা যায়। শহরের অপর দিকটা ও সমুদ্রের দিকটা এখান থেকে বেশ দেখা যায়। হোটেলের চারদিকে হেঁটে চলে বেড়াবার মতো চমৎকার একটি রাস্তা আছে। আমাদের কামরাগুলি আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, দিন-রাত আগুন পোহাবার মতো চুল্লী আছে, এক কথায় নিজের বাড়ির মতো বেশ আরামে এখানে বসবাস করা যায়। গত দু-মাস ধরে সমুদ্রে ও সমুদ্র-তীরে যে ধকলটা গেছে, তারপর কিছুদিনের মতো পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে আমার মন্দ লাগছে না। এর ফলে বকেয়া সব চিঠিপত্র লেখা সম্পূর্ণ করতে পারব এবং অন্যান্য যে-সব দেশে অতঃপর ভ্রমণ করতে যাব তাদের বিষয়ে বই পড়ে অনেক কিছু জেনে নিতেও পারব। এ-পর্যন্ত এ দ্বীপটার যতটুকু যা দেখেছি মনে হয় একপ্রকার

দুর্ভেদ্য। শহরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তৈরী হয়েছে একটি পাহাড়ের উপর, চারিদিক শক্তিশালী দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত। দ্বীপের বিভিন্ন দিকে খাল কেটে, মনে হয়, পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানকার জলহাওয়া মোটামুটি য়ুরোপীয় জলহাওয়ার অনুরূপ। যদিচ এখন মহাবিষুবের সময়, একটা দিনমানের মধ্যেই জলহাওয়ায় বেশ অদলবদল দেখা যায়—ঘণ্টায় ঘণ্টায় অদলবদল হচ্ছে। এখন এখানে যতটা শীত, আমার গন্তব্যস্থানগুলি এর চাইতে বেশী ঠাণ্ডা হবে না বলে শুনতে পাচ্ছি। সে-কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শীতে কাবু হবার ভয় আমার আব করতে হবে না—যদিচ কলকাতার অনেকে শীতের প্রাবল্য নিয়ে আমায় খুব ভয় দেখাতেন। সকাল ন'টার সময় আমরা প্রাতরাশ সেরে বাইরে রোদ্দুরে একটু পায়চারী করে আসি, বেলা বারোটায় সামান্য একটু জলখাবারের পর আবার খানিকটা হাঁটা চলা, বিকেল চারটায় ডিনারের পর বেশ অনেকক্ষণ ধরে দুর্গপ্রাকারের মাথায় সমতল ছাদের উপর পায়চারী করে বেড়াই এবং তৎপরে ফিরে এসে চা-পান। দিনের বেলা অন্তর্বর্তী সময় কাটে বই পড়ে কিংবা চিঠিপত্র লিখে। সন্ধ্যায় আমার প্রশস্ত কামরাটাতে দশ বারো জন একত্রিত হন, গীটার কিংবা পিয়ানো বাজিয়ে কিংবা গান গেয়ে সময়টা দিব্যি কেটে যায়। আমাদের কোরনটিন শেষ হবে ১ এপ্রিল তারিখে, তখন আমরা নেপলস রওনা হব এবং সেখানে কয়েকটা দিন থেকে চলে যাব রোম। রোম থেকে ফ্লোরেন্স, ভেনিস ইত্যাদি সেরে আমরা চলে যাব কালে এবং ক্যালে থেকে ডোভার হয়ে লণ্ডন।'

পরের চিঠিখানি লিখেছিলেন মাল্টা দ্বীপেরই ভালেত্তা থেকে ১৮৪২ অব্দের ৩ এপ্রিল তারিখে ঃ 'কোরনটিন থেকে মুক্তি পেয়ে আমি কী-কী করেছি সে-খবর এখন তোমায় জানাতে পারি। পয়লা তারিখে আমরা গেলাম মানুয়াল; ভূখণ্ড থেকে একটা সেতু পার হয়ে মানুয়াল যেতে হয়। সেখানে পৌঁছবার পর ভালেত্তা যাবার পথে গ্রামদেশের শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। লর্ড অকল্যাণ্ড মাল্টার গভর্ণর স্যর হেনরী বুভেরি-র নামে যে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন সেই সুবাদে খাতির যত্ন প্রচুর পেয়েছি, সুযোগও পেয়েছি এখানকার সব দ্রষ্টব্য বিষয় ভালো করে দেখে নেবার। ভালেত্তা শহরটা বেশি বড়ো নয়—কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর বস্তুসম্ভারে ভর্তি। কীরকম চমৎকার সব ঘর বাড়ি মঠ মন্দির, প্রাচীরে কী সুন্দর সব চিত্র ও নকশা-শোভিত পর্দা, অপরূপ সব স্মৃতিস্তম্ভ, মেঝেতে রঙিন পাথরের উজ্জ্বল সব আলপনা, অস্ত্রাগারে কত বিচিত্র সব অস্ত্র-শস্ত্র—এই সবকিছু আমার এত আগ্রহ জাগিয়েছে যে আমার কৌতূহল পুরোপুরি মেটাবার মতো সময় বা অবসর আমার মিলবে না। সকাল থেকে শুরু করে রাত না হওয়া পর্যন্ত আমি সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখি, কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে তার যেন ঠিক নেই! এই স্বল্পপরিসর একটি জায়গাতেই যদি এত সব দ্রষ্টব্য থাকে, আমার আশঙ্কা হয়, সীমিত সময়ের মধ্যে য়ুরোপের অনেক কিছু দ্রষ্টব্য হয়তো আমার সম্পূর্ণ

দেখা হয়ে উঠবে না। সেন্ট জন-এর চার্চ দেখে আমি একটু একটু যেন বুঝতে পেরেছি ক্যাথলিকদের পূজা-মন্দিরগুলি কত সমৃদ্ধ ও জমকালো। মধ্যযুগে যে সব ধর্মবীর ক্রুজেড-এ যোগ দিতে যেতেন, সেন্ট জন চার্চ তাঁদের হাতেই গড়া—সোনারূপো ও মর্মরের অলংকরণে চারিদিক ঝলমল করছে, মণিমুক্তা খচিত দেয়াল, মাঝে মাঝে অপূর্ব সব প্রাচীরচিত্র—নিশ্চয় এই চার্চ নির্মাণ করতে বহু অজস্র টাকা ব্যয় হয়ে থাকবে। সবকিছু মিলে কেমন যেন একটা মহান ও সুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, এত কল্পনাতীতভাবে সুন্দর যে ভাসা-ভাসা বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অথচ শুনছি, রোম-এর সেন্ট পীটার্স্ গির্জার কাছে নাকি এই সেন্ট জন গির্জা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গতকাল এই গির্জা ঘুরে ঘুরে দেখেছি, দিনের অধিকাংশ সময় এখানে কাটিয়েও সবটা যেন দেখা হয়ে ওঠেনি। সুতরাং সেন্ট পিটার্স্ গির্জায় গিয়ে আমার কী যে দশা হবে—সে আমি বলতে পারি না। দেশে আমরা হিন্দুদের ঠাকুরবাড়ি, মুসলমানদের মসজিদ এবং তোমাদের চার্চ নিয়ে কত গর্ব করি, বড়াই করে বলি কোনটার পিছনে কত খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এখানকার ব্যাপার দেখেশুনে আমার ধারণা হয়েছে আমাদের দেশের মন্দির মসজিদ বা চার্চ কোনোটাই এদেশের ক্যাথলিক ভজনালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না।

'গতকাল রাত্রে আমি অপেরা দেখতে গিয়েছিলাম—এ আমার কাছে আরো একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। প্রেক্ষাগৃহের পরিসজ্জা ও ব্যবস্থাদি দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সংরক্ষিত আসনের সারি—একটির উপর একটি—খুবই সুবিধাজনক ও আরামদায়ক। আমার দুঃখ এই যে আমাদের দেশের পচা আবহাওয়াতে এই রকম ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। প্রসঙ্গান্তরে বলি, গতকাল প্রধান নৌ-সেনাপতি সমভিব্যাহারে রণতরী **কুইন**-কে পোতাশ্রয়ে ভিড়তে দেখে ভারি ভালো লেগেছে। ব্রিটিশ রণতরী-বাহিনীর এটিই সবচেয়ে বড়ো রণতরী। এতে মোতায়েন আছে ১২০টি কামান। আগামীকাল আমায় নিয়ে যাওয়া হবে **কুইন** দেখাতে—দেখে যে আমার খুব ভালো লাগবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

৮ এপ্রিল তারিখে উপরোক্ত প্রসঙ্গের জের টেনে দ্বারকানাথ লিখলেন ঃ 'রণতরী **কুইন** দেখে এলাম। এই চমৎকার জাহাজ দেখে যতটা না আনন্দ পেয়েছি তার চেয়ে কম আনন্দ পাইনি আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু, নৌ-সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড ওয়েন ও তাঁর পত্নীকে দেখে। গভর্ণর আমার সঙ্গে ছিলেন বলে এই রকম প্রথম শ্রেণীর রণতরীর সবকিছু বেশ ভালো করে দেখা গেল। এ-জায়গায় ক্রমাগত সাক্ষাৎকার হয় লর্ড, ডিউক, ব্যারন এবং নৌ-বাহিনীর ও স্থল-বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে। বিদেশাগত অতিথিদের প্রতি এঁদের সকলের আচরণ খুবই সহৃদয়তাপূর্ণ। এখানে সব সময় বিলেত থেকে আগত স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় লেগেই থাকে—য়ুরোপীয়দের পক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ যেমন, ইংরেজদের কাছে মাল্টা তেমনি। **কুইন** তো ব্রিটিশ নৌবাহিনীর

সবচেয়ে বড়ো রণতরী, সুতরাং **কুইন** দেখবার পর আর কোনো রণতরী দেখার প্রসঙ্গ ওঠে না। আমার গত চিঠিতে (মনে হয় এ চিঠিটি **ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** ছাপেন নি) মাননীয় মিঃ ফ্রের-এর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা লিখেছি। তিনি আমার প্রতি খুবই সৌজন্য দেখিয়েছেন। তাঁর পল্লী-ভবনে বেড়াতে গিয়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে স্তরে স্তরে তাঁর চমৎকার বাগান উঠেছে, একবারে শীর্ষে তাঁর বাড়ি। সেখান থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। এখানকার পোত-নির্মাণ কেন্দ্র ও মেরামতি কারখানার সুব্যবস্থা দেখে আমি মুগ্ধ। আমাদের বন্ধু রুস্তমজী এখানে এলে কিছু শিখে নিতে পারতেন। শুনেছি এ প্রতিষ্ঠানটি খোদ ইংলণ্ডের বিরাট বিরাট পোতাঙ্গনের অনুরূপ—কেবল আকারে এটি অনেক ছোট। আজ সকালে একটি শিশু-বিদ্যালয় দেখে যেমন আনন্দ লাভ করেছি তেমনি আশ্চর্য হয়েছি। বিদ্যালয় পত্তন হয়েছে মাত্র মাস ছয়েক আগে, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় এমন উৎকর্ষ লাভ করছে যে দেখে অবাক হতে হয়। বিদ্যালয় এমনভাবে পরিচালিত হয় যে শিশুরা মনে করে না বিদ্যালয়ে তাদের আটক করে রাখা হয়েছে, বরঞ্চ সবাই বিদ্যালয়ে থাকতে ভালবাসে। গতকাল আমি গিয়েছিলাম ফিনিসিয়ানদের সময়ে মাল্টা দ্বীপের পুরাতন রাজধানী চিত্তাভীচিয়া দেখতে। ভালেত্তা থেকে সে-জায়গাটা হবে প্রায় ছয় মাইল দূরে। খ্রীস্টীয় ধর্মযুদ্ধের বীরব্রতী 'নাইট'-দের অধিকারে ছিল এই রাজধানী, তারা এখানে ভারি সুন্দর একটি ভজনালয় নির্মাণ করেছিল, সেখানে বেশ কিছুটা সময় পরম আনন্দে কাটানো যায়। এ ভজনালয় সেণ্ট পল-এর নামে উৎসর্গীকৃত বলে এখানকার চিত্র ও অলংকরণ সবকিছুই মুখ্যত সেণ্ট-এর জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে। কিন্তু আকারে আয়তনে ও অন্যান্য দিক থেকে সেণ্ট জন-এর ভজনালয় এর চেয়ে অনেক বড়। এখানে ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি কলেজ আছে, আর আছে ভূগর্ভস্থ সমাধি এবং সেণ্ট পল-এর গুহা। দ্বীপের সর্বোচ্চ জায়গায় এই পুরাতন রাজধানী অবস্থিত থাকায় এখান থেকে বহু দূরবিস্তৃত দৃশ্যাবলী মনোরম দেখায়। এখানকার আবহাওয়া এমনি পরিষ্কার যে সিসিলি দ্বীপের মাউণ্ট এটনা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়—যদিচ দুই দ্বীপের ব্যবধান হবে এক শো মাইলেরও বেশি। এখানে এতই সুখে ও আনন্দে আমার দিন কেটেছে, সকলের কাছ থেকে আদরযত্ন এতই পেয়েছি, যে এ জায়গা ছেড়ে যেতে আমার কেমন একটু যেন মায়া হবে—কিন্তু ছেড়ে তো যেতেই হবে আজ বাদে কাল, নয় তো পরশু।'

ইতালি দর্শনের জন্য **পলিফিমাস** নামক ব্রিটিশ জাহাজে দ্বারকানাথ মাল্টা ত্যাগ করেন ১১ এপ্রিল তারিখে। পথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মুখোমুখি হবার পর তিনি নেপলস পৌঁছন ১৪ তারিখে। সেখান থেকে অতঃপর তিনি যে চিঠি লেখেন তার তারিখ ছিল ২০ এপ্রিল ঃ

'সিসিলি দ্বীপের উচ্চচূড় মাউন্ট এটনা ও সুন্দর শহর মেস্‌সিনা, এয়োলিয়ান দ্বীপ ও জ্বলন্ত স্ট্রম্বোলি দেখার পর আমি নিরাপদে এই সুরম্য নগরে এসে পৌঁছেছি। এখন আমি পম্পেয়ি-র ধ্বংসাবশেষ এবং শহরের মনোরম স্থানগুলি দেখতে ব্যস্ত। পর্বতশিখর থেকে যেসব দৃশ্যাবলী দেখা যায়, প্রাসাদ, জলপ্রপাত, ভজনালয়, প্রদর্শশালা, ভাস্কর্যমূর্তি, চিত্রাবলী, গ্রন্থাগার, দরিদ্রনিকেতন, হাসপাতাল, উদ্যান, খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ—কত কী দেখে দেখে যে আমার সময় কেটে যাচ্ছে কী বলব। সময় অল্প অথচ দ্রষ্টব্য প্রচুর, সুতরাং তাড়াহুড়োয় সব দেখে চলেছি ভাসাভাসাভাবে। য়ুরোপ-এর যে সব শহর ইতিমধ্যে দেখেছি, নেপলস তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। অন্য কোনো শহরে দ্রষ্টব্য বিষয়ের এমন নিখুঁত বিন্যাস য়ুরোপ-এর কোনো একটি শহরে দেখা যায় না বলে শুনেছি। তাপমাত্রা মাত্র ৬৪ ডিগ্রী এবং যে হোটেলে আমরা আছি (দ্য ভিক্টোরিয়া) তার আসবাবপত্র এমন চমৎকার যে কলকাতার যে কোনো গৃহসজ্জাকে হার মানায়। আর শহরে লোকজনের গতায়াতের কথা কী বলব—কেবল বলতে পারি দিনে হোক রাতে হোক, পথ দিয়ে সারাক্ষণ যানবাহন চলছে শ'য়ে শ'য়ে। বড় বড় রাস্তাগুলি আমাদের কলকাতার রাস্তার তিনগুন চওড়া, ধুলোবালি নেই, চমৎকার বাঁধানো সড়ক—দু-ধারে পদচারীদের পথ। অধিকাংশ দোকানপাট গ্যাসের আলোকে আলোকিত বলে সন্ধ্যায় সারাটা রাস্তা ঝলমল করে। কয়েকটি কফি-হাউসে বসবার এমন চমৎকার ব্যবস্থা আর এমনি আলোকসজ্জা, যে লোভ হয় একটা সন্ধ্যা কোনো কফি-হাউসে বসে কাটাই। সান্ কার্লো থিয়েটর-গৃহ য়ুরোপে সর্ববৃহৎ নাট্যশালা—এই রঙ্গমঞ্চের গঠন-সৌষ্ঠব ও আভ্যন্তরীণ পরিসজ্জা বিষয়ে কী আর বলব। বাদ্যবৃন্দের অর্কেস্ট্রা এবং ফরাসী ব্যালে-র সম্মেলক নৃত্যে মঞ্চের উপর শতাধিক সুন্দরী তরুণী ও সুপুরুষ যুবকদের সুললিত দেহভঙ্গিমা যে কোনো নবাগত দর্শককে পাগল করে দেবার মতো। এর পর ইচ্ছা হয় যেন কলকাতার থিয়েটর থেকে চিরবিদায় নিতে পারি। এখানে আমি একটা রেল-রাস্তাও দেখেছি—আমার ঘোড়াগাড়ির পাশ দিয়ে রেলগাড়িটা যখন হুস্ করে বেরিয়ে গেল, ভেবে দেখো আমার মনের তখন কী অবস্থা! এই সবকিছু ছেড়ে আগামীকাল সকালবেলা আমায় রোম-অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। আজকাল আমি আমার নিজের চার ঘোড়ার গাড়ি চেপে ঘোরাঘুরি করি, দূরপাল্লার যাত্রায় প্রতি দশ মাইল অন্তর ঘোড়া বদল করা হয়। এইভাবে যদি চলি, মনে হয়, আগামীকাল অর্থাৎ ২৩ তারিখের সকালবেলা রোম পৌঁছে যাব—সারাটা দিন একটানা তো আমরা চলি না, থেমে থেমে চলি আর রাতে ঘুমোই।'[১০]

নেপলস শহরের সৌন্দর্যে দ্বারকানাথ অভিভূত হয়েছিলেন কারণ শহরের যে কোনো স্থান থেকে দেখা যেত নেপলস-এর উপসাগর ও ভিসুভিয়াস-এর আগ্নেয়গিরি। বলেছেন, 'নবাগতের কাছে এ-দৃশ্য অতি সুন্দর।' শহরের প্রধান রাজপথ টোলোডো-র

প্রশংসাতেও তিনি পঞ্চমুখ; বলেছেন, রাস্তার দু'ধারে ঝকঝকে ঝলমলে সব মহামূল্য বস্তুসম্ভারের দোকান, প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি ও বিরাট সব প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু মনোরম নেপলস দেখার পর রোম দেখে তাঁর চোখ যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল—তার প্রমাণ দেখি ২৩ এপ্রিল তারিখে রোম পৌঁছবার পর ২৬ তারিখে দ্বারকানাথ যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তাতে ঃ

'দু-দিনের যাত্রাপথ বেশ ভালোভাবে অতিক্রম করে আমরা এখানে এসে পৌঁছলাম ২৩ তারিখের সকালবেলা। একটা দিন ঘোড়া গাড়িতে এক নাগাড়ে সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি একটুও ক্লান্তি বোধ না করে। তা থেকেই বুঝতে পারবে আমার শরীর স্বাস্থ্যের কতটা উন্নতি ঘটেছে। ভারতে থাকতে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর অবধি যেতেই তো আমার জিভ বেরিয়ে যেত। সারাটা রাস্তার দু-ধারে গ্রামাঞ্চল খুবই উর্বর মনে হল, ভালো চাষ-আবাদ হয়, গাড়ি চড়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল ফুলে ফলে ভরা বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছি। সারা রাস্তা ধরে পথ ছিল খুবই ভালো—যেমন চওড়া তেমনি শক্ত তেমনি সমতল—আঁকাবাঁকা পথে চড়াই উৎরাই যথেষ্ট ছিল, উপত্যকা অতিক্রম করে কখনো বা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি, কখনো বা পর্বতশিখর পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছি উপত্যকার দিকে। পথ চলতে এত সুন্দর সব দৃশ্য দেখেছি যার কোনো তুলনা হয় না। এমন উঁচু রাস্তা দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলা এই আমার প্রথম বলে নীচের দিকে তাকাতে আমার একটু যে ভয় ভয় করছিল না, মাথাটা যে ঘুরছিল না—এমন কথা বলব না। কিন্তু গাড়ি এমনি স্বচ্ছন্দে চলছিল যে কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড কিম্বা চৌরঙ্গির রাস্তাতেও এমন মসৃণভাবে কখনো যেন চলি নি। রোম শহর সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত, চোখে না দেখলে এর সৌন্দর্য ঠিক বোঝা যায় না। বর্ণনা দিয়ে কতটুকুই বা বোঝানো যায়! এখানকার সবকিছুই যেন মহান বিরাট। মাল্টার সেন্ট জন ভজনালয় এবং নেপলস-এর গির্জাঘরগুলি দেখে আমি কতই-না মোহিত হয়েছিলাম, কিন্তু রোম-এর সেন্ট পীটার্স্-এর তুলনায় সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। আকারে-আয়তনে সেন্ট পীটার্স্ এত বৃহৎ যে ওরকম দশ বিশটা গির্জা অনায়াসে তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আকারের সৌষ্ঠবে কিংবা অলংকরণে কেউ তারা সেন্ট পীটার্স্-এর ধারেকাছে আসতে পারে না। প্রতিদিন দেখলেও সেন্ট পীটার্স্ পুরনো হয় না, রোজই যেন চক্ষুমনের তৃপ্তিকর নূতন নূতন বস্তু এখানে দৃষ্টিগোচর হয়। সেন্ট পীটার্স্ ছাড়া রোমে দর্শনীয় সামগ্রীর মধ্যে আছে প্রদর্শশালা, গ্রন্থাগার, প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি, নদনদী, ভাস্কর্যের নিদর্শন, তৈলচিত্র, প্রাচীরচিত্র, জলের ফোয়ারা এবং আরও কত কী! সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে রোমের কোনো তুলনা হয় না। এখানকার আবহাওয়া খুবই মনোরম, আকাশ মেঘলেশহীন, ঠাণ্ডা ঠিক ততখানি যতখানিতে পাখা টানার দরকার হয় না এবং সন্ধেবেলা খোলা আকাশের তলায় বসে থাকতে বেশ আরাম। দেশে যে সব রুগ্ন বা অসুস্থ ব্যক্তি আছেন তাঁদের পক্ষে এরকম

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া খুবই উপকারী। রোমের মত চমৎকার শহর আর কোথাও থাকতে পারে বলে আমি জানি না। প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য যা কিছু আমার নজরে পড়ছে আমি সে সবের উপর কিছু কিছু নোট লিখে রাখছি, দেখা হলে সেগুলি পড়ে আবার একদফা আনন্দ উপভোগ করা যাবে—যদিচ আমার অক্ষম বর্ণনায় আসল সত্যের রূপটুকু ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ। গতকাল আমাদের স্থানীয় এজেন্ট প্রিন্স তোরলোনিয়ার সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে যে উপার্জন হয় সেটা বাদ দিলেও তাঁর বার্ষিক আয় হবে ৯৫,০০০ পাউণ্ড। তাঁর লেনদেনের দপ্তর একটি প্রাসাদবিশেষ, প্রভূত অর্থব্যয়ে সুন্দর সব মর্মরমূর্তি ও রঙিন টালি দিয়ে সুসজ্জিত। যতগুলি ভাস্কর কিংবা চিত্রকরের দোকানে গেছি শুনেছি তারা সবাই তোরলোনিয়ার বরাত দেওয়া কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। শহরে ও পল্লী অঞ্চলে তাঁর যেসব বাড়িঘর আছে সেগুলির পেছনে তিনি খরচ করেন দেদার অথচ ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি অক্লান্তকর্মা, দৈনিক বেলা দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত নিজেই দপ্তরে বসে সব কাজকর্ম দেখেন, খদ্দের-মক্কেল যাঁরাই আসেন অমায়িকভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন ও তাঁদের প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনে থাকেন। তিনি ও তাঁর অংশীদারেরা আমাদের সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন দু-বার এবং আমাদের সঙ্গে খুবই সহৃদয় আচরণ করেছেন। কারো যদি প্রচুর অর্থ থাকে এখানে শিল্পমূর্তি, তৈলচিত্র, মোজেয়িক প্রভৃতি খরিদ করে পকেট অনেকখানি হালকা করতে পারেন। আমি কিন্তু—এর উপদেশক্রমে অতি কষ্টে কেনাকাটার লোভ সংবরণ করে চলেছি। আজ বিকেলে আমায় পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উপস্থাপিত করা হয়েছিল—চমৎকার ঋষিকল্প বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বড়ই অনুগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের স্বাগত করলেন, তিনি পোপের আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালে সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় তাঁর সন্দর্শনে উপস্থিত হয়েছে বলে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। তাঁর প্রাসাদের লাইব্রেরিকক্ষে সাক্ষাৎকার হল; লাইব্রেরি-ঘর এত বৃহৎ যে এক প্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্ত দেখা শক্ত, গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে লাইব্রেরি ঠাসা। শুনলাম, পোপের প্রাসাদে বারো হাজার কামরা আছে, সেকালের শিল্পীদের রচিত বহু প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও চিত্রাদি দিয়ে এইসব ঘর ভরা।'

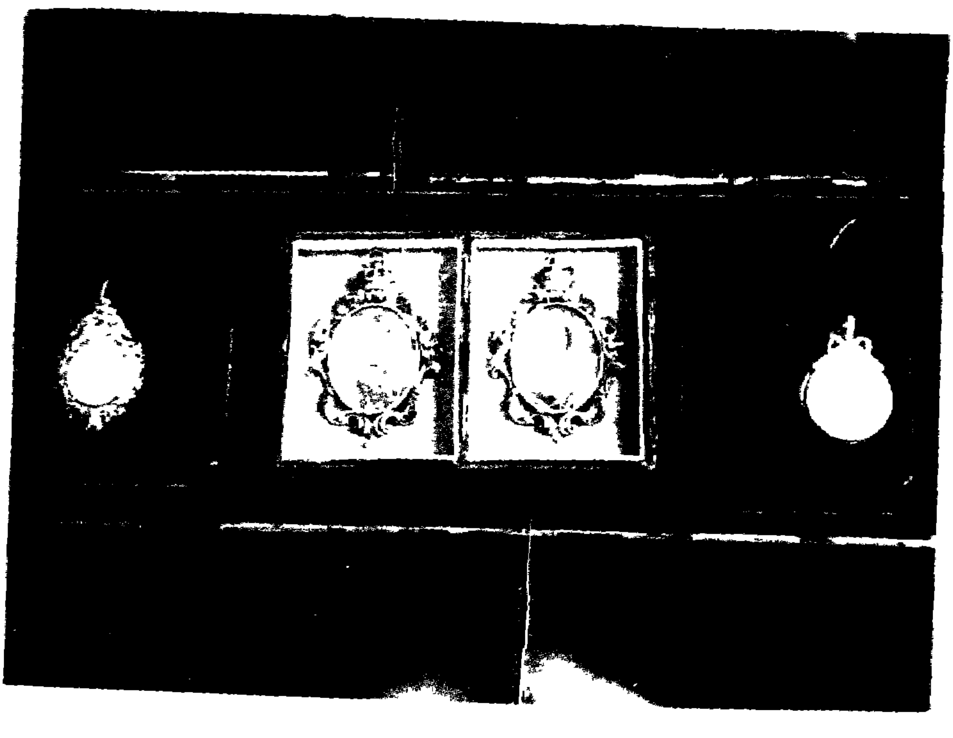
সম্ভবত দ্বারকানাথের ডায়ারির ভিত্তিতে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন যে, রোম শহরের ইংলিশ কলেজের অধ্যক্ষ পোপের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দেন। পাগড়ি না খুলে আসার জন্য দ্বারকানাথ মহামান্য ধর্মগুরুর মার্জনা ভিক্ষা করে নিবেদন করেন যে খ্রীস্টান দেশের রেওয়াজ অন্যবিধ হলেও তাঁর নিজের দেশের রীতি হল সম্মানিতকে সম্মান দেখাবার জন্য শিরস্ত্রাণ ধারণ করে আসা। সন্ধ্যা বেলায় দ্বারকানাথকে নিয়ে যাওয়া হয় কর্নেল কল্ডওয়েলের এক পার্টিতে—সেখানে প্রাশিয়ার প্রিন্স ফ্রেডরিক ও জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ মিসেস সোমারভিল-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রোমের সুবৃহৎ রঙ্গশালা কোলোসিয়ম তাঁর মনকে অভিভূত করেছিল একটু



ব্যারন ডি. শোযাইটের অঙ্কিত প্রতিকৃতি। মাদাম কৃষ্ণা রিবুর সৌজন্যে।



দ্বারকানাথেব নামাঙ্কিত পান্নার আঙটি।



দ্বারকানাথকে উপহৃত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্ট-এব মিনিযেচর ছবি ও দুটি সোনার মেডেল।



দ্বাবকানাথ ঠাকুব ও ফেলিক্স সেবাস্তিয়ঁ ফুইয়ে দা কঁশ।—ম শার্ল ইয়েগবস্মিট ও মাদাম কৃষ্ণা বিবৃব সৌজন্যে। (ফুইয়ে দা কঁশ-এব উত্তব পুরুষ ইয়েগবস্মিট বলেন, এই কার্টুন এঁকেছিলেন ফুইয়ে দা কঁশ স্বয়ং। ছবিব বাঁ দিকেব কোণায় তাঁব হাতেব লেখায় তারিখ ও স্বাক্ষব দেওয়া আছে—পয়লা মার্চ ১৮৪৬ পাবী, ফুইয়ে দা কঁশ, আমাব বন্ধু কলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুরকে। ডানদিকেব কোণায় দু' ছত্রেব একটি ফবাসী পয়াব আছে

তুমি শুধু, ওগো তুমি, সকল দেবতা' চেয়ে তুমি বরণীয়,
তুমি শুধু, ওগো তুমি, পূজা সবাব চেয়ে মোব পূজনীয়।



১৮৪২ সালেব ৯ জুন তবিখে এস এস বেইনবো স্টিমাব যোগে দ্বাবকানাথ ঠাকুব ও তাঁর ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম কবেন। সহযাত্রী ভাস্কব এইচ উইকস অঙ্কিত জলবঙা ছবিব প্রতিলিপি।—সুভো ঠাকুরেব সৌজন্যে।



ব্যারন দো' রসে অঙ্কিত প্রতিকৃতি ১৮৪২।—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে।



আনুমানিক ১৮৬০ সালে গৃহীত দেবেন্দ্রনাথের ফটো-প্রতিকৃতি।—শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

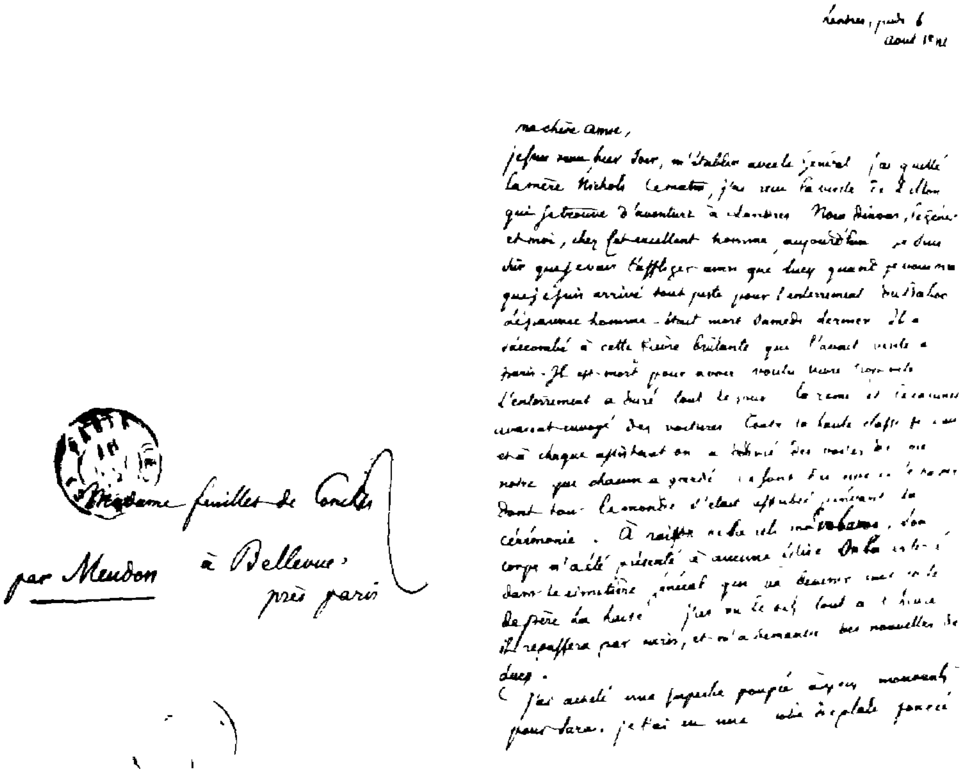
Dear Sir,

Our friend Walker has left me and as I only got my things from the Customhouse today I could not send my little fair friend my promised present before - But as Genl. Ventura is here and kindly offers to take it with him I have delivered it over to his charge and I hope it will safely arrive. I am fully busy day & night among the great people & very little time left for my own amusement & even I have not been able to go to a theatre. However the gaiety will be over in a few days when I hope I shall be able to see the sights - With

লণ্ডনের সেন্ট জর্জ হোটেল থেকে ৫ জুলাই ১৮৪৫ তারিখে ফুইয়ে দ্য কঁশ-কে লেখা দ্বারকানাথের চিঠির প্রতিলিপি।—ম. শার্ল ইয়েগবস্মিট ও মাদাম কৃষ্ণা রিবুর সৌজন্যে।



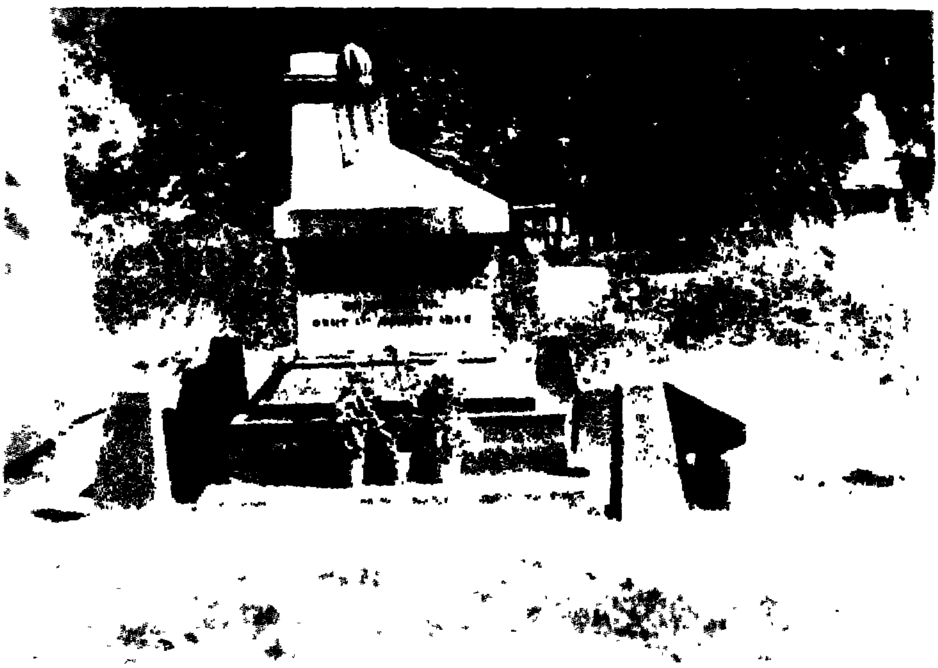

মহারাণী-কর্তৃক অনুমোদিত দ্বারকানাথের বংশমর্যাদার প্রতীক। ১৮৪২ সালে লণ্ডনের কলেজ অব আর্মস-এ রেজিস্ট্রিভুক্ত।


Londres, jeudi 6 août 1846

ma chère amie,

Madame Feuillet de Conches
par Meudon à Bellevue près paris

লণ্ডন থেকে দ্বারকানাথের মৃত্যুর খবর দিয়ে পারী-স্থিত স্ত্রীকে লিখিত ফুইয়ে দা কঁশ-এর চিঠির প্রতিলিপি।—ম শার্ল ইয়েগরস্মিট ও মাদাম কৃষ্ণা রিবুর সৌজন্যে।



দ্বারকানাথের সমাধি।

অন্যভাবে, তিনি বলেছিলেন, 'একদা এই বিরাট রঙ্গভূমি হাজার হাজার মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদে অনুরণিত হত।'[১১]

২৯ এপ্রিল তারিখে রোম থেকে লেখা তাঁর অপর একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন : 'গতকালের দিনটা আমার খুব ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হয়, কুইরিনোল-এ পোপের প্রাসাদ দেখে আমি গিয়েছিলাম ডোরিয়ান চিত্রমঞ্চে, তারপর প্রখ্যাত কয়েকজন ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীর স্টুডিয়ো ঘুরে আমি যাই প্রিন্স তোরলোনিয়ার সুরম্য ভিলায়। ভারি সুন্দর এই ভিলা—আয়তনে বড় না হলেও প্রচুর অর্থব্যয়ে সুসজ্জিত। ভিলাটি নির্মিত হয়েছে পম্পেয়ি-র একটি প্রাচীন আবাসগৃহের আদলে—কক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকার হলে কী হবে, দেওয়ালে যেসব কাজ-করা পর্দা ঝুলছে, সেগুলির এবং ঘরের ভিতরকার আসবাবপত্রের তুলনীয় আমি কায়রোর পর থেকে এ পর্যন্ত আর কোথাও দেখিনি। ছবিতে-রঙিন টালিতে সুসজ্জিত এক একটি কক্ষ যেন সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রতীক—যেন কল্পনা পরিণত হয়েছে বাস্তবে। আশেপাশের জমিতে ইতস্তত ছড়ানো আছে বহু ভগ্নাবশেষের অনুকরণ—ইজিপ্টের চতুষ্কোণ পাথরের স্তম্ভ, গথিক ধরনের ভজনালয়, বীরব্রতী 'নাইট'-দের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মল্লভূমি, পাশে তার রূপসীশ্রেষ্ঠার উন্নত মঞ্চ, স্পেন-বিজয়ী মূরদের প্রাসাদ—কেন্দ্রে তার একটি ছোট টেবিল, ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে নেমে যাচ্ছে পাতালে, আবার উঠে আসছে নানা আহার্যসম্ভার বহন করে। এই মূর-প্রাসাদের ভিত্তি এমনভাবে তৈরি, দেখে মনে হয়, প্রকাণ্ড কয়েক খণ্ড পাথরের উপর প্রাসাদটি যেন দাঁড়িয়ে আছে—তলায় যেন বিরাট একটা গুহা। বাগানের মধ্যে যে নাটমঞ্চটি তৈরি হচ্ছে, দেখে মনে হয় অপূর্ব দেখতে হবে। খোলা আকাশের তলায় ক্ষুদ্রায়তন একটি প্রাচীন গ্রীসের গ্যালারি-থিয়েটর ধরনের রঙ্গমঞ্চও রয়েছে। তারই পাশে বহুমূল্যে সুসজ্জিত একটি গ্রীষ্মাবাস। এ জায়গাটা তৈরি করতে কত যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার সামান্য একটা ধারণা তুলে ধরলাম। এখানকার ঘোড়াশালও প্রাসাদবিশেষ, জাবনাপাত্র মার্বেল পাথরে তৈরি।...আগামীকাল ভোরবেলা আমি এ জায়গা ছেড়ে রওনা হচ্ছি। পথে আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য থাকবে না বলে আমি যথাসম্ভব লণ্ডন পৌঁছবার চেষ্টা করব। এর পরের চিঠিটা লিখব লণ্ডন থেকে।'

কিন্তু লণ্ডন পৌঁছবার আগেই তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন ২০ মে তারিখে ইনসব্রুক থেকে। সে চিঠিতে তিনি রোম ছাড়ার পর যে সব শহর দেখেছিলেন তাদের তালিকামাত্র দিয়েছিলেন—ফ্লোরেন্স, বোলোনা, পাদুয়া ও ভেনিস। ফ্লোরেন্স মধ্যযুগে ছিল ইতালিয়ান রেনেশাঁস-এর প্রাণকেন্দ্র, সেখানে দ্বারকানাথ কিছুদিন অবস্থান করলে ভালো হত। ডায়ারিতে অবশ্য ভিনাস দ্য মেদিচির আদি ও অকৃত্রিম মর্মরমূর্তি দর্শনে নয়নের তৃপ্তি বিষয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন : 'এ ধরনের মূর্তি আর কোথাও দেখা যায় না।' এখানে রঙিন মার্বেল পাথরের টালি দিয়ে তৈরি কয়েকটি মোজেইক টেবিল দেখে তিনি হিসেবী সওদাগরের মতো বলেছিলেন, 'এর প্রত্যেকটির দাম হবে দেড়

লাখ টাকা।' টাসকানি বেড়াতে গিয়ে সেই প্রথম তিনি জনসাধারণের বিষয়ে দু-একটা কথা বলেছিলেন, 'টাসকানির প্রত্যেকটি কুটীর পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত। তাছাড়া চেহারায় ও বেশভূষায় তাদের বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশের চাষাভূষো কেনা গোলামের মতো, সে সব দেশে এ রকমটা দেখা যায় না।' টাসকানি দেখে তাঁর কি ক্ষণতরে মনে পড়েছিল নিজের দেশের কৃষকসমাজের দুরবস্থার কথা? কিন্তু দ্বারকানাথ তো আর রামমোহন রায় নন, কাজেকাজেই রোমের উপকণ্ঠে প্রিন্স তোরলোনিয়ার বাগানবাড়ির ঐশ্বর্য-গৌরব দেখে তিনি যেমন অভিভূত হয়েছিলেন, জনসাধারণের জীবনযাত্রা নিয়ে ততটা মাথা ঘামাতে যাননি। কিন্তু নিসর্গদৃশ্যের সৌন্দর্য, সে মানুষের হাতের তৈরি হোক বা প্রকৃতির নিজস্ব জিনিসই হোক, তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে পারেনি।

যেমন ভেনিস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ 'ভেনিস এক অদ্ভুত আশ্চর্য জায়গা, এখানকার রাস্তাঘাট সবই খাল, খালের ধারে অবস্থিত বলে মনে হয় বাড়িঘর সব উঠেছে জল থেকে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে গোন্দোলা চড়ে যেতে হয়। এ পর্যন্ত যে সব শহর দেখে এসেছি, প্রত্যেকটিতে গাড়ি ঘোড়া ও পথচারীদের হৈ চৈ হট্টগোল—ভেনিসে সে সব কিছু নেই বলে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লাগে।' চিত্রশালায় তিনি টিশিয়ান-এর আঁকা ভেনিস-শাসক ডোজ-দের প্রতিকৃতি এবং প্রজাতন্ত্রের নানা কীর্তিকলাপের ছবিও দেখলেন।

বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী সমতটের লোক ছিলেন দ্বারকানাথ, হিমালয় তিনি কখনো দেখেন নি, সুতরাং পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে তিনি খুবই উল্লসিত বোধ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ 'আলপস-এর দৃশ্যাবলী দেখে আমি যে আনন্দ লাভ করেছি তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই—কয়েক পা এগিয়ে যেতেই যেন পট পরিবর্তন হচ্ছে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর—এবং প্রত্যেকটি দৃশ্যই যেন আশ্চর্য সুন্দর! রাস্তার অবস্থা ছিল খুবই ভালো; যদিচ অধিকাংশ সময় চলেছিলাম চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে, একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি—এক কেবল অনেক নীচের উপত্যকা দেখতে গিয়ে মনে একটু ভয় ভয় করছিল। বরফে আবৃত জায়গার মধ্যে দিয়েও আমাদের গাড়ি ছুটেছিল—আমার জীবনে এই প্রথম আমি একটু বরফ নিয়ে এ-হাত ও-হাত করলাম। অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন, পাহাড় অতিক্রম করে যেতে খুব ঠাণ্ডা লাগবে, আমার কিন্তু ভালোই লাগল পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যেতে, এমনকি সচরাচর আমি যে পোশাক পরিধান করে থাকি তার উপরে আর কিছু গায়ে চাপাতেও হয়নি। একবার কল্পনা করে দেখো, এখানকার মে মাসে শীতল ও আরামপ্রদ আবহাওয়ায়, আমি সূতীর জামা কাপড়ে পরম আনন্দে বরফে ঢাকা আলপস পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চলেছি, দিনরাত পাংখা চালাতে হচ্ছে না—সেটা কি কম আরামের! আমরা এখন গাড়ি বেশ দ্রুত ছুটিয়ে চলেছি, ছ'টা থেকে আট

ঘোড়া আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে দৈনিক সত্তর থেকে আশি মাইল গতিতে, অথচ পথশ্রমের ক্লান্তি আমায় স্পর্শ করছে না, সুতরাং লণ্ডন এখন প্রায় যেন নাগালের মধ্যে।'

এত সহজে লণ্ডনের নাগাল মেলেনি। আরও বেশ কয়েকটা দিন দ্বারকানাথকে পথে পথে কাটাতে হয়েছে, জর্মানীর মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে—স্টুটগার্ট, হাইডেলবর্গ প্রভৃতি শহরে সামান্য একটু বিশ্রাম নিতে নিতে। কোনো একটা শহরে অধিক দিন তাঁর থাকা হয়নি, কারণ লণ্ডনে গিয়ে স্থিতিবান হতে তাঁর বিশেষ একটা তাড়া ছিল—সেই কবে ৯ জানুয়ারি তারিখে কলকাতা ছেড়েছেন, দীর্ঘ ও আয়াসসাধ্য পথ অতিক্রম করে এখন তিনি একটু যেন ক্লান্ত। পথ চলা ত্বরান্বিত করলেন বটে কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু নজর করলেন, খুব ভাল লাগল জর্মানীর পল্লী-অঞ্চল—কেমন সুবিন্যস্ত, উত্তমরূপে কর্ষিত ক্ষেতখামার, পরিষ্কার রাস্তা, ছিমছাম ছবির মতো গ্রাম ও শহর। বিশেষ করে ও দেশের শিক্ষার মান লক্ষ্য করে তিনি মুগ্ধ হলেন, ডায়ারিতে লিখলেন ঃ 'শিক্ষাক্ষেত্রে জর্মানীর প্রগতি খুবই উল্লেখযোগ্য—সেদিক থেকে ইতালির সঙ্গে এ দেশের পার্থক্য প্রচুর। সেখানে ইতালিয়রা ইতালিয়ান ছাড়া আর কোনো ভাষাতে কথা বলতে পারে না, এখানে সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা সবাই ফরাসী বলতে পারে—অনেকে ইংরেজীও বলতে পারে। রাস্তায় এমন একটি ছেলে বা মেয়ে চোখে পড়ল না, যার হাতে কোনো বই নেই। কোনো শহরে ভিক্ষুক দেখিনি। ব্যাভেরিয়ার রাজা নিজে বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁর রাজ্যে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে স্কুল নেই, তাছাড়া ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলকেই স্কুল যেতে হয়, গরিব ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না, ধনীরা সামান্য কিছু দেন। সারা দেশ জুড়ে ফোয়ারা ও পানীয় জলের প্রাচুর্য।'[১২]

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রেলযোগে তিনি গেলেন মাইন্‌ৎস্‌ এবং সেখানে একটি ভাসমান সেতু দিয়ে তিনি রোন্‌ নদী অতিক্রম করে কোলোন-গামী স্টিমার ধরলেন। কোলোন-এর ক্যাথিড্রাল দেখে তাঁর খুব ভালো লেগেছিল, ভালো লাগেনি কোলোন-এর গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া—বলেছেন, জর্মানদের উচিত গ্রীষ্মকালে ভারতীয় পাংখার প্রবর্তন করা। কোলোন-এ আবার তিনি রেলগাড়ি চেপে চলে গেলেন শার্লেমান-এর জন্মস্থান ও সমাধিস্থান আাঁ-লা শাপেল্‌-এ। অতঃপর ব্রাসেলস ও তার পর ওস্টেণ্ড-এ কিছুকাল অবস্থান করে ঘোড়ায় টানা ডাকগাড়ি চেপে চলে যান ক্যালে—সেখানে তাঁর বহুকালের বন্ধু ও কারবারের অংশীদার জন কার, দ্বারকানাথকে স্বাগত করবার জন্য ব্রাউন রবার্টসকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন রেনবো-নামধেয় একটি স্টিমার যোগে। সেই জাহাজেই ভাস্কর এইচ. উইকস-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় (পরে দ্বারকানাথ কলকাতার টাউন হল-এ স্থাপনার জন্য মার্বেল প্রস্তরে তাঁর নিজের আবক্ষ মূর্তি গড়বার বরাত দিয়েছিলেন উইকস-কেই)।

উইকস কেবল ভাস্কর ছিলেন না, ছবিও আঁকতেন; জাহাজে থাকাকালেই তিনি জলরঙে দ্বারকানাথ ও তাঁর ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছবি এবং স্টিমার থেকে ডোভার-দুর্গের দৃশ্য এঁকেছিলেন।

দলবলসহ দ্বারকানাথ ডোভার পৌঁছলেন ৯ জুন তারিখে এবং রাতটা কাটালেন ক্যান্টারবেরিতে। ক্যান্টারবেরির বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল তথা ব্ল্যাক প্রিন্স ও টমাস বেকেট-এর স্মৃতিসৌধ তাঁর কাছে বড্ড বেশি 'জাঁকালো' মনে হয়েছিল। কোনোদিন তিনি নিতান্ত প্রাথমিক ছাড়া অন্য স্কুলে পড়েননি যদিচ, নিজে নিজে বাড়িতে বসে অনেক কিছু পড়ে থাকবেন, কারণ ইতিহাস তিনি ভালোই জানতেন। ঘোড়াগাড়িতে চ্যাটাম ও রচেস্টার হয়ে তাঁরা লণ্ডনে পা দিলেন ১০ জুন তারিখে—কলকাতা ছেড়ে যাবার ঠিক পাঁচ মাস দু'দিন বাদে।

**ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া** কাগজে তাঁর শেষ যে চিঠিটি প্রকাশিত হয় সেটি তিনি লিখেছিলেন লণ্ডন থেকে, ১৮৪২ অব্দের ২৯ জুন তারিখে। ইতিপূর্বে তাঁর যেসব চিঠি ওই কাগজে বেরিয়েছিল সেগুলি তিনি নিশ্চয় তাঁর এমন কোনো য়ুরোপীয় বন্ধুকে লিখেছিলেন যিনি ছিলেন অ্যাংগলিকান সমাজের লোক, তা না হলে মাল্টা দ্বীপের ভালেত্তা শহরের অতিশয় জাঁকালো ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক্যাথলিক ভজনালয়ের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে 'তোমাদের চার্চ'-এর কথা বলতেন না। উল্লিখিত তাঁর শেষ চিঠিখানি তিনি সম্ভবত লিখেছিলেন পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে। কিশোরীচাঁদ মিত্রও তাই অনুমান করেন। (দ্রষ্টব্য *Memoi*—পৃ. ৮৮)।

'গত বিশ বছর ধরে যা আমার ধ্যানের বিষয় ছিল আমি শেষ পর্যন্ত আমার সেই বহু ঈপ্সিত জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কলকাতা ছেড়েছিলাম জানুয়ারির ১০ তারিখে।[১৩] (বুঝতেই পারো তাহলে গত কয়েক মাসের মধ্যে কত আশ্চর্য ব্যাপার আমি ঘটিয়েছি), সুয়েজ পৌঁছলাম ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে, ইজিপ্ট, মাল্টা, নেপলস, রোম, ভেনিস, জর্মানীর বিভিন্ন রাজ্য, বেলজিয়ম, আলপস পর্বতমালা ও রাইন নদীর তীরবর্তী দৃশ্যাবলী দেখে ক্যালে পৌঁছলাম জুন মাসের ৮ তারিখে। পরদিন প্রাতে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভার, রাত কাটালাম ক্যাণ্টারবেরিতে, পরের দিন সকালবেলা জুন মাসের ১৬ তারিখে[১৪] উপস্থিত হলাম মহিমামণ্ডিত এই লণ্ডন শহরে। কণ্টিনেণ্টের সবকিছু দেখবার পর আমি আশাই করিনি এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আমায় এত গভীরভাবে অভিভূত করবে, কিন্তু বাস্তবিকই এই লণ্ডন হল এক **আশ্চর্য শহর**![১৫] নগরজীবনের প্রাণচাঞ্চল্য, যানবাহন, বিপণি এবং বিশেষ করে শহরের মানুষগুলো আমায় একেবারে বিভ্রান্ত করে তুলেছে! সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আমি অভ্যাগতদের স্বাগত করতে নয় তো নিমন্ত্রণরক্ষায় ব্যস্ত থাকি। এখানে পা দেবার দু দিন পরেই মহামান্যা মহারাণী 'সদয় অভ্যর্থনায় আমায় আপ্যায়ন করেছিলেন।[১৬] রাজপরিবার এবং অভিজাতবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন,

করেছেন, প্রাক্তন ও বর্তমান মন্ত্রীরা সকলেই সর্বপ্রকারে খাতির যত্ন করেছেন।

'এখনো আমি লণ্ডন শহরের বিশেষ কিছু দেখে উঠতে পারিনি এক কেবল হাউস অব লর্ডস, হাউস অব কমনস ও ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস ছাড়া। জুলাই মাস শেষ হবার আগে আর যে বিশেষ কিছু দেখতে পারব, আশা করি না। আবহাওয়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয় বাংলাদেশের সূর্য আমার পিছন পিছন এসেছেন, সত্যি বলতে কি কয়েকটা দিন তো আমায় হাতপাখা ব্যবহার করতে হয়েছিল এখানে। সারাক্ষণ বর্ষণ ও ঘন ঘন আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়ে যেসব কথা শুনে এসেছিলাম, সে বিষয়ে সানন্দে হতাশ হয়েছি। এইরকমটাই যদি এখানকার আবহাওয়া হয়, তাহলে কেউ এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আবহাওয়ায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে বলে মনে হয় না। অপেরা ও থিয়েটর দেখে আমি যে প্রচুর আনন্দলাভ করেছি, সেকথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের রমণীদের সৌন্দর্য দেখে আমার রূপকথার গল্প মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় পারসিক গল্পে যে সব কথা পড়েছিলাম এখানে সে সব যেন প্রত্যক্ষ দেখতে শুরু করেছি। যদি কারো ঐশ্বর্য থাকে তা উপভোগ করার উপযুক্ত স্থান হল এই। আজ বিকেলে আমি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে গিয়েছিলাম; অরগ্যান বাজনার সঙ্গে সমবেত ধর্মসংগীত, ধর্মোপদেশ ও সমবেত উপাসনার মধ্যে আমি যে সুপবিত্র গাম্ভীর্য দেখেছি—তা খুবই মনোরম। অভিজাত পরিবারের কারো কারো বাগান আমি দেখেছি; এখন আমার বেলগাছিয়ার বাগান সম্পর্কে তুমি যা মনে চায় লিখতে পারো—ও বাগানকে সাজাবার আশা আমি সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। এবারকার ডাকে তোমায় এর চেয়ে বেশী কিছু লেখার মতো সময় নেই, দীর্ঘতর অবকাশ পেলে এর পরের চিঠিতে লণ্ডন প্রসঙ্গে সুবিচার করতে পারব বলে আশা রাখি।'

লণ্ডনে এসে দ্বারকানাথ ও তাঁর দলবলের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল ৩২ নম্বর অলবেমার্ল স্ট্রীটের[১৭] সেন্ট জর্জেস হোটেলে। পৌঁছনোর পরের দিনই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় চিজউইক উদ্যানে উদ্যানপালনবিষয়ক উৎসব দেখাবার জন্য। সেখানে ফল ও ফুলের প্রদর্শনী দেখে তিনি যতটা আনন্দ পেয়েছিলেন ততটাই আনন্দ পেয়েছিলেন 'উত্তম বেশভূষায় সুসজ্জিত' আঠারোশো দর্শকের সমাগম দেখে। পরের কয়েকটি দিন সাক্ষাৎকারে কেটে গেল—দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী স্যর রবার্ট পীল, চরমপন্থী দলের নেতা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্রুয়াম, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন এবং বোর্ড অব ট্রেড-এর প্রেসিডেন্ট লর্ড ফিটজেরাল্ড-এর সঙ্গে। লর্ড ফিটজেরাল্ডই আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাণীর সকাশে তাঁকে উপস্থাপিত করেছিলেন ১৬ জুন তারিখে। শনিবার ১৮ জুন তারিখে এই উপস্থাপিত করার ঘটনাটি 'মহামান্যা মহারাণীর অভ্যর্থনা-কক্ষ' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্রে **কোর্ট জার্নাল**-এ নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশিত হয় ঃ 'বিদেশী দূতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মহামান্যা মহারাণীর সকাশে যথাক্রমে উপস্থাপিত করা হয়।' তালিকায়

সর্বপ্রথম নাম ছিল লর্ড ফিটজেরাল্ডের উপস্থাপনায় জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের। কেবল মহারাণীর সঙ্গে নয়, তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয় প্রিন্স অলবার্ট, ডাচেস অব কেন্ট এবং ডিউক অব ওয়েলিংটনের সঙ্গেও। মহারাণী খুবই সহৃদয়তার সঙ্গে দ্বারকানাথের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছিলেন এবং পরে তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন ঃ 'ব্রাহ্মণ চমৎকার ইংরেজী বলেন—ভারি বুদ্ধিমান ও আগ্রহ-উদ্দীপক লোক।'[১৮]

সম্রাজ্ঞী কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে দ্বারকানাথ এক সপ্তাহ বাদে ২৩ জুন তারিখে ব্রিটিশ সেনাদলের একটি বৃহৎ সমাবেশ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিশেষভাবে সংরক্ষিত চক্রাকার আসনে বসেছিলেন সম্রাজ্ঞী, প্রিন্স অলবার্ট, ডিউক অব ওয়েলিংটন, এবং সম্রাজ্ঞীর পিতৃব্য ডিউক অব কেম্ব্রিজ-এর সঙ্গে। এর অল্পদিন পরেই বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে আমন্ত্রণ অথবা রাজকীয় এত্তেলা আসে মহারাণীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দেবার জন্য। সেই ভোজসভায় মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অলবার্ট ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাকস-কোবর্গ-গোথার যুবরাজ ও যুবরাণী, লর্ড ফিটজেরাল্ড, আর্ল অব লিভারপুল ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ। 'মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ও তাঁর স্বামী দ্বারকানাথের সঙ্গে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় যোগ দেন—আলাপের মুখ্য বিষয় ছিল ভারত সংক্রান্ত। তারপর তিনি ডাচেস অব কেন্ট-এর সঙ্গে একহাত তাসও খেলেন। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী সদ্য সেদিন টাঁকশালে ছাপা তিনটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারকানাথকে উপহার দেন। অতঃপর একদিন দ্বারকানাথ প্রাসাদের শিশুসদন পরিদর্শন করার জন্য মহারাণীর আমন্ত্রণ পান। লেডি লিটলটন, সর্বজ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ও প্রিন্স অব ওয়েলসকে শিশুসদনের বাইরে এনে দ্বারকানাথকে দেখান—তাঁদের পরণে ছিল মুক্তা-খচিত শাদা মসলিনের সাদাসিধা জামা।'[১৯]

দ্বারকানাথের ডায়ারিতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহের সম্পর্কে কিছু কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের শিশুসদন থেকে দ্বারকানাথ সরাসরি যান জন গিবসন লকার্ট-এর বাড়ি; অনুমান হয়, লকার্ট তাঁর শ্বশুর স্যার ওয়ল্টর স্কট-এর যে প্রখ্যাত জীবনী রচনা করেছিলেন, সে বই তিনি পড়ে থাকবেন। সে সময় লকার্ট **কোয়াটার্লি রিভিউ** সম্পাদনায় নিযুক্ত। ডায়ারিতে লকার্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্বারকানাথ লিখছেন ঃ 'তিনি নিজেও খুব চমৎকার মানুষ। তাঁর অধিকারে যে-সব মূল্যবান তথ্য মজুদ আছে তিনি সেগুলি পরিবেশন করেন পাণ্ডিত্যের ভাণ না করে। বই সম্পর্কে বহুমূল্যবান তথ্য তিনি সরবরাহ করলেন এবং তাঁর লেখা বার্নস-এর জীবনী ও তাঁর শ্বশুরমশায় স্যার ওয়ল্টর স্কট-এর জীবনী—এক কপি করে উপহার দিলেন। তাঁর পরিচয় লাভ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'[২০]

সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত মহলে স্কট-এর নভেল ছিল খুবই জনপ্রিয়, ভারতীয় ভাষায় প্রথম উপন্যাসকারদের উপর স্কট-এর প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু চার্লস ডিকেন্স-এর নাম তখনো সে মহলে খুব বেশি সুবিদিত ছিল না, অথচ মনে হয়

দ্বারকানাথ ডিকেন্স-এর নভেল পড়ে থাকবেন এবং পড়ে উপভোগও করে থাকবেন। সংগীত নাটকে তাঁর প্রীতি ছিল, ভারতে ইংরেজি শিক্ষার উন্নতিসাধনে ও মাতৃভাষা বাংলার চর্চায় আগ্রহ ছিল গভীর। এ সব থেকে মনে হয় সমসাময়িক ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিকট পরিচয় থাকা মোটেই আশ্চর্য ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাজ-কারবার ও সামাজিকতার আবর্তে থেকেও কী করে তিনি সময় পেতেন আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে এমন ওয়াকিবহাল থাকতে। জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্রের একটি মস্ত সুবিধা এই ছিল যে দ্বারকানাথের ডায়ারিগুলি তাঁর হাতে এসেছিল—সেইসব ডায়ারির সূত্র ধরে মিত্র বলেছেন, লণ্ডনে যে দু-বার দ্বারকানাথ বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই দু-বারই ডিকেন্স-এর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাতের ও আপ্যায়নের সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। দ্বিতীয় সফরের সময় লণ্ডনে তিনি কিছুদিন ছিলেন এবং সেসময় সাহিত্যিকদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করতেন। এইরকম একটি ভোজসভায় প্রখ্যাতদের মধ্যে ছিলেন ঃ কাউন্ট দ্যো'র্সে, চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়ম থ্যাকারে, ডগলস জেরোল্ড, মার্ক লেমন এবং জে. মেহিউ। প্রথমে স্থির হয়েছিল ভোজসভায় কেবল পাঞ্চ পত্রিকার লেখকেরাই নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন, কিন্তু কাউন্ট দ্যো'র্সে নিজেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিজেকে। স্বদেশে প্রত্যাগত লর্ড অকল্যাণ্ড এই ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করে পত্র দেওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যেই অভ্যাগতদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। আহার চলাকালে আলাপ-আলোচনা অতি সূক্ষ্ম হাস্যকৌতুকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ফরাসী হলেও কাউন্ট দ্যো'র্সের ইংরেজীর ওপর এমনি দখল ছিল যে শ্লেষাত্মক উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপারে তিনি ডগলস জেরোল্ডকেও টেক্কা দিচ্ছিলেন। ডিকেন্স বসেছিলেন (দ্বারকানাথের) উল্টো দিকে—টেবিলের শেষপ্রান্তে—(দ্বারকানাথের) একান্তসচিব মিঃ সেফ-এর পাশে। তিনি এতই চুপচাপ ছিলেন যে তাঁর লেখকবন্ধুরা সে বিষয়ে কেবল যে মন্তব্য করলেন এমন নয় তাঁকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও করতে লাগলেন। তাঁর কোনো কোনো রচনার বিরূপ সমালোচনা ডিকেন্স-এর চুপ করে থাকার কারণ—এই বলে ডগলস জেরোল্ড খুব খেপাতে লাগলেন। এবার আর তূষ্ণীভাব রাখা গেল না, তোড়ে ডিকেন্সের মুখ থেকে বাক্য বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বাকশিল্পীদের এমন এক উজ্জ্বল সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে। অভ্যাগতেরা যেমন নিমন্ত্রণকর্তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন, নিমন্ত্রণকর্তাও তেমনি আনন্দ লাভ করলেন অতিথিদের সাহচর্যে।[২১]

বিলেতে দ্বারকানাথের অভ্যস্ত পরিবেশ তো হওয়া উচিত ছিল বিলেতের অভিজাত সমাজ—ডিউক-ডাচেস, লর্ড-লেডি এবং আর যাঁরা শক্তি ও ঐশ্বর্যে চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রিন্স কীভাবে সাহিত্যরথীদের জগতে প্রবেশ লাভ করলেন—সেটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। প্রফেসর অমলেন্দু বসুর ধারণা,[২২] সাহিত্যজগতে দ্বারকানাথের প্রবেশের পথ হয়তো সুগম করে দিয়ে থাকবেন মিসেস কেরোলিন এলিজাবেথ সারা

নর্টন—প্রখ্যাত নাট্যকার ও পার্লামেণ্টের বাগ্মীপ্রবর রিচার্ড ব্রিনসলি শেরিডনের তিনজন সুন্দরী দৌহিত্রীর অন্যতমা। তাঁর নিজের কবি-খ্যাতি কিছু কম ছিল না, উপরন্তু রূপসী, গুণবতী ও বাকপটীয়সী ছিলেন বলে ১৮৩০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে লণ্ডনের উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে তিনি বহু-পরিচিত ছিলেন। বিবাহে তিনি সুখী হননি, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি একাকিনী থাকতেন বলে তাঁর সম্বন্ধে আড়ালে কিছু গুজবও রটেছিল। শোনা যায়, জর্জ মেরিডিথ তাঁর **ডায়না অব দ্য ক্রসওয়েজ** নভেলের নায়িকাকে চিত্রিত করেছিলেন মিসেস নর্টন-এর আদলে। অভিজাত সমাজের কোনো এক পার্টিতে নিশ্চয় দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকবে। প্রফেসর বসু এই অনুমানের সপক্ষে মিসেস চার্লস ডিকেন্সকে লেখা মিসেস নর্টন-এর নিম্নলিখিত চিঠিখানি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'দ্বারকানাথ ঠাকুর নামে অভিহিত এক হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রতি এদেশে এসেছেন। মহারাণীর উইণ্ডসর ভবনে কিছুদিন তিনি ছিলেন।[১১] এখানকার অনেকেই তাঁর খাতিরযত্ন করছেন। কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যেবেলায় তিনি আমার বাড়িতে এসে আমায় জিগ্যেস করছিলেন আমার অভ্যাগতবর্গের মধ্যে (সেদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন খুবই স্বল্পসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন) কে মিঃ টি. মোর...কে মিঃ রোজার্স...কোনজন মিঃ ডিকেন্স। তিনি নিশ্চয় আশা করেছিলেন আমার বাড়িতে গুণী-সজ্জনদের ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সমাগম হয়ে থাকে। সে কথা ভেবে আমার কত যে লজ্জা হচ্ছিল তা তো আপনি বুঝতেই পারেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম ঃ আমায় একটু সময় সুযোগ দিন, আপনি যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান আমি তাঁদের কয়েকজনকে সংগ্রহ করে আনব।'

'আপনার কাছে ওজর দেখাবার এই হল ইতিহাস। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে রিচমণ্ডে তিনিই ভোজসভার আয়োজন করবেন, তখন যেন আমি আমার প্রতিশ্রুতি মতো অভ্যাগতদের সংগ্রহ করে নিয়ে যাই। মিঃ ডিকেন্স-এর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, বললেন, লোকে ডিকেন্স-কে যেমন জানে তেমন আর কোনো ইংরেজ লেখককে জানে না। অনুগ্রহ করে মিঃ ডিকেন্স-কে রাজি করাবেন আসতে এবং সম্মত থাকেন তো আপনার সুন্দরী ভগ্নীটিকেও ও আর আর যাদের যুক্ত করতে চান সঙ্গে আনবেন। যদি ১৫ তারিখে সোমবারে আপনার অসুবিধা না থাকে বা অন্য কাজ না থাকে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এদিককার ব্যবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দেব। উজানপথে কিছুটা টেমস নদীতে ঘুরে আসার জন্য আমাদের নিজস্ব একটি ছোট স্টিমারও থাকবে।...'[২২]

প্রফেসর বসুর হিসাব-অনুসারে ১৫ তারিখ সোমবার ছিল ১৮৪২ অব্দের ১৫ জুলাই। এই আমন্ত্রণ আয়োজনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল জানবার উপায় নেই কারণ কোথাও লিখিত কোনো দলিলপত্র নেই। প্রফেসর বসু ইংরেজী সাহিত্যের

প্রখ্যাত অধ্যাপক। এই ঘটনা নিয়ে তিনি কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন ঃ 'পশ্চিম য়ুরোপ-এ তথা ব্রিটেনের তদানীন্তন উপনিবেশ আমেরিকায় ডিকেন্স-ভক্তের সংখ্যা তখন দিনে দিনে বাড়ছিল—এ তথ্যটা আমাদের নানা সূত্র থেকে সু-পরিজ্ঞাত। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে এবং বিশেষ করে কলকেত্তাইদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী বই পড়তেন তাঁরা কি ডিকেন্স পড়তেন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনাদি করতেন? এইসব ভারতীয়দের এবং বিশেষ করে দ্বারকানাথের ইংরেজী সাহিত্যের এই নবতম ধরনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? দ্বারকানাথের বেলা মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যে এই নতুন ধরনের তুলনীয় কিছুই ছিল না—**আলালের ঘরের দুলাল**[২৫] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ অব্দের মধ্যে আর গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল ১৮৫৮ অব্দে। এইসব প্রশ্নের জবাব মেলার মতো কোনো দলিল এ পর্যন্ত আমার হস্তগত হয়নি। কিন্তু একটা যে খবর আমার মনে দাগ কেটেছে তা হল এই যে সেই তখনকার দিনে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মোর ও রজার্স-এর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত দ্বারকানাথ কেবল এই দু'জনের কথা বলে থাকবেন যেহেতু রোমাণ্টিক যুগের তরুণ কবিরা তখন সকলেই পরলোকগত, সাউদে তখন রুগ্ন ও শয্যাগত এবং ওয়র্ডসওয়র্থ কাম্বারল্যাণ্ডে রয়েছেন সন্ন্যাস নিয়ে। আমার বিস্ময়ের অপর একটি কারণ এই যে, এই বাঙালী ভদ্রলোকটির সাহিত্যবোধ এমনি সূক্ষ্ম ছিল যে ডিকেন্স পড়ে তিনি উপভোগ করতেন—যদিচ স্কট-এর প্রখ্যাত নভেল কিংবা তদানীন্তন মহিলা-লেখিকাদের শান্ত সংযত নভেলের সঙ্গে ডিকেন্স-এর লেখার কোনো সাদৃশ্য ছিল না। আমার ধারণায় দ্বারকানাথ ঠাকুর হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদনে সাড়া দিতে পেরেছিলেন। তিনি বিত্তশালী মানুষ ছিলেন, সমাজে তাঁর মর্যাদা ছিল অসাধারণ, লোকে তাঁকে বলত প্রিন্স—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই পিতামহ সাহিত্য-সম্ভোগের ক্ষেত্রেও তাঁর সুরুচির পরিচয় রেখে গেছেন।'

সাহিত্যিক ছাড়া আর যাঁদের সঙ্গে পরিচয়লাভে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিলেতের চরমপন্থী রাজনীতিবিদ ও সমাজের সেবা ও সংস্কার সাধনে নিবেদিতচিত্ত কিছু ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত—দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করতেন, তাঁরা ছিলেন মানবহিতৈষী ও ভারতের শুভানুধ্যায়ী, তাঁরাই সংগঠন করেছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ভারতে থাকতে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির তরফ থেকে দ্বারকানাথ এই সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, লণ্ডনে পা দেবার পর প্রথম যাঁদের সঙ্গে দ্বারকানাথ সাক্ষাৎ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন লর্ড ব্রুহাম—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। কর্নেল জেমস ইয়ং ছিলেন ব্রুহাম ও দ্বারকানাথ উভয়েরই বন্ধু—ব্রুহাম-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় ঘটাতে গিয়ে ইয়ং লিখেছিলেন ঃ 'ইনি

আমার বহুকালের পরিচিত বিশেষ বন্ধু...ভারতের উদারনৈতিক সকল আন্দোলনের ইনি হলেন নেতৃস্থানীয়...রামমোহনের স্থলাভিষিক্ত হলেন ইনি...যদিচ রামমোহনের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য এঁর নেই...বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, স্বভাবসিদ্ধ নানা সদ্‌গুণের অধিকারী এবং ইংরেজী ভাষার উপর এঁর আশ্চর্য দখল। জাতপাত, পানভোজন ও অন্যান্য সংস্কারের বালাই থেকে বহুকাল আগেই মুক্ত হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন... সমসাময়িক কালের ভারতে ইনি হলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।'[২৬]

ব্রুহাম-এর মধ্যস্থতায় দ্বারকানাথের পরিচয় হয় জর্জ টমসনের সঙ্গে—তিনি তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি, দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে ও মানবিক অধিকারের সপক্ষে তাঁর তেজস্বী বাগ্মিতার জন্য চারিদিকে তাঁর নামডাক। প্রথম দর্শনেই টমসন ও দ্বারকানাথ উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগী হন এবং দ্বারকানাথের নির্বন্ধে টমসন তাঁর সঙ্গে ভারতে যেতে রাজি হয়ে যান। আরো একজন কোয়েকার ও সাহসিক ধর্মযোদ্ধার হৃদয় জয় করেছিলেন দ্বারকানাথ প্রথম দর্শনেই—ইনি হলেন যোসেফ পীজ। যদিচ পীজ ছিলেন জর্জ টমসনের বন্ধু ও সহকর্মী, টমসন যখন তাঁর পেশার খাতিরে সাতারা-রাজের হয়ে কোম্পানী বাহাদুরের কোর্ট অব ডিরেকটরদের কাছে ওকালতি করতে সম্মত হয়েছিলেন, পীজ বিরূপ হয়ে বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি যখন প্রথম স্থাপিত হয় লণ্ডনে, সোসাইটির সাফল্য কামনা করে ভারত থেকে যাঁদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বার্তা এসেছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। পীজ তাঁর বার্তা পেয়ে খুশি হয়েছিলেন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর নামটা মনে রেখেছিলেন, তা না হলে হয়তো সূচনাতেই পীজ দ্বারকানাথকে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব নাকচ করে দিতেন। সাক্ষাতের প্রস্তাব পেয়ে পীজ তাঁর জবাবে দ্বারকানাথকে সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন ঃ 'আমার সঙ্গে ও আমার সহকর্মীদের সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ কিছু কাজে লাগতে পারে, যদি তোমার বহুকাল-ব্যাপী অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত মতামত থেকে, তোমার দেশের মানুষের শোচনীয় দুরবস্থা দূরীকরণে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার—তদ্বিষয়ে বর্তমানে আমরা যতটুকু জানি, তার চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়।' কোনো রাখাঢাকার বালাই না রেখে তিনি সোজাসুজি দ্বারকানাথকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'যে সব মর্যাদাবান ও বিত্তবান ভারতীয় এদেশে এসে বণিকশ্রেষ্ঠদের কিংবা সভাসদদের মহলে দহরম-মহরম করতে গিয়ে, দীনহীন স্বদেশবাসীদের শোচনীয় দুরবস্থার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে ও সম্ভবপক্ষে প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করে সেসব কথা ভুলে যান বা গোপন করেন—সেইসব ভারতীয়দের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।'[২৭]

২২ জুন তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেকটরদের একটি সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য দ্বারকানাথ আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি মরিশাস উপনিবেশে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকবাহিনী প্রেরণ করা সম্পর্কে একটি বিতর্ক

শোনেন। সেই রাত্রেই ডিরেক্টরবর্গ লণ্ডন টেভার্ন-এর একটি ভোজসভায় দ্বারকানাথকে আপ্যায়ন করেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে ২৯ জুলাই তারিখে, লণ্ডনের লর্ড মেয়র ম্যানসন হাউসে অনুষ্ঠিত একটি বিরাট ভোজের উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। আহার্য ছিল চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়, অভ্যাগতবর্গের এক-একজন যেন লণ্ডন সমাজের মুকুটমণি! উপরন্তু যখন লর্ড মেয়র উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় দ্বারকানাথের গুণগান করে তাঁর স্বাস্থ্য কামনার প্রস্তাব আনলেন, দ্বারকানাথ যেন মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, লর্ড মেয়রের প্রত্যুত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, পরে তা নিয়ে তাঁর খুবই কুণ্ঠার কারণ ঘটেছিল। ১৮৪২ অব্দের ৪ আগস্ট তারিখে **লণ্ডন মেল** বক্তৃতার রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

'অতঃপর দ্বারকানাথ ঠাকুর দাঁড়ালেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে। বললেন, সমবেত সজ্জনেরা নিশ্চয় তাঁর কাছ থেকে ভালো একটি বক্তৃতার প্রত্যাশা করবেন না কারণ ইংরেজী ভাষা তাঁর কাছে বিদেশী ভাষা। অন্ততপক্ষে সে ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা তাঁর জানা নেই—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা সম্ভবত কোনো ভাষাতেই মেলে না। (হর্ষধ্বনি)। কেবল ওই একটা রাতে, সমবেত সজ্জনদের মধ্যে থেকে তাঁকেই বেছে নিয়ে যে সৌজন্য ও আপ্যায়নের চূড়ান্ত করা হল—কেবল সেই জন্যই তিনি যে কৃতজ্ঞ—এমন নয়, পরন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতার কারণ হল এই যে ইংলণ্ডের জমিতে পদার্পণ করার পরমুহূর্ত থেকে তিনি দয়া ও সৌজন্য লাভ করে আসছেন; কিন্তু যে সম্ভ্রম ও মৈত্রীভাবের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত করা হয়েছে সে যদি তিনি অনুভব করে থাকেন (অবশ্যই অনুভব করা উচিত), তাহলে সমগ্র ইংরেজ জাতি যে সৌহার্দ্য ও মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সার্বিক বিপর্যয় থেকে ভারতকে উদ্ধার করেছে, ইংলণ্ডের সেই প্রচেষ্টার গৌরবময় ফলশ্রুতি দেখে প্রত্যেক ভারতবাসীর কেমন অনুভব করা উচিত? (হর্ষধ্বনি)। এই ইংলণ্ডই পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ও কর্ণওয়ালিসকে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ভারতের উপকারসাধন করার জন্য। এই ইংলণ্ডই সেই সুদূরবর্তী দেশে এমন একজন মহান লোককে পাঠিয়েছিল যিনি পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম সেই প্রাচ্যভূমিতে যথাযথ ও চিরস্থায়ী শৃংখলার অবতারণা করতে পেরেছিলেন। এ হল সেই দেশ, সমবেত সজ্জনেরা যার প্রতিনিধিস্থানীয়, যে দেশ মানবিক মর্যাদার সম্মানে দুর্বৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছে। (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এবং ইংলণ্ড এই সবকিছুই করেছে কোনো প্রাপ্তির আশা না করেই, বিনিময়ে কিছু লাভ করবে বলে নয় পরন্তু নিছক উপচিকীর্ষার মনোভাব নিয়ে...। তাঁর দেশবাসীর পক্ষে ইংলণ্ডের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অসম্ভব...।'

দ্বারকানাথের বক্তৃতার এই রিপোর্ট পড়ে বিলেতে ও ভারতে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা বিচলিত বোধ করেছিলেন। যোসেফ পীজ আপত্তি জানিয়েছিলেন ঃ

নির্বিকার দ্বারকানাথ ১৮৪২ অব্দের ৩১ আগস্ট তারিখের একটি চিঠিতে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ঃ 'আমার বক্তৃতায় যা আপনার ভ্রমাত্মক ও ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে সেজন্য আপনার কাছে দুঃখপ্রকাশ করার এই সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ, কারণ আপনি হলেন আমার দেশের একজন খ্যাতনামা হিতৈষী। আমার কেবল এই কথা বলার অভিপ্রায় ছিল—জানিনা সে অভিপ্রায় যথাযথ সিদ্ধ করতে পেরেছি কি না—যে, অগ্রপশ্চাৎ সব কিছু বিবেচনা করলে দেখা যায় মুসলমান রাজত্বের জোয়াল অপসারিত হবার ফলে জাতি হিসাবে আমরা উপকৃত হয়েছি...।' কোয়েকার ভদ্রলোককে দ্বারকানাথ টলাতে পারেন নি।[২৮]

তাঁর নিজের দেশেও বেশ কয়েকজন 'পেট্রিয়ট' এই বক্তৃতার অছিলা নিয়ে ব্রিটিশের জো-হুকুম তাঁবেদার ও খয়ের খাঁ বলে দ্বারকানাথকে অপবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভালো করে চিনতেন এবং তাঁর মুখে ব্রিটিশ রাজের অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন যে তলায় তলায় আসলে এ বক্তৃতা ছিল নিন্দা-ছলে স্তুতি, কারণ এই ধরনের পরিহাস-রসিকতায় দ্বারকানাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই দেখা যায় **বেঙ্গল হরকরা** কাগজের সম্পাদক ১৮৪২ অব্দের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

'দ্বারকানাথ ঠাকুর যে দুঃসাহসী মানুষ সেকথা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বিলেত পাড়ি দেবার ব্যাপারটাই এক দুঃসাহসিক অভিযান—কিন্তু বিলেতে পা দেবার পর তিনি যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা আগের সবকিছু ছাপিয়ে যায়। একবার মনশ্চক্ষে কল্পনা করে দেখুন ঃ ম্যানসন হাউস-এর বিরাট এক ভোজসভায় যোগদানের জন্য আমাদের বন্ধুশ্রেষ্ঠ উপস্থিত হয়েছেন, উপস্থিত হয়েছেন এমন একজন ব্রিটিশ রাজকুমার ধমনীতে যাঁর রাজরক্ত প্রবাহিত, এসেছেন সেদেশের আরো অনেক বিত্তশালী প্রভাবশালী অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা—যাঁদের মধ্যে আছেন কোম্পানী বাহাদুরের কোর্ট অব ডিরেক্টর থেকে কতিপয় সদস্য। সেই ভোজসভায় আমাদের বন্ধুবর কী করলেন? অবজ্ঞাভরা বক্তৃতায় সুরুচির বালাই না রেখে গ্রেটব্রিটেনের দেশবিজয়ের প্রচণ্ড লিপ্সার ডাহা সত্যটা সেই হাটের মধ্যে ফাঁস করে দিলেন। তাঁর পরিহাস-রসিকতার মধ্যে বেশ একটা প্রকাশ-সৌষ্ঠব ছিল, কিন্তু তা নিশ্চয় ইণ্ডিয়া হাউসের চাঁইদের আঁতে ঘা দিয়ে থাকবে। বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ স্থানে কী চমৎকার কথাই না তিনি বলেছেন, উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা শক্ত ঃ 'এ হল সেই দেশ, সমবেত সজ্জনেরা (Company) যার প্রতিনিধি স্থানীয়, যে দেশ মানবিক মর্যাদার সম্মানে দুর্বৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছে। (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এবং ইংলণ্ড এই সবকিছুই করেছে কোনো প্রাপ্তির আশা না করেই, বিনিময়ে কিছু লাভ করবে বলে নয়।' তা তো নয়ই, নিশ্চয় নয়, ভারত অধিকার করেছে স্রেফ মানবিক মর্যাদার সম্মানে 'নিছক উপচিকীর্ষার

মনোভাব নিয়ে।' আমাদের দেশবাসীর দিক থেকে সে ছিল নিতান্তই একটা স্বার্থলেশহীন কাজ। তারা কিছু প্রাপ্তির আশা করেনি। মুনাফার নাম শুনলে নিশ্চয় তারা কানে আঙুল দিত। ইংলণ্ড থেকে তারা গিয়েছিল থলি বোঝাই করে, ফিরে যখন গেল তখন তাদের থলি একেবারে শূন্য। স্বার্থবুদ্ধি-বিরহিত হয়ে তারা তাদের থলি-ভরতি ঐশ্বর্য সম্পদ ঢেলে দিয়েছিল ভারতবাসীদের উন্নতি বিধানে। বিনিময়ে পেয়েছিল কী? কিছুই পায় নি—কিচ্ছু না। ভারত থেকে কিছুই নিয়ে যায় নি তারা—না মশাই, একটি পয়সা দূরের কথা, কানাকড়িও নিয়ে যায়নি একটা। দেশটা অধিকার করেছিল নিছক উপচিকীর্ষার খাতিরে। আমাদের এই বিরাট উপমহাদেশ আত্মসাৎ করা সম্পর্কে কী রকম সুললিত মন্তব্য। হিন্দুর মুখ থেকে এই শ্লেষোক্তির তীব্র অভিঘাত নিশ্চয় মর্মে প্রবেশ করে থাকবে।

'কচ্ছপের সুপ ও মিশ্রিত মদের পাঞ্চ পান করার জন্য যাঁরা ভোজসভায় জুটেছিলেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁদের অনেকেই ভেবে থাকবেন দ্বারকানাথ যখন বললেন ব্রিটিশ শক্তিই হিন্দুদের রক্ষা করেছে 'দুর্বৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতার হাত থেকে', তিনি নিশ্চয় তখন ভালো করে ভেবেচিন্তে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই এবম্প্রকার মন্তব্য করে থাকবেন। এই মন্তব্যের পর যে তুমুল হর্ষধ্বনি হয়, তা থেকে মনে হয় দ্বারকানাথের আন্তরিকতায় তাঁদের সন্দেহমাত্র ছিল না। জন বুল-এর বিশ্বাস-প্রবণতা সর্ববিদিত। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তাঁরা একেবারেই বুঝতে চাননি একজন হিন্দু কী করে জানবে 'রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা'র কথা। রুশীয়েরা হিন্দুদের উপর সন্ত্রাসজনক অত্যাচার চালিয়েছে বলে আমরা তো কখনো শুনিনি। ম্যানসন হাউসে ভোজসভার অতিথিরা নিশ্চয় ইতিহাসের এই তথ্যের প্রতি কোনো নজর দেননি। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস দ্বারকানাথ সুকৌশলে এই-যে ছেঁদোকথার ফাঁদ পেতেছিলেন তাতে লণ্ডনের বাছা বাছা রাশভারী নাগরিকেরা কেমন অনায়াসে পা দিয়েছিলেন দেখে আড়ালে নিশ্চয় তিনি প্রচুর আমোদ পেয়ে থাকবেন। তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন আমাদের কী প্রকার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, রাশিয়ার গালে একটা ঠোনা মারলে আমরা কেমন উল্লাসে ফেটে পড়ব। তাঁর এই অনুমান মিথ্যা হয়নি। কিন্তু জন বুল যদি তাঁর বক্তৃতার আসল তাৎপর্যটুকু ধরতে পারত তাহলে এত ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে ফেটে পড়ত না। দ্বারকানাথ ভেবেছিলেন, 'এবার এদের ওপর এক হাত নিতে হবে।' তাঁর এই ভাবনা থেকে উদ্ভূত হল এই অদ্ভুত সূক্ষ্ম ব্যাজস্তুতি যা নিয়ে আমাদের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য। এ ব্যাপারে দোয়ার্কির অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে—কিন্তু তিনি এতটা কঠোর না হলেও পারতেন—বিশেষ করে কচ্ছপের সুপ এবং স্যালমন মাছ এবং হরিণের মাংস এবং শ্যাম্পেন এবং ঠাণ্ডাই মদের মিশ্রিত পানীয়ের পরে।'

উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কোনো বিশিষ্ট বিদেশাগত অতিথিকে যেমন সম্মান প্রদর্শন

করা হয়ে থাকে, দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে সেই সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর গতিবিধি, তাঁর মুখনিঃসৃত কথাবার্তা—সবকিছু বেশ শ্রদ্ধাভরে ছাপা হয়ে বেরোত খবর-কাগজে। **মন্থ্‌লি টাইমস** লিখেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের শুভাগমন এমন একটি ঘটনা যা নিয়ে নীরব বা নিস্পৃহ থাকা আমাদের শোভা পায় না। কলকাতায় তাঁর চরিত্রমহিমা, পদমর্যাদা ও সুদূরবিস্তৃত প্রভাব প্রতিপত্তির কথা এদেশে তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব থেকে ঘোষিত হওয়ার ফলে, ইংলণ্ড ও ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য তিনি যে সব সুযোগ সুবিধা চেয়েছিলেন সেসব যাতে তিনি পান—সেজন্য সকল রকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।' ওই একই পত্রিকা সেই দিনের, অর্থাৎ ১৮৪২ অব্দের ৬ জুলাই সংখ্যায়, অন্যত্র লিখেছিলেন ঃ 'এ দেশে পা দেবার পর থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর এত ভোজসভায় আপ্যায়িত হয়েছেন, কৌতূহলী ও গায়ে-পড়া ব্যক্তিরা তাঁকে এতই উত্যক্ত করেছে যে তিনি বলেছেন এই স্বাধীন দেশে তিনিই যেন একমাত্র কেনা গোলাম। সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় সারা দিন ধরে এত বিচিত্র ধরনের দর্শনার্থী তাঁর হোটেলে ভিড় করে যে নিভৃতে আধঘণ্টার জন্যও তাঁর সঙ্গে কাজের কথা বলার সুযোগ পাওয়া যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অতীব দুরূহ। অথচ এতদ্দণ্ডে কতিপয় গুরুতর ও অবশ্যকৃত্য কাজ সম্পন্ন করা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। গত রবিবারের দিন দেখা গেল দূরপাল্লা-ভ্রমণের জন্য তাঁর চারঘোড়ার গাড়ি হোটেলের দ্বারদেশে মোতায়েন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদালয়ে তাঁর অধিষ্ঠিতকরণ উৎসবে যোগদানের জন্য স্বয়ং লর্ড লিণ্ডহার্স্ট দ্বারকানাথকে আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু হোটেল থেকে রওনা হতেই তাঁর প্রায় চারটা বেজে গেল। দ্বারকানাথের আচার আচরণ মার্জিত, তিনি রীতিনীতি মেনে চলেন, পরের মন বুঝতে পারেন—তাই তাঁর বন্ধু জোটে প্রচুর। আগামী মাসে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করব। আপাতত মহামান্যা মহারাণীর অভ্যর্থনা-কক্ষে উপস্থাপিত হওয়ার সূত্রে, তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য মহারাণীর যে কথোপকথন হয় সেটা উদ্ধৃত করে আমরা উপসংহার টানব। অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এ দেশে কত দিন আছেন?' য়ুরোপের অভিজ্ঞ রাজসভাসদের মতো দ্বারকানাথ এই প্রশ্নের সাদাসিধা জবাব দিয়ে বললেন ঃ 'মাত্র কয়েকদিন হল এসেছি—কিন্তু এসেছি আমার নিজের এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনেক প্রতিকূল সংস্কার পেরিয়ে, হাজার হাজার মাইল ধরে নানা দুঃখ কষ্ট বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসেছি আপনার মহিমা দেখতে—আপনি তো এই মহাজাতির মহারাণী। দেখা তো হল, এখন আগামীকালই যদি আমায় ফিরে যেতে হয়—ফিরে যাব পর্যাপ্ত প্রতিদান নিয়ে।' মহারাণী মৃদু হাসলেন। মহারাণীর প্রসারিত হাতে চুম্বন দিয়ে দ্বারকানাথ এগিয়ে গেলেন।'

রাজবাড়িতে তিনি আপ্যায়িত হচ্ছেন, অনেকে তাঁকে নিয়ে দহরম মহরম করছে—

এতে দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে খুশি হয়ে থাকবেন, কিন্তু হেলায় কালহরণ করার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না, তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথের ডায়ারির ভিত্তিতে নিছক সামাজিকতা ছাড়া তাঁর অন্যান্য সব কাজকর্মের একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন ঃ প্রিন্টিং হাউস স্কোয়ার-এ গিয়ে তিনি দেখলেন মাত্র দু-ঘণ্টা সময়ের মধ্যে লণ্ডনের **টাইমস** পত্রিকার কুড়ি হাজার কপি ছাপা হয়ে গেল; পোস্ট আপিসে গিয়ে লক্ষ্য করলেন মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে দু'লাখ চিঠি ও পত্রপত্রিকা আলাদা আলাদা সাজিয়ে শহরের বিভিন্ন পল্লীতে বিলি কবার জন্য তৈবী; ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে গেলেন তাদের কাজের বহর ও কার্যপ্রণালী দেখতে—দেখলেন বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে কী ভাবে ব্যাঙ্কনোট ছাপা হয়, এবং লেনদেনেব বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্ম চলে। অভিজাত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিব বাসভবন তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাচেস অব সাদারল্যাণ্ড-এর স্ট্যাফোর্ড হাউস। চাটসওয়র্থ-এ ডিউক অব ডেভনশায়ার-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন তাঁর বেলগাছিয়া ভিলা এসব বাড়িব তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। লণ্ডন শহরেব পার্ক ঘুরে ঘুরে দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগত—সবচেয়ে তাঁর ভালো লেগেছিল ('অতি চমৎকার!') হাইড পার্ক, রিজেন্টস পার্ক এবং কেনসিংটন গার্ডেনস।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে দ্বাবকানাথের হাতের লেখা সম্বলিত কতিপয় কোয়ার্টার ফুলস্কেপ খুচরো, বিবর্ণ ও প্রায় ভঙ্গুর চিরকুট দেখা যায়। এই সব চিবকুটের বিষয়বস্তু হল দিনকৃত্য ও দর্শনীয় স্থানের তালিকা। কিশোরীচাঁদ মিত্র যে ডায়ারির ভিত্তিতে নানা তথ্য সরবরাহ করেছেন, এইসব চিরকুট সেই ডায়ারির কিংবা অপর কোনো দিনকৃত্য-পুস্তিকার অন্তর্গত ছিল কিনা বলা যায় না। দ্রুতলিখিত এই সব চিরকুটে কালির আঁচড় বিবর্ণ হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে এমন সব ফাঁক আছে যা পূরণ করার প্রশ্ন ওঠে না, অস্পষ্ট হাতেব লেখা থেকে অর্থ খুঁজে পাওয়াও শক্ত। এই সব শূন্য বা দুষ্পাঠ্য অংশ চার চার বিন্দু দিয়ে নিচে উদ্ধৃত নমুনার মধ্যে বর্ণিত হল ঃ 'সোমবার ৮ তারিখ (কোন মাস উল্লেখ নেই) স্যর মার্টিন শী আজ আমায় বসিয়ে আমার পোর্ট্রেট-এর প্রথম স্কেচ করলেন...আরো বার চারেক বসতে হবে...চিত্রকর সো-এর স্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম—লেডি '—' -এর স্কেচ দেখলাম...ও একটি পূর্ণাবয়ব ছবির কথা বললাম।'[২৯] আর একটি তারিখবিহীন চিরকুটে লেখা ঃ 'হপ্-লতার বাগিচার মধ্যে দিয়ে ঘুরে এলাম—চাষের ব্যবস্থা চমৎকার.. থেকে সেভেন ওক্স্ উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোরম ..বহু অভিজাতবর্গের বসতস্থান দেখা যায়.. পূর্বপুরুষের বসতবাটী এবং ক্যান্টারবেরি আর্চবিশপের প্রাসাদ...বসতবাটীর একটা অংশ নির্মিত হয়েছিল রাজা জন-এর আমলে...কয়েকটি অতি প্রাচীন এবং...তরুরাজি—একটি বাতাবি লেবুর গাছ তিন সারিতে ঝুরি নামিয়েছে অনেকটা অশ্বত্থ গাছের মতো...পুরাতন কায়দায় বিন্যস্ত চমৎকার উদ্যান...পার্কটাও চমৎকার ..জনসাধারণ দর্শন করতে আসতে

পারে...অনেক ভালো ভালো পুরনো ছবি, তার মধ্যে কয়েকটি স্যর যোশুয়া রেনল্ডস-অঙ্কিত মূল চিত্র। অদ্ভুত সব পুরাতন আসবাবপত্র ও খোদাইকরা কাঠের কাজ—একটি কক্ষে প্রথম জেমস-এর শয্যাসহ রাজকীয় পালঙ্ক...।' আর একটি তারিখহীন চিরকুটে লেখা ঃ 'দুর্গতিগ্রস্ত অন্ধদের স্কুল, সেণ্ট জর্জেস ফিল্ডস-এ পিতামাতা পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয়স্থান—কেণ্ট রোড স্থিত মূকবধিরদের আশ্রম—লণ্ডনের অনাথাশ্রম হ'ল নিঃসম্বল অনাথদের শিক্ষার জন্য...পিতামাতা—এটা ক্ল্যাপটন-এ অবস্থিত—চার্লস স্ট্রীট-এর মিডলসেক্স হাসপাতাল...হোস্টন-এ নিঃসম্বলদের আশ্রয়স্থান...অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সংস্কারকল্পে। চেলসী-র সামরিক বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল—ক্রাইস্টের হাসপাতাল...নিউজগেট এর নীল-জামা স্কুল, হানওয়েল-এর উন্মাদ আশ্রম। গ্রীনিচ-এর ধারেকাছে নোঙর ফেলা বিরাট রণতরী ১০৪ কামান সম্বলিত, নিউজগেট-এ নাবিকদের জন্য ভাসমান হাসপাতাল। লণ্ডনের ডক। ডেবরেট-এর বনেদী বংশের কুলুজী।'

একটি পৃষ্ঠায় ফরাসীতে লেখা আছে ঃ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথম সমুদ্রযাত্রা, অপর পৃষ্ঠায় হিজিবিজি কেটে মাল্টা, নেপলস প্রভৃতি জায়গার নাম লেখা (সবশুদ্ধ ৩১টি জায়গার নাম পাওয়া যায়—সেই সব জায়গার হোটেলের নাম সহ—হয়তো দ্বারকানাথের প্রথম বিদেশভ্রমণের পথপঞ্জি)।

অপর একটি চিরকুটে স্বচ্ছ স্ফটিক ও মর্মর প্রস্তরে তৈরি আবক্ষ মূর্তি, পুষ্পস্তবকের আধার প্রভৃতির তালিকা এবং ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা লুই-য়ে তাদের মূল্য লিখিত আছে। বোৎসানট্রিস-এর দোকান থেকে এই সব সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছিল। আর একটি পৃষ্ঠায় লণ্ডনে যে-সব চিত্রশালা, উদ্যান, জাহাজ মেরামতির কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করেছিলেন তার তালিকা দেখা যায়। পৃথক একটি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ 'দেখে এলাম...বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করার সব চেয়ে ভালো কারখানা, এরা পুরাতন পদ্ধতিতে এবং নূতন পেটেণ্ট অনুসারেও যন্ত্র নির্মাণ করে থাকে। বার্কলে-র মদ-চোলাই করার কারখানাটা বহু-বিস্তৃত। শীরা, শুষ্ক যব ও হপ্‌-সহযোগে কীভাবে বিয়র ও পোর্টর মদ তৈরি হয় দেখা গেল।'

একটি তারিখহীন কাগজে লেখা ঃ 'ড্রুরি লেন গিয়েছিলাম মানিয়ো ফালিয়ের্দকে দেখলাম **ডোজ অব ভেনিস** নাটকে আর দেখলাম **ফোলিজ অব এ নাইট**। চেরস ম্যাথুজ-এর অভিনয় ও তাঁর স্ত্রী মাদাম ভেস্ত্রিয়েরেরও, দেখে খুব ভালো লাগল। মহিলার বয়স প্রায় ৫০ হবে এবং ভদ্রলোকের ২৫—।'

চিরকুটগুলির নিঃসম্পর্কিত হিজিবিজি থেকে কোনো অর্থ বা পারম্পর্য আবিষ্কার করা কঠিন। লক্ষণীয় এই যে এগুলি হল দ্বারকানাথের অদম্য কৌতূহলের সাক্ষ্যপ্রমাণ। ১৮৪২ অব্দের লণ্ডনে যা কিছু দেখবার জানবার ছিল তার কোনোটাকেই তিনি বাদ দেননি অথবা বাদ দিতে চাননি। কেবল রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরার সঙ্গে মোলাকাত

করে অথবা মিউজিয়ম, গ্যালারি এবং থিয়েটর-এর মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দ্বারকানাথ তাঁর সমস্ত সময় কাটিয়ে দেননি, পরন্তু তিনি গেছেন নানা হাসপাতালে ও স্কুলে এবং বিশেষ করে সেই সব প্রতিষ্ঠানে যেখানে আশ্রয় পায় সমাজের প্রতিবন্ধী দুর্গতজন—যারা চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, যাদের বাপ-মা নেই এবং যারা সহায়সম্বলহীন। সম্ভবত এই সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি উদার হস্তে কিছু অর্থসাহায্যও করে থাকবেন—যদিও নিজে তার কোনো হিসেব রাখেননি।

স্মীটন থেকে ১৮৪২ অব্দের ২৮ আগস্ট তারিখে দ্বারকানাথ কলকাতায় জনৈক বন্ধুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, পরে সেই চিঠি ১ নভেম্বর তারিখে **বেঙ্গল স্পেক্টেটর** কাগজে বের হয়। চিঠিখানি এই ঃ 'আমি বার্মিংহাম ও লণ্ডনের বেল চলাচলব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলাম। ইংলণ্ডের অত্যাশ্চর্য সব ব্যাপারের মধ্যে রেলচলাচল অন্যতম। এর ফলে যেসব স্থান সুদূর বলে পরিগণিত হত সেগুলি হাতের নাগালের মধ্যে সন্নিকট হয়েছে, নবাগত কোনো ব্যক্তি যিনি এমন বিরাট ব্যাপার ইতিপূর্বে চোখেই দেখেননি তাঁর কাছে এটি খুবই লক্ষণীয় মনে হবে। বৃহদাকারে নির্মীয়মান পার্লামেণ্ট-এর ইমারতগুলিও আমি দেখতে গিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ হলে পর হয়তো এই সব অট্টালিকা লণ্ডনের সবচেয়ে সুদর্শন ভবন বলে পরিগণিত হবে...আমি লণ্ডনের সবগুলি পোতাঙ্গন এবং আশেপাশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কারখানাগুলি দেখে এসেছি। এগুলিই ইংলণ্ডের সম্পদ বিশেষ। এইসব সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা দেখে খুবই আনন্দিত বোধ করেছি—এদের কাছে কোথায় লাগে আমাদের জাহাজ-ঘাটার সরকারী গুদাম অথবা খিদিরপুরের ডক! রূপোর কাজ করে এমন কয়েকটি স্যাকরাদের দোকান দেখেছি লণ্ডনে; আমার ধারণা, এদের সম্পদ হবে কলকাতার সমস্ত কাজকারবার থেকে অর্জিত সম্পদের সমান।'

ডায়ারিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'এ-দেশীয় ফল আমি যেমন ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সুস্বাদু। স্ট্রবেরী চমৎকার খেতে—বিশেষত সব ও চিনি সহযোগে। চেরীও ভালো, কিন্তু গুজবেরীর ওপর আমার লোভ নেই—ও আমার ভালোই লাগে না। এ-দেশী কিশমিশ ভালো নয়—টক; কুল-জাতীয় প্লাম, পীচ ও নেকটারাইনও বেশ সুস্বাদু—তবে আমি পীচ-টাই বেশি পছন্দ করি।' ইংলণ্ডে জাত শাকসব্জি দেখে দ্বারকানাথ তেমন খুশি হতে পারেন নি। সকালবেলা একদিন কভেণ্ট গার্ডেন মার্কেট দেখার পর তাঁর মনে পড়ে যায় কলকাতার টাউন হল-এ এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি আয়োজিত বিভিন্ন ঋতুর ফুল-ফলের প্রদর্শনী। তিনি বলেছেন কভেণ্ট গার্ডেন-এ শাক-সব্জির একটা প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দর্শনধারী মনে হলেও, স্বাদে ও গুণাগুণে এগুলি কলকাতার টাউন হল-এ প্রদর্শিত শাকসব্জির তুলনায় নিকৃষ্ট।'[৩০]

দ্বারকানাথ ছিলেন মৎস্যাহারী ভোজনবিলাসী বাঙলাদেশের মানুষ। ২০ জুন

তারিখে গ্রীনীচ-এ মুখ্যাত মাছের পদ-সম্বলিত একটি ডিনার খেয়ে তিনি এমনি তৃপ্তি লাভ করেছিলেন যে তাঁর ডায়ারিতে প্রত্যেকটি পদের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন : 'প্রথমে গেলাম হ্যাঙ্গারফোর্ড জেটি—সেখান থেকে স্টিমারে গ্রীনীচ গিয়ে শিপ নামক একটি ভাসমান রেস্তোঁরায় আহারাদি হল। সঙ্গে ছিলেন পার্কার ও হজসনদের দল, আর আমার নিজের দল। কেবল মাছের পদের ডিনার—সে এক দারুণ ব্যাপার! প্রথম পদে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেওয়া হল—ভাজা বান মাছ (ভাজা হয়েছিল ফ্রান্স-এর তুলুজ অঞ্চলের বিশেষ পদ্ধতিতে), ফ্লাউণ্ডার মাছ ভাজা, স্টিমসেদ্ধ টাটকা ট্রাউট মাছ, ভাপে সেদ্ধ বান মাছ এবং বান মাছের কটলেট। দ্বিতীয় পদে ছিল কেবল ওয়াটার-সাকার (ওই নামই যেন শুনেছিলাম) থেকে তৈরি একটি স্বাদহীন জলীয় পদার্থ। তৃতীয় পদটা ছিল হোয়াইট বেট-নামক ছোট মাছ দিয়ে তৈরি, এটার লোভেই আমার খেতে আসা; চমৎকার খেতে। চতুর্থ পদে ছিল স্টিম সেদ্ধ ও ঝলসানো পাখির মাংস, জিভের মাংস, গলদা চিংড়ির কটলেট, যেনতেন প্রকারের একটা কারি, সেই সঙ্গে সব্জি দিয়েছিল মটরশুঁটি, বীন ও গোল আলু। পঞ্চম পদে ছিল সেই একই হোয়াইট বেট—তবে এবার দিয়েছিল ভেজে। ষষ্ঠ পদের মধ্যে দিয়েছিল সীড পুডিং, ছোট ছোট টক-মিষ্টি পেস্ট্রি, কিশমিশ ও চেরীর তৈরী টক আচার, দুটি অলংকৃত পুডিং-এর স্তূপ, জেলি ও ব্লাঁমাঁজ নামে পায়েস জাতীয় একটা পদার্থের ডিশ। সবশেষে দিয়েছিল নানা রকম পনির—এবং সবরকম ফলের টুকরো মিশিয়ে একটা মিষ্টি-জাতীয় ডিশ।'[৩১]

ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত এই অংশ পড়ে অনেকের হয়তো ধারণা হবে দ্বারকানাথ বেশ খাইয়ে মানুষ ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন পরিমিত পানাহারের পক্ষপাতী; রুচিমাফিক খেতেন। তিনি খুব একটা শক্তসমর্থ মানুষ তো ছিলেন না, তাঁর দেহের গঠন ছিল কৃশ ও কমনীয়, প্রায়ই তিনি জ্বরের আক্রমণে ভুগতেন। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের শক্তি তাঁর ছিল অসাধারণ আর কৌতূহল ছিল অপরিসীম—লণ্ডনের কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা, বহুবিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশ, তা সে উচ্চস্তরের বিনোদন হোক কিংবা শিল্পকলা হোক—কোনোটাই তিনি বাদ দিতে চান নি, সব কিছু দেখতে চেয়েছেন, সবকিছু আস্বাদ করতে চেয়েছেন। খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে তিনি বন্ধু-সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এফ. আর. সো যাঁকে তিনি কলকাতা টাউন হল-এ টাঙাবার জন্য তাঁর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করতে বলেছিলেন, আর ছিলেন স্যর মার্টিন শী ও কাউন্ট দ্যোর্সে—তাঁদের দুজনেই তাঁর পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন—এবং ছিলেন ভাস্কর উইকস যিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর আবক্ষ মর্মর-মূর্তি। থিয়েটার অপেরাতে তিনি প্রায়ই যেতেন—কোনো গায়ক-গায়িকা কিংবা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন কিনা—জানা যায় না। চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করার পর বলেছিলেন সেখানকার প্রাণীরা মুখ্যত ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ থেকে আমদানি করা।

পোতাঙ্গন, জাহাজ মেরামতির কারখানা, শ্রমশিল্পের বিভিন্ন উদ্যোগ, মদ-চোলাইয়ের কারখানা, স্কুল, হাসপাতাল এবং বিশেষ করে অনাথ-আতুরদের সেবা-প্রতিষ্ঠান—এইসব দেখায় তাঁর আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। দুর্গত দুর্দশাগ্রস্ত অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি তাঁর করুণা ছিল অসীম—তাদের আশ্রয়-স্থানগুলি যাতে সুবিহিতভাবে চলে সেজন্য তিনি অকাতরে দান করতেন। লর্ড আমহর্স্ট পথপ্রদর্শকরূপে দ্বারকানাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠস্থিত অঞ্চল দেখাতে। এইসব অঞ্চলের চমৎকার দৃশ্যাবলী ও বড়ো বড়ো অভিজাত বাসগৃহ দেখে তাঁর খুব ভালো লেগেছিল।

ইংলণ্ডের রাজধানীতে দ্বারকানাথের কর্মব্যস্ত জীবনের কথা বলতে গিয়ে ১৮৪২ অব্দের ৪ আগস্ট তারিখে **মন্থলি টাইমস** লিখেছিলেন ঃ 'এই প্রখ্যাত ভারতীয়, শহরের বর্তমান মরশুমে, সামাজিক জীবনের একেবারে শীর্ষভাগে অবস্থান করছেন বলা চলে। মহামান্যা মহারাণীর সঙ্গে তিনি একাধিকবার ডিনারে যোগ দিয়েছেন, প্রিন্স অলবার্ট ও ডাচেস অব কেন্ট-এর সঙ্গে তাস খেলেছেন, হরিণের মাংস ও কচ্ছপের সুরুয়া খেয়েছেন লর্ড মেয়রের ভোজসভায়, ডাচেস অব বাকলে-র বাড়িতে 'তুশুা সিমকিন' পান করেছেন এবং শুনেছি অলম্যাক-এর ওখানে নৃত্যও করেছেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু ঠাকুরকে নিয়ে যেরকম টানাটানি খাতির যত্ন চলছে, এমনকি বো ব্রুমেলও তাঁর গৌরবের দিনে এতটা খাতির যত্ন পাননি। সেইজন্যই তো বলা হয় 'কেউ কেউ বড়ো হয়ে জন্মায়, কেউ বা চেষ্টাচরিত্র করে বড়ো হয়, কাউকে আবার জোর করে তুলে ধরা হয় সবার বড়ো আসনে।' সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমান মরশুম সমাপ্তপ্রায়—তা না হলে তাঁর পক্ষে বহাল তবিয়তে এই ধকল কাটিয়ে ওঠা শক্ত হত। এই সূত্রে আমরা যেন স্বীকার করতে ভুলে না যাই যে এত মান-সম্মান আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থেকেও তিনি কিন্তু তাঁর পুরাতন বন্ধুদের মনে রাখেন, দেখা হলেই খোলামেলা দিল নিয়ে এগিয়ে এসে তাঁদের খোঁজ খবর করেন—যেমনটা করতেন ভারতে থাকতে—এসব দেখে মনে হয় তাঁর উদার হৃদয়ের সৌহার্দ্যে কোনো ঘাটতি পড়েনি। এখানে যে-সব বিষয় নিয়ে তিনি আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেছেন (কোনটা ফেলে কোনটা রাখা যায়, সে এক সমস্যাবিশেষ কারণ তাঁর সকল বিষয়েই আগ্রহ) তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এখানকার ডাক-পরিচালনা ও ডক-পরিচালনা। আমাদের এই বাবুমশাই যাঁদেরই সংস্পর্শে এসেছেন সকলেই ইংরেজী ভাষার ওপর তাঁর দখল দেখে, তাঁর সুপরিচিত মতামত শুনে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে তাঁর পরমতসহিষ্ণু মনের পরিচয় পেয়ে এবং সর্বোপরি সকল বিষয়ে তাঁর জানবার বুঝবার অভীপ্সা দেখে মুগ্ধ ও আশ্চর্য হয়েছেন। আগামী ১০ তারিখে আবার তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া ডিরেক্টরবর্গের সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত হচ্ছেন, তারপর তিনি সফরে বেরোবেন স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের কেন্দ্রগুলিতে।'

**মন্থলি টাইমস**-এর ওই একই সংখ্যায় **টাইমস** পত্রিকা থেকে একটি মজার খবর উদ্ধৃত হয়—শিরোনাম ছিল **প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর** ঃ 'গত শুক্রবারে হিজ হাইনেস বেশ একটা উভয়সংকটে পড়েছিলেন। তিনি তখন গেছেন টুইকেনহম-এ—টেমস নদীর ওপর ভাসমান একটি প্রমোদতরীতে লর্ড মেয়র আয়োজিত বিনোদনের এক অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যা ৬টার সময় তরী যখন পোপের ভিলার নিকটবর্তী ঘাটে বাঁধা হয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে এক সওয়ার এসে পড়লেন। লর্ড ফিটজেরাল্ড তাঁকে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন, মহারাণীর আদেশ প্রিন্স যেন সেই সন্ধ্যাতেই রাজপ্রাসাদের ডিনার পার্টিতে হাজির থাকেন। হিজ হাইনেস-এর দুর্ভাগ্যক্রমে তখন হাতের কাছে এমন কোনো যানবাহন ছিল না যাতে করে তিনি লণ্ডনে ফিরে যেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ঘাটে এসে ভিড়ল ল্যাম্বেথ রোড-এর মিঃ টি. পি. অস্টিন-এর স্টানহোপ ফীটন গাড়ী, তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পৌঁছে দিতে এসেছেন লর্ড মেয়র-এর পার্টিতে যোগ দেবার জন্য'। বন্ধুটি নেবে যেতে মিঃ অস্টিন তাঁর শূন্য আসনে বসিয়ে হিজ হাইনেস-কে নিয়ে লণ্ডন অভিমুখে ফীটন চালিয়ে দিলেন। পথে দেখা হয়ে গেল প্রিন্স-এর নিজস্ব গাড়ির সঙ্গে, সুতরাং একেবারে শেষ মুহূর্তে বাকিংহাম প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্টাচার ভঙ্গের অপরাধ থেকে রক্ষা পেলেন।'

শেফিল্ড শহর লোহা ও ইস্পাতের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। সেখানে রোজার্স-এর ছুরি-কাঁচি-কাঁটা-চামচ নির্মাণের কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, তাদের শো-রুম-এ দ্বারকানাথ একটি আঠারশো একাত্তর ফলাওয়ালা, একটি একশো পঁয়তাল্লিশ ফলা-ওয়ালা এবং একটি পঁচাত্তর ফলা-ওয়ালা ছুরি দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন। এক প্রান্তে একটি পেনসিল-লাগানো এই রকম একটি বহু ফলাযুক্ত ছুরি তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য কিনেছিলেন।[৩১] অতঃপর তিনি ইয়র্ক গিয়ে সেখানকার ক্যাথিড্রাল দেখে বলেন, 'এটি পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জাঘরের মধ্যে একটি।' এর পর তিনি গেলেন নিউকাসল-এ—'বাংলাদেশের বর্তমানের সর্ববৃহৎ কয়লাখনির প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি যে ইংলণ্ডের কয়লাখনি অঞ্চল (ইংলণ্ডের রানীগঞ্জ) দেখে সে সম্বন্ধে **পুঙ্খানুপুঙ্খ** বর্ণনা লিখবেন তাঁর ডায়ারিতে—এতে আর বিচিত্র কী! তবে সে সব বর্ণনা সাধারণ পাঠকের আগ্রহ উদ্রেক করবে না।'[৩২]

রেলরাস্তার ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'ইংলণ্ডের অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' ১৮৫৮ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁর দ্বিতীয়বারের সফরে যাত্রা করার আগে তাঁর বিশেষ বাসনা ছিল তাঁর নিজের বাংলাদেশে একটা অনুরূপ আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে তুলতে। দুঃখের বিষয় তাঁর স্বপ্ন যখন সত্যে পরিণত হল তখন তিনি আর ইহলোকে নেই।

স্কটল্যাণ্ডে বিশপ-শাসিত চার্চকে বলা হয় কার্ক। এইরকম একটি কার্ক-এ উপাসনায় যোগ দিয়ে দ্বারকানাথ লক্ষ্য করলেন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য আছে। ডায়ারিতে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয় একটি

ধর্মোপদেশই যথেষ্ট, সুতরাং প্রথমটির পরেই আমায় চলে আসতে হল, মনে হল এ তো ধর্মোপদেশ নয়—বক্তৃতাবিশেষ।[৩৪] তিনি তো তখন আর জানতেন না তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়ে যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, সেখানেও ধর্মোপদেশের ছলে দীর্ঘ বক্তৃতাদানের অনুরূপ একটা প্রথা গড়ে উঠছিল।

গ্লাসগো শহরে গিয়ে তিনি মেহনতি মানুষের সপক্ষে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে একটি বেকার জনতার পদযাত্রা দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ 'বর্তমানে এ-দেশে প্রায় তিন লাখ লোকের কাজকর্ম নেই। এইসব বেকার বেচারারা (devils) সেনাদলের হাতে প্রায় নিগৃহীত হচ্ছে। ভারতের ক্ষুৎপীড়িত হিল-কুলিদের নিয়ে এরা যতই বাগবিস্তার করুক না কেন, এ-দেশে দুঃখদুর্দশা তুলনায় কিছু কম নয়।'[৩৫]

২৯ আগস্ট তারিখে দ্বারকানাথ এডিনবরা এসে পৌঁছলেন। পরের দিন এডিনবরা টাউন কাউন্সিল একটি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্থির করেন, 'এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ভারতীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের' সম্মানে তাঁকে শহরের অন্যতম নাগরিকরূপে গ্রহণ করা হবে। এডিনবরার মুখ্য দৈনিক **দ্য স্কটসম্যান**, 'একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে এডিনবরা শহরের নাগরিকরূপে স্বীকৃতিদানকে' বর্ণনা করলেন গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা বলে। **দ্য স্কটসম্যান** এক কলম-ব্যাপী একটি প্রশস্তিতে দ্বারকানাথের নানা-বিষয়িণী প্রতিভা ও কীর্তিকলাপের গুণগান গাইলেন। সম্মান প্রদান করতে গিয়ে লর্ড প্রভোস্ট স্যর জন ফরেস্ট ব্যারনেট বললেন ঃ 'এ-শহরে আমরা এই সম্মানকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়ে থাকি। এই সম্মান প্রচুর পরিমাণে আমরা কখনো অর্পণ করি না। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদানে যাঁরা আমাদের নাগরিক জীবন সমৃদ্ধ করেন, দেশ ও দশের উপকার সাধন করেন, সমাজের সেবায় কিংবা সাহিত্যের সেবায় কৃতিত্ব অর্জন করে যাঁরা বিশিষ্ট হয়েছেন এবং উচ্চপদস্থ ও সুবিখ্যাত বিদেশী অতিথি, যাঁরা কোনো সময় আমাদের দেশে পদার্পণ করেছেন—বেছে বেছে আমরা তাঁদেরকেই এই সম্মানে সম্মানিত করি। আপনি ভারতীয় জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁকে এভাবে আমরা সম্মানিত করলাম। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি না, যাঁরা আপনাকে চেনেন, জানেন ও আপনার কীর্তিকলাপের সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাঁদের সকলের সাক্ষ্যক্রমে আমায় এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে এই কথা বলতে আজ যে. এ সম্মান আপনার প্রাপ্য, আপনি এ সম্মান নিজগুণে অর্জন করেছেন...।' দ্বারকানাথ এই ভাষণের একটি যে সুষ্ঠু জবাব দিয়েছিলেন. কাউন্সিল স্থির করেন, সেটি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[৩৬]

১ সেপ্টেম্বর তারিখে সম্রাজ্ঞী এলেন এডিনবরায়—উত্তরাঞ্চলের রাজধানীতে সেই তাঁর প্রথম আগমন। দু'দিন বাদে তাঁকে নগরীর চাবি উপহার দেওয়া হয়। এখানকার দুর্গগৃহে অবস্থানকালেও সম্রাজ্ঞী দ্বারকানাথকে সমাদরে স্বাগত করেছিলেন।

৫ সেপ্টেম্বর তারিখে এডিনবরার একেশ্বরবাদীদের সংস্থা—য়ুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশন অব এডিনবরা দ্বারকানাথকে একটি মানপত্র দেন। তিনদিন পরে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মানপত্র দেন এডিনবরার দেশান্তরী ও আদিবাসী সংরক্ষণ সমিতি—এমিগ্রেসন এণ্ড অ্যাবোরিজিনস প্রোটেকশন সোসাইটি। এই সমিতি প্রথম গঠিত হয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ দেশান্তরী নিগ্রোদের দাসত্বমুক্ত করার জন্য। পরে ব্রিটিশ শাসনভুক্ত ভারতের কৃষককুলের উন্নতিসাধন অর্থাৎ যাকে হিলকুলি এমিগ্রেসন পদ্ধতি বলা হত, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এই সোসাইটি। ভারতীয় জনসাধারণ সম্পর্কে সোসাইটির উদ্দেশ্য-সাধনে দ্বারকানাথের উপদেশ-নির্দেশ যাচ্ঞা করার পর, তাঁর গুণাবলী বিবৃত করতে গিয়ে সোসাইটি তাঁদের মানপত্রে বললেন ঃ 'যে-প্রকার জ্ঞান লাভ করলে মানুষের আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, সেই প্রকার জ্ঞানের প্রতি আপনার প্রীতি ও আগ্রহ আছে। এতদ্ব্যতীত স্বদেশীয় যুবকদের শিক্ষার বহুবিস্তৃত পরিকল্পনা আপনার উদার দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট...।'[৯৭]

এডিনবরা থেকে দ্বারকানাথ ফিরে গেলেন স্কটল্যাণ্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র গ্লাসগো শহরে—সেখানে তিনি বহু কারখানা ও গুদামঘর ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আর দেখলেন স্টিমবোট-এর আবিষ্কর্তা বেল-এর স্মৃতিস্তম্ভ; কারণ, স্টিমবোট সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। যদিচ সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি তিনি সযত্নে পবিহার করে চলতেন তত্রাচ ষোড়শ শতকের ধর্ম-সংস্কারক জন নকস-এর সমাধিতে শ্রদ্ধার্পণ করতে তাঁর ভুল হয়নি। গ্লাসগো থেকে জাহাজ ধরে দ্বারকানাথ গেলেন লিভারপুল, সেখানে তাঁর দ্রষ্টব্য স্থান ফকেট-এর ইঞ্জিন তৈরির কারখানা। তাঁর স্টিম টাগ এসোসিয়েশন-এর জন্য তিনি যে-চারটি ইঞ্জিনের অর্ডার দিয়েছিলেন, কারখানায় সেইসব নির্মীয়মান ইঞ্জিন দেখে খুব খুশি হলেন তিনি—একটি ইঞ্জিন তাঁর নামাঙ্কিত স্টিম-বোট 'দ্বারকানাথ'-এর জন্য।

লিভারপুলে সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল অন্ধদের আশ্রম। ডায়ারিতে লিখেছিলেন ঃ 'এ-দৃশ্য দেখবার মতো। ফিরে আসছি যখন, আশ্রমের সকলেই আমার সঙ্গে করমর্দনের জন্য এগিয়ে এল—আমি প্রত্যেকের সঙ্গেই করমর্দন করলাম।'[৯৮]

লিভারপুল থেকে দ্বারকানাথ রেলযোগে গেলেন ম্যানচেস্টর, সেখানে মারে-র কারখানা দেখে তাঁর খুব ভালো লাগে। যন্ত্রপাতি হল আধুনিক সভ্যতার বাহন—তাই যন্ত্রপাতি দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগত। কিন্তু হাতে তৈরি সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। উস্টার গিয়ে সেখানকার চীনামাটির তৈরি ফুলদানি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এত ঘোরাঘুরি সেরে অবশেষে তিনি বেরোলেন তীর্থযাত্রায়। উস্টার থেকে ডাকের ঘোড়াগাড়ি চেপে তিনি চলে গেলেন ব্রিস্টল—উদ্দেশ্য, যে-মাটিতে তাঁর

পরম বন্ধু রামমোহন রায় চিরনিদ্রায় শায়িত—সে-মাটিতে একবার শ্রদ্ধায় মাথা ঠেকানো। গন্তব্য সেই স্টেপলটন গ্রোভ—যেখানে মিস কাসল-এর অতিথি হয়ে রামমোহন জীবনের শেষ কয়েকটি দিন যাপন করেছিলেন। মিস কাসলও পরলোকে—বাড়ির সংলগ্ন বাগান জঙ্গলাকীর্ণ, সেখানে রামমোহনের সমাধি ভগ্নপ্রায়। দ্বারকানাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে রাজার দেহাবশেষ তুলে নিয়ে স্থাপিত হয় শহরের সমাধিস্থান আর্নোজ ভেল-এ। পরে একজন স্থপতিকে বরাত দিলেন সমাধির ওপর হিন্দু মন্দিরের আদলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে। এইভাবে তাঁর বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শকের স্মৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ঋণ পরিশোধ করে, কলকাতা টাউন হল-এর জনসভায় সমর্পিত কৃত্য সমাপন করে, তিনি লণ্ডন ফিরে গেলেন।

এদিকে **মন্থলি টাইমস** নিয়মিতভাবে দ্বারকানাথের স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ, ইংলণ্ডের পণ্যোৎপাদন কেন্দ্রাদি পরিদর্শন বিষয়ে সমস্ত খবর সরবরাহ করছিলেন। ১৮৪২ অব্দের ৪ অক্টোবর সংখ্যায় **মন্থলি টাইমস** লিখলেন ঃ 'কিছু দিন আগে আমরা মিঃ উইকস-এর স্টুডিয়োয় গিয়ে দেখলাম তিনি আবক্ষ মূর্তির একটি ছাঁচ নিয়ে তার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধনে রত আছেন। এই ছাঁচ থেকেই মর্মর মূর্তিটি নির্মিত হবে। সৌসাদৃশ্য ফুটিয়েছেন চমৎকার। স্যার মার্টিন শী একটি পূর্ণাবয়ব পোর্ট্রেট অঙ্কনে ব্যস্ত আছেন। মিঃ স্যে-ও এই বিশিষ্ট ভারতীয়ের একটি প্রতিকৃতি রচনা করছেন।'

লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পর দ্বারকানাথ মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন তিনি যেন ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর স্বামী প্রিন্স অলবার্ট-এর সঙ্গে উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে এসে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদান করেন। এই ভোজসভাতেই সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অলবার্ট দ্বারকানাথের অনুরোধে তাঁদের দুজনের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি দ্বারকানাথের হাত দিয়ে কলকাতার টাউন হল-এ উপহার দিতে স্বীকৃত হন। সম্রাজ্ঞী উপরন্তু স্বয়ং নির্দেশ দেন তাঁদের দুজনের ক্ষুদ্রাকার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে যেন ব্যক্তিগত উপহার ও স্মরণ-চিহ্নরূপে দ্বারকানাথকে প্রদান করা হয়।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে এই ভোজসভা বসেছিল ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে, কিন্তু **ক্যালকাটা স্টার** কাগজের সম্পাদক জেমস হিউম তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তারিখ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিল তার পরের দিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে।[৩১] নিবন্ধের উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল ঃ

'মার্সেই থেকে ভারত পাড়ি দেবার পথে, পারী শহরে রওনা দেবার আগেই, কলকাতার (এবং সম্প্রতি এডিনবরার) এই বিশিষ্ট নাগরিক, উইণ্ডসর দুর্গে মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে গত শুক্রবার ৩০ তারিখে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অলবার্ট এই বাবু-কে বিশেষ সদয় সহৃদয়তার সঙ্গে সম্বর্ধিত করেছিলেন। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী সাতিশয় অনুগ্রহের সঙ্গে তাঁর মনোগত বাসনা প্রকট করে বলেন যে দ্বারকানাথকে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর স্বামীর একটি যুগল প্রতিমূর্তি উপহারস্বরূপ

দিতে ইচ্ছুক। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দানের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। হবে না-ই বা কেন; স্বয়ং সম্রাজ্ঞী নিজের হাতে সানন্দে যা প্রদান করেন, সদ্য-সম্মানিত আমাদের ভারতবর্ষীয় এই রাজানুগৃহীত প্রজার পক্ষে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর রাজ-প্রসাদের প্রতীক আর কী হতে পারে!...দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনন্য ও অতুলনীয় গুণাবলীর স্বীকৃতিতে মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর মন্ত্রী মহোদয়েরা মহারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর প্রতি কী-প্রকার সুবিচার করা স্থির করেন, আমরা তা দেখবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছি। একথা আমাদের সুপরিজ্ঞাত যে বাবু সেসব উপাধি-পদবীতে ভূষিত হতে অভিলাষী নন, যা তাঁর মতন নৈতিক ও মানসিক গুণে গুণান্বিত নন এমন ব্যক্তিদের চোখে নিতান্ত আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু তাই বলে, সম্মানসূচক পুরস্কার বিতরণ ব্যাপারে যাঁরা রাজমুকুটধারিণীকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাঁদের দায়িত্ব কিছু কম হচ্ছে না। তাঁদের পক্ষে উচিত হবে মহোচ্চ যোগ্যতার স্বীকৃতিতে গুণান্বিত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা।

'পদমর্যাদা ও অনুভবে অনুরূপ জনৈক বোম্বাইবাসীকে ইতিমধ্যে নাইটহুড দিয়ে সম্মানিত করা হয়ে গেছে।' সুতরাং আমাদের পক্ষে এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তি এ-দেশ ত্যাগ করে চলে যাবেন, অথচ এমন কোনো সম্মাননার বৈশিষ্ট্যসূচক প্রতীক তাঁর সঙ্গে থাকবে না যা থেকে তাঁর দেশের লোক বুঝতে পারবে যে বর্তমানে এ-দেশ শাসনের ভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁরা তাঁর গুণাবলীর কতখানি সমাদর করেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর নেটিভ কিংবা য়ুরোপীয় যাঁদেরই সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের সামনে একটি মহৎ আদর্শ তুলে ধরেছেন—ব্যক্তিগতভাবে তিনি উদার আতিথ্যপরায়ণতা, মার্জিত ব্যবহার ও রাজোচিত দাক্ষিণ্যের পরিচয় রেখেছেন; সরকারী কর্মচারীরূপে সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছেন তাঁর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা; অন্যতম ভূস্বামীশ্রেষ্ঠরূপে তিনি নিরন্তর রত থেকেছেন তাঁর জমিদারীর প্রজাসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে; বণিকরূপে তাঁর অবিচলিত সততা ও উদ্যোগী বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি বাংলাদেশে সকলের শ্রদ্ধা, আস্থা ও চিরকালের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রয়াত গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই দুর্লভ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এতই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন যে, সেই অভিজাতপ্রবরের বিশেষ বাসনা ছিল যেন তাঁর মধ্যস্থতায় দ্বারকানাথ এমন কোনো উপাধিতে ভূষিত হন যা থেকে সূচিত হবে তাঁর প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা। আমরা ভালো করেই জানি বহুকাল ধরে লর্ড অকল্যাণ্ড দ্বারকানাথকে বন্ধু-মর্যাদা দিয়ে আসছেন; ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ও ভারতীয় প্রজাসাধারণের মঙ্গল-সাধনে তাঁর সকল প্রচেষ্টায় সহযোগী এই বন্ধুবর যদি উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন লর্ড অকল্যাণ্ড সর্বাগ্রে আনন্দ প্রকাশ করবেন। জনসভায় দ্বারকানাথকে সম্বর্ধিত করে এবং টাউন হল-এ তাঁর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি ও আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য

চাঁদা তুলে, কলকাতার নাগরিকবৃন্দ প্রমাণ করেছেন এই নাগরিকশ্রেষ্ঠের প্রতি তাঁদের অনুরাগ কত আন্তরিক। আমরা এতে বিস্মিত বোধ করি না, কারণ আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট-এর সহযোগিতায় এই দ্বারকানাথ ও তাঁর পরিবারবর্গ হিন্দু-কলেজের মতো একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। স্কুলবুক সোসাইটি, মেডিকেল কলেজ, কলকাতা ও শহরতলীতে দেশীয়দের তাবৎ স্কুল, ফিভার হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, অন্ধ-আশ্রম, কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম এবং ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি—এই সকল সংস্থাই দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছে ঋণী। তাদের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও সাফল্য—সকলই এঁদের উদারহস্তের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীল। দেশভক্তি ও মানবপ্রেমের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক না করে পারে না। সেই সঙ্গে আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকট করে বলি যে, যে-ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গল সাধনের জন্য এত কিছু করেছেন, সে-দেশের বর্তমান ভাগ্যনিয়ন্তারা নিশ্চয় তাঁকে যথাযথ সম্মানচিহ্নে ভূষিত করবেন।'[১]

কিন্তু ঘটনাচক্রের এমনি বিধান যে দ্বারকানাথকে ব্রিটিশ সরকারের নাইটহুড কিংবা অপর কোনো সম্মাননা না পেয়েই ইংলণ্ডের তীর ছেড়ে চলে যেতে হয়। একাধিক লেখক অনুমান করেছেন নাইটহুড কিংবা অনুরূপ সম্মাননা দেবার প্রস্তাব দ্বারকানাথ স্বয়ং প্রত্যাখ্যান করেন। এই অনুমানের সপক্ষে কোনো সরকারী নথিপত্র পাওয়া যায় নি বলে কোনো কিছু নিশ্চিত বলা শক্ত। ১৮৪২ অব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখে **বেঙ্গল স্পেক্টেটর** বলেন, 'নাইটহুড-এর সম্মান তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে শোনা গেছে।' লর্ড ব্রুহামকে লেখা জেমস ইয়ং-এর একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন ব্লেয়র ক্লিং: 'আমার খুব ইচ্ছা ওঁকে ব্যারনেট করা হয়—ভারতের সর্বপ্রথম ব্যারনেট।'[১২] ক্লিং-এর ধারণা, এইরকম কোনো সম্মাননার প্রত্যাশা থেকেই দ্বারকানাথ তাঁর বংশমর্যাদাসূচক প্রতীকচিহ্ন অর্থাৎ কোট অব আর্মস লণ্ডনের কলেজ অব আর্মস-এ রেজিস্ট্রিভুক্ত করেছিলেন। বর্তমান লেখক ১৯৭৬ অব্দের জুলাই মাসে যখন লণ্ডন ভ্রমণে গিয়েছিলেন, কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট-স্থিত এই কলেজ অব আর্মস-এর রেজিস্টার পরীক্ষা করে জেনেছিলেন দ্বারকানাথ লণ্ডন ছেড়ে চলে যাবার পর ১৮৪২ অব্দের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে এই রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। মহারাণীর যে হুকুমনামা অর্থাৎ ওয়রেণ্ট-এর বলে কোট অব আর্মস রেজিস্ট্রিকৃত হয়, তার মূল দলিল এখন কলকাতার রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার অন্তর্ভুক্ত। প্রদর্শশালার তালিকা-অনুসারে 'ডিউক অব নরফোক মারফত মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত দ্বারকানাথের কুলমর্যাদাসূচক প্রতীকের নকশা।' 'ইস্ট ইণ্ডিজ-স্থিত বাংলা দেশের জমিদার ও বণিক দ্বারকানাথ ঠাকুরের' নামে রেজিস্ট্রিকৃত এই ওয়রেণ্ট একটি কৌতূহল-উদ্দীপক দলিল, এরই শীর্ষে আছে শীল্ড-এর আকারে বিচিত্র বর্ণের সেই কোট অব আর্মস। শীল্ডটি তিন অংশে

বিভক্ত—নিম্নভাগে সমুদ্রের স্রোতে ভাসমান একটি জাহাজ, মধ্যভাগে দুটি পাকানো পার্চমেন্ট কাগজের মাঝখানে একটি খোলা বই এবং উপরিভাগে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। শীল্ড-এর শীর্ষভাগে চিত্রিত আছে একটি হাতি—শুঁড়ে ধরে আছে একটি পদ্মফুল। হাতির পিছন দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে একটি পতাকা—যার মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে একটি লাঙলের ছবি। শীল্ড-এর তলায় সংকল্পবাক্য রূপে লেখা আছে ঃ 'কর্মের নিশ্চিত জয়, Work will win।' এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, সংকল্পবাক্যসহ কুলমর্যাদার প্রতীকচিহ্ন-স্বরূপ এই শীল্ড বহুকাল পরিবারের ছাপানো চিঠির কাগজের শীর্ষে শোভা পেত। দ্বারকানাথের সর্বকনিষ্ঠ পৌত্র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা চিঠিপত্রের মাথায় এই প্রতীকচিহ্ন দেখা যেত।

ইতিপূর্বে **বেঙ্গল স্পেক্টেটর** কাগজ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ওই কাগজেই বেরিয়েছিল যে মহারাণীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় দ্বারকানাথ চমৎকার একটি শাল উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে এবং একটি বহুমূল্য বত্নখচিত ছোরা প্রিন্স অব ওয়েলসকে। (কাগজে নিশ্চয় প্রিন্স কনসর্ট বলতে গিয়ে ভুল করে প্রিন্স অব ওয়েলস বলা হয়ে থাকবে)। একই কাগজে মাসখানেক পরে একটি রিপোর্ট-এ বলা হয়েছিল ঃ 'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহারাণী ও প্রিন্স অলবার্ট-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর সঙ্গে বোর্ড অব কণ্ট্রোল-এর প্রেসিডেন্ট, লর্ড ফিটজেরল্ড-এর একটি সাক্ষাৎকার হয়। সেই সাক্ষাৎকারে মহামান্যা মহারাণীর আদেশক্রমে রাজানুগ্রহের বিশেষ প্রতীক এবং ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে তাঁর অশেষ গুণের কদরস্বরূপ একটি স্বর্ণ-পদক দ্বারকানাথকে উপহার দেওয়া হয়।'

ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আরও একটি সম্মান পেয়েছিলেন দ্বারকানাথ, কিমরেইজিড্ডিয়ন ঈ ফেন্নি নামক এক ওয়েলস প্রতিষ্ঠান থেকে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল প্রাচীন কেলটিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা। এঁদের বিশ্বাস প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এই ঐতিহ্যের সম্পর্ক ছিল নিকট।[৪৩] এই কারণে বৈদিক ভারতের প্রতিনিধিরূপে দ্বারকানাথকে তাঁরা যে মানপত্র দেন, তার সূচনা-অংশটি উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ

'হে অতি বিশিষ্ট গোষ্ঠীপতি—দ্বারকানাথ ঠাকুর! কিমরেইজিড্ডিয়ন ঈ ফেন্নির নামে ও তাঁদের তরফ থেকে আপনাকে এই দ্বীপের প্রাচীন ও আদিম ভাষায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিমরি-দের এই জাতীয় উৎসবে আপনার উপস্থিতি দ্বারা আপনি যেভাবে তাঁদের সম্মানিত করেছেন, সেজনা তাঁরা গভীর আনন্দ প্রকাশ করছেন। দেশের সুপ্রাচীন আচার-আচরণ ও বহু যুগ ধরে চলে আসা প্রথা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উৎসব পালিত হয়। কীভাবে এর সূচনা হল তার কোনো স্মারণিক ইতিহাস নেই, আছে কেবল অনিশ্চিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং তাও এতই অস্পষ্ট যে তাকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না। তথাপি

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে কিমরি-দের প্রচরণ সম্পর্কিত লোকপ্রসিদ্ধির যদি কোনো গুরুত্ব থাকে, ড্রুইড ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের সাদৃশ্যে যদি কোনো তাৎপর্য থাকে, সংস্কৃত ও কিমারইজ ভাষার মধ্যে প্রচুর ও অতি আশ্চর্য মিল যদি কল্পনামাত্র না হয়, তাহলে হিন্দু ও কেলটিক গোষ্ঠীর স্বাজাত্য সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেতে অসুবিধা হয় না। স্বাজাত্য যদি না-ও থাকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মানবসমাজের এই দুটি শাখার মধ্যে প্রাচীনকালে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।'[১৬]

দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করে যাঁরা তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে তাঁদের মধ্যে ছিলেন—'অননুকরণীয় ও বর্তমানে পরলোক-প্রয়াত প্রখ্যাত উপন্যাসকার চার্লস ডিকেন্স।'[৪২] ইংলণ্ড-ত্যাগের আগের দিন একটা যেন দরবার বসে গেল, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন বিদায় জানাতে। ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় লণ্ডন ব্রিজ-এর জাহাজ ঘাট থেকে দলবল সমেত দ্বারকানাথ **উইলিয়ম ফকেট** নামক জাহাজে উঠলেন। তিনদিন বাদে তাঁরা পারী পৌঁছলেন। প্রথম দর্শনে পারী শহর সম্বন্ধে তাঁর অনুভব ব্যক্ত করে দ্বারকানাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন যে সৌন্দর্য ও প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ, জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার তীর্থস্বরূপ 'এই মহান নগরীর প্রবেশপথটি যেমন রমণীয় তেমনি সুগম্ভীর। পৃথিবীতে এ-দৃশ্যের তুলনা মেলা ভার। পথের ধারে এত সব উজ্জ্বল আলো, দেখে মনে হল যেন কোনো মহোৎসবের জন্য পারীকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে।'[৪৩] পারী এসে তিনি পার্কার পরিবার, ক্যাম্বেল পরিবার ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ-এর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। ভারত থেকে এঁরা তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন, কিন্তু পারীতে এঁরা দিনকয়েক আগেই এসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। এইসব পুরাতন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট ফরাসীদের সঙ্গে পারীতে পা দেওয়ামাত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ ডাচেস দ্য গ্রামোঁ, সি লাপেৎ, ব্যারন জেমস রথচাইল্ড, এম. গিজো প্রভৃতি। তাঁর পূর্বপরিচিত বন্ধু কাউন্ট দ্যো'র্সে অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন নিজের হাসিখুশি শহরের সঙ্গে ভারতীয় বন্ধুকে আলাপ করিয়ে দিতে।

দ্বারকানাথের পারী-গমন সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়ে ৪ নভেম্বর তারিখে **লণ্ডন মেল** লিখলেন ঃ '২৮ অক্টোবর তারিখে ফ্রান্স-এর রাজা এই বাবুকে তাঁর প্রাসাদে স্বাগত করেন। প্রচলিত দরবার-বিধি লঙ্ঘন করে আদবকায়দার বালাই না রেখে, রাজা খুব খুশি হয়ে অতিথিকে তাঁর পরিবারবর্গের নিকট নিয়ে যান। প্রাচ্যদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিটির সঙ্গে মহামান্যা রাণী, বেলজিয়াম-এর রাজা ও রাণী, নেমুর-এর ডিউক ও ডাচেস এবং রাজকুমারী ক্লেমাঁতিন-এর সঙ্গে পরিচয় সাধন করাবার পর, রাজা তাঁকে রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষগুলি দেখাতে নিয়ে যান। এতদুপলক্ষে কক্ষগুলি আলোকসজ্জিত করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় রাজা খুব খোলাখুলিভাবে অতিথির সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে ও ভারতের বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনা-

অন্তে রাজা সহৃদয়তার সঙ্গে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন তাঁর বিশিষ্ট অতিথি ফ্রান্স-এ পুনরাগমন করেন। বাবুও প্রতিশ্রুতি দেন যে ১৮৪৩ অব্দে শীতের মরশুমে তিনি পুনরায় আসার বাসনা রাখেন।' দববারে তখন শোকপালনেব পালা চলছিল বলে বাবুর আগমন উপলক্ষে কোনো উৎসবাদির আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। প্যারীতে থাকতে দ্বারকানাথ কোম্পানী বাহাদুরের কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছ থেকে একটি উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পত্র পান। পত্রে ডিরেক্টরবর্গ বলেন ঃ 'ব্রিটিশ ভারতে আপনার জনহিতকর কার্যকলাপ কোম্পানী বাহাদুরের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষা-প্রসারের এবং কলা ও বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষার প্রবর্তনে আপনার বদান্য উৎসাহ এবং ভারতীয় বা ব্রিটিশ নির্বিশেষে আর্তত্রাণের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আপনার উদার আনুকূল্য এর কোনটিই কোম্পানী বাহাদুরের দৃষ্টি এড়ায়নি।' পত্রে কোর্ট অনুরোধ জানালেন যে তাঁর অশেষ গুণাবলীর স্বীকৃতিতে কোর্ট একটি স্বর্ণপদক তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা যেন দ্বারকানাথ অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ কালবিলম্ব না করে এই পত্রের উত্তরে 'মহামান্য কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে' তাঁদের প্রদত্ত 'বিশেষ সন্তোষজনক প্রশংসাপত্রের' জন্য উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে 'মহামান্য কোর্ট-এর ভারতশাসন-ব্যাপারে ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার' গুণকীর্তন করেন, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের পুনরুক্তি করে বলেন, 'ভারতের সুখসমৃদ্ধি বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল আপনাদের মহান ও যশোমণ্ডিত দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকা..। বিধাতার বিধানে যে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের দায় আপনাদের উপর বর্তেছে, সে-দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহৃদয় ব্যাকুলতা সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে।'

ডিরেক্টরবর্গের চিঠি ও দ্বারকানাথের জবাব একত্র প্রকাশিত হয় ১৮৪২ অব্দের ৪ নভেম্বর তারিখে **টাইমস** কাগজে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় টিপ্পনীসহ ঃ 'এই ভদ্রলোকেব কর্মপ্রচেষ্টা ও জনহিতাকাঙ্খার প্রশংসা করে কোর্ট অব ডিরেক্টরস যা লিখেছেন তার চেয়ে সন্তোষজনক আর কী হতে পারে? অবশ্য প্রত্যেক ভারতপ্রেমীর পক্ষে অনুরূপ সন্তোষের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সেই বিরাট দেশের বিশিষ্ট নেটিভ-রূপে এই ভদ্রলোক ঠিক তেমনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন এই সব বণিক রাজাদের (মহামান্য কোর্ট-এর) ভারত-শাসন ব্যাপারে ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার উল্লেখ ক'রে।'

জনহিতকর কাজের স্বীকৃতিতে দ্বারকানাথ ডিরেক্টরদের কাছ থেকে যে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পত্র ও স্বর্ণপদক দানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, তার উত্তরে তিনি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেই যদি ক্ষান্ত হতেন, তাহলে কিছু ক্ষতি হত না। তা না করে তিনি অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এমন সব কথা বললেন যা শোনাল কোম্পানী শাসনের 'ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার' বিষয়ে নিতান্ত দাসসুলভ মনোবৃত্তির

প্রশস্তিবাদের মতো। তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন যে তাঁর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে অর্ধাশনে বঞ্চিত খর্বিত জীবন যাপন করে, অথচ প্রগলভ প্রশংসায় উল্লেখ করলেন এই সব লোকের 'কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে' ব্রিটেনের 'সহৃদয় ব্যাকুলতার' কথা। কিন্তু এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি তো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল না, তাঁর আত্মমর্যাদা-জ্ঞান ছিল প্রখর এবং তাঁর দেশের শাসকবর্গের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথায়—সে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। জন্-কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মিষ্টি কথায় তিনি তো গলে যাবার পাত্র ছিলেন না। তাঁদের প্রশংসায় অভিভূত কেন হতে যাবেন তিনি? স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে সমাদর করেছেন, ইংলণ্ডের অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁকে সমান মর্যাদায় স্বাগত করেছেন এবং অতি সম্প্রতি ফ্রান্স দেশের রাজাও প্রভূত শিষ্টাচারে তাঁকে আপ্যায়িত করেছেন। সুতরাং বণিকরাজদের সম্মানলাভে তাঁর বিগলিত হবার তো কোনো কারণ ছিল না। তিনি কি তবে পূর্বকল্পিত কোনো কৌশলের সূত্র ধরে চাটুবাক্যে ডিরেক্টরদের তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা বাগড়া না দিয়ে বরঞ্চ খুশি মনে তাঁর অভিপ্রেত সিদ্ধিতে সহায়তা ও সহযোগিতা করেন? তিনি কি মনে মনে স্থির করেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ত্বরিত-গামী বাষ্পীয় পোত চালনা করে তাঁর কার-টেগোর কোম্পানী ভারতের সঙ্গে বিলেতকে যোগযুক্ত করবে, অথবা ভারতে রেলপথ স্থাপন করে কলকাতাকে যুক্ত করবে অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরের সঙ্গে? ভারতের সদাগর-রাজ কি কূটনীতির চাল চেলেছিলেন বিলেতের সদাগর-রাজদের সঙ্গে? তা না হলে লর্ড মেয়রের ভোজসভায় ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতায় যে-হঠকারিতা করেছিলেন এবং যার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কেবল ভারতীয় বন্ধুরা নয়, অপিচ বিলেতের বন্ধুরাও—সেই প্রমাদের পুনরুক্তি করতে গেলেন কেন? ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতার একটি তবু বাঁচোয়া এই ছিল যে স্তুতির অতিশয়োক্তিকে লোকে ব্যাজস্তুতি বলে মনে করতে পারত—যেমন করেছিলেন **বেঙ্গল হরকরা**-সম্পাদক। কিন্তু ডিরেক্টরদের উদ্দেশে লিখিত চিঠির প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্তঃসলিল ছলাকলার কোনো অবকাশই ছিল না—ছিল নিছক খোশামুদি।

ক্লিং বলেন, দ্বারকানাথ ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা, নাটকের কুশলী নায়কের মতো যখন যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন তদুপযোগী আচরণ করতেন, সংলাপ করতেন। ক্লিং-এর অনুমান সত্য হলেও হতে পারে। 'কলকাতায় থাকতে তিনি কখনো কখনো অবতীর্ণ হয়েছেন দুঃসাহসিক লোকনেতার ভূমিকায়—রাজনীতিক কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণকে পরিচালনা করেছেন অনমনীয় দৃঢ়তায়। বিলাতে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন সুমার্জিত ও কুশলী কূটনীতিবিদের ভূমিকা—যেন ভারতের জনগণ তাঁকে দৌত্য করতে পাঠিয়েছেন মহামান্যা মহারাণীর দরবারে! পাত্রমিত্র সভাসদ পরিবৃত হয়ে এমন চালচলন করতেন যেন মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য তাঁর হাতের মুঠোয়; উপহার-বিনিময়, সৌজন্য-বিনিময় ও আতিথ্য-বিনিময় করতেন সমান

আভিজাত্যে। এই ভূমিকায় সংলাপ করতে হয় কূটনীতির ভাষায়। ডিরেক্টরবর্গের পত্রোত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, তা কিন্তু ছিল তাঁর মনের কথা। অন্তরে অন্তরে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদিচ একহাতে ভারতের জনগণকে শোষণ করছে ও তাদের সর্বস্ব অপহরণ করছে, অপরপক্ষে কিন্তু সমসাময়িক জগতে ব্রিটিশ-ব্যতিরেকে এমন কোনো শক্তি ছিল না ভারতকে যথাসম্ভব সু-শাসনে রাখার জন্য।'[৪৭]

দ্বারকানাথ যখন তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, 'ভারতের সুখসমৃদ্ধি বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল আপনাদের মহান ও যশোমণ্ডিত দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকা', তিনি তখন তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছিলেন। কেবল সে যুগে নয়, এই সেদিন পর্যন্ত, গরিষ্ঠ-সংখ্যক ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন। ১৯০৭ অব্দে এলাহাবাদে একটি প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর সভাপতিত্ব করতে গিয়ে জওহরলাল নেহরুর পিতা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা মতিলাল নেহরু বলেছিলেন ঃ 'জন বুল এ-দেশের মঙ্গলই চায়, অমঙ্গল কামনা করা তার ধাতে নেই...। পরিস্থিতিটুকু বুঝে নিতে পারলে তার করণীয় মোদ্দা কর্তব্য সম্পাদনে সে কোনো বাধা মানে না। একবার যখন তার গোঁ চাপে পৃথিবীতে হেন কোন শক্তি নেই যা তাকে ঠেকাতে পারে, তখন সে তার এ-দেশের কিংবা ও-দেশের জ্ঞাতিকুটুম্বদের কথায় কান দেয় না।'[৪৮]

১৮৪২ অব্দের ৯ নভেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মার্সেই থেকে পাড়ি দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সে-যুগের অন্যতম অসাধারণ মানুষ জর্জ টমসন—যাঁকে তিনি তাঁর দেশ দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন।[৪৯] কোম্পানী বাহাদুরের সরকার থেকে একটি বিশেষ স্টিমার বোম্বাই থেকে তাঁদের নিয়ে আসে মাদ্রাজে। সেখান থেকে আর একটি স্টিমার যোগে দ্বারকানাথ কলকাতার মাটিতে পুনরায় পা দিলেন ডিসেম্বর মাসে—প্রায় এগারো মাস প্রবাস-যাপনের পর।

## টীকা

১. এই ন্যাস-পত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

২. 'আত্মজীবনী' ঃ দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী, কলিকাতা। ১৯৬২, পৃ. ৮৫।

৩. সত্তর বছর বাদে কলকাতার এই টাউন হলেই দ্বারকানাথের সুবিখ্যাত পৌত্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা-সভা আহূত হয়েছিল। কিন্তু সে সমাবেশে অভ্যাগতবৃন্দের উৎসাহ যদিচ কিছু কম ছিল না, তাঁরা সর্বদেশিক ছিলেন না—অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী। অন্তর্বর্তী সময়টাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ঘটেছিল বিস্তর। ব্রিটিশ-রাজ্যের রাজত্বে সকলের রাজা হবার স্বপ্ন তখন কেটে গেছে—কেবল লিবারেল দলের মনে তখনো ছিল একটা ক্ষীণ আশা।

৪. *Memoir*, by Kissery Chand Mitra, pp. 77-78

৫. এফ. আর. স্যে অঙ্কিত প্রতিকৃতিটি পূর্বে টাউন হল-এ টাঙানো ছিল, এখন সেটি কলকাতার

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ স্থানান্তরিত। উইকস-রচিত আবক্ষ মর্মর মূর্তি এখন বেলভিডিয়রে ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রবেশপথে স্থাপিত।

৬. রামমণির কন্যা ও দ্বারকানাথের ভগ্নী রাসবিলাসীর পুত্র, পিতার নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য : *Memoir* বাংলা সংস্করণে কল্যাণ কুমার দাশগুপ্তের টীকা, পৃ ২৮৮।

৭. *Memoir*, p. 79.

৮ *The Classical Accounts of India*, Ed. by R. C. Majumder. এই গ্রন্থে আদি কালের রোমান লেখকদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে এক-একটি কচ্ছপের খোল এমন বিরাট আকারের হত যে তা ঘরের ছাদ-হিসাবে ব্যবহৃত হত।

৯. রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮১ অব্দে। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ অব্দে। 'রবীন্দ্রবচনাবলী', প্রথম খণ্ড।

১০. চিঠির শীর্ষভাগে যে তারিখ দেওয়া আছে, চিঠির শেষ দিকে 'আগামী কাল ২৩ তারিখ' এই দুয়ের সাযুজ্য না থাকায় এটাই প্রমাণ হয় যে চিঠি খুবই তাড়াহুড়োয় লেখা—এমনও হতে পারে যে চিঠি শেষ করতে তিন দিন সময় লেগেছিল।

১১. *Memoir*, p. 82.

১২ তদেব, পৃ ৮৪।

১৩. পাড়ি দেবার আসল তারিখ ৯ জানুয়ারি।

১৪. হয় তারিখ গুলিয়ে গেছে কিম্বা ছাপার ভুল। তিনি লণ্ডন পৌঁছেছিলেন ১০ জুন তারিখে।

১৫. দ্বারকানাথের কথায় যাঁরা অত্যুক্তি-দোষ দেখবেন তাঁরা যেন তরুণবয়স্ক গান্ধীর লেখায় লণ্ডন-দর্শনে তাঁর 'প্রথম অনুভূতি'র কথা পড়ে দেখেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে ১৮৮৮ অব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন পৌঁছবার পর ভিক্টোরিয়া হোটেলে তাঁর কামরাটি দেখে গান্ধী বলেছিলেন, 'মনে হয় গোটা জীবনটাই এই ঘরে কাটিয়ে দিতে পারি।' দ্র : *Gandhi in London*, by James D. Hunt. অপরপক্ষে তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম অনুভূতি' ছিল একেবারে অন্যরকম। হয়তো ওপরচালাকি ছিল তখনকার কায়দা-বিশেষ।

১৬. বাস্তবপক্ষে মহারাণীর সাক্ষাৎ তিনি প্রথম লাভ করেন ১৬ জুন তারিখে। দ্র : *The Times*, June 17, 1842 : *Court Circular* for June 16

১৭ ১৮৪৫-৪৬-এ দ্বিতীয়বার সফরে এসে দ্বারকানাথ এই হোটেলেই উঠেছিলেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমানে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে উচ্চ মর্যাদায় ব্রাউনস হোটেল—আলবেমার্ল স্ট্রীটের ২৯ নম্বর পর্যন্ত এই হোটেলের বিস্তার। মূল প্রবেশদ্বারের দু পাশের টালি-ঢাকা দেওয়ালে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে 'ব্রাউন এণ্ড সেণ্ট জর্জেস হোটেলস'।

১৮. *Partner in Empire*, by Blair Kling, pp 169-170 রাজকীয় অভিলেখাগারে রক্ষিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃত।

১৯. *Memoir*, pp. 89-90. মনে হয় অধুনালুপ্ত দ্বারকানাথের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত।

২০. তদেব পৃ. ৯০। কোথায় লকার্ট-কর্তৃক উপহৃত এই সব বই? দ্বারকানাথ নিশ্চয় সেসব বই কলকাতায় এনে থাকবেন। তবে কি তাঁর পুত্র মহর্ষি পিতার লাইব্রেরি দান কিংবা বিক্রয় করে দিয়েছিলেন?

২১. *Memoir*, pp. 113-114.

কাউণ্ট দ্যোর্সে ছিলেন সদাপ্রফুল্ল ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক যাঁর বিষয়ে কটন তাঁর 'ক্যালকাটা ওল্ড এণ্ড নিউ' গ্রন্থে 'ফুলবাবুদের রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি চিত্রশিল্পীও ছিলেন এবং দ্বারকানাথের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-

৭০) ও উইলিয়ম থ্যাকারে (১৮১১-১৮৬৩) উভয়েই ছিলেন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। কটন বলেন, 'হালকা একটা ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও থ্যাকারে-র একটি নভেলে দ্বারকানাথকে বেশ চেনা যায়।' যদিচ কটন বলেননি সেটা কোন নভেলে, শ্রীঅমৃতময় মুখোপাধ্যায় বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন, *The New Comes* হল সেই নভেল। Everyman's Library প্রকাশিত দুইখণ্ডে থ্যাকারে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে ৮১-৮৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৩২ পৃষ্ঠায় যে 'প্রিন্স' রমণলালের (Rummun Lull) সাক্ষাৎ মেলে, তাঁর সঙ্গে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের সাদৃশ্য স্পষ্ট। ডগলাস জেরল্ড (১৮০৩-১৮৫৭) ছিলেন লেখক ও নাট্যকার, *Punch* পত্রে নিয়মিত লিখতেন। মার্ক লেমন (১৮০৯-১৮৭০) ছিলেন *Punch*-এর সম্পাদক। হোরেস মেহিউ (১৮১৬-১৮৭২) ছিলেন নাট্যকার ও সাংবাদিক।

২২. *A Note on Dwarkanath Tagore,* by Amalendu Bose, *Visva-Bharati Quarterly,* Vol. 31, p. 222, 1956-66.

২৩. মহারাণীর অতিথি হয়ে দ্বারকানাথ যে কখনো উইণ্ডসর কাসেল-এ ছিলেন সেবিষয়ে আব কোনো লিখিত প্রমাণ নেই।

২৪. টমাস মোর (১৭৭৯-১৮৫২) আইরিশ কবি ও লেখক। স্যামুয়েল রোজার্স (১৭৬৩-১৮৫৫) কবি ও সাহিত্যিক।

২৫. মূল বাংলায় লিখিত নভেলের মধ্যে সর্বপ্রথম হল 'আলালের ঘরেব দুলাল'। একটি সস্তা মাসিকের পাতায় এই নভেল প্রথমে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ অবধি ধারাবাহিক ছাপা হয়, বই হয়ে বের হয় ১৮৫৮ সালে। এই নভেলের লেখক খ্যাতনামা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি টেকচাঁদ ঠাকুব ছদ্মনামে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

২৬. *Partner in Empire,* by Blair Kling, p. 171. ক্রহাম নথিপত্র থেকে উদ্ধৃত।

২৭. *British Folks and British India Fifty Years Ago : Joseph Pease and His Contemporaries,* by John Hyslop Bell, London

২৮. তদেব।

২৯. স্যর মার্টিন আর্চার শী ছিলেন রয়েল একাডেমির প্রেসিডেন্ট।

৩০. *Memoir,* p. 93

৩১ তদেব, পৃ. ৯৩।

৩২. তদেব, পৃ. ৯৫।

৩৩. তদেব, পৃ. ৯৫। দ্বারকানাথের কয়লা-সংক্রান্ত উদ্যোগ কী গভীরভাবে দেশের লোকেব মন অধিকার করেছিল তারই প্রমাণ দেখা যায় নিউ কাসল-কে যখন কিশোরীচাঁদ বলেন 'ইংলণ্ডের রানীগঞ্জ'।

৩৪. তদেব, পৃ. ৯৫।

৩৫. ১৮৪২ অব্দে ১ নভেম্বব তারিখে *Bengal Spectator*-এ প্রকাশিত পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লেখা দ্বারকানাথের চিঠি।

৩৬. এডিনবরার নাগরিকত্ব বিষয়ে মূল দলিল বা চার্টার রক্ষিত আছে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায়। ১৮৪২ অব্দের ৩১ আগস্ট তারিখে *The Scotsman* এডিনবরা টাউন কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৭৬ অব্দের আগস্ট মাসে বর্তমান লেখক যখন এডিনবরা গিয়েছিলেন তখন এডিনবরা পাবলিক লাইব্রেরির আনুকূল্যে তিনি ঐ প্রতিবেদনের জেরোক্স্ কপি পান। সেই কপি তিনি দান করেছেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে দ্বারকানাথের পর মাত্র পাঁচজন ভারতীয় এডিনবরা শহরের নাগরিকরূপে বৃত হন, তাঁরা হলেন : বিকানীরের মহারাজা গঙ্গা সিং (১১ এপ্রিল ১৮১৭), বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব

(২৪ নভেম্বর ১৯২৬), ভূপালের নবাব (৯ জানুয়ারি ১৯৩১), শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (৯ জানুয়ারি ১৯৩১)—এই দুজন বিলেত গিয়েছিলেন প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স-এর ডেলিগেট হয়ে—এবং পাতিয়ালার মহারাজা (১০ জুন ১৯৩৫)। এডিনবরা টাউন কাউন্সিলের অভিলেখাগার-রক্ষক মিঃ ম্যাকির সৌজন্যে এই সব তথ্য লেখক পেয়েছেন।

৩৭ *Memoir*, pp 98-99.

৩৮. তদেব, পৃ. ১০০।

৩৯. *Calcutta Star*. 24 Nov. 1842 Reproduced by *Modern Review*, July-December, 1934.

৪০ জামশেদজী জীজীভাই সর্বপ্রথম ভারতীয়—যিনি নাইট-উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৪২ অব্দের ৫ মে তারিখে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' তাঁদের রিপোর্ট-এ বলেছিলেন : 'মহামান্য মহারাণী স্যর জামশেদজী জীজীভাইকে নাইটহুড সম্মানের জন্য নির্বাচন করেছেন বলে বোম্বাইয়ের বিত্তবান পার্সি মহল তাঁদের সমর্থনের প্রতীকরূপে তাঁকে একটি ধাতুপট উপহার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চার বছর আগে এই কাগজেরই ১৮৩৮ অব্দের ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল, বোম্বাই শহরের ধনাঢ্য বণিক জামশেদজী জীজীভাই এক লাখ টাকা অর্থাৎ দশ হাজার পাউণ্ড দান করবেন বলেছেন এই শর্তে যে শতকরা ছয় টাকা সুদে সরকার সে টাকা তাঁকে ধার দেবেন। টাকাটা ব্যয় করা হবে বোম্বাই শহরে একটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য।' লণ্ডনের কলেজ অব আর্মস-এর ১৮৪২ অব্দের রেজিস্টার বর্তমান লেখক দেখেছেন। স্যর জামশেদজী জীজীভাই-এর নামে নাইটহুড-এর পরওয়ানা বেরিয়েছিল ১৮৪২-এর ১৪ এপ্রিল তারিখে।

৪১ *Calcutta Star*, 24 November, 1842.

৪২ *Partner in Empire*, by Blair Kling, p. 173

৪৩. এই এসোসিয়েসন-এর বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই—কিন্তু ওয়েলসদের স্বাজাত্যপ্রেম এখনো শক্তিশালী। বর্তমান লেখক খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন দ্বারকানাথকে মানপত্র দেবার ঘটনা ১৮৪২ অব্দের ১৫ অক্টোবর তারিখে 'মনমথশায়ার মার্লিন' কাগজে রিপোর্ট আকারে বেরিয়েছিল। কার্ডিফ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরির কাউণ্টি লাইব্রেরিয়ান আরও জানিয়েছিলেন, 'ঈ ফেন্নি হল আবেরগাভেন্নির (দক্ষিণপূর্ব ওয়েলস-এ অবস্থিত) শুদ্ধ ওয়েলস নাম। কিমরেইজিড়ডিয়ন কথাটার মূলে আছে কিমরেইজ অর্থাৎ ওয়েলস। সুতরাং কিমরেইজিড়ডিয়ন ঈ ফেন্নির অর্থ দাঁড়াচ্ছে আবেরগাভেন্নির ওয়েলস সোসাইটি।'

৪৪. কলকাতা রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় মূল মানপত্রটি সুরক্ষিত।

৪৫. *Memoir*, p. 103.

৪৬. তদেব, পৃ. ১০৩।

৪৭. *Partner in Empire*, by Blair Kling, p. 174

৪৮. দ্রঃ *Gokhale, Gandhi and the Nehrus : Studies in Indian Nationalism*, by B. R. Nanda, Allen & Unwin, London. 1947.

৪৯. *Memoir, p. 105.*

□

নবম পরিচ্ছেদ

# প্রত্যাবর্তন

প্রায় এক বছর প্রবাস-যাপনের পর দ্বারকানাথের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন নিশ্চয় আনন্দের কারণ হয়ে থাকবে—তাঁকে নিয়ে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগী ভক্তেরা খুবই আহ্লাদ প্রকাশ করে থাকবেন। কিন্তু ঈশান কোণে মেঘ জমেছিল আসন্ন সংকটের সংকেতের মতো। জেমস হিউম তাঁর বিলেতের এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'একটা খবর শুনে তোমার নিশ্চয় মজা লাগবে। যিনি ওদেশে-এদেশে পুরুষসিংহরূপে গণ্য হয়েছেন, রাজারাজড়াদের যিনি পেয়ারের অতিথি, ভাবতে পারো, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছেন, নিজের পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, আত্মীয়-কুটুম্ব তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন? কিন্তু কেন? কালাপানি পার হয়ে তিনি য়ুরোপ গিয়ে সেদেশের লোকেদের সঙ্গে পানাহার করেছেন বলে। এমনটা হতে পারে বলে কেউ যদি ভবিষ্যদ্বাণী করত, মনে হত অবিশ্বাস্য। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে। মেরী এন ওয়াকার-এর দল ধৃষ্টতা-ভরে কী বলেছে জানো? বলেছে বিদেশযাত্রার জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়নি, হয়েছে যেহেতু তিনি ম্যানসন হাউসের বক্তৃতায় ও ডিরেক্টরবর্গকে লেখা চিঠিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্চ-প্রশংসা করেছিলেন।'[১]

ঝড়ের মেঘ উড়ে গিয়েছিল সামান্য ধুলোবালি ছড়িয়ে, ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি। এটা তো ধরেই নেওয়া যায় ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতা ও ডিরেক্টরবর্গকে লেখা চিঠিতে দ্বারকানাথ যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্বদেশের বেশ কিছু স্পর্শকাতর ব্যক্তির কানে তা বেসুরো বেজে থাকবে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তাঁর বিজাতীয় আচার-ব্যবহার পছন্দ করতেন না, কারো কারো মনে হয়তো তিনি ঈর্ষা উদ্রেক করে থাকবেন, কেউ কেউ হয়তো অন্য কোনো কারণে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। সকলেই এঁরা কিন্তু তালে তালে ছিলেন কী করে দ্বারকানাথের উপর এক হাত নেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তখনকার কাগজে প্রকাশিত একটি চিঠির উল্লেখ করা যায়। চিঠি যিনি লিখেছিলেন তিনি নিশ্চয় মনেপ্রাণে দ্বারকানাথ বিরোধী ছিলেন, নাম সই করেছিলেন 'ওল্ড হিন্দু' বলে। চিঠিতে তিনি দ্বারকানাথকে ধিক্কার দিয়ে বলেন ঃ 'লোকটা হৃদয়হীন স্তাবক-মাত্র, নীতির ধার ধারে না, লজ্জা পাবার মতো সামান্য আত্মসম্মান সেটুকুও নেই।'[২]

দ্বারকানাথের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়েও **বেঙ্গল হরকরা**-র মতো কাগজ কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লেখা চিঠির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। চিঠিতে জর্জ টমসনের হাত ছিল—এই অনুমান নাকচ করে দিয়ে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে **হরকরা** বলেছিলেন ঃ 'সে যেমনই হোক না কেন, ম্যানসন হাউস-এ মুখের কথায় আমাদের বন্ধুবর যেমন হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এ-চিঠিতে হাতের লেখায় স্বাক্ষর বসিয়ে তার চেয়ে কোনো অংশে কম হঠকারিতার পরিচয় দেননি। ঠাকুর-পরিবার বলেন, অপর কোনো কারণে নয়, এই চিঠি ও সেই বক্তৃতার জন্যই তাঁরা দ্বারকানাথকে একঘরে করেছেন; তাঁরা বলেন, তিনি বিলেত গেছেন এবং সেখানে ইংরেজদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন বলে তাঁদের কেন আপত্তি থাকবে; তাঁদের মতে, তাঁর আসল অপরাধ এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ এই কথা বার বার বলে তিনি স্বদেশীয়দের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছেন।...আমাদের দিক থেকে আমরা বলব দ্বারকানাথের বক্তৃতা বা চিঠি আর কিছুই নয়, সৌজন্যসূচক উচ্ছ্বাসমাত্র, মধু ও গুড়ের ছিটেফোঁটা—যার কোনো অর্থ নেই। এগুলি যে কেবল কথার কথা—দ্বারকানাথের মনের কথা নয়—এ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহমাত্র নেই, কিন্তু লোকেরা এ থেকে গভীর একটা তাৎপর্য খুঁজে বের করতে কৃতসংকল্প। অসন্তুষ্ট কিছু কিছু ব্যক্তি যখনি দেশীয়দের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন, স্যর জে. লাশিংটন[২] ও **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** এই হতভাগা-চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে-সব অভিযোগ খণ্ডন করতে চেয়েছেন। আমাদের সেজন্য দুঃখ হয় দ্বারকানাথ আদৌ কেন এ চিঠি লিখলেন অথবা এ চিঠিতে স্বাক্ষর করলেন—এই কথা ভেবে। সৌজন্য প্রকাশের দিক থেকে এ-চিঠিতে যদিও খুঁত নেই, লোকে এ-চিঠি ব্যবহার করছে সরকারী দলিলরূপে—বুদ্ধিমত্তায় বিশিষ্ট যে-নেটিভকে বহু ব্যক্তি এদেশের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁরই সুচিন্তিত মত বা সিদ্ধান্তরূপে। সেদিক থেকে বিচাব করলে এ-চিঠি প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো ক্ষতি করতে পারে।'[১]

ছ'দিন বাদে **বেঙ্গল হরকরা** জানান দ্বারকানাথ ঠাকুরকে যে ঠাকুর পরিবার থেকে 'একঘরে' করা হয়েছে, এ সংবাদ তাঁরা পেয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা শাখার হরকুমার ঠাকুরের কাছ থেকে। কিন্তু **হরকরা**-র সেই একই সংখ্যায় অর্থাৎ ১৮৪৩ অব্দের ২৩ মার্চ তারিখেই সম্পাদকের কাছে লিখিত অপর একজন জ্ঞাতিভ্রাতা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। চিঠিতে উপেন্দ্রমোহন লিখলেন যে হরকুমার ঠাকুরের বাড়িতে যখন দ্বারকানাথকে একঘরে করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য পারিবারিক বৈঠক বসে, তিনি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্রমোহনের মতে, আলোচনা হয়েছিল নিছক ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক থেকে এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে দ্বারকানাথকে একঘরে করা হবে না। উপেন্দ্রমোহন **হরকরা**-সম্পাদককে লিখেছিলেন ঃ 'দ্বারকানাথ দেশে ফেরার জন্য বিলেত ছেড়েছেন এবং যে-কোনো দিন

তিনি কলকাতায় এসে পড়তে পারেন—এই খবর রাষ্ট্র হবার পর ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউ নিছক ধর্মীয় ভাবনার বশবর্তী হয়ে ভাবতে লাগলেন পূর্বেকার মতো সমাদরে তাঁকে সমাজে গ্রহণ করলে, হয়তো গোটা ঠাকুর পরিবারের কুলে কালি পড়তে পারে। সেই ভয়ে পরিবারের কয়েকজন পরস্পরের সঙ্গে নিত্য দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার পর স্থির করেন তাঁকে একঘরে করাই শ্রেয়। সংখ্যায় তাঁরা তিন-চার জনের অধিক ছিলেন না। অন্যেরা তাঁদের কথায় বড়ো একটা কান দেননি। তাঁরা মনে করেন ইতিপূর্বে দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁরা যেভাবে আচার আচরণ করে এসেছেন তার ইতরবিশেষ করতে যাওয়া অসঙ্গত হবে। ব্যাপারটা এইরকম অমীমাংসিতভাবেই ঝুলে ছিল এতদিন। দ্বারকানাথের প্রত্যাবর্তনের পর পারিবারিক বৈঠক বসে আমার শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয় বাবু হরকুমার ঠাকুরের বাড়ি। সেই বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম—আমি স্পষ্টত বলতে পারি বিরুদ্ধ দলের যে-কয়জন একঘরে করার সপক্ষে ছিলেন তাঁরা ধর্মীয় নীতি ও কুলাচারের কথাই বড়ো করে দেখেছিলেন, কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লেখা দ্বারকানাথের চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁদের মনে প্রবেশ করেনি। বৈঠকে সে-বিষয়ে উল্লেখমাত্র হয়নি।...বৈঠকের আলোচনায় আমি যখন যোগ দিলাম আমি ছিলাম সংখ্যালঘু দলে। সুখের বিষয় বৈঠক যখন ভাঙল আমরাই হলাম দলে ভারী।'

এই সব চিঠিপত্রের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **হরকরা**-সম্পাদক—পীরালি ও ঠাকুর পরিবারের হয়ে হরকুমার যা লিখেছিলেন, সেটাই তিনি উপেন্দ্রমোহন বর্ণিত ঘটনার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন—লিখলেন ঃ 'ইতিপূর্বেই তো আমরা বলেছি দ্বারকানাথের যেসব কীর্তি এখন ইতিহাস-বিশ্রুত, যেসব কীর্তি তাঁকে সঙ্গত কারণেই যশোবন্ত করেছে, সেই সব কীর্তির কথা স্মরণ করে আমরা অনেক বেশি পরিতোষ লাভ করে থাকি। মনশ্চক্ষে আমরা দেখি রামমোহনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সতীদাহের আগুন নেভাচ্ছেন, মৃত পতির চিতানলে দগ্ধ হয়ে অতি বীভৎস মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করছেন অসহায়া নারীকে। সতীদাহ-নিবারণের মতো একটি পরম কারুণিক কীর্তির জন্য ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করে থাকবেন—তাঁর এই প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি।...আবার দেখি দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে যিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতিত হয়েছেন, সম্পত্তি যাঁর বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যিনি দেশান্তরী হয়েছেন। দুর্গতির দিনে আর সবাই যখন বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, একমাত্র দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অটল। সরকারের ক্রোধ উদ্রেক করেছেন এমন একজন ব্যক্তির বন্ধু ও সহায় হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে, কোনো তিরস্কার তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। যাঁরা রুপোলি জরির জুতো পরে ফুল বিছানো পথে চলাফেরা করেন কেবল তাঁদের সহচর হতে তিনি চাননি। সবাই যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে তিনি যখন আঁধার রাতে একা

পথে চলেছিলেন তখন সহৃদয় দ্বারকানাথই তাঁর হাতে হাত রেখে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৫] এ-সব কথা আর যারা ভুলতে চায় ভুলুক—আমরা ভুলিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরাও বিনিময়ে কিছু 'অনুগ্রহ' চাই। আমরা আশা করি এবং আমরা চাই যে, তাঁর দেশের হয়ে যাঁরা সংগ্রাম করবেন, দ্বারকানাথ যেন এখনো অগ্রণী হয়ে তাঁদের হয়ে তাঁদের প্রথম সারির মধ্যে দাঁড়াবেন। তাঁর প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, দায়িত্বও তেমনি। জনগণের নায়ক যিনি হন তাঁকে খুবই একটি দুরূহ কর্তব্য পালন করতে হয়—সে হল তাঁর লব্ধ কীর্তিকে সংরক্ষণ কবা...। দ্বারকানাথ ঠাকুরই কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্ষতি সাধন করতে পারেন। তিনি যেন নিজের প্রতি সত্য হন। তাহলে সমসাময়িকেরা তাঁর নানা গুণের সমর্থনে যে রায় দিয়েছেন, তা সত্য প্রমাণিত হবে। সেই সুদূর অনাগত কালে যখন কথার স্তোকবাক্য লোকে ভুলে যাবে এবং যখন কেবল কৃতকর্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকবে সৌধেব মতো, তখন আজকের বিচারের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।'

পীরালি তথা ঠাকুর পরিবারের লোকেরা সত্য সত্যই তাঁকে যদি 'একঘরে' করত, দ্বারকানাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের মনে একটু হয়তো হাসতেন। জ্ঞাতিকুটুম্বদের সঙ্গে তিনি সবসময় সদ্ভাব বেখে চলতেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সদ্ভাব বজায় ছিল, কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছার উপব তিনি কখনো নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব পরিবারে তখন তো তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন, জীবিতকালেও স্বামী-সহবাস তিনি বহুপূর্বেই পরিহার করেছিলেন। ম্লেচ্ছসংসর্গীয় স্পর্শদোষ থেকে তাঁর ও বাড়ির অন্যান্য বর্ষীয়সীদের অশুচি হবার একটা দারুণ ভয় ছিল। সে-ভয় থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেবার জন্যই তো তিনি বিরাট এক বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করে, ভদ্রাসন ছেড়ে উঠে যান। কলকাতায় যখন থাকতেন তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত সেই বৈঠকখানা বাড়িতে, অশন-শয়নের সব ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন সেখানেই। নিত্যকৃত্যের মধ্যে একমাত্র ছিল গৃহদেবতার সেবা—ঠাকুরদালানের এক কোণে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন মাত্র, পূজা-বন্দনা-সেবার ভার ভাগ করে দিয়েছিলেন আঠারোজন বেতনভোগী পুরোহিতের উপর।

প্রত্যাবর্তনের পর নিন্দিত লাঞ্ছিত হওয়া দূরের কথা, অতি অল্প কালের মধ্যেই দ্বারকানাথ যেন তাঁর জীবনযাপনের অভ্যস্ত ধারায় ফিরে গিয়েছিলেন। তার প্রমাণ এই যে, ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে এক জাঁকালো নৈশভোজ ও বল-নাচের আয়োজন করেছিলেন। ১৮৪৩ অব্দের ৩১ জানুয়ারি তারিখে সন্ধ্যাবেলায় শুরু হয়েছিল এই বিরাট ব্যাপার। **বেঙ্গল হেরল্ড** ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই ঘটনার একটি বর্ণাঢ্য ছবি তুলে ধরেছিলেন ঃ

'গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাদেব বিশিষ্ট নাগরিকপ্রবর তাঁর বাগানবাড়িতে একটি জমকালো রকম বিনোদনের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল

দু'টি—বিলেতফেরতা বাবু একটা সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একত্রে পুনর্মিলিত হতে, উপরন্তু ডেপুটি গভর্ণর বাহাদুরের পত্নী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বার্ড-কে ভারত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে। বল-নাচ ও নৈশ-ভোজনের তাবৎ ব্যবস্থা এমন নিখুঁত হয়েছিল যে আমন্ত্রণকর্তার রুচি ও বহুখ্যাত বদান্যতা অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সমস্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে। যে-অভূতপূর্ব পরিমাণে অতিথিসমাগম হয়েছিল তা যেন বিনা বাক্যব্যয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছিল, তাঁর পরিচিতবর্গের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে দ্বারকানাথ ঠাকুর কতটা শ্রদ্ধার পাত্র। এই ধরনের সমাগমে উপস্থিত সজ্জনদের একটি নামের তালিকা বিলাতে সচরাচর প্রকাশিত হয়ে থাকে বলে আমরা জানি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা যদি সেই প্রথা অনুকরণ করতে চাই তাহলে 'বেঙ্গল ডিরেকটরি'-র সেই সমস্ত পৃষ্ঠা পুনর্মুদ্রিত করতে হবে, যে-সব পৃষ্ঠায় সরকারের ঊর্ধ্বতন অধস্তন সকল আধিকারিকদের নামের তালিকা মুদ্রিত আছে (কেবলমাত্র একটি নাম অবশ্য বাদ দিতে হবে—গভর্ণর জেনারেলের নাম। তিনি আফগানদের মধ্যে বহু 'বল' নিক্ষেপ করার পর অধুনা বন্দিত্ব-মুক্ত মহিলা ও তাঁদের সাহসিক স্বামীদের সম্মানে 'বল' দিতে ব্যাপৃত আছেন), আর আছে সুপ্রীম কোর্ট-এর সমস্ত জজ, অফিসার ও ব্যারিস্টারদের নাম, মহারাণী ও কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত মুখ্য আধিকারিকদের নাম, শহরের বণিক-সমাজের সকল মুখপাত্রদের নাম, অসংখ্য য়ুরোপীয় মহিলাদের নাম এবং রাজা ও বাবু ইত্যাদিদের নাম। এই সমস্ত নামের তালিকা দিতে গেলে আমাদের কাগজের পরিধি ও পাঠকদের ধৈর্যের পরিধি লঙ্ঘন করতে হবে। অবশ্য নিমন্ত্রিতবর্গের কেউ কেউ নামের তালিকায় তাঁদের নাম, পদমর্যাদা, পোশাকপরিচ্ছদ, বস্ত্রালংকার প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দেখলে হয়তো খুশি হতেন। তা যখন সম্ভবপর হচ্ছে না, সকলের সন্তোষ সাধনের জন্য আমরা এইটুকুই বলব যে, মঙ্গলবারের রাত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া ভিলায় যে সমাবেশ দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল, সংখ্যায় ও চমৎকারিত্বে তার তুলনীয় কোনো সমাবেশ ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। এই সান্ধ্য-উৎসবের আনন্দে ভাগ নিয়েছিলেন কেবল সুন্দরীরা, খেতাবধারীরা ও বিত্তবানেরা—এমন কথা যদি আমরা বলি তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভিলার ভিতরে ছিলেন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা, কিন্তু ভিলা-সংলগ্ন প্রশস্ত উদ্যান উন্মুক্ত ছিল 'সর্বসাধারণের' জন্য, হাজারে হাজারে ইতর-শ্রেণীর নেটিভরা এসেছিল উৎসবের দর্শক হয়ে। বাগানের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে কেউ কেউ সন্তর্পণে হাঁটছিল, কেউ কেউ আলো-ঝলমল বিলের ধারে ছিল দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ দেখছিল রোমক ধরনে তৈরি মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে বহুবিচিত্র দীপাবলী, কেউ কেউ ভিড় জমিয়েছিল লন-এ আতসবাজির সমারোহ দেখতে। আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি যে ভিলার অভ্যন্তরস্থ আমোদ প্রমোদের চেয়ে ভিলার বাইরেকার এই জনতা আমাদের মনে অধিকতর আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

বাবুর রবাহূত এই অতিথিবৃন্দের আহ্লাদ দেখে মনে হল বাবুর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের তুলনায় এরা কম আনন্দিত হয়নি এ-উৎসব দেখে। এদের মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়ে, এদের চালচলন দেখে খুবই বিস্মিত হলাম—কোনো আতিশয্য নেই, উত্তেজনা নেই, শান্ত, সংযত, সুন্দর শৃঙ্খলাবোধ। মাঝে মাঝে তাদের হর্ষধ্বনির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, তা না হলে বুঝতেই পারা যাচ্ছিল না বাইরে হাজারো লোকের ভিড়! সবাই এসেছিল শাদা ধুতিচাদর পরে, মাথায় শাদা পাগড়ি দেখে মনে পড়ছিল খ্রীস্টানদের শেষ বিচারের দিনের কথা—ছবিতে দেখেছি প্রয়াত আত্মারা শেষ বিচারের দিন এইরকম শাদা পরিচ্ছদে সমাধি থেকে উঠে আসেন।

'বাগান আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল বৃত্তাকারে ভিলাকে কেন্দ্র করে বাগানের পরিধি পর্যন্ত। ভিলার চারিদিকে লন, তারপর ফুলের কেয়ারি, তারপর গোল হয়ে বাগান ঘিরে আছে ঝিল, চারিদিকে চারটি সাঁকো, ভিলার সামনের সাঁকো পেরিয়ে গ্রীষ্মাবাস—সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবীত্রয়ের মন্দিরের আকারে পরিকল্পিত। অন্যান্য সাঁকোর মুখে প্রাচীন রোমক ধরনের মন্দির। ঝিলের এপার ওপার, সাঁকো ও মন্দির সব কিছু দীপান্বিত হয়েছিল বলে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। ভিলার সামনের বারান্দার ঠিক মুখোমুখি, আতসবাজির জন্য সংরক্ষিত লন-এর পিছনে দীপ্যমান অক্ষরে রাজভক্তির নিদর্শন হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে জ্বলছিল, God save the Queen। বাগানের অন্যত্র ছিল আলোর অক্ষরে লেখা মিসেস বার্ড-এর নামের আদ্যাক্ষর H. B.। যতদূর দৃষ্টি যায়, বাগানের সীমা পর্যন্ত তরুশ্রেণী ও কৃত্রিম টিলাগুলিও আলো দিয়ে আলোময় করা হয়েছিল। গাড়ি চলাচলের রাস্তা ও পদচারণার পথগুলিতে এত আলো দেওয়া হয়েছিল—রাতকে দিন করার মতো। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পরীস্থানে এসেছি। মিসেস বার্ড পৌঁছবামাত্র আতসবাজির খেলা শুরু হয়ে গেল—সে যে কত প্রকারের, কত ছাঁদের, কত রঙের বাজি—সে আর কী বলব। বেশ কয়েকটা বাজি দেখা গেল যা কেবল এই দেশেই দেখা যায়। আতসবাজির খেলা যখন শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হল, হঠাৎ দেখা গেল বাগানের শেষ প্রান্তে এক সারি আলোর গাছ, ডালপালা, ফুল পাতা সব আলো দিয়ে তৈরি। সে এক চমকপ্রদ খেলা!

'আতসবাজির পর আরম্ভ হল নাচ—কোয়াড্রিল ও ওয়লৎস—চলল ভোর রাত তিনটে পর্যন্ত। নৈশভোজনের কক্ষে কক্ষে রক্ষিত ছিল এ-দেশে যা-কিছু সংগ্রহ করা যায় সেইরকম ভোজ্য ও পেয়। অতিথিসমাবেশ প্রচুর হলেও খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যে কোনো টান পড়েনি। বাবু পরিধান করেছিলেন চৌকো ছক-কাটা একটি কালো মখমলের জামা, গলায় ধারণ করেছিলেন একটি মোটা সোনার চেন, তাতে লকেটের মতো ঝুলছিল মহারাণীর উপহৃত স্বর্ণপদক।

'আমাদের এই নিতান্ত অসম্পূর্ণ সংবাদ শেষ করার আগে একটি আন্তরিক বাসনা প্রকাশ না করে পারছি না ঃ হৃদয়মনের বিবিধ গুণের অধিকারী হয়ে দ্বারকানাথ

সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন, দীর্ঘজীবী হযে তিনি যেন দীর্ঘকাল সেই শ্রদ্ধা উপভোগ করেন এবং তাঁব অর্থবিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যেন স্বদেশের হিতসাধনে উৎসর্গ করে যেতে পারেন। সর্বশেষ একটি কথা যোগ করা উচিত ঃ অতিথিদের নিবাপত্তা ও সুবিধার খাতিরে দ্বারকানাথ শ্যামবাজারেব মোড় থেকে তাঁর ভিলা পর্যন্ত সাবাটা পথ আলোকিত করেছিলেন।'

দ্বারকানাথ গলায যে 'একটি মোটা সোনাব চেন' ধাবণ করেছিলেন, যাতে 'লকেটের মতো ঝুলছিল মহারাণীর উপহৃত স্বর্ণপদক'—সেই সোনার চেন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন চীনদেশবাসী ইংরেজ বন্ধু ল্যান্সলট ডেন্ট। স্কটল্যাণ্ড ও বিলেতেব উত্তবাঞ্চল সফরের পর লণ্ডনে ফিরে এসে এই উপহাব পান। মনে হয সে সময কয়েকটা দিন সেন্ট জর্জেস হোটেলে না থেকে তিনি উঠেছিলেন সেন্ট জেমস স্কোয়ার-এব ফেনটনস হোটেলে। ১৮৪২ অব্দের ১৫ অক্টোবর তাবিখে ল্যান্সলট ডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি যে-চিঠি লেখেন[৮] তার শিরোনামায় ফেনটনস হোটেলেরই নাম ছিল ঃ

'আমায় এই চেন পাঠাতে গেলে কেন তা আর বুঝতে বাকি বইল না। তুমি তো চীন দেশের মানুষ, স্বর্ণপদকের সঙ্গে তোমার এই উপহাব যুক্ত করে তুমি খোলাখুলিভাবে চাও দিবা রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটেনের মহামান্যা মহা-দেবীকে বাঁধতে, সবচেয়ে শক্ত অথচ সবচেয়ে পবিত্র বন্ধনে। তাই তোমার কুঠিতে তৈরি খাঁটি সোনাব এই শিকলটি দিয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট করতে চাও তোমাব মহারাণীর মূর্তি ও লেখনকে।

'আমি আর কী বলতে পারি, বলো! কেবল এই কথাটাই বলতে পারি, যদি প্রমীলা-শাসনেই আমাদের থাকতে হয় তবে এঁর চেয়ে বেশি ভালো শাসক কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। আর ইনি আমার প্রতি যেমন আচরণ করেন সকলের প্রতি এঁর আচরণ যদি তেমন হয়, ত' হলে ইনি জগদীশ্বরী হন—এই কামনা করি।

'আমার অন্তবে যেমন অনুভব হওয়া উচিত সেই সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তোমার এই মহামূল্য দান গ্রহণ করলাম—যদিচ আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য এইরকম একটি স্বর্ণরজ্জুর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই উপহারের সূত্রে তোমার একটা সঙ্গসৌভাগ্য লাভ হবে। অতঃপব তোমার কথা না মনে কবে মহারাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। যখনই বাজভক্তি আমার মুখ দিয়ে বলাবে, 'মহারাণী দীর্ঘজীবী হোন', সেই সঙ্গে আমি যুক্ত কবতে বাধ্য হব ঃ 'এবং ল্যান্সলট ডেন্ট'।

'তোমার আয়ু যেন তোমার চেন-এর চেয়ে দশগুণ দীর্ঘ হয়, তোমার আনন্দ যেন হয় সোনার সম্পদ—এই হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের একান্ত কামনা।'

তাদের নিজেদের দেশে ব্রিটিশ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখে আসার পর দ্বারকানাথ পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে শিক্ষার উন্নতি না হলে জাতির উন্নতি হয় না এবং সমাজে

পুরুষের যে স্থান, নারীর স্থান তার চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন হওয়া উচিত নয়। তাঁর বন্ধুস্থানীয় লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন। নূতন গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসেছেন লর্ড এলেনবরা, দেশের অভ্যন্তরীণ বিকাশ বা প্রগতির পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না, তিনি তখন আফগান অভিযান নিয়ে মত্ত। দ্বারকানাথ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর শিক্ষা-বিষয়ক কার্যসূচী রূপায়িত করার কাজে গভর্ণর জেনারেলের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেন। সরাসরি তাঁর দ্বারস্থ না হয়ে চেষ্টা করেছিলেন বিলেতে তাঁর নবলব্ধ বন্ধু লর্ড ব্রুহাম মারফত। দ্বারকানাথ ব্রুহাম-কে লিখলেন যে শিক্ষা বিষয়ে বেণ্টিঙ্ক ও অকল্যাণ্ড যে-নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের স্কুলসমূহ 'দেশের অসামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কোম্পানীর শাসন বিভাগের নিম্নতর স্তরে বেশ কয়েকজন সুদক্ষ কর্মণিককে পাঠাতে সমর্থ হয়েছে। এরাই হল সরকারের কার্যসিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ও হাতিয়ার।' এলেনবরা ব্রুহাম-এর ওকালতিতে কান না দিয়ে বললেন—বাঙালী 'ভদ্রলোক' সমাজে ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্তন করতে যাওয় মারাত্মক ভুল হয়েছে, বরঞ্চ উনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে কেবল ভারতের অভিজাতশ্রেণীর ছেলেরাই শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। ভূম্যধিকারী ও বণিকরূপে নিজে একজন ধনকুবের হলেও, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে দ্বারকানাথের আস্থা ছিল প্রবল এবং সেই সমাজের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর মমতা ছিল গভীর। ইতিপূর্বে ব্রুহাম-কে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন বাংলা দেশের যুবসম্প্রদায় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশব্রতীর দলে নিজেদের এমনভাবে সংগঠিত করতে পারে যাতে তারা রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং সে-অধিকার কায়েম রাখতে পারে।' বেশ কয়েক দশক বাদে দ্বারকানাথের প্রখ্যাত পৌত্র পিতামহের কথার পুনরুক্তি করে দেশের যুবসমাজকে আহ্বান করেছিলেন দেশহিতের কাজে।

সেকালে মেয়েদের স্কুল ছিল না বললেই হয়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোনো তাগিদও ছিল না। কারণ রক্ষণশীল পরিবারের মা-বাপেরা, হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে, তাঁদের মেয়েদের বাড়ির বাইরে স্কুলে পাঠাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। খুব অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত—মনে করা হত মাতৃভাষায় সামান্য একটু লিখতে পড়তে পারাটাই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট। দ্বারকানাথ তাঁর গুরুস্থানীয় রামমোহনের মতো ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন নূতন যুগের চাবিকাঠি আছে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে। দ্বারকানাথ নিজ ব্যয়ে শিক্ষণ-শিক্ষিত য়ুরোপীয় মহিলাদের তত্ত্বাবধানে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশে উপযুক্ত মহিলা শিক্ষিকা সন্ধান করার জন্য তিনি আর্চবিশপ ক্যারু-র শরণাপন্ন হন। আর্চবিশপ পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কী কারণে যেন দ্বারকানাথের সাধু প্রচেষ্টা সফল

হয়নি। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে দ্বারকানাথের আগ্রহ নিশ্চয় বহুবিদিত ছিল। দেখা যায়, তাঁর পরলোকগমনের পর কলকাতায় যে স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে রেভারেণ্ড ডঃ ন্যাশ, 'স্ত্রীশিক্ষার উপকার ও উপযোগিতা বিষয়ে উপস্থিত দেশীয়দের অবহিত করে বলেন তাঁরা যেন কার্যত হিন্দু স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহ দান করেন দ্বারকানাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে।'[১০] প্রায় চার বছর পরে, ১৮৫০ অব্দের ৮ই জুন তারিখে **বেঙ্গল হরকরা** একজন ইংরেজ মহিলার স্মৃতিকথা থেকে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার বিষয়ে দ্বারকানাথের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। দ্বারকানাথ মহিলাটিকে বলেছিলেন ঃ 'শিক্ষা থেকে আমার দেশীয় মেয়েরা আনন্দ লাভ করবেন, সে সুদিন আসতে এখনো অনেক দেরি। হিন্দুদের মধ্যে এমন মানুষ কেউ যদি থাকেন যিনি সাহস-ভরে স্ত্রী-কন্যাদের ঘরের বাইরে এনে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত, তবে তেমন মানুষকে আমি কিছু ইনাম দিতে রাজি।' দুর্ভাগ্য এই যে তাঁর এই সৎসাহসের প্রমাণ দেবার মতো তাঁর কোনো মেয়ে ছিল না (প্রথমজাত কন্যাসন্তানটি শৈশবেই মারা যায়। কিন্তু গুজবের মুখ চাপা দেবে কে? একটা সময়ে কু-লোকে রটনা করেছিল দ্বারকানাথ তাঁর কন্যাটিকে নাকি পীর আলি নামক কোনো মুসলমানের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। এ-গুজব নিশ্চয় সেই তথাকথিত কুলকলঙ্কের জের।) কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্বারকানাথ যদি বেঁচে থাকতেন এবং দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরের পর স্বদেশে ফিরে আসতে পারতেন, তাহলে অকুতোভয়ে এবং মুক্তহস্তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক শুভ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করার জন্য বুনিয়াদ রচনা করে দিতে পারতেন।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে দ্বারকানাথের বিশেষ অনুরোধে জর্জ টমসন তাঁর সঙ্গে ভারতে আসতে রাজী হয়েছিলেন। ১৮৪২ অব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সেই খবর দিতে গিয়ে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** লিখেছিলেন ঃ 'মিঃ জর্জ টমসন এ-যুগের অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার জোরে তিনি ব্রিটিশ-শাসিত সকল উপনিবেশ থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করে, সম্প্রতি এ-দেশে এসেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর আসার ফলে ভারতের মঙ্গল সাধিত হবে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস। দ্বারকানাথের সহজাত প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদাশয়তার গুণ। তাঁর গভীর সহানুভূতি সদাসর্বদা ধাবিত হয় তাদের প্রতি যারা দীন, হীন, অবহেলিত ও পরিত্যক্ত।'

ভারতে এই চরমপন্থী লড়াকু লোকটির আগমন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অনেকে সুনজরে দেখেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গল-এর উপর এমন লোকের প্রভাব বিপজ্জনক হতে পারে। **ক্যালকাটা স্টার** কাগজের সম্পাদক জেমস হিউম-এর মতো বেশ কিছু লোক ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, দ্বারকানাথের মতো ধীর স্থির বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কী করে এমন উগ্রপন্থীকে বরদাস্ত করতে পারলেন, কেমন

করেই বা সেই ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতার পর টমসন-এর মতো লোক দ্বারকানাথকে বরদাস্ত করলেন।[১১] তাঁরা জানতেন না কী বিচিত্রমনা মানুষ ছিলেন এই দ্বারকানাথ—কীরকম নমনীয় ছিল তাঁর মানসপ্রকৃতি, কত প্রশস্ত ছিল তাঁর হৃদয়, স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁর মমতা ছিল কত গভীর। ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতায় তাঁর রাজভক্তির উচ্ছ্বাস অথবা রাজরাজন্যদের সঙ্গে দহরম-মহরম সত্ত্বেও জর্জ টমসন-এর মতো চরমপন্থী ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনে দ্বারকানাথকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। উল্টে বরঞ্চ বলা যায়, টমসন ছিলেন তাঁর একজন গুণগ্রাহী ভক্ত। ভারতে আসার প্রাক্কালে এডিনবরা শহরে টমসন-এর সম্মানে যে বিদায় ভোজের আয়োজন করা হয় সেই ভোজসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে টমসন শত মুখে দ্বারকানাথের চারিত্রিক গুণাবলী ও জনসেবার প্রশংসা করেছিলেন।[১২]

ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে ভারত যাতে সুবিচার পায় সে বিষয়ে টমসন অনেকদিন থেকেই বলে আসছিলেন। ১৮৩৮ অব্দের নভেম্বর মাসে গ্লাসগো শহরে আদিবাসী সংরক্ষণ সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ 'প্রায়ই শোনা যায় আয়ারল্যাণ্ড ও আইরিশ আদিবাসীদের প্রতি সুবিচার হওয়া উচিত।...আয়ারল্যাণ্ড ও ভারত যেন সৃষ্টিই হয়েছিল ইংলণ্ডের স্বার্থে—যাতে অত্যাচারী ইংরেজ শাসক দুই দেশের আদিম-বাসীদের উপর যথেচ্ছাচারিতা করে তাদের লুণ্ঠন শোষণ করতে পারে।...আজ যদি আমরা সমস্বরে দাবি করে বলি যে আয়ারল্যাণ্ড ও তার ৭০ লক্ষ আদিম-বাসীদের প্রতি সুবিচার করতে হবে, তাহলে কণ্ঠস্বর আরো অনেকখানি চড়িয়ে দিয়ে দাবি জানাতে হবে যে ভারত ও তার ১০ কোটি আদিবাসীদের প্রতি সুবিচার হওয়া দরকার।'[১৩] টমসনের কলকাতা আগমন খুবই উৎসাহে স্বাগত করেছিলেন এ দেশের চরমপন্থীরা—তাদের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিল কলকাতার ইয়ং বেঙ্গল দল। টমসনের বাগ্মিতায় তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল, প্রতি সপ্তাহে যখন তাঁর বক্তৃতা হত, উৎসাহী শ্রোতার দল আসত ভিড় ক'রে, বহু কাগজে সেসব বক্তৃতার দীর্ঘ রিপোর্ট বের হত। বক্তৃতার ব্যবস্থা করত সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ—সাধারণ জ্ঞানোপার্জনী সমিতি। ডিরোজিয়োর অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন থেকে হয়েছিল এই সমিতির উদ্ভব। সমিতির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এঁরাই ছিলেন বোধশক্তিতে তৎপর ও রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

এইসব বক্তৃতায় টমসন তাঁর ভারতীয় শ্রোতাদের সনির্বন্ধ মিনতি জানিয়ে বলতেন যেন বুদ্ধিমান নাগরিকদের মতো তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকেন। একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ 'ভারতের শাসকেরা বিদেশী, তাদের সচিব ও মন্ত্রণাদাতারা বিদেশী, ভারতের ইতিহাস-রচয়িতারা বিদেশী, এদেশের কুৎসাকারীরা বিদেশী এবং সখেদে বলতে বাধ্য হচ্ছি ভারতের হয়ে ওকালতি করার

ক্ষেত্রেও সেই বিদেশী উকিল ব্যারিস্টারের শরণ নিতে হয়। ভারতীয়দের নিজেদের সমস্যা নিয়ে যখন টাউন হল-এ সভা ডাকা হয়, তখন বক্তৃতা দেবার জন্য ডাকতে হয় বিদেশী বক্তাদের। এ-দেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব কোনো ঘটনা বা মামলার নিষ্পত্তির জন্য যদি ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে সে মামলার দালাল বা এজেন্ট নিযুক্ত করতে হয় কোনো বিদেশীকে।' ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণে একজন ভারতীয় এগিয়ে আসবেন—এটা তাঁর কাছে এত গভীরভাবে কাম্য যে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হয় ভারতীয়রূপে জন্মগ্রহণ করে দেশ ও দেশবাসীর উপকারার্থ তিনি আত্মনিবেদন করতে পারেন, নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ দেশসেবার একটি আদর্শ স্থাপন করতে পারেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি আশা রাখি, বিশ্বাস রাখি, এইরকম একজন দেশভক্ত একদিন এগিয়ে এসে বলবেন—কেবল নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাই না, আমি বেঁচে থাকব আমার দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য।'[১৪]

প্রফেসর এস. আর. মেহরোত্রা বলেন, 'তাঁর প্রদীপ্ত বাগ্মিতা বাংলাদেশের তরুণসমাজকে মুগ্ধ করেছিল। কলকাতায় এরকম বক্তৃতা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি।' **বেঙ্গল হেরল্ড** লিখেছিলেন, 'মিঃ টমসনের বক্তৃতা এ-দেশের লোকের মনে যেমন গভীর রেখাপাত করেছে তেমন ইতিপূর্বে কেউ করেননি।' ভারতে রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর কলকাতা আগমন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যখন বলা হয় যে প্রকৃত প্রস্তাবে 'সেদিনকার বাঙালী টমসনের কাছেই বাস্তব রাজনীতিতে দীক্ষা লাভ করেছিল', সেকথা মিথ্যা নয়। ১৮৪৩ অব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে যখন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির পত্তন হয়, সে প্রতিষ্ঠানের পথ প্রস্তুত করেছিল টমসনের বক্তৃতা।'[১৫]

আসলে কিন্তু রাজনীতিতে ভারতের দীক্ষালাভ হয়েছিল আরো বেশ কিছু কাল আগের থেকে এবং তাতেও দ্বারকানাথের হাত ছিল। ১৮২৩ অব্দে প্রেস আইন জারী হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন রামমোহন রায়। তাঁর মুসাবিদায় একটি স্মারকলিপি (এটি এখন ঐতিহাসিক দলিলরূপে পরিগণিত) পেশ করা হয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট এবং কিং-ইন-কাউন্সিলের কাছে। রামমোহন ছাড়া ওই দরখাস্তে আর যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ দিন আন্দোলন চালিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ও আরো কেউ কেউ। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ অব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। রাজনীতিক শিক্ষার ব্যাপারে ভারতের অগ্রগতি হয়েছিল খুবই মন্থরভাবে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের ধাপে এসেছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ু ছিল ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৪, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সোসাইটি বিশেষ চমকপ্রদ কিছু করতে পারে নি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ধরনে একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা রূপে এই সোসাইটি

যে কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ তুলে ধরেছিল, তা বহুকাল অনুসৃত হয়েছিল পরবর্তী কালে, ভারতের নানা রাজনীতিক সংস্থায়। সেদিক থেকে বিচার করলে এ-দেশের রাজনীতিক ইতিহাসে সোসাইটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৮৬৮ অব্দে কলকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে তাঁর মতে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ছিল 'দেশের স্বাধীনতা সাধনের অগ্রদূত। আইনসংগতভাবে কীভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, নিজেদের পৌরুষে নির্ভরশীল হয়ে কীভাবে দাবীদাওয়া পেশ করতে হয় ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে হয়, এই সমস্ত ব্যাপারে দেশের লোক প্রথম শিক্ষা লাভ করে সোসাইটির কাছ থেকে।'[১৬]

১৮৪২ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথের প্রথমবার বিদেশ যাত্রার পর সোসাইটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ১৮৪৩ অব্দের ২৬ জানুয়ারি তারিখে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** লিখেছিলেন, 'সোসাইটির কার্যকলাপ এমনকি তার অস্তিত্ব বিষয়েও, আমরা গত বারো মাসের বেশি হয়ে গেল কোনো সাড়াশব্দ পাই নি।' জর্জ টমসনকে নিয়ে দ্বারকানাথ যখন দেশে ফিরে এলেন, সোসাইটি আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সোসাইটির নূতন দপ্তর খোলা হয়েছিল এক নম্বর চিৎপুর রোডে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নিজের পদে ফিরে এসে কাজ শুরু করে দিলেন, টমসন কর্মসমিতির সক্রিয় সদস্য হলেন, জন ক্রফার্ড-এর স্থলে তাঁকেই নিযুক্ত করা হল সোসাইটির এজেন্ট রূপে। 'সরকার-প্রস্তাবিত লাখেরাজ সম্পত্তির পুনর্গ্রহণ ও বাংলাদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করার হুমকি—এই দুই ব্যাপারের বিরুদ্ধতা করার জন্যই ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির উদ্ভব হয়েছিল। পুনর্গ্রহণ নীতি কার্যত প্রায় বর্জিত হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম রাখা সম্পর্কে খোলাখুলি নিশ্চিতি দেওয়া হয়। এইভাবে সোসাইটির বিক্ষোভের মুখ্য দুটি কারণ সরকার কর্তৃক সুরাহা করে দেবার ফলে, সোসাইটির অস্তিত্ব বজায় রাখার কারণটাই যেন অপসৃত হয়ে গেল। ১৮৪৩ অব্দে একটি রাজনীতিক সংস্থার উদ্ভব হয়—বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। এই সোসাইটির সদস্যপদ কেবল ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায়—সকল শ্রেণী ও সকল স্বার্থের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা সোসাইটির সকর্মক ও উৎসাহী সভ্যরূপে যোগ দিলেন। এই নূতন সংস্থার উদ্ভবে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির গৌরব স্তিমিত হয়ে পড়ল, সোসাইটির কাজে জমিদারেরা তেমন করে আর গা লাগাতেন না।'[১৭] ফলে অচিরে এই সংস্থা লুপ্ত হল।

১৮৪৩ অব্দের ২৭ এপ্রিল তারিখে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** লিখলেন: 'গত বৃহস্পতিবার বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংগঠিত হল। এই নূতন সংস্থা রাজানুগত্য বিষয়ক যে-প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে মূল প্রস্তাবের বেশ কিছু অদল-বদল হয়েছে। আমরা সবিনয়ে বলব রাজভক্তি-সূচক প্রস্তাবটি একেবারেই অবান্তর, সোসাইটি তাঁদের আনুগত্য

সম্বন্ধে যতই সোচ্চার হবেন ততই সন্দেহ জাগবে তাঁদের আনুগত্য সম্বন্ধে।'

এর কিছুদিন পরেই, ১৮৪৩ অব্দের ১০ মে তারিখে ডেপুটি গভর্ণর ডব্লু. বার্ড একটি জনসমাবেশে কোর্ট অব ডিরেক্টরস কর্তৃক উপহৃত স্বর্ণপদক দিয়ে দ্বারকানাথকে ভূষিত করেন।[১৮] একটি নাতিদীর্ঘ জবাবে দ্বারকানাথ বললেন ঃ 'এ-সম্মান একান্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রাপ্য বলে আমি মনে করতে পারি না...এই সম্মানের মধ্যে দিয়ে দেশের শাসকেরা আমার মারফত ভারতের জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতে চান যে এ-দেশের সুখসমৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি শাসকদের কাছে বিশেষভাবে কাম্য।' তিনি বিজ্ঞ মানুষ, ওদেশে থাকতে তিনি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, দেশে ফিরে এখন তিনি সংযতবাক।

বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের প্রথম দিকে তিনি দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরে বেরোবেন ভাবছেন—এ-যাত্রায় দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাকা তাঁর ইচ্ছা। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিবারবর্গের, বিরাট ভূসম্পত্তির এবং বহুবিস্তীর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা কী করে সম্ভবপর হতে পারে, তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে দিদিমা অলকাসুন্দরীর গঙ্গাযাত্রার পর এক গভীর অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, উপনিষদের বেদান্ত দর্শনে তিনি এক নূতন ধর্মবিশ্বাসের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তত্ত্ববোধিনীসভা স্থাপন করে তিনি তাঁর নবলব্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রচারে আগ্রহী এবং সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি সমাজে নূতন প্রাণসঞ্চার নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যাপৃত। জ্যেষ্ঠপুত্রের এরূপ আচার-আচরণ দেখে পিতার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে? মনে হয় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল উভচরী। অপরাপর আলালের ঘরের দুলালের মত পুত্র যে বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয় নি, উচ্ছন্নে যায় নি, বরঞ্চ দুরূহ তত্ত্বকথা নিয়ে গভীর আলাপ আলোচনা করে ও উচ্চ আদর্শ পোষণ করে—এতে পিতার সন্তুষ্ট বোধ করার কথা। পুত্রকে নিয়ে গর্ববোধ করারও একটি সংগত কারণ ছিল ঃ দ্বারকানাথের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও দিশারী রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উত্তরাধিকার জীইয়ে রাখার দায়িত্ব দ্বারকানাথই একা হাতে গ্রহণ করেছিলেন। পুত্র সমাজের মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করে রামমোহনের প্রারব্ধ সম্পূর্ণ করার ব্রত গ্রহণ করেছে দেখে নিশ্চয় গর্বিত বোধ করে থাকবেন। দ্বারকানাথ সমাজকে ধর্মায়তনরূপে কখনো দেখেননি, দেখেছিলেন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতিরোধী প্রতীক-রূপে রামমোহনের উত্তরাধিকার রূপে। এককালে তিনি যে-নীতির সক্রিয় সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন, পুত্রের মধ্যে সেই উদ্দীপনার প্রতিফলন দেখে তিনি নিশ্চয় আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকবেন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে পুত্রের উৎসাহ যেমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল—তাতে তিনি খুব বেশি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি নিশ্চয়। মূলতঃ দ্বারকানাথের মনের গঠন ছিল ইহলৌকিক—আধ্যাত্মিকতার বহিরঙ্গ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অপর পক্ষে পুত্রের কাছে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিই ছিল নব-আবিষ্কৃত

সত্যের রূপ। পিতার পক্ষে তাই ধর্মসাধনায় পুত্রের তুঙ্গীভাব অনধিগম্য বলে মনে হয়ে থাকবে।

রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকার সংরক্ষণে পুত্রের যে-পরিমাণ অভীপ্সা ছিল, দ্বারকানাথ নিশ্চয় মনে মনে গভীরভাবে চেয়েছিলেন যে পিতার উত্তরাধিকার সংরক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ অনুরূপ উৎসাহ দেখান। কিন্তু স্বভাবতই তিনি বিজ্ঞ ও বাস্তববাদী ছিলেন বলে বুঝেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সে-যোগ্যতা ছিল না, কাজে কারবারে তাঁর মাথা খেলত না এবং তাতে তাঁর তেমন উৎসাহও ছিল না। মেজো ছেলে গিরীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবেন বলে তাঁর মনে হয়নি, আর তৃতীয় ও সর্বকনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ তো তখনো প্রায় নাবালক ও অপরিণত বুদ্ধি। পুত্রেরা ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে সমর্থ হবে কি না—সে বিষয়ে খানিকটা অনিশ্চিত হলেও তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হবার পাত্র ছিলেন না। খানিকটা এইরকম দোনামনা ভাব নিয়ে ১৮৪৩ অব্দের ১৬ আগস্ট তিনি একটি উইল সম্পাদন করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রথম বিলাত সফরে বেরোবার আগে তিনি তাঁর ভূসম্পত্তির ব্যাপারে একটি ট্রাস্ট-ডীড সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন ১৮৪০ অব্দের আগস্টেই।[১১] উইলে বলা হয় দেবেন্দ্রনাথ যদি তেমন ইচ্ছা করেন পিতার বিয়োগের পর কার-টেগোর এণ্ড কোম্পানীতে দ্বারকানাথের পুরো শেয়ার নিতে পারেন, অন্যথায় গিরীন্দ্রনাথ এবং তিনিও যদি অনিচ্ছুক হন তাহলে তৃতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথ। উইলে পুনরুক্তি করে বলা হয়, পূর্বতন ট্রাস্ট-ডীড অনুযায়ী চারটি জমিদারি-এস্টেট পুত্র-পৌত্রদের ভোগদখলের জন্য ট্রাস্টীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। যদি কার-টেগোর কোম্পানীতে পুত্রদের কেউ অংশীদাররূপে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হন এবং কোম্পানীতে দ্বারকানাথ যে লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন তা তুলে নিতে চান, তাঁরা কিস্তিতে কিস্তিতে এমনভাবে আদায় নেবেন যাতে করে বাজারে কোম্পানীর সুনামের কোনো হানি না হয় এবং ব্যবসায়িক নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে। এই শর্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, কার-টেগোর কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল গভীর। জোড়াসাঁকোর গৃহসম্পত্তি জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করার কথা ছিল উইলে—বৃহত্তর বসতবাটীরূপে পৈতৃক ভদ্রাসনের অধিকারী হবেন দেবেন্দ্রনাথ এবং জমকালো বৈঠকখানাবাড়ি পড়বে গিরীন্দ্রনাথের অংশে। কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথের জন্য কিছু নগদ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল যাতে তিনি যদি ইচ্ছা করেন নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা বসতবাটী নির্মাণ করিয়ে নিতে পারেন। পরিবারের অপর সকলের জন্য উইলে যথাযথ বরাদ্দ করা হয়েছিল। লক্ষ টাকার একটি এককালীন দান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির নামে। উইলের তাবৎ শর্তাদি কার্যকর করার জন্য এক্সিকিউটর রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ডি. এম. গর্ডন ও তিন জন পুত্র।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দ্বারকানাথ বায়ু-

পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সফরে বের হন। ১৮৪৩ অব্দের ৫ আগস্ট তারিখে **বেঙ্গল হেরল্ড** ঘোষণা করেন, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলাত সফরে বেরোবার আগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানা গেল। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই স্টিমার যোগে এলাহাবাদ অভিমুখে তাঁর বেরিয়ে পড়বার কথা। সেখান থেকে ডাকের গাড়ি ধরে তিনি যাবেন আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি শহরে।' মনে হয়, জর্জ টমসনকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই সফর উপলক্ষে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করার অন্যতম কারণ ছিল ওই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ইংরেজ বন্ধুর পরিচয় সাধন এবং দিল্লীতে মোগল বাদশাহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। ইতিপূর্বে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** তাঁদের ১৮৪৩ অব্দের ৮ জুন সংখ্যায় সাপ্তাহিক ঘটনার নির্ঘণ্ট অংশে জানিয়েছিলেন ঃ 'গতকাল **স্টার** খবর দিয়েছেন (কিছুদিন আগেই খবরটা এসেছিল আমাদের হাতে) মিঃ জর্জ টমসন দিল্লীশ্বরের দূত হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে মোগল বাদশাহের অনুযোগ অভিযোগ পেশ করবেন। **স্টার** বলেন, এজন্য পারিশ্রমিক ধার্য হয়েছে মাসিক এক হাজার টাকা এবং কলকাতা থেকে দিল্লী ও দিল্লী থেকে লণ্ডন রাহাখরচ বাবদ তিন হাজার টাকা। আমরা শুনেছিলাম দক্ষিণার অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছিল সর্বমোট বারো হাজার টাকায়। আমরা আশা করি বাদশাহের মুখের কথার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য জামিনদার যাতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে মিঃ টমসন পূর্ব থেকেই সাবধান হবেন। তৈমুরের এই বংশধর একদা রাজা রামমোহন রায়কেও এই প্রকার দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করেছিলেন একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দানের বিধিসম্মত অঙ্গীকার ক'রে। রাজা রামমোহনের পুত্র দীর্ঘকাল ধরে বাদশাহের দরবারে পিতার প্রাপ্যটুকু আদায়ের জন্য আবেদন নিবেদন করে বিফলমনোরথ হয়েছেন। আমাদের জ্ঞাতমতন সে-টাকা আজো আদায় করা যায়নি।'

ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ দিল্লী গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে ১৮৪৩ অব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখের **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** লিখেছিলেন ঃ 'পয়লা তারিখে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিল্লী এসে পৌঁছেছেন এবং শহরের দ্রষ্টব্য দেখায় ব্যস্ত আছেন।' **বেঙ্গল হরকরা** তাঁদের রিপোর্টে জানালেন ঃ 'দিল্লী-সম্রাট তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন, তিনি সম্রাটের অতিথি হয়ে অবস্থান করছেন বেগমের প্রাসাদে। গুজব শোনা যাচ্ছে, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর হবেন দিল্লীশ্বরের রাজদূত ও মিঃ টমসন হবেন তাঁর সেক্রেটারি এবং অচিরেই বাবু বিলাত রওনা হয়ে যাবেন।' কিন্তু আখেরে দেখা গেল গুজব গুজবই।

জলপথে ও স্থলপথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই লম্বা সফরের ফলে দ্বারকানাথের শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদের মধ্যে সরকার পরিচালিত স্টিমবোট সার্ভিস একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না বলে, তিনি মনে মনে স্থির করলেন

ওই জলপথে তিনি সরকারের পাশাপাশি একটা সার্ভিস চালু করবেন। এইভাবে জন্ম হয় এক নূতন কোম্পানীর—ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী। ব্লেয়র ক্লিং বলেছেন ঃ 'শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল কোল কোম্পানী[১০] ও আসাম টী কোম্পানীর মতো ইণ্ডিয়া জেনারেল দ্বারকানাথের অধিকতর সার্থক উদ্যোগের অন্যতম হয়ে পরম্পরাগত কোনো কোম্পানীর অধীনে আজও টিকে আছে।'[১১] এতেও তাঁর যেন তৃপ্তি ছিল না, এবার তিনি পথিকৃৎ-রূপে এমন এক উদ্যোগের সূত্রপাত করতে চাইলেন যা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে নয়, ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নূতন রাস্তা খুলে দিতে পারবে। বিলাতে ও য়ুরোপে রেলপথে চলাচলের অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখবার পর থেকে দ্বারকানাথের সুদূরপ্রসারী কল্পনা যেন পক্ষ-বিস্তার করেছিল। তাঁর নিজের দেশেও চলাচলের এই অধুনাতন ব্যবস্থা করতে হবে—এই ভেবে তিনি গ্রেট ওয়েস্টার্ণ অব বেঙ্গল নাম দিয়ে একটি রেল কোম্পানী পত্তন করার সমগ্র পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। 'রেল চলাচল ব্যবস্থা ভারতে ঠিক শুরু হবার মুখেই তাঁর মৃত্যু হয়। রেলপথেব যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মূলধন বিনিয়োগের রাস্তা খুলে যায় দিকে দিকে। দ্বারকানাথ সেই বহু-প্রতিশ্রুত স্বপ্নরাজ্যের আভাসমাত্র দেখতে পেয়েছিলেন দূর থেকে, সে-রাজ্যে প্রবেশলাভ করতে পারেন নি।'[১২]

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল দ্বিতীয়বার বিলেত সফরে বের হবেন ১৮৪৩ অব্দের শেষ দিকে কিংবা ১৮৪৪ অব্দের গোড়ায়। কিন্তু এই সব নূতন উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি নিয়ে তাঁকে বড়ই ব্যস্তবিব্রত থাকতে হল, উপরন্তু স্বাস্থ্যও বাদ সাধল। পৌনঃপুনিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হত। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন ১৮৪৫ অব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে তিনি রওনা হয়ে যাবেন; তাঁর ভয় ছিল আগতপ্রায় গ্রীষ্মের আধিক্য তাঁর দুর্বল শরীরে বরদাস্ত হবে না।

ইতিমধ্যে দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অলবার্ট তাঁদের যে-দুটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি কলকাতা শহরকে উপহারস্বরূপ দেবেন বলেছিলেন, সেই দুটি ছবি এসে পৌঁছল। মহামান্যা মহারাণীর আদেশক্রমে লিখিত সরকারী চিঠি এল ১৮৪৪ অব্দের শেষ দিকে ঃ 'ইতিপূর্বে আপনাকে জানানো হয়েছে যে আপনার অনুরোধক্রমে কলকাতা নগরীর জন্য যে-দুটি রাজকীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত করানো হয়েছিল, সেগুলি ভারত অভিমুখে ইতিমধ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চিঠিতে আপনাকে জানাতে চাই যে মহারাণী আদেশ দিয়েছেন যথাসত্বর তাঁর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়ে আপনাকে পাঠাতে হবে—এটি থাকবে আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে, মহামান্যা মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহের প্রতীকস্বরূপ।'[১৩]

১৮৪৫ অব্দের ১ মার্চ তারিখে শনিবার বিকেলবেলা টাউন হল-এ কলকাতা নাগরিকদের একটি সভায় স্থির হয় 'মহামান্যা মহারাণীকে দুটি চমৎকার প্রতিকৃতির জন্য মানপত্র দেওয়া হবে।' **বেঙ্গল হরকরা**-র সান্ধ্য ক্রোড়পত্রে এ-সম্পর্কে যে

রিপোর্ট বের হয় তাতে বলা হয়, 'সকল প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—একটি প্রস্তাবে সংগত কারণেই স্থির হয় আমাদের শ্রদ্ধেয় সম-নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানানো হোক যেহেতু এ-দুটি চমৎকার শিল্প নিদর্শন কলকাতার জন্য তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছেন।'[২৪] এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে সমবেত নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বারকানাথ বলেন যে 'তিনি যতটুকু যা করেছেন, কর্তব্যবোধেই করেছেন। তিনি পুনরায় বিলেত যাচ্ছেন কেবল সুদূরবর্তী দেশ দেখার আনন্দ লাভের জন্য, কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বন্ধুদের নিশ্চিতি দিয়ে বলেন, এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে দেশবাসী অনেকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁর মতের মিল হয় না—কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলতে চান যে ভাগ্য তাঁকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, তিনি তাঁর নিজের ও অন্য সকলের এই যে বিরাট দেশ—তার স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি কখনও অমনোযোগী হবেন না, পরন্তু তাঁর নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব দেশের স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনে সর্বদা যত্নবান থাকবেন।'[২৫]

বছরের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ যখন বিলেত যাবার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত-ব্যাপৃত তখনো তাঁর মন অধিকার করে ছিল দেশের শিক্ষা সমস্যা। তাই দেখা যায় ওই সময়েই তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনকে একটি চিঠি লিখে জানালেন যদি মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে চান, তবে তাঁদের যাতায়াত ব্যয় এবং লণ্ডনে থেকে শিক্ষার সমস্ত ব্যয় তিনি স্বয়ং বহন করতে প্রস্তুত আছেন। কাউন্সিল সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ভোলানাথ বসু ও সূর্যকুমার চক্রবর্তীকে নির্বাচন করেন[২৬] বিলেতে পাঠাবার জন্য। সরকার থেকে স্থির হয় আরও একজন ছাত্রকে পাঠানো হবে সরকারী খরচে।[২৭] চতুর্থ একজন ছাত্রকে বৃত্তি দেবার জন্য চাঁদা তোলা হয়েছিল জনসাধারণের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত চারজন মেডিকেল ছাত্র দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলেত পাড়ি দেন—শেষ দুজনের নাম দ্বারকানাথ দাস বসু ও গোপালচন্দ্র শীল। এঁদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য সঙ্গে গিয়েছিলেন এঁদের শিক্ষক, ডাঃ এইচ. এইচ. গুডিভ।

## টীকা

১. *Letters to Friends at Home* (from June 1842 to May 1843). By An Idler. Published by Star Press, Calcutta.
২. *Partner in Empire*, by Blair B. Kling. pp. 179-180.
৩. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুজন ডিরেক্টরদের মধ্যে যাঁকে এই চিঠি লেখা হয়েছিল।
৪. *Bengal Hurkaru*, 17 March 1843.
৫. অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল জন এডামস-এর বিরক্তিভাজন হবার ফলে *Calcutta Journal*-এর বহুগুণ-সম্পন্ন ও নির্ভীক সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহম ভারতে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৬. *Our Family Correspondence—1835-37.* রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগার, শান্তিনিকেতন।

৭. *Partner in Empire* by Blair B. Kling. p. 179. ক্রহাম পরিবারের নথীপত্র থেকে উদ্ধৃত।

৮. তদেব, পৃ. ১৭৯।

৯. তদেব, পৃ. ১৭৯।

১০. *Bengal Hurkaru,* 3 December, 1846.

১১. *Letters to Friends at Home :* by An Idler.

১২. *Bengal Hurkaru,* 20 January, 1843. *The Scotsman,* 26 October, 1842.

১৩. *Friend of India,* 9 May 1839. *Glasgow Argus.* 19 November, 1838 *Glasgow Saturday Post,* 24 November, 1838 থেকে উদ্ধৃতি।

১৪. *The Emergence of the Indian National Congress.* by S. R. Mehrotra Vikas Publications, Delhi, 1971.

১৫. তদেব।

১৬ তদেব।

১৭ তদেব।

১৮ মহারাণী প্রদত্ত ও ডিরেক্টরদের প্রদত্ত দুটি স্বর্ণপদকই রক্ষিত আছে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল-এ।

১৯. দ্বারকানাথের জীবনে আগস্ট মাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মাস। পৌত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনেও। কার-টেগোর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় আগস্ট মাসে, ট্রাস্ট ডীড সম্পাদিত হয় আগস্ট মাসে, উইল সম্পাদনা হয় আগস্ট মাসে। তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল আগস্ট মাসে। আগস্ট কি তাঁর জন্মমাস? তাঁর কোন্ দিন বা কোন্ মাসে জন্ম হয়েছিল জানা যায় না—আগস্ট হলেও হতে পারে।

২০ ডীনস ক্যামবেল-এর সহযোগে বেঙ্গল কোল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই কয়লা কোম্পানীর কাজ খুব ভালো চলেছিল। ১৯০৮ অব্দে এনড্রু ইয়ুল এণ্ড কোম্পানী এর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হন।

২১. *Partner in Empire,* by Blair B. Kling, p. 194 এ-বইয়ে এই তিন কোম্পানীর অদৃষ্টে কী ঘটেছিল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে।

২২. তদেব, পৃ. ১৯৪।

২৩. প্রতিকৃতি দুটি এখন আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল-এ।

২৪. *Memoir,* p. 108.

২৫. *Bengal Hurkaru,* Weekly Supplementary Sheet, 1 March 1845. সম্পাদকীয় মন্তব্য।

২৬. বিভিন্ন কাগজে এই নাম ভিন্ন ভিন্ন বানানে ছাপানো হয়েছিল।

২৭. কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়, ডাঃ এইচ. এইচ. গুডিভ একজন ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করবেন বলেছিলেন। ডঃ গুডিভ পুরো খরচ বহন করেছিলেন না অংশত এবং বাকি টাকা সরকার থেকে কিংবা জনসাধারণের চাঁদা থেকে দেওয়া হয়েছিল—সে বিষয়ে পরিষ্কার জানা যায় না। এই ছাত্রটি সম্ভবত সূর্যকুমার চক্রবর্তী। ইনি ছিলেন ডাঃ গুডিভ-এর প্রিয় ছাত্র এবং মেডিকেল কলেজে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। বিলেত যাবার আগেই তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিলেতে থাকতে একজন ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্রের *Memoir* গ্রন্থের বাংলা সংস্করণে কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের টীকা দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৯৬-৯৭। অপরপক্ষে নবীনচন্দ্র লণ্ডন থেকে ১৮৪৬ অব্দের ১৯ মে তারিখে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে-চিঠি লেখেন তা থেকে মনে হয়, যে-দুজন ছাত্রের সমস্ত খরচ দ্বারকানাথ বহন করেছিলেন, সূর্যকুমার তাঁদেরই একজন।

□

দশম পরিচ্ছেদ

# দ্বিতীয় বারের বিদেশ সফর

শনিবার সন্ধ্যায় ১৮৪৫ অব্দের ৮ মার্চ তারিখে **বেঙ্গল হরকরা** তাঁদের রিপোর্টে লিখলেন : 'আজ সকালবেলা **বেন্টিঙ্ক** জাহাজ শহর ছেড়ে পাড়ি দিল প্রায় আশি জন যাত্রীসহ।' দ্বারকানাথ ও তাঁর দলবল ছিলেন এই আশি জনের অন্তর্ভুক্ত। পি. এণ্ড ও. স্টিমার যখন ধীরে ধীরে ডক ত্যাগ করে সরে যেতে লাগল এবং দ্বারকানাথ জন্মভূমির কাছ্ থেকে বিদায় নিলেন তখন কি কোনো পূর্বাভাস পেয়েছিলেন—দেশে আর তিনি ফিরতে পারবেন না? কে জানে!

অনুমান করা শক্ত, বিদায়কালে তাঁর মনের ভাব ছিল কেমন। যদিচ তিনি গোছালো স্বভাবের লোক ছিলেন ও নিয়মিত দিনলিপি লিখতেন, তাঁর মনের গঠনটা ছিল বহির্মুখী, বাইরের জগতে তাঁর গতিবিধি, বাইরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি বা ধারণাটুকুই এই সব দিনলিপিতে স্থান পেয়েছে, উপরিতলের ভাসা ভাসা ছবি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন, মনের গভীর চিন্তাভাবনা মনের গোপনেই রেখে দিয়েছেন। এবারকার বিদেশ সফরের ব্যাপারটা স্থির হয়েছিল প্রায় দু'বছর পূর্বে, ১৮৪৩ অব্দের গোড়ার দিকে, দেশে ফেরারও আগে। পারী থাকতে, ১৮৪২ অব্দের অক্টোবরের শেষে, ফ্রান্স-এর রাজা লুই ফিলিপকে তিনি কথা দিয়েছিলেন পরের বছর ফিরে আসবেন। তখন তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো, সুতরাং প্রথম সফরের অনতিকাল পরে দ্বিতীয় সফরে আসার উদ্দেশ্য আর যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান নিশ্চয় ছিল না। এবার তিনি নিশ্চয় বেশ দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার মন নিয়ে বের হয়ে থাকবেন, কারণ সঙ্গে এনেছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে। এই ষোড়শ-বর্ষীয় সুদর্শন তরুণটিকে তিনি চেয়েছিলেন বিলেতের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের মতো সুশিক্ষিত করে তুলতে। তিনি কি স্বয়ং চেয়েছিলেন বিলেতে নিজের একটা কর্মজীবন গড়ে তুলতে? কে জানে!

পুত্র ব্যতিরেকে তাঁর নিজস্ব পারিষদবর্গের মধ্যে ছিলেন ভাগনে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথম সফরে যে ভাগনে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়), তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা: ডব্ল্যু. র‍্যালে, প্রাইভেট সেক্রেটারি টি. আর. সেফ এবং তিনজন সেবক। ডা: গুডিভের তত্ত্বাবধানে সেই চারজন মেডিকেল

ছাত্রও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রথম সফরের সময় দ্বারকানাথ তাঁর চোখে-পড়া জিনিস ও নানা অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর ডায়ারিতে কিংবা দেশের বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিপত্রে। দ্বিতীয় সফরের বেলা তিনি সে-রকম কিছু লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না, লিখে থাকলেও সেসব লেখা কালের কবল থেকে উদ্ধার পায়নি। সুতরাং কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর গ্রন্থে যতটুকু লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগারে রক্ষিত কয়েকটি চিরকুট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এবার অবশ্য ভাগ্নে নবীনচন্দ্র দ্বারকানাথের মধ্য পুত্র গিরীন্দ্রনাথকে নিয়মিত চিঠি লিখে খবরাখবর দিতেন—কয়েকটি চিঠি সে-যুগের খটমট বাংলায়; কয়েকটি স্কুলপড়ুয়া ছেলের মতো বালভাষিত সহজ সরল ইংরেজীতে।

১৮৫৪ অব্দের ৮ মে তারিখের **ইংলিশম্যান** একটি চিঠি ছাপান। '**বেন্টিঙ্ক** জাহাজের জনৈক যাত্রী' বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠিতে জানিয়েছেন জাহাজের ব্যবস্থাদি 'জঘন্য', বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা খুব খারাপ, আলোর ব্যবস্থাও তদ্রূপ—অধিকাংশ যাত্রী তাই মুক্ত আকাশের তলায় ডেক-এ রাত্রিযাপন করেন বাধ্য হয়ে। 'আধ ডজন কেবিনের কথা বাদ দিলে বাকি আর সব ভারতসাগর অতিক্রম করার পক্ষে বাসের অযোগ্য।' চিঠিতে পত্রপ্রেরকের নাম ছিল না, কিন্তু জাহাজের ডাইনিং রুমে পাঙ্খা-চালানোর প্রস্তাব দেখে মনে হতে পারে বেনামা ব্যক্তিটি দ্বারকানাথ ছাড়া কেউ হয়তো নন। প্রথম সফরের বেলা তিনি তাঁর নিজস্ব যে-জাহাজে গিয়েছিলেন তার ব্যবস্থাদি নিশ্চয় পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর **বেন্টিঙ্ক** জাহাজের চেয়ে ভালো ছিল। ভারত-ব্রিটেনের মধ্যে ডাক-চলাচলের জন্য তিনি একটি যে-পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তা বানচাল হয়ে যাবার ফলে তাঁর আক্ষেপ তিনি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুই দেশের মধ্যে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন খাঁটি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে। তাঁর নিজস্ব স্টিমার-লাইন যদি থাকত তিনি নিশ্চয় নিখুঁত ব্যবস্থা করতে পারতেন। ভদ্রতার খাতিরে পত্রলেখকরূপে তিনি হয়তো নিজের নাম দিতে চান নি।

সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করলেন দূর দিগন্তের 'কয়েকটি কালো পাহাড় ছাড়া সমস্ত জায়গাটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ'। সুয়েজ-এ **বেন্টিঙ্ক** থেকে অবতরণ করে দলবল-সহ দ্বারকানাথ স্থলপথে কায়রো গিয়ে সেখানকার শেফার্ডস হোটেলে পক্ষকাল যাপন করলেন। কায়রোর ভাইসরয় মহম্মদ আলি পাশা বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং 'উৎকৃষ্ট জিন, গদি ও রেকাব চড়িয়ে স্বর্ণখচিত সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত করে নয়টি আরবী ঘোড়া, একটি মালবাহী অশ্বতর এবং পথপ্রদর্শনকারী জনাছয়েক রক্ষী সৈন্য দ্বারকানাথের ব্যবহারের জন্য মোতায়েন করে দিলেন।' কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন দ্বারকানাথ এই ভাইসরয়ের সঙ্গে কতিপয় সাক্ষাৎকারে মিলিত হন, সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে রেলপথে যোগযুক্ত করা

বিষয়ে দ্বারকানাথের প্রস্তাব তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অবধান করেন।[১] চুরাশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ খেদিভ খুবই পরিহাস-রসিক, 'দ্বারকানাথের পুত্র নগেন্দ্রনাথের জমকালো পোশাক নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে গিয়ে তিনি হাসিতে ফেটে পড়তেন। সবচেয়ে বেশি মজা করতেন নগেন্দ্রনাথের পাগড়ি নিয়ে, রসিকতা করে বলতেন, বিলেতে সুন্দরী মেমসায়েবরা যখন তাকে নিয়ে প্রণয়রণে মাতবে, নগেন্দ্রনাথ যেন তার পাগড়ি ও হৃদয় খুইয়ে না বসে'।[২] ফার্সি ভাষায় জ্ঞান থাকার ফলে দ্বারকানাথ পাশার সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারতেন, অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা চলত দোভাষীর মাধ্যমে।

আবার নীল নদ ধরে কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে মাল্টা। মাল্টাতে রোগ-সংক্রমণের ভয়ে দলবলসহ দ্বারকানাথকে পক্ষকাল সঙ্গরুদ্ধভাবে আলাদা কাটাতে হয়। গভর্ণর ও এডমিরাল পূর্বেকার মতো হৃদ্যতা সহকারে নেপলস যাবার জন্য দ্বাবকানাথকে একখানি স্টিমার দেন। 'লর্ড ক্লারেন্স পাগেট-এর নির্দেশে চালিত স্টিমার **এইগ্ন** যখন নোঙর তুলতে উদ্যত গভর্ণর বাহাদুর তাঁকে আহারাদির জন্য আমন্ত্রণ করলেন...। নেপলস বন্দরে জাহাজ ভিড়তেই রাজকীয় মর্যাদায় তোপধ্বনি দিয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষিত হল। জাহাজে বসে থাকতে কামানের গর্জন শোনা দ্বারকানাথের পক্ষে সেই প্রথম। নেপলস-এ দ্বারকানাথ ও তাঁর দলবলকে নিয়ে ওঠানো হল ভিক্টোরিয়া হোটেলে। সেখানকার বিট্রিশ দূতাবাসে তিনি যথারীতি হাজিরা দিলেন। ব্রিটিশ রাজদূত স্যর উইলিয়ম টেমপল তাঁকে নিয়ে গিয়ে নেপলস-এর রাজার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন, রাজা বিদেশী অতিথির সঙ্গে অনর্গল ইংরেজীতেই কথাবার্তা বললেন।[৩]

১৮৫৪ অব্দের ১৮ মে তারিখে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে নবীনচন্দ্র নেপলস, পম্পেই, ভিসুবিয়াস প্রভৃতির শোভা দেখে পঞ্চমুখ হলেন। তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল কৃত্রিম জলপ্রপাত, রেলগাড়ি, নেপলস-এর প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত কিছু ভারতীয় দৃশ্য-সামগ্রী দেখে। প্রতি রাস্তায় একটি করে নাট্যমঞ্চ আছে দেখে তিনি তো অবাক।[৪]

নেপলস থেকে বেরিয়ে পথে লেগহর্ণ, পিসা, জেনোয়া, মার্সেই ও বোর্দো হয়ে দ্বারকানাথের দলবল পৌঁছল পারী শহরে। ৫ জুন তারিখে বোর্দো থেকে লেখা একটি চিঠিতে পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবীনচন্দ্র লিখলেন : 'এতাবৎ কাল আমি এইরকম দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। যদ্দূর দৃষ্টি যায় কেবল আঙুর লতা, জলপাই গাছ, আপেল গাছ, চেরী গাছ আর স্ট্রবেরী গাছ...।' খাস বোর্দো শহরের বিষয়ে লিখলেন (ইংরেজী লিখতে গিয়ে নবীনচন্দ্র ব্যাকরণের ধার৷ বড় একটা ধ৷রতেন না।) : 'এ শহর স্থানীয় মদের জন্য বিখ্যাত। তোমরা যাকে ক্লারেট বলো এখানে সেটা এই শহরের নামেই পরিচিত। কলকাতায় সর্বোৎকৃষ্ট ক্লারেট বলে তোমরা

যা পান করে থাকো সেটা আসল বোর্দো নয়, নিতান্তই এ-অঞ্চলের দিশী মদ, ইংরেজরা চালান দেয় বোর্দো-র ক্লারেট বলে। মি: দিস্তোনোর আঙুর-বাগানে সর্বোৎকৃষ্ট বোর্দো তৈরি হয়, গতকাল তিনি তাঁর বাগান থেকে তাঁর তৈরি কিছু মদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনলাম ১৭৭৮ অব্দের আঙুরের রস নিষ্কাশিত করে এ-মদ তৈরি হয়েছে। আমার জীবনে এমন উৎকৃষ্ট স্বাদের ক্লারেট আমি খাইনি। আমার ধারণা আগামী কিস্তিতে মদের কেস দিস্তোনো যখন কার-টেগোর কোম্পানীতে পাঠাবেন, এই উৎকৃষ্ট ক্লারেটের বোতল কয়েকটা হয়তো সঙ্গে যাবে। সচরাচর উনি আমাদের দেশে যা পাঠান ক্লারেটের নাম ক'রে, তা এ-অঞ্চলের দিশী মদ।/ আমরা এখানে ওই ১৭৮৮-এর চোলাই উৎকৃষ্ট ক্লারেট ছাড়া আর কিছু ছুঁই না, মাঝে মাঝে অবশ্য শ্যাম্পেন-এর খোদ জন্মস্থান-থেকে-আনা শ্যাম্পেন পান করে থাকি।...এখানে আমরা এত ভালো আছি যে ডা: র‍্যালের মতে কলকাতার অতি বড়ো স্বাস্থ্যবান পুরুষও আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। র‍্যালে নিজে তো দ্বিগুণ মোটা হয়েছেন, সেফ-সায়েবের অবস্থাও তথৈবচ। সবাই আমরা যে-হারে মোটা হতে লেগেছি, আমাদের ঢিলেঢালা শার্টগুলো পর্যন্ত অঙ্গে আর আঁটছে না।...এই অঞ্চলের মেয়েরা খুবই রূপসী হয় বলে একটা খ্যাতি আছে। গতকাল অপেরা হাউসে বিশ জন পরমা সুন্দরী দেখলাম, পরণে আঁটোসাঁটো লাল রঙের জামা-পাজামা, ভারি চমৎকার লাগছিল তাদের দেখতে—যেন রূপকথার পরী। চিঠি লিখে আর কতটুকুই বা বলতে পারি—দেখা হলে মুখে বলব এক মাস ধরে...। আগামীকাল আমরা পারী রওনা হচ্ছি।'[৫]

পারী শহরে দ্বারকানাথ ছিলেন পক্ষকাল—রাজা লুই ফিলিপ প্রায়ই তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন রাজপ্রাসাদে। 'প্রাচ্যদেশের এই ভূম্যধিকারী মহামান্য রাজার হৃদয় যেন জয় করেছিলেন। কেবল যে সৌজন্য-সহকারে দ্বারকানাথকে অভ্যর্থনা এমন নয়, স্বাগত করতেন আন্তরিক সহৃদয়তায়। উৎসবের দিনে একবার দ্বারকানাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভার্সাই প্রাসাদে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায় সেদিন অজস্র পুষ্পের অপূর্ব সমারোহের মধ্যে শত শত ফোয়ারা থেকে উৎসারিত জলের ফুলঝুরি একটি জমকালো দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। এই উৎসবে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। আশপাশের পল্লী অঞ্চল থেকে বহু দর্শনার্থী এসেছিল রাজবাড়ির উৎসবসজ্জা দেখতে। রাজা এত খুশি হয়ে এমন সমাদরে যে-বিশিষ্ট ব্যক্তিটিকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন—তিনি কে? লোকেরা সব মজা করতে এসেছে, চারিদিকে হাসিখুশির আবহাওয়া, বৈদেশিক বিভাগীয় মন্ত্রীর সেক্রেটারি মঁসিয়ে ফুয়ে কৌতুক করে জিজ্ঞাসুদের বললেন, বিশিষ্ট আগন্তুক হলেন স্বর্গ-রাজ্যের (সেকালে চীনদেশকে বলা হত স্বর্গরাজ্য) রাজা। খবর শুনে দর্শকদের একটা দল সমস্বরে বলে উঠল : 'হা ভগবান, একেই বলে কপাল! অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলে এমন একজন মহাপুরুষকে সশরীরে দেখা গেল আমাদের এই দেশে।'[৬]

কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন দ্বারকানাথ লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৫৪ অব্দের ২৪ জুন তারিখে। কিন্তু নবীনচন্দ্র শনিবার ২১ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে গিরীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানালেন : 'আজই এখানে এসে পৌঁছলাম—ঘণ্টাখানেক আগে। ডোভার ও লণ্ডনের মধ্যে ইংলণ্ডের যতটুকু যা দেখা যায় তার চেয়ে বেশি কিছু এখনো দেখা হয়নি।' এ-যাত্রাতেও দ্বারকানাথ বাসস্থান ঠিক করলেন পিকাডিলি অঞ্চলে আলবেমার্ল স্ট্রীট-এ অবস্থিত সেই সেন্ট জর্জেস হোটেলে। প্রথম প্রথম পুত্র ও ভাগনে তাঁর কাছেই ছিল, কিছুদিন পরে তাদের আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এবার যেন বিলেতে বেশ কিছুকাল থাকবেন বলে মনে হল, কারণ নগেন্দ্রের জন্য মি: ড্রামণ্ড বলে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে ভূতপূর্ব গভর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ও ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান—উভয়েই নিশ্চিতি দিয়ে বললেন নগেন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। কলকাতায় থাকতে নবীনচন্দ্র কিছুদিন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক-এ শিক্ষানবিশি করেছিলেন, বিলেতে তাঁকে কার-টেগোর কোম্পানীর এজেন্ট রবার্ট মিচেল এণ্ড কোম্পানীতে একজন সহকারী-রূপে নিযুক্ত করে দেওয়া হল। ৬ জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে নবীনচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে খবর দিয়ে চিঠি লিখলেন : 'স্যর এডওয়ার্ড রায়ান ও লর্ড অকল্যাণ্ড নগেন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন। লণ্ডনের প্রধান প্রধান বণিক ও দালালদের কাছ থেকে আমি নিজে পুবাদস্তুর শিক্ষা নেব রেশম, নীল, চিনি, শোরা প্রভৃতি ভারতজাত পণ্য-রপ্তানি করার ব্যাপারে। বণিক ও দালালেরা সবাই বলেছেন যে এদেশে আমার অবস্থানকালে তাঁরা এমনভাবে আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন যে আমি দেশে ফেরার আগে পাকা ব্যবসাদার বনে যাব। আমার মামাও বলেছেন এখান থেকে আমি যখন কলকাতা ফিরে যাব আমি তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাব।' নিতান্ত সরলচিত্ত বলে নবীনচন্দ্র পুনশ্চ-অংশে যোগ করলেন : 'নৈতিক চরিত্র এখনো আমার নষ্ট হয়নি, নষ্ট হতে দেবার ইচ্ছাও নেই। মামার ও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু আমি করতে চাই না।'

মামার গতিবিধি ও দিনকৃত্য বিষয়ে নবীনচন্দ্র জানালেন : 'বাবু প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়েন। দুপুরবেলা একটা সময়ে এসে মধ্যাহ্নভোজ করেন। তারপর যান নৈশভোজ ও নাচের পার্টিতে, ফিরে আসেন ভোর আড়াইটার সময়। সবাই তখন ঘুমে অচেতন। আমি কিন্তু উঠে এসে পরের দিনের কাজকর্ম প্রভৃতি ব্যাপারে মামার নির্দেশ নিই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাবু অত রাতে শুতে গেলেও পরের দিন ঠিক ছয়টার সময় উঠে পড়েন, মুখে চোখে রাতজাগার কোনো ক্লান্তি নেই, একেবারে তাজা। তাহলে বুঝতেই তো পারো কলকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে জল-হাওয়ার কত তফাত।'

ইংরেজী ব্যাকরণের ধার না ধারলেও, নবীনচন্দ্রের কোনো অসুবিধা হত না মোদ্দা

মানেটা বুঝিয়ে দেবার। কেন যে তিনি গিরীন্দ্রনাথকে মাতৃভাষা বাঙলায় চিঠি না লিখে ইংরেজীতে চিঠি লিখতেন তার কারণটা সম্ভবত এই যে নগেন্দ্রনাথের মতো (নগেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারি লিখতেন ইংরেজীতেই) তাঁরও প্রবল বাসনা ছিল যথাসম্ভব বিলিতি ভদ্রলোকে রূপান্তরিত হওয়া। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ স্বভাব সম্বন্ধে দ্বারকানাথের নিজের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল, তাই তিনি হয়তো এই দুই তরুণবয়স্কদের ইংরজী ভাষার প্রতি পক্ষপাত পছন্দ করতেন ও উৎসাহিত করতেন। পরবর্তী প্রজন্মে এই ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের উগ্র-মানসিক প্রভাবে; তিনি ছিলেন স্বদেশীয় ভাষা ও ভাবধারার সমর্থক।

লণ্ডনে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই দ্বারকানাথ পুনরায় মহারাণীর বৈঠকখানা-ঘরে বিশেষ সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। মহারাণীর জন্য তিনি ভারত থেকে কিছু উপহার এনেছিলেন এবং সেগুলি মহারাণীর শয়নাগারের ভারপ্রাপ্তা মহিলা লেডি জোসলিন-এর হাতে দিয়ে মহারাণীর উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন : 'তার মধ্যে থেকে মহারাণী গ্রহণ করেছিলেন শুধু কতকগুলি বিচিত্র-গঠন চৈনিক অলঙ্কার এবং দিল্লির স্বর্ণকারদের হাতে তৈরি সোনার বালা। প্রিন্স অলবার্ট গ্রহণ করেছিলেন একটি সুন্দর শালের চোগা।'[৭]

৭ জুলাই তারিখে বাকিংহাম প্যালেস থেকে দ্বারকানাথ বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হন। সেদিন রাত দু'টোর সময় নবীনচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি চিঠিতে খবর দিলেন : 'বাবু এইমাত্র মহারাণীর কাছ থেকে ফিরলেন। মহারাণীর যে-প্রতিকৃতি এখন কলকাতার টাউন হল-এ দেখতে পাও, মহারাণীর কাছ থেকে সেটি উপহার পেয়ে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ মহারাণীকে যে-মানপত্র দিয়েছিল, বাবু সেটি তাঁর হাতে দিতে গিয়েছিলেন।...মহামান্যা মহারাণী আরো একটি ছবি দিয়েছিলেন—তাঁর ও প্রিন্স অলবার্টের একটি মিনিয়েচর—বাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য, টাউন হলের জন্য নয়। বাবু আজও একটা সান্ধ্য পার্টিতে যাবেন—রাত সাড়ে ন'টায়।'

প্রথম বিদেশযাত্রা ও বিদেশসফর বিষয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রচুর উপাদান পেয়েছিলেন দ্বারকানাথের ডায়ারি থেকে, কিন্তু এই দ্বিতীয় সফরের বেলা তিনি কোনো ডায়ারির উল্লেখমাত্র করেন নি। দিনলিপি লেখা যাঁদের নিয়মিত অভ্যাস, তাঁদের পক্ষে সে-অভ্যাস পরিহার করা শক্ত। মনে হয় এ-যাত্রাতেও দ্বারকানাথ ডায়ারি লিখে থাকবেন কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর অকালমৃত্যুতে তাঁর অন্য নানা কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত টুকিটাকির সঙ্গে সেই ডায়ারিও লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। দেখা যায় যে গতবারের মতো এ-বারও তিনি একটি পকেট-নোটবুকে ঝটিতি লিখে রেখেছিলেন কোন্ দিন, কোন্ সময়ে, কোথায়, কেন, যেতে হবে; কার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে; কোন্ কথা তাঁর মনে উদয় হয়েছে, ইত্যাদি। এইরকম একটি পকেট-নোটবুকের কয়েকটি খসে-পড়া, ছেঁড়া, গুঁড়িয়ে যাবার মতো বিবর্ণ পৃষ্ঠা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন

অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। এই সব হিজিবিজি লেখার কিছুটা পড়া যায় কিছুটা পড়া যায় না, দুটো কথার মাঝখানে যে-সব ফাঁক আছে ভরাট করা দুঃসাধ্য। অনেক সময় মনে হয় যেন কথার সংকেত, ঠিক কথা নয়, কৌতূহল উদ্রেক করে কিন্তু তৃপ্ত করে না। সেইসব চিরকুট থেকে কয়েকটি নমুনা নিচে তুলে দেওয়া গেল :

**পৃ. ১—তারিখ ১৭ জুলাই**

'সকালবেলা ১০টার সময় মহারাণীর কাছে গেলাম—মহারাণী ও প্রিন্স, বেলজিয়ামের রাজা-রাণী, ডিউক ও ডাচেস অব কেম্ব্রিজ, লর্ড লিভারপুল ডেলাওয়র, ডিউক অব আর্গিল, লর্ড অকল্যাণ্ড, স্টানলি ও তাঁর লেডি, পামারস্টোন ও তাঁর লেডি, লর্ড এশলি...-এর অফিসর...এবং বাদবাকি খবরকাগজ অনুরূপ।

'মহামান্যা মহারাণী আমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, কেমন করে এলাম, গত দু-বছর কী করেছি না করেছি, সাধারণভাবে ভারতের খবর—সব জানতে চাইলেন। তাঁর শেষ কথা—হার্ডিঞ্জ কেমন আছেন, কবে শেষ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আশা করি তিনি দেশের উন্নতি সাধন করার জন্য সবরকম চেষ্টা করে চলেছেন।

'প্রিন্স অলবার্ট, রাজা লেওপোল্ড শুরুতে প্রশ্ন করলেন শেষ কবে আমি পারী গেছি এবং খোলাখুলিভাবে ভারতীয় ব্যাপার বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। ডিউক ও ডাচেস অব কেমব্রিজ নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুললেন। বেলজিয়মের রাণী ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন তাঁদের দেশে আমার দেখা পান—দুটি ছোট মেয়ে বেহালা বাজাল চমৎকার। ডিউক অব আর্গিল আমায় স্কটল্যাণ্ডে তাঁর বাড়ি যেতে আমন্ত্রণ করলেন। প্রাসাদ ছেড়ে বেরোলাম ১২টার সময়।'

ওই একই কাগজে কোনো তারিখ উল্লেখ না করে লিখেছেন : 'বেলজিয়মের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে বাকিংহাম প্যালেস-এ ১২টার সময়। ২নং হাইড পার্ক গার্ডেনস, এডমিরাল স্যার রবার্ট ওটোয়ে, লেডি স্টানলি, মিসেস ডাম্পিয়েরেব সঙ্গে দেখা করতে হবে আগামীকাল।'

**পৃ. ২—৩০ জুলাই ১৮৪৫**

'মি: হাডসনের সঙ্গে গাড়ী করে বুশি পার্ক যাওয়া হল, ভূতপূর্বা মহারাণীর সাক্ষাৎকারে। বিশেষ সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। স্বয়ং মহারাণীর বাসনাক্রমে মধ্যাহ্নভোজনের টেবিলে আমায় ঠিক তাঁর পাশেই বসতে দেওয়া হল। মধ্যাহ্নভোজন না বলে সান্ধ্যভোজন বলাটাই হয়তো সংগত। খুবই সদয় ও প্রসন্নভাবে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বললেন ও দুঃখ প্রকাশ করলেন যে আবহাওয়া এত খারাপ থাকায় নিজে আমার সঙ্গে হাঁটাচলা করে প্রাসাদের উদ্যানটা দেখাতে পারলেন না, বিশেষ

করে বললেন আবার যেন এসে মহামান্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁর সদয় আচরণ ও অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলব না।'

**পৃ. ২—অনুবৃত্তি। ১ আগস্ট**

'ফিশমংগার্স হল। লর্ড মেলবোর্ণ স্যার রবার্ট পীল-এর প্রশংসা করে বললেন যদিচ পীল তাঁর আইন-বিধান সমস্তই তাঁর কথা থেকে ধার করেছেন, উদারনৈতিক দিক থেকে তিনি তাঁর সমস্ত কাজই সমর্থন করেন। তাঁর মন্ত্রীপরিষদ-স্বরূপ দেহটার মৃত্যু ঘটেছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তরস্থিত অমর আত্মা অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল প্রজ্ঞার উদ্দীপনা স্যার রবার্ট কর্তৃক স্বীকৃত সমস্ত বিধি-বিধানের মধ্যে অন্তর্নিহিত। লর্ড জন রাসেলও কিছু বললেন এবং আমি সুস্বাস্থ্য কামনায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।'

**পৃ. ২—অনুবৃত্তি। শনিবার ২ আগস্ট ১৮৪৫**

'আজ হল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল। উপস্থিতবর্গের মধ্যে ছিলেন অধুনাতন ভাইকাউন্ট হাওয়ারডেন, ব্যারন ডোভেল, ও মি: বণ্ড। রাজা আমায় তাঁর দেশে যেতে আমন্ত্রণ করলেন; বললেন আগামী অক্টোবরে যখন তাঁর ছেলে থাকবে হল্যাণ্ডে—তখন যেন যাই। এত লোক ঘিরে ছিল তাঁকে যে রাজার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কওয়া গেল না।'

ইত্যবসরে দ্বারকানাথের স্বদেশে কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম জনরব প্রচারিত হচ্ছিল। ১৮৪৫ অব্দের ১৭ জুলাই তারিখে **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** তাঁদের সাপ্তাহিক সংবাদের নির্ঘণ্টে, **বোম্বে টাইমস**-এ প্রকাশিত কায়রো থেকে একটি চিঠি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন!' **ইংলিশম্যান** অনুমান করলেন ভ্যাটিকানের প্রভাবক্রমে তিনি হয়তো রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন, এমনকি ভ্যাটিকানের প্রচার-বিভাগের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হতে পারেন। তাঁরা তো ভারতে রোমান ক্যাথলিক মিশনের কাজে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠান। **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** মন্তব্য করলেন : 'আমাদের ধারণা এই সব জনশ্রুতি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে।' সত্য সত্য রোমান ক্যাথলিক কিংবা অন্য কোনো খ্রীস্টীয় সংস্থা থেকে তাঁকে খ্রীস্টীয় ধর্মে ধর্মান্তকরণের জন্য চেষ্টা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। যদিবা এরকম কোনো চেষ্টা করা হয়েও থাকে, দ্বারকানাথের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হয়ে থাকবে তাঁর গুরুস্থানীয় রামমোহন রায়ের মতো। কলকাতার প্রথম লর্ড-বিশপ মিডলটন ভেবেছিলেন রামমোহন খ্রীস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেছেন, সেই সুবাদে 'পবিত্রতর ধর্ম গ্রহণের' জন্য তিনি যখন তাঁকে অভিনন্দিত করতে যান, রামমোহন তাঁকে বলেছিলেন : 'মিলর্ড, আপনি ভুল শুনেছেন—এক-প্রস্থ কুসংস্কার পরিহার করে আর-এক প্রস্থ কুসংস্কার গ্রহণ করতে যাব কেন?'[৮]

দ্বারকানাথের পুরাতন বন্ধু জে. এইচ. স্টকলার তখন ছিলেন বিলেতে—লণ্ডনে। তিনি তাঁর *Memoirs of a Journalist* গ্রন্থে (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ অব্দে।) দ্বারকানাথের সামাজিক জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন :

'য়ুরোপীয় সংগীত ও নাট্যাভিনয় ভালো করে বুঝবার মতো উন্নত রুচি ছিল দ্বারকানাথের। স্বদেশে থাকতেই তিনি তাই ইতালিয়ান অপেরার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কেবল তাই নয়, একজন গুণী অপেরা-গায়ককে তিনি মাসমাহিনায় নিযুক্ত করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নেবার জন্য। সুতরাং বিলেতে আসার পর তিনি যে য়ুরোপীয় সঙ্গীত-নাটকের রসে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে যাবেন—এতে আর বিচিত্র কী? তাঁর মার্জিত সহবৎ, জমকালো শাল, বিরাট খ্যাতি ও বহুমূল্য পান্নার আঙটি, তাঁকে উৎসবের মরশুমে লণ্ডনের শৌখিন-সমাজের মধ্যমণি করে তুলেছিল। দাম্ভিক অভিজাতশ্রেষ্ঠদের প্রাসাদে প্রাসাদে তিনি সর্বাগ্রগণ্য অতিথিরূপে সমাদৃত হতেন, মধুব-স্বভাব ডাচেস অব ইনভেরনেস ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতমা।

'লণ্ডনের প্রমোদ-কেন্দ্র এক দফা ঘুরে আসার পর আমায় তিনি লিখেছিলেন যেন আলবেমার্ল স্ট্রীটে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি—তিনি আমার কাছ থেকে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করবেন। কলকাতায় থাকতে তাঁর কাছ থেকে কত অনুগ্রহ লাভ করেছি, কত কাজ আমার উপর তিনি গভীর বিশ্বাসভরে ন্যস্ত করেছেন, সুতরাং তাঁর কাজে যদি লাগতে পারি আমার পক্ষে খুবই আনন্দের কারণ হবে। আলবেমার্ল স্ট্রীটে গিয়ে দেখলাম লণ্ডন-জীবনের হৈ-হল্লা তাঁর ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে বলে মনে হল না, মনে হল একটু যেন ক্লান্ত তিনি, উৎসবের পর অবসাদগ্রস্ত। দু-চারটে কুশল জিজ্ঞাসার পর আমায় বললেন, 'দেখো এস্টকলর সায়েব, রূপে, পদমর্যাদায় কিংবা অর্থবিত্তে তোমাদের এই মহানগরীর সবার সেরা অভিজাতবর্গকে তো একনজর দেখলাম, কিন্তু জ্ঞানে গুণে যাঁরা অভিজ্ঞাতশ্রেষ্ঠ, কই তাঁদের দেখা তো পাইনি এখনো! রাজদরবারের বাইরে এ-রকম দীপ্তিমান যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তোমার যদি আলাপ-পরিচয় থাকে, তাহলে আমার বিশেষ ইচ্ছা সামাজিকভাবে এঁদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করি। সে-রকম একটা পার্টির ব্যবস্থা কি তুমি করতে পারবে?' আমি তাঁকে সবিনয়ে জানালাম, 'জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছেন অথবা সাহিত্যজগতে যাঁরা নেতৃস্থানীয়—তাঁদের খুব কম লোককেই আমি চিনি। কিন্তু সহজাতগুণসম্পন্ন যদি এমনকিছু লোকের সঙ্গ পেতে চান যাঁরা উত্তম পানাহার উপভোগ করতে জানেন, যাঁদের গাম্ভীর্যের মুখোশ সহজেই খসে যায়, লাগাম একটু ঢিল দিলেই যাঁদের কথায়-বার্তায় গল্পে-গুজবে রঙ্গরসের ফুলঝুরি জ্বলে ওঠে—তাহলে হয়তো তেমনকিছু লোক আমি একাট্টা করতেও পারি।' বাবু সোৎসাহে বললেন, 'আরে, ঠিক তাই তো আমি চাই!' আমি তখন কালবিলম্ব না করে কয়েকজনকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

'সপ্তাহ যেতে না যেতে নিমন্ত্রিতেরা জড়ো হলেন নটিংহিল স্কোয়ারে আমার মায়ের বাড়িতে। পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন অক্সেনফোর্ড, টম টেলর, অলবার্ট স্মিথ, জিলবার্ট আ'বেকেট, হ্যারিসন এইনসওয়ার্থ, শার্লি ব্রুকস, রবার্ট কীলী ও তাঁর স্ত্রী, জর্জ মুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর ভাগনে নবীনচন্দ্র। পানীয় যা ছিল মন্দ ছিল না এবং যে-হেতু আহার্যতালিকা সযত্নে প্রস্তুত করেছিলেন আমাদের বাড়ির মহিলাবৃন্দ, ডিনার বেশ ভালোই জমেছিল। দ্বারকানাথের পাশে বসেছিলেন অক্সেনফোর্ড—দ্বারকানাথের আলাপ-আলোচনার উপর তিনি একপ্রকার একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিলেন। *Times* কাগজের এই সহৃদয় সমালোচকটি পণ্ডিত মানুষ, তিনি সবিশেষ খুশি হলেন এমন একজনকে পেয়ে, যাঁর কাছ থেকে প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি সুবুদ্ধিপূর্ণ প্রশ্নের সুযুক্তিপূর্ণ জবাব পাওয়া গেল। সচরাচর কৌতুকরসিক ব্যক্তিরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে থাকেন—বাছা বাছা মনের কথা পাছে বেহাত হয়ে যায়—সেই ভয়ে মুখ খুলতে চান না। এ-ক্ষেত্রে কিন্তু তার অন্যথা ঘটল, মজাদার চুটকি গল্প ও সকৌতুক হাস্য-পরিহাসের আদান-প্রদান হল বিস্তর। পাশে অক্সেনফোর্ড-এর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার সুসংযত জবাব দেবার ফাঁকে ফাঁকে, দ্বারকানাথ দিলখোলা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। অক্সেনফোর্ডের ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল রামায়ণ, হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তা নিয়ে। এসব দেখে শুনে ধারণা হল আমার এ-পার্টি জমেছিল ভালো। ডিনারের পর যখন আমরা বৈঠকখানা ঘরে কফি পান করার জন্য জমায়েত হলাম, দ্বারকানাথ আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটল, মনে হল একটা ঘণ্টা কাটালাম চাঁদের হাটে।'[৩]

আগস্ট মাসে দ্বারকানাথ আয়ারল্যাণ্ড সন্দর্শনে গেলেন। ১৮৪৫ অব্দের ২৩ আগস্ট তারিখে নবীনচন্দ্র কলকাতায় গিরীন্দ্রনাথকে লিখলেন : '...আমার গত চিঠি থেকে নিশ্চয় জেনে থাকবে বাবু গেছেন আয়ারল্যাণ্ড আর আমরা আছি লণ্ডনে। নগেন্দ্র তার লেখাপড়ায় বেশ ভালোই এগোচ্ছে, আমিও বিভিন্ন ভারতীয় পণ্যের দালালদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিচ্ছি...। গতকাল বাবুর চিঠি থেকে জেনেছি তিনি নিরাপদে ডাবলিন পৌঁছেছেন এবং তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটেছে।

'কিছুদিনের মধ্যে তোমায় হয়তো বাবুর একটি পূর্ণাবয়ব ছবি পাঠাতে পারব। প্রখ্যাত চিত্রকর মি: স্যে বাবুর যে-প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন এবং যা এখন তোমাদের টাউন-হল-এ শোভা পাচ্ছে, এ-ছবিটি হবে তারই হুবহু নকল—অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে।

'মহামান্যা মহারাণীর অনুমতিক্রমে বাবু দুটি আইভরি-নির্মিত আবক্ষ মূর্তি নিয়ে যাবেন—একটি তাঁর নিজের অন্যটি তাঁর স্বামীর। এ-রকম মূর্তি আর কেউ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। ইতালি হয়ে আসবার সময় আমরা যে-সব মর্মরমূর্তি কিনেছিলাম

সেগুলি সত্বর তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছবে। মনে হয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মূর্তি তোমরা আগে দেখোনি। **টিউটর** জাহাজে এগুলি পাঠাবার কথা—জাহাজ লণ্ডন ডক ছাড়বে আগামী মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট তারিখে।'

ক্যাপটেন এণ্ড্রু হেণ্ডারসনকে সঙ্গে করে দ্বারকানাথ লিভারপুল থেকে সমুদ্র পার হয়ে ডাবলিন গিয়েছিলেন। লিভারপুলে একদিনই ছিলেন সেখানকার মেয়রের অতিথি হয়ে। ডাবলিনে ভাইসরয় তাঁকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেছিলেন।[১০] ১৮৪৫ অব্দের ১৮ অক্টোবর তারিখে **বেঙ্গল হরকরা**-য় দ্বারকানাথের আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের একটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল : 'ডাবলিন থেকে বিরাট দলবলসমেত দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলফাস্ট এসে পৌঁছেছেন।' কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে বেলফাস্টে তিনি যে-হোটেলে উঠেছিলেন সেটি দর্শনার্থীদের ভিড়ে ভর্তি হয়ে থাকত। সেখানে আইরিশ চরিত্রের সহজাত কৌতুকপ্রিয়তার পরিচায়ক একটি মজার ঘটনা ঘটে। পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: হার্টলে লক্ষ্য করলেন তাঁর এক বন্ধু দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। হার্টলে তাঁকে বললেন দ্বারকানাথ যখন তাঁকে অভিবাদন করবেন তখন যেন তিনি নতজানু হয়ে প্রিন্স-এর হস্তচুম্বন করতে ভুলে না যান।[১১]

এত উৎসব আড়ম্বরের মধ্যেও দ্বারকানাথ সময় বের করে নিয়ে মি: ডিকসনের (পরবর্তীকালে পার্লামেণ্ট-সদস্য) আইরিশ লিনেনের বড়ো বড়ো কারখানাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল লর্ড রোস-এর বৃহদায়তন দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ভারতীয় অতিথিকে তিনি বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করে যন্ত্রটি তন্ন তন্ন করে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণে কর্ক-এর দিকে যাত্রা করে কিলার্ণে গিয়ে ডানিয়েল ও'কোনেল-এর সঙ্গে[১২] তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখা করেন। প্রখ্যাত আইরিশ দেশব্রতী তাঁকে সঙ্গে করে কিলার্ণের হ্রদগুলি দেখান। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও রাজনীতিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। ও'কোনেল-এর দেশভক্তি ছিল গভীর, তিনি চাইতেন ব্রিটেনের সঙ্গে সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করে আয়ারল্যাণ্ড যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। তিনি মনে করতেন তা নাহলে আইরিশ জাতি পুনর্জন্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে না। অপরপক্ষে যদিও দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব ধরনে দেশব্রতী ছিলেন ও গভীরভাবে স্বদেশের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই যে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এবং কেবল ব্রিটেনের অধীনে ও তার সহযোগিতায়ই ভারতবাসীর পুনর্জাগরণ সম্ভবপর হতে পারে। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ভারতীয় অতিথির এই দাসমনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে স্বদেশভক্ত ও'কোনেল কী ভেবে থাকবেন; তাঁর তো উপনিবেশবাদী ব্রিটেনকে ভালো মতন চিনতে আর বাকী ছিল না। রাজনীতির নানা প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেশ খোলাখুলি আলোচনা হত। যদিচ উভয়ের মধ্যে পুরোপুরি

মতের মিল হতে পারেনি, নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় ও'কোনেল-এর চরমপন্থী মনোভাব ও অসাধারণ বাকপটুতা নিশ্চয়ই দ্বারকানাথের মনের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। দ্বারকানাথ যদি বেঁচে থাকতেন এবং ভারতের রাজনীতিক জীবনে ফিরে যেতে পারতেন, তাহলে হয়তো সে-প্রভাব কার্যকর হয়ে বিশেষ একটা রূপ নিতে পারত।

আরও একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য আইরিশের সংস্পর্শে এসেছিলেন দ্বারকানাথ, তিনি হলেন প্রখ্যাত মানবপ্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক ও মদ্যপান-বিরোধী প্রচারক ফাদার ম্যাথু।[১৩] তাঁর নিকট-পরিচয় লাভ করে দ্বারকানাথ মুগ্ধ হন। তিনি ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে যখন গোল আলুর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকর্মে ফাদার ম্যাথু কী অসম্ভব কাজ করেছিলেন। একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ-এ ফাদার ম্যাথুর উপাসনা শেষ হবার পর উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। সেখানেই দ্বারকানাথ ফাদারের হাতে একটি মোটা টাকার অনুদান তুলে দেন তাঁর আর্ত-ত্রাণ কাজের জন্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দু-জনের মধ্যে এমন একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে ফাদার ম্যাথু বেশ উঠে পড়ে লাগলেন দ্বারকানাথের মতো পানাহারে ভোগবিলাসী ব্যক্তিকে দিয়ে নেশাবন্ধী শপথ-পত্রে সই করিয়ে নিতে। পানাহার নিয়ে শপথ করার অযৌক্তিকতার কথা তুলে দ্বারকানাথ প্রচুর রঙ্গরসিকতা করলেন। ভারতীয় অতিথিকে স্বমতে আনতে না পারলেও সদ্ভাবের অভাব ঘটল না, বিদায় দেবার আগে ফাদার ম্যাথু দ্বারকানাথকে একটি ধর্মীয় পদক উপহার দিলেন। দ্বারকানাথও ফাদারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে তিনি প্রত্যহ একটু সময় করে বসবেন, তখন একজন চিত্রকর এসে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকবেন। দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে এই উন্নতমনা সন্ত সাধুর প্রতিকৃতি রাখতে চেয়েছিলেন, চিত্রকররূপে নিযুক্ত করেছিলেন আয়ারল্যাণ্ড-এর নামজাদা পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে মি: লীহাই-কে।

১৮৪৫ অব্দের ২৪ নভেম্বর তারিখে **লণ্ডন মেল** নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি ছাপিয়েছিলেন **কর্ক রিপোর্টার** থেকে :

'নিচের চিঠিটি তুলে দিতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দিত—চিঠিটি এসেছে ভারতের বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। সম্প্রতি তিনি যখন বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর রাজোচিত আচার-আচরণ ও বদান্যতার কথা আমরা সবিস্তারে জানিয়েছি। খুবই আনন্দের বিষয় এই সম্ভ্রান্ত ভারতীয় সজ্জন, প্রতিকৃতি অঙ্কনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমাদেরই শহরের একজন বিশিষ্ট চিত্রকরকে। মি: এডওয়র্ড ডি. লীহাই যে এই কর্ক শহরেরই মানুষ, সেকথা বলতে আমরা গর্ব অনুভব করি—ম্যাকলিজ, ফিশার ও হোগান-এর মতো, তিনিও এই শহরের সহজাত শিল্প-প্রতিভার উচ্চ আদর্শ ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। মি: লীহাই বহু বছর বাদে তাঁর নিজের শহরে এসেছেন, আশা করি তিনি দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকতে পারবেন যাতে

আমরা তাঁর সহ-নাগরিকবৃন্দ তাঁর উপস্থিতির যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করতে পারি :

'প্রিয় ফাদার ম্যাথু, পত্রবাহক মি: লীহাইকে আমি নিযুক্ত করেছি আপনার প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য। আপনি এই প্রতিকৃতির জন্য বসবেন বলে আমায় সদয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমার ধারণা মি: লীহাইকে আপনি পূর্ব থেকেই চেনেন, এমত অবস্থায় তিনি যে তাঁর পক্ষে এই প্রীতিপূর্ণ দারিত্ব খুবই যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করবেন, প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে প্রতিকৃতির পাত্রের প্রতি যথোচিত সুবিচার করবেন—এ আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস। আপনাব সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ করে আমি কত যে গৌরবান্বিত ও কৃতকৃতার্থ বোধ করেছি, সে আমি ইতিপূর্বেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। আমার স্বদেশের লোক যাতে সে-গৌরবের কিছুটা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমি এখন দ্বিগুণিত আগ্রহে চাই আমার বাসগৃহের দেওয়াল অলঙ্কৃত করে থাকুক এমন একজন মহাত্মার প্রতিকৃতি যিনি এতকালের জাতীয় কলঙ্ক ক্ষালন করে তাঁর স্বদেশের সুনাম উদ্ধারে সমর্থ হয়েছেন।' আপনার নিত্যযুক্ত বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন, ফাদার ম্যাথু, ইতি। সেণ্ট জর্জেস হোটেল, ১৮৪৫ অব্দের ১ নভেম্বর।'[১১]

সেকালে ফাদার ম্যাথুর মতো সাধুপুরুষ খুব কমই দেখা যেত—তাঁর সততা ছিল সর্বজনবিদিত—অতি স্বল্পকালের পরিচয় সত্ত্বেও এইরকম একজন নির্মলচরিত্র সন্তের কাছ থেকে দ্বারকানাথ যে এতটা শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এ-থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে দ্বারকানাথের নিজস্ব ব্যক্তি-চরিত্রে ও স্বভাবে এমন একটা মহত্ত্ব ও মাধুর্য ছিল, যা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে। এই কারণেই তিনি রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিরও শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হতে পেরেছিলেন। কর্ক থেকে ১৮৪৫ অব্দের ১ অক্টোবর তারিখে ফাদার ম্যাথু একটি যে-চিঠি[১২] লিখেছিলেন, তা থেকে সপ্রমাণ হয় ভারতীয় বন্ধুর প্রতি তাঁর কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি নিজে কতখানি খ্রীস্টান বিনয়নম্রতার অধিকারী ছিলেন :

'প্রীতিভাজন ও বহুসম্মানিত মহোদয়,

'যে শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, আমার জীবনে তা ছিল সর্বাপেক্ষা আনন্দের অভিজ্ঞতা—সে-আনন্দ আমি কখনো ভুলব না। যিনি তাঁর স্বদেশের ও স্বজাতির হিতসাধনে একনিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর মুখে আমার কাজের প্রশংসা শুনে আমি চরিতার্থ বোধ করেছি। যে-পবিত্র কর্মসাধনায় আমি রত আছি, সে-কাজে যদি আমি এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লাগতে পারি, তবে তার প্রবর্তনা পাব মানবপ্রেমিক দ্বারকানাথকে আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে লাভ করার গৌরব থেকে।

'আমার অনাবিল আনন্দের মধ্যে একটুখানি খাদ বিমিশ্রিত হয়েছে কর্ক-শহরে

আপনার উপস্থিতির হ্রস্বতা-হেতু। কিংসটন ও ডাবলিনে অতি অল্প সময়ের জন্য আপনার মহামূল্য সান্নিধ্যে আসার যে-সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, তাতে আমার তৃপ্তি হয়নি বরঞ্চ আকুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে সুদীর্ঘতর সঙ্গলাভের জন্য। আগ্রহ করে আমার হাত থেকে যে-সামান্য স্মৃতিচিহ্ন আপনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে এত উচ্চমূল্য দিয়েছেন দেখে আমি যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি, তেমনি আমার গভীর অনুশোচনা হচ্ছে যে আপনার গ্রহণযোগ্য কোনো উপহার আমার হাতের কাছে ছিল না। আপনার সামান্যতম ইচ্ছা আমার কাছে আদেশের সমতুল্য, সুতরাং আমি বেশ খুশি হয়েই কয়েক ঘণ্টা প্রতিকৃতি-শিল্পীর সামনে বসে থাকব। ভারতের যিনি প্রিন্স তাঁর পাশাপাশি একই চিত্রপটে দৃষ্টিগোচর হওয়া, আমার পক্ষে অহমিকা বিশেষ, কিন্তু আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করি—এমন সাধ্য আমার নেই...।

'জনহিতকর কাজের জন্য আপনি যে উদারহস্তের দান আমার হেফাজতে দিয়েছিলেন, আমি তার সমস্তটাই বিতরণ করে দিয়েছি উৎকৃষ্ট রিচমণ্ড বিদ্যালয়সমূহে, তরুণদের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারে আপনার ঐকান্তিক আগ্রহের কথা স্মরণ করে। আমার কথার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহলে দেখবেন আপনার জনহিতকর কাজের তুল্য প্রতিদান আপনি অতি অবশ্য পাবেন। কিন্তু মানুষের প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে আপনার জন্য যে-পুরস্কার অপেক্ষা করে আছে, তা রয়েছে আপনার হৃদয়ের ঔদার্যে এবং সেই সৎস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপের মধ্যে যাঁর পরম কারুণিক বিধান সফল করার জন্য আপনি দৃঢ়বিশ্বাসে তাঁর সহযোগিতা করে চলেছেন।

'আপনার পুনর্দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করব, আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অন্তরের গভীর থেকে প্রার্থনা জানাব। আপনার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানাই—ইতি আপনার অনুগত বন্ধু থেওবল্ড ম্যাথু।'

১৮৪৫ অব্দে ২৬ নভেম্বর তারিখের **বেঙ্গল হরকরা** লিখলেন : 'বাবু দ্বারকানাথ আয়ারল্যাণ্ড থেকে লণ্ডন ফিরে এসেছেন। আইরিশদের আতিথ্যপরায়ণতার তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সেদেশে কেউ কেউ মনে করেছেন তিনি বুঝি ভারতের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জের রাজা, কেউ কেউ তাঁকে ফলমূল নিবেদন করে তাঁর হস্তচুম্বন করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জাহাজ পোতাশ্রয়ে পৌঁছনোমাত্র সকল পতাকা এক সঙ্গে উড্ডীন করা হয়েছিল। আইরিশদের নিম্নস্তরের লোকদের অশেষ দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বাবু খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন ভারতের রায়তদের চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ।'

লণ্ডনে থাকতে একদিন সন্ধ্যাবেলা মি: গ্ল্যাডস্টোন গিয়েছিলেন দ্বারকানাথের সাক্ষাতে; দুজনের কথায়-কথায় কথা উঠল কোনো ভারতীয়ের পার্লামেন্ট-সদস্য হওয়া নিয়ে। গ্ল্যাডস্টোন বললেন, অ-খ্রীস্টান যদি সদস্যরূপে নির্বাচিত-ও হন, পার্লামেণ্টে তিনি সদস্যের আসন গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ তাঁর পক্ষে নির্দিষ্ট

শপথবাক্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বললেন, খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে যারা মেনে নিতে পারে না, তারা নিজেদের খ্রীস্টান বলে দাবি করতে পারে না। দ্বারকানাথ যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন যে, যে-হিন্দু একমেবাদ্বিতীয়মে বিশ্বাসী, তাঁর ঠিক ততখানি অধিকার আছে পার্লামেণ্টের সদস্য হবার—যেমনটা আছে খ্রীস্টের দেবত্বে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির। এ আলোচনায় দু-পক্ষের কোনো পক্ষই খুশি হতে পারেননি কারণ কেউ কাউকে স্বমতে আনতে পারেননি।[১৬]

গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে তাঁর এই আলোচনার কথা পড়লে কেমন যেন মনে হয় দ্বারকানাথ হয়তো মনে মনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হবার প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তাঁর প্রথম সফরের বেলা তিনি যেমন শীত পড়বার কিছুটা কাল আগেই স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন তেমনটা এবার করলেন না বলে সন্দেহ হয়, এবার তিনি বিলাতে দীর্ঘতর কাল কাটাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। হয়তো বিলাতেই দ্বিতীয় একটি বাসস্থান পত্তন করার বাসনাও তাঁর মনে উদয় হয়ে থাকবে। ছেলেকে তিনি এমনভাবে শিক্ষাদীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সন্তানের মতো বড়ো হয়ে উঠতে পারে। ওদিকে ভাগনে নবীনচন্দ্রকেও এমনভাবে তালিম দিচ্ছিলেন—ইংরেজ সওদাগর ও দালালদের কাছ থেকে যাতে সে দেশে ফিরে গিয়ে কার-টেগোর কোম্পানীর কাজকারবারে খানিকটা মদত দিতে পারে। তাঁর মনে ঠিক যে কী ছিল সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা শক্ত হলেও, এটুকু অনুমান করা শক্ত নয় যে তিনি কোনো কারণে তাঁর বিদেশ-বাস দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তো নিশ্চয় জানতেন ভারতে তাঁর কাজ-কারবার তাঁর অনুপস্থিতিতে খুব ভালো চলছিল না—দেশে ফিরে গিয়ে পুনরায় নিজের পরিচালনায় সব কিছুর সুরাহা করা তাঁর খুবই উচিত ছিল। তবু তিনি বিলেতেই থেকে গেলেন! শরীরস্বাস্থ্যের অজুহাত দেওয়া খানিকটা শক্ত ছিল—কলকাতায় গরম তাঁর অসহনীয় মনে হয়ে থাকে যদি, বিলেতের শীত কি তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যে সইবে!

স্পষ্টত দেখা যায় তিনি একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন : ১। কাজ-কারবারের সুরাহা করার জন্য তাঁর দেশে ফেরা দরকার, সুতরাং তিনি কি দেশে ফিরে যাবেন? ২। কাজ-কারবারের সুরাহা তো এদেশ থেকেও করা যায়। ব্যাঙ্ক যা মাসোহারা দিচ্ছে তাতে তো স্বচ্ছন্দে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো দিন কেটে যাচ্ছে। এখানে কত আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, আজ ডিনার কাল পার্টি, কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা...এ-সবকিছু ছেড়েছুড়ে সাত-তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফেরা আর কেন? দুই বিকল্পের মধ্যে দ্বিতীয়টাই তাঁকে যেন প্রলুব্ধ করল বেশি। হ্যাঁ, ঝুঁকি একটু নিতে হবে, তা না হলে মজা কিসের! ১৮৪৫ অব্দের ২ অক্টোবর তারিখে নবীনচন্দ্র কলকাতায় গিরীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'বাবু বলেছেন এক বছর বাদে আগামী বছর (১৮৪৬)

অক্টোবরে আমরা দেশে ফিরে যাব। তাহলে কলকাতা পৌঁছব ১৮৪৭ অব্দে মার্চ মাসের গোড়ায়। বাবু বলেছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার জো নেই—কারণ তুমি তো জানো, বাবুর ঘন ঘন মত বদল হয়।' ১৮৪৫ অব্দের অক্টোবর মাসে নবীনচন্দ্র যখন এই চিঠি লেখেন, দ্বারকানাথের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালো। আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে সদ্য তখন তিনি উল্লসিত চিত্তে লণ্ডন ফিরে এসেছেন। সেখানে তিনি যে রাজকীয় সম্মানে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন তাতে গর্ববোধ করার মতো হেতু ছিল যথেষ্ট, হয়তো তার ফলে তাঁর উচ্চাশাও খানিকটা প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে।

পুত্র নগেন্দ্র তখন নিয়মিত অশ্বপৃষ্ঠে হাইড পার্কে বেড়াতে যান, অভিজাতবংশীয় ইংরেজ তরুণের সব রকম কায়দাকানুন ও সহবৎ তাঁর তখন নখাগ্রে। ভাগনে নবীনচন্দ্রের ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল বেশ চালাক চতুর বুঝদার সওদাগর হবার পথে সে বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নবীনচন্দ্রের আচার-ব্যবহারে মামা বেশ খুশি—বেশ মিতাচারী ও সংযমী; অপর ভাগনে চন্দ্রমোহনের মতো মোটেই নয়। ১৮৪২ অব্দে প্রথম সফরের সময় চন্দ্রমোহনকে সঙ্গে এনে একটু যেন পস্তাতে হয়েছিল, কারণ 'এ কেবল বিলেতী মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা ছাড়া তার অন্য কোনো ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল না।' ডাকের জাহাজ প্রতি ক্ষেপে কলকাতা থেকে প্রচুর মূল্যবান সামগ্রী আনত—ডজনে ডজনে উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল, নানারকম আতর, আর বোতলে বোতলে আচার, চাটনী ও ভারতীয় রন্ধনকলার বিবিধ মশলা। মহিলাদের এসব জিনিস ভারি পছন্দ, তাছাড়া চিত্তবিনোদনের বিচিত্র ব্যবস্থা করতে গেলে এসব জিনিস খুবই কাজে লাগে।

## টীকা

১। *Memoir*, p. 109

২। *Bombay Courier*, April 7, 1846. এই কাগজের সম্পাদক দ্বারকানাথ ও তাঁর দলবলের সঙ্গে সুয়েজে মিলিত হন। পরে তিনি খেদিভের প্রাসাদে দ্বারকানাথের সঙ্গে খেদিভের সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা লিখেছিলেন। বর্তমান উদ্ধৃতি সেই বর্ণনা থেকে নেওয়া।

৩। *Memoir*, p. 111.

৪। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগারে ১০ নং ডকেট।

৫। তদেব।

৬। *Memoir*, pp. 111-112 দুঃখের বিষয় কিশোরীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেননি খবরের উৎস কি।

৭। তদেব, পৃ. ১১২-১১৩।

৮। India Gazette, 8 October, 1892.

৯। Oxenford (1811-77) খ্যাতনামা সমালোচক ও নাট্যকার; Tom Taylor (1817-80) নাট্যকার

ও এককালে *Punch* পত্রিকার সম্পাদক; William Harrison Ainsworth (1805-82) ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক।

১০। *Memoir,* p. 115.

১১। তদেব, পৃ. ১১৫।

১২। Daniel O'Connell (1775-1847) আইরিশ দেশপ্রেমী, রাজনীতিক, আইনবিশারদ ও পার্লামেণ্ট-সদস্য। দেশের লোক তাঁর নাম দিয়েছিল 'The Liberator'–মুক্তিদাতা।

১৩। Father Theobald Mathew (1790-1856), আইরিশ দেশপ্রেমী ও নেশাবন্ধী আন্দোলনের নেতা। ক্যাথলিক Cupuchin সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজক। কর্ক-শহরে বহু বৎসর মদ্যপানের বিরোধী আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন। Encyclopaedia Britannica বলেন . 'স্বদেশে (আয়ারল্যাণ্ডে) তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। কালে সে-প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ইংলণ্ডে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৪৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর জন্য একটি পেন্সনের ব্যবস্থা করে দেন। ১৮৫৬ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কুইনস টাউনে তাঁর মৃত্যু হয়।'

১৪। ১৮৪৬ অব্দের আগস্ট মাসে লণ্ডনে দ্বারকানাথের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর এই প্রসিদ্ধ প্রতিকৃতিটির কী গতি হয়েছিল বর্তমান লেখকের কাছে তা অজ্ঞাত।

১৫। মূল চিঠি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন অভিলেখাগারে রক্ষিত।

১৬। *Memoir,* p. 116.

□

একাদশ পরিচ্ছেদ

## পারীর প্রহসন

১৮৪৫ অব্দের ২০ নভেম্বর তারিখে গিরীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে নবীনচন্দ্র খবর দিলেন : 'শুনছি ফরাসীদের রাজা খোঁজ নিয়েছেন মামা পারী যাচ্ছেন কি না, সুতরাং কিছুকালের জন্য তাঁর পারী না গেলেই নয়।'

দ্বারকানাথের তখন বিলেতে প্রথমবার শীত যাপনের পালা চলছে, বিলিতি আবহাওয়ার খামখেয়ালী তখন তাঁর শরীরে ঠিক বরদাস্ত হচ্ছিল না। কাজেকাজেই মেজর হেণ্ডারসন ও তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মি: সেফ-কে সঙ্গে নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর তারিখে তিনি পারী রওনা হয়ে গেলেন। ছেলে ও ভাগনে লণ্ডনেই রয়ে গেল। নবীনচন্দ্র লিখলেন : 'এখানে আমাদের কত কাজ, পারী গিয়ে কী হবে!' ১৮৪৬ অব্দের ৭ জানুয়ারি তারিখের চিঠিতে নবীনচন্দ্র লিখলেন : 'বাবু পারীতে বেশ ভালো আছেন এবং খুশিতেই আছেন। শরীর-স্বাস্থ্যও দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।' পারী শহরে দ্বারকানাথ ভাড়া নিলেন সেখানকার এক ফ্যাশনেবল হোটেলের সবচেয়ে বড়ো একটি সুঈট—পরস্পরসংলগ্ন অনেকগুলি কক্ষ।

দ্বিতীয়বার পারী শহরে উপস্থিতি-কালে, দ্বারকানাথ ভারতবিদ্যাবিশারদ ফ্রেডরিশ ম্যাকসমূলরের নিকটসান্নিধ্যে আসেন। ম্যাক্সমূলর তখনো ঋগ্বেদ সংকলন ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনো ছড়িয়ে যায়নি সর্বত্র। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা ম্যাক্সমূলর ও তাঁর পত্নী উভয়েই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সম্প্রতি নীরদ চৌধুরী এই দুজনের লেখা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে[১] একটি বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলর স্বয়ং প্রত্যক্ষত এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, তাঁর পূর্ণতর বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে :

'ভারতীয়েরা আজকাল যেমন স্বাধীনভাবে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ায়, পঞ্চাশ বছর আগে তেমন ছিল না। কালাপানি পার হবার পাপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে এমন সব জটিল প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ছিল যে, তখনো সাগর পার হওয়া নিয়ে ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের অবধি ছিল না। সুতরাং ১৮৪৪ অব্দে[২] একজন জ্বলজ্যান্ত হিন্দু পারী শহরে আবির্ভূত হয়েছেন জেনে শহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আমারও মনে গভীর ইচ্ছা জেগেছিল সেই ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে। দেখতে শুনতে তিনি

খুবই সুপুরুষ, উপরন্তু যখন জানা গেল পারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেলে সবার সেরা কক্ষগুলি তিনি ভাড়া নিয়েছেন—সর্বত্র তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ল। আমি তখন কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ প্রফেসর বার্নুফ-এর বক্তৃতাবলী শুনতে মগ্ন। ভারতীয় অতিথি একদিন কলেজে এলেন ফরাসী দেশের মহাপণ্ডিত সন্দর্শনে। প্রফেসরের নামে তিনি কিছু পরিচয়পত্র সঙ্গে এনেছেন। উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় আমি উপস্থিত থাকায়, প্রফেসর আমার সঙ্গে সেই অপরিচিত ভারতীয়ের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। অনতিকাল পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার বেশ ঘনিষ্ঠ হল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভারতের সর্বজনমান্য ও প্রভূত বিত্তশালী পরিবারের প্রতিভূ—তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখনো জীবিত, পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন। তরুণ বয়সে যখন তিনি বিলাতে ছাত্ররূপে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, তিনি বহু বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর দেশ ও দেশের মহারাণীর সেবা করে সম্প্রতি তাঁর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

'দ্বারকানাথ ঠাকুর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রথম যেবার অ্যাঁস্তিত দা ফ্রাঁস-এ তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি, বার্নুফ তাঁকে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত একখণ্ড ভাগবতপুরাণ উপহার দিয়েছিলেন—গ্রন্থের একদিকের পাতায় মূল সংস্কৃত-পাঠ, পাশের পাতায় ফরাসী অনুবাদ। দেখে খুব আশ্চর্য লাগল যে ভারতীয় অতিথি তাঁর পিঙ্গল রঙের পেলব আঙুল ফরাসী অনুবাদ-সম্বলিত ডান দিকের পৃষ্ঠায় বুলিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা, এটা যদি পড়তে পারতাম!' তিনি তাঁর দেশের প্রাচীন ভাষা জানতে চাইবেন, বুঝতে চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক হত, কিন্তু না, তিনি তৃষিত ছিলেন ভালো করে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করার জন্য।

'তিনি না ছিলেন প্রত্নবিদ, না নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত, বেদ-বেদান্তের ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল যৎসামান্য। কিন্তু বার্নুফ তাঁকে যখন আমার গবেষণা-সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা বললেন এবং জানালেন কীভাবে পারী শহরে বসেই আমি বেদের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে বিভিন্ন সূক্তের মূল পাঠ ও পাঠান্তর সংকলন ও কপি করায় ব্যাপৃত আছি—তখন আমার সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি আমায় তাঁর হোটেলে আমন্ত্রণ করলেন—অধিকাংশ দিন সকাল বেলাটা তাঁর ওখানেই কাটত, তিনি ভারতের কথা বলতেন, ভারতীয়দের আচার-ব্যবহারের কথা বলতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংগীতে তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর এবং ইতালিয়ান ও ফরাসী সঙ্গীতে নিজের চেষ্টায় রুচি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত আমাকে পিয়ানোয় বসিয়ে তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করানো, অত্যল্প কালের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম তাঁর গানের গলা ভালো এবং তিনি তালিমও পেয়েছেন ভালোই। সুতরাং

সদ্ভাব জমতে দেরি হল না। একদিন প্রাতে ইতালিয়ান সঙ্গীতে তাঁর সুরুচির প্রশংসা করে, তাঁকে অনুরোধ করলাম খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীতের কিছু নমুনা শোনোতে। প্রথম প্রথম তিনি যা গাইলেন তা নামেই ভারতীয় কিন্তু আসলে ফারসী—তার বিশেষ কোনো শৈলী বা ঘরানা কিছু ছিল বলে মনে হল না। আমি তো সেরকম গান শুনতে চাই নি, তাই জিজ্ঞাসা করলাম আসল ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত তাঁর কিছু জানা আছে কি না। তিনি হেসে মুখখানা ঘুরিয়ে বললেন, 'সে তোমার ভালো লাগবে না।' ক্রমাগত আমার নির্বন্ধের ফলে তিনি পিয়ানোয় বসে একটা সুর ভেঁজে নিয়ে, নিজেই সঙ্গত করে গাইতে শুরু করলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগল শুনতে—তিনি যা গাইলেন মনে হল তাতে না আছে সুর, না ছন্দ, না সঙ্গতি। তাঁকে যখন এই কথা বললাম তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'ওই তো, তোমাদের সকলের একই ধারা : অপরিচিত হলেই তোমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়—আর গান শুনে সদ্য সদ্য যদি তোমাদের শ্রুতিমধুর মনে না হয়, তোমরা মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকো। আমি যখন প্রথম ইতালিয়ান গান শুনি মনে হয়েছিল এ আবার গান নাকি। কিন্তু আমি তালিম নিতে ছাড়িনি, ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন শিক্ষা করেছি, তবে-না আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে, তবেই তো—তোমাদের ভাষায়—আমি বুঝতে শিখেছি। কেবল সঙ্গীত কেন, শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই এই কথাটা প্রযোজ্য। তোমরা হয়তো বলবে আমাদের ধর্ম ধর্মই না, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শন নয়। য়ুরোপ যা-কিছু সৃষ্টি করেছে আমরা তা বুঝতে চাই, ভালো লাগাতে চাই, তাই বলে মনে কোরো না যেন ভারত যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তা আমরা হেয় জ্ঞান করি। যদি আমরা তোমাদের সঙ্গীত যেমন অভিনিবেশে শিক্ষা করে থাকি, তোমরা তেমনি অভিনিবেশে আমাদের সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারো, তাহলে দেখবে আমাদের সঙ্গীতে সুর, ছন্দ ও সঙ্গতি—সব কিছুই রয়েছে তোমাদের সঙ্গীতের মতো, কোনো ইতরবিশেষ নেই। আর যদি তোমরা মন দিয়ে আমাদের কাব্য বা ধর্মশাস্ত্র বা দর্শন অধ্যয়ন করতে পারো, তাহলে দেখবে তোমরা যাকে অসভ্য বর্বর বা দুর্বৃত্ত বলে থাকো, আমরা সেরকম মোটেই নই, জ্ঞানের অতীত পুরুষকে তোমরা যতটুকু জেনেছো আমরা তার চেয়ে কিছু কম জানবার চেষ্টা করিনি—হয়তো তোমাদের চেয়েও আরো একটু গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পেরেছি।'

'তিনি যা বললেন খুবই খাঁটি কথা। হঠাৎ একটা উত্তেজনায় তিনি বাঙ্ময় হয়ে উঠলেন, তাঁকে শান্ত করবার জন্য আমি তাঁকে বললাম ভারতের নিজস্ব একটি যে সঙ্গীতবিজ্ঞান আছে এবং তার ভিত্তি যে গাণিতিক—সে আমি জেনেছি। সঙ্গীত-সম্পর্কিত কিছু কিছু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিও আমি সযত্ন-পরীক্ষায় পড়ে দেখেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। প্রফেসর হোরেস হেম্যান উইলসন বহুবছর ভারতে বসবাস করেছেন, নিজে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ—তাঁকে একবার ভারতীয় সঙ্গীত

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমায় খুব উৎসাহ দেননি। তিনি আমায় বলেছিলেন যে ভারতে থাকতে তিনি এমন একজন দেশীয় সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে গিয়েছিলেন যিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। সপ্তাহে দু-তিনবার উইলসন তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য যাবেন—এই শর্তে তিনি শেখাতে রাজিও হয়েছিলেন, বলেছিলেন তাহলে ছ-মাস শিক্ষানবিশি করার পর তিনি উইলসনকে বলতে পারবেন তাঁর দ্বারা সঙ্গীত-শিক্ষা হতে পারবে কি না। তারপর তিনি যদি অধিকারী প্রমাণিত হন এবং পাঁচ বছর নিয়মিত শিক্ষা লাভ করতে পারেন তা হলে তাত্ত্বিক ও প্রাযুক্তিক উভয় দিক থেকে তিনি সঙ্গীতে পণ্ডিত বলে পরিগণিত হতে পারবেন। উইলসন তখন ভারতীয় সিভিলিয়ান—সম্ভবত টাকশালের কর্তা ও আরো অনেক কিছু, দুহাতে কাজ করেও তাঁর কাজ ফুরোতে চাইত না, অথচ তারই মধ্যে পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক-কিছু তিনি শিক্ষা করে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞের কাছে পাঁচ বছর সাগরেদি করা তাঁর আর হয়ে ওঠেনি। আমার কাছে এই গল্প শুনে দ্বারকানাথ ঠাকুর খুবই আমোদ পেলেন, কিন্তু বলতে ছাড়লেন না যে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের সমস্ত জটিলতা কেউ যদি আয়ত্ত করতে ইচ্ছুক হন তাহলে ন্যূনতম সময় তাঁর লাগবে অন্তত পাঁচ বছর। তাঁর কাছ থেকে এই কথা শোনবার পর থেকে **সঙ্গীতরত্নাকর**-এর মতো কোনো প্রাচীন গ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়নের আশা আমায় চিরতরে বিসর্জন দিতে হয়— অথচ ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারে ভারতীয় শাস্ত্র-সঙ্গীতের বই ও পাণ্ডুলিপি দেখলেই আমার যে কী-পরিমাণ কৌতূহল হত—সে আমি বলতে পারি না।

'আমার ভারতীয় বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না সত্য, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান ইহজাগতিক মানুষ ছিলেন; ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা ছিল। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভারতে ফিরে যাবার পর তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না। প্রশ্ন শুনে তিনি খুব হাসতে হাসতে জবাব দিলেন : 'না হে না! আমি তো এদেশে আছি, দেশে বহু ঘর ব্রাহ্মণ আমার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে—সে-ই তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।'[*]

'তাঁর স্বদেশের ব্রাহ্মণদের তিনি হেয় জ্ঞান করতেন সত্য, তাই বলে এ-দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর যে কিছু বেশি শ্রদ্ধা ছিল এমন নয়—তিনি তাঁদের বলতেন কালো-কোট-পরা বিলিতি বামুন। ইংরেজদের অনেক-কিছু বিষয়ে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও ইংরেজ সমাজের এবং বিশেষ করে বিলিতি যাজক-সম্প্রদায়ের খুঁত ধরতে তিনি খুবই মজা পেতেন। রাজনীতি ও ধর্ম-সম্পর্কিত বহু পত্র-পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। তাঁর একটি কালো মলাটওয়ালা খাতা ছিল, যখনি কোনো বিশপ বা পাদ্রী প্রভৃতির নিন্দা কলঙ্কের খবর বের হত, তিনি তা সযত্নে সেই কালো খাতায় টুকে রাখতেন। গির্জার অ-গৌরবজনক সকল প্রকার কুৎসার সেই খাতা ছিল এক অতি অদ্ভুত সমাহার। অনেকবার ভেবেছি সেই খাতার কী গতি হয়েছে। তাঁর

ঋষিপ্রতিম পুত্র ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয় ধর্মযুদ্ধে এরকম অস্ত্র ব্যবহার করতেন না। কিন্তু সে-খাতা তাঁর পিতাকে প্রচুর কৌতুকের রসদ জোগাত—যখনই ভারতের ধর্ম ও খ্রীস্টানদের ধর্ম নিয়ে তর্কবিতর্ক হত, তিনি সেই খাতা টেনে বের করতেন। আমার নিজের তো মনে হয়, পুরোহিত-সম্প্রদায়কে দিয়ে কোনো ধর্মের উৎকর্ষ বিচার করতে যাওয়া ভুল—তা সে ধর্ম ইতালির হোক, বিলেতের হোক কিম্বা ভারতেরই হোক।

'দ্বারকানাথ যখন পারী শহরে ছিলেন প্রাচ্যদেশ-সুলভ আড়ম্বরের মধ্যে বসবাস করতেন। রাজা লুই ফিলিপ কেবল যে তাঁকে তাঁর প্রাসাদে অভ্যর্থনা করেছিলেন এমন নয়, আমার যতদূর স্মরণ হয় দ্বারকানাথের একটি জমকালো সান্ধ্য মজলিসে সপরিষদ যোগদান করে তাঁকে সম্মানিতও করেছিলেন। সেই মজলিসে ঘর সাজানো হয়েছিল ভারতের বহুমূল্য শাল-দোশালা টাঙিয়ে। পারীর সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কাছে সে-সময় ভারতীয় শাল ছিল বিলাসিতার চূড়ান্ত। মজলিস শেষ হবার পর মহিলারা যখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, ভারতের এই প্রিন্স তাঁদের প্রত্যেকের কাঁধে একটি করে শাল জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা এই উপহার পেয়ে কত যে আনন্দ লাভ করে থাকবেন, সে এখন অনুমানের বিষয়।

'বিলাতে থাকতে ভারতের মহান ধর্মসংস্কারক রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের কৃত্য পালনের উদ্দেশ্যে, দ্বারকানাথ ব্রিস্টলের গোরস্থানে রামমোহনের ভস্মশেষের[১] উপর একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নিশ্চয় তাঁর মনেও হয়নি যে রামমোহনের মতো তিনিও বিদেশের মাটিতে দেহরক্ষা করবেন।

'আমার ধারণা ভারতে বেদ-অধ্যয়নের জন্য একটি নূতন উদ্দীপনার সূত্রপাত দ্বারকানাথই করেছিলেন। খুবই আশ্চর্য ও অদ্ভুত মনে হতে পারে, যে-দেশে বেদ সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত ছিল, অভ্রান্ত ও ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্ররূপে যার মর্যাদা ছিল ইংলণ্ডের নিউ টেস্টামেন্ট-এর বহুগুণ বেশি, হিন্দুদের সেই বাইবেল কখনো ছাপা হয়নি, ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি-আকারে কিংবা মুষ্টিমেয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্থ হয়ে বেদ বেঁচে ছিল। বেদ-অধ্যয়নে এমনি অবহেলা ছিল যে পরলোকগত জে. মুইর যখন বেদ-সম্পাদনার জন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে পারিতোষিক দিতে চেয়েছিলেন, তখন দেশীয় পণ্ডিতদের একজনও এগিয়ে আসতে চাননি অথবা এগিয়ে আসতে পারেন নি। তাই দ্বারকানাথ যখন দেখলেন আমি নীরব অধ্যবসায়ে চতুর্বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সকল বেদের সার ঋগ্বেদের একটি প্রামাণ্য সংকলন সম্পাদনায় নিযুক্ত আছি, যখন বুঝলেন পারী ও বার্লিনের রয়্যাল লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত ঋগ্বেদের তাবৎ পুঁথি নকল করে পাঠান্তর নিয়ে আমি গবেষণায় রত আছি এবং আমার গবেষণার কাজ অনতিদূরকালে লণ্ডনে সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে—তখন তিনি সম্ভবত পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লিখে পারীতে আমি যে কী কাজ করছি তার

একটা বিবরণ জানিয়ে থাকবেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মধর্ম ও ধর্মসংস্কারের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। পিতার পত্র যখন তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছল, তারই কাছাকাছি একটা সময়ে তিনি চারজন তরুণ শিক্ষার্থীকে পাঠিয়ে দিলেন পুণ্যধাম বারাণসী গিয়ে পণ্ডিতদের নির্দেশে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করতে—একজন পড়বে ঋগ্বেদ, একজন সামবেদ, একজন যজুর্বেদ এবং চতুর্থজন পড়বে অথর্ববেদ। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং একটি পত্রে বলেছিলেন যে পিতার পত্রপ্রাপ্তি ও বারাণসীতে ছাত্র-প্রেরণ যুগপৎ সংঘটিত হলেও পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল না।'

ম্যাক্সমূলর 'একটি জমকালো সান্ধ্য মজলিসে' সপরিষদ রাজা লুই ফিলিপের যোগদানের কথা লিখেছেন। পারী শহরে দ্বারকানাথ যে-তিন মাস কাটিয়েছিলেন সেইটুকু সময়ের মধ্যে তিনি হয়তো একাধিক মজলিসের আয়োজন করে থাকবেন। ১৮৪৬ অব্দে ১৪ মার্চ তারিখে লণ্ডনের **কোর্ট জর্নাল**' একটি সুদীর্ঘ ও বহু-বিস্তারিত, এবং সম্ভবত উদ্ভট অত্যুক্তিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন দ্বারকানাথের আয়োজিত এমন একটি পার্টির বিষয়ে। জনমানসে এইসব জাঁকজমকের কীরকম প্রতিক্রিয়া ঘটত তার একটা ইঙ্গিত দেবার জন্য পুরো বিবরণটুকু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। ম্যাক্সমূলরের জীবনচরিতে দ্বারকানাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নীরদ চৌধুরী লিখেছেন : 'ফরাসীদের রাজধানীতে তিনি যে রোমাঞ্চকর উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন দুমা'-র 'কাউন্ট অব মন্তেক্রিস্তো' ছাড়া তেমনটা আর কেউ করতে পারেন নি।' সে যাই হোক, আপাতত ফিরে যাওয়া যাক **কোর্ট জর্নাল**-এ প্রকাশিত সেই বিবরণে :

'পারী শহরের ফ্যাশনদুরস্ত জগতে বর্তমানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-ঘটনা ঘটে গেল, সে হল হোটেল স্টাকপুলে বিখ্যাত ভারতীয় ব্যাঙ্ক-মালিক, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর-আয়োজিত আড়ম্বরে অতুলনীয় সান্ধ্যভোজের উৎসব। আমাদের পাঠকসমাজ সোৎসাহে এই উৎসবের বিবরণ অনুধাবন করবেন, কারণ নিঃসন্দেহে বলা যায় পারীতে আতিথেয়তার যে ঐশ্বর্য-সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এই ভারতীয় ধনকুবের নিশ্চয় তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন এই লণ্ডন শহরে। এই শহরেও তাঁর অতিথি-সম্বর্ধনার আন্তরিকতা সর্বজনবিদিত।

'বিলাস-বৈভবে, পরিকল্পনার মৌলিকতায় এবং সেইসব পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার অপূর্ব সাফল্যে, এ-উৎসব অতুলনীয় হয়েছিল। পারী শহরে এই সেদিন পর্যন্ত অনেকে মুগ্ধ প্রশংসায় এবং সখেদে স্মরণ করেছে লর্ড সীমূর, কর্নেল থর্ন, মি: হোপ প্রভৃতি ব্যক্তিরা অতিথি-আপ্যায়নে কেমন দু-হাতে দেদার খরচ করতেন। আমাদের এই লণ্ডন শহরেও আমরা এখনো স্মরণ করি সেই সব ভোজ-উৎসবের কথা, যার আয়োজন করতেন ডাচেস অব সাদারল্যাণ্ড, ডাচেস অব বাকলীচ, মার্শিওনেস অব লণ্ডনডেরি এবং ডিউক অব ডেভনশায়র-এর মতো অভিজাত সমাজের নামকরা আতিথ্যপরায়ণ ব্যক্তিরা, যাঁরা সাজসজ্জা সমারোহে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। হোটেল

স্টাকপুলে আমরা এবার যে আশ্চর্য অদ্ভুত পরীস্থান দেখে এলাম, শোভায়, ঐশ্বর্যে ও সমারোহে তা এঁদের সকলকেই অতিক্রম করেছে।

'হোটেল স্টাকপুল—রু সাঁতোনরে-এর উপর অবস্থিত একটি অতি চমৎকার হোটেল, হোটেল-সংলগ্ন বাগান প্রায় গিয়ে ছুঁয়েছে সাঁজেলিজে উদ্যান। এই হোটেলে আমাদের এই ধনাঢ্য নবাব (কেউ কেউ বলে অর্থেবিত্তে ইনি কিঞ্চিদধিক ত্রিশ লাখের মালিক) গত দু-মাস ধরে এক নাগাড়ে রয়েছেন। দু-হপ্তা যেতে না যেতে হোটেল স্টাকপুলের আগাপাছতলা রূপান্তর ঘটে গেল—মাটির তলার গুহাঘর থেকে শুরু করে উচ্চতম ছাদের চিলেকোঠা পর্যন্ত। তারপর এ-হোটেলের সভারম্ভ যে বিরাট সমারোহে হল তা যে না দেখেছে তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত।

'হোটেল-সংলগ্ন বাগানের প্রবেশপথে ঢুকতে হলে আভিন্যু দ্য মারিনি দিয়ে আসতে হয়। সন্ধ্যা আটটা বাজতে না বাজতে আভিন্যুর সারাটা পথ খুব এক অদ্ভুত ও অভিনব উপায়ে আলোকিত করা হয় : পাঁচ-শো জন লোককে প্রাচ্য ধরনের শাদা পোশাক পরিয়ে রাস্তার দু-ধারে কিছুটা অন্তর অন্তর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে জ্বলন্ত মশাল, কোনো একটা সংকেতের সূত্র ধরে সেই সব জ্বলন্ত মশাল কখনো তোলা হচ্ছে ওপরে কখনোবা নামানো হচ্ছে মাটির দিকে, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনোবা বনবন ঘোরানো হচ্ছে মাথার চারদিকে। কখনো মশালধারীদের দেখে মনে হচ্ছে দেবদূত, কখনোবা প্রেতলোকের বাসিন্দা। এক মুহূর্তে মনে হল মশালগুলো যেন শুয়ে আছে গাছতলায়, পরমুহূর্তে দেখা গেল গাছের ডালপালা যেন আগুনে আগুনময়। কিছু কিছু ঘোড়া এইসব চলমান আলো দেখে ভয় পাবার ফলে, পরে মশালধারীদের স্থির হয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। উদ্যানে প্রবেশমুখের উলটো দিকে আভিন্যু-র অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট একটি পারসিক বুটিদার চাঁদোয়া টাঙানো, পায়ের তলায় মহামূল্য পুরু গালিচা বিছানো। এখানেই নিজ নিজ গাড়ি থেকে নেমে অতিথিরা প্রবেশ করলেন। এখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল একটি সেলুনে, তার চারিদিকে সারি সারি আয়না, সেখানেই অতিথিরা তাঁদের বহির্বাস জিম্মা করে দিলেন। সেলুনে ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন নেপথ্যবিধানকারিণী, পরনে তাঁদের ভারতীয় পোশাক, সাজপোশাকে প্রসাধনে গোছগাছ বা বিন্যাসের কাজটা তাঁরা ক্ষিপ্র অথচ নিপুণ হাতে সারিয়ে দিচ্ছিলেন। অতিথিদের পরিচারকবর্গের জন্য বিরাট একটি গ্যালারির ব্যবস্থা ছিল—রাতে একটা সময়ে সেখানে জমায়েত হয়েছিল প্রায় বারো-শো পরিচারক। তাদের খেলাধুলো বিনোদনের জন্যও পৃথকভাবে প্রচুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই গ্যালারিতে মোতায়েন রাখা হয়েছিল বিশেষ উর্দিপরিহিত বিশজন ঘোষককে। যখনি কোনো প্রভু বা প্রভুপত্নীর প্রয়োজন হচ্ছিল স্ব-স্ব পরিচারকের, ঘোষক তাদের নাম ঘোষণা করছিল বজ্রনির্ঘোষে। এইভাবে সম্ভাব্য যতরকম জরুরী অবস্থা ঘটতে পারে—তা বৃহৎ হোক বা যৎসামান্য হোক—সব

কিছু কথা আগে ভাগে ভেবেচিন্তে এমন সুন্দর ও রুচিকর ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল যা সুসভ্য য়ুরোপের সংস্কৃতিবান পরিবেশেও অভাবনীয়।

'কিন্তু এতসব আশ্চর্য ব্যাপার অত্যাশ্চর্য আরো অনেককিছুর প্রস্তুতি মাত্র। ফুল ও লতাগুল্মে সুসজ্জিত চারটি তোরণশ্রেণী, প্রত্যেকটিতে পারসিক যোদ্ধৃবেশে দু-জন করে দ্বারপাল, কাঁধে তাদের নগ্ন তলোয়ার—চারিদিকের এই চারটি তোরণ-শ্রেণী অতিক্রম করার পর নজরে এল এক বিরাট-আকার কক্ষ—তার চার দেওয়াল ও ছাদ ঢেকে দেওয়া হয়েছে অজস্র গোলাপে, গোলাপী রঙের স্ফটিক ঝাড়-লণ্ঠন থেকে মৃদু একটি দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে কক্ষের সর্বত্র। এখানে প্রত্যেক মহিলা ক্যামিলিয়া ফুলের একটি করে স্তবক পেলেন, প্রত্যেক তোড়ার মধ্যে একটি করে রূপোর বোঁটা, তার মাথায় হয় এক খণ্ড চুনি, নয়তো নীলকান্ত মণি, নয় তো পান্না—আর এইসব মূল্যবান পাথরের ফুল ঘিরে যে-সব রূপোর পাতা—তার একটিতে কালো মিনেতে কী-যেন সব লেখা—দুর্বোধ্য অক্ষরে কী যেন এক রহস্য!

'এই গোলাপী কক্ষ পেরিয়ে অতিথিরা প্রবেশ করলেন বিরাট বড়ো এক বাগানে—সেখানে গাছে গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ও নবকিশলয়—যদিচ শীতের মরশুমে এইসব গাছের পুষ্পিত পল্লবিত হবার কথা নয়। ইতস্তত দেখা গেল গোলাপের কুঞ্জ, লাইলাকের কিংবা পুষ্পলতার ঝাড়, কোথাও কমলালেবুর গাছ মঞ্জরিত, যুঁই ফুটেছে অজস্র—সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। সারা বাগানের মাথার ওপব বিরাট এক শামিয়ানা, সেখান থেকে ঝুলছে অজস্র গোলাকার আলোর ফানুস, বাগানকে আলোময় করে রেখেছে। চোখের আড়ালে বড় বড় নলের ভিতর দিয়ে গরম জল চলাচল করানোর ফলে মনে ভ্রম হচ্ছিল সময়টা বসন্তের আলোকোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর। এই বাগানে হরেকরকম পাখির গান শোনা গেল, ঝরণার ঝর ঝর শব্দের সঙ্গে ভেসে এল যেন পোলকা অথবা ওয়লৎস নাচের বাজনার দূরাগত সুর। বাগানের ধারেই নাচের কক্ষ। ইতস্তত দেখা গেল অতিথিরা আরামে আধশোওয়া অবস্থায় পুষ্পিত ম্যাগনোলিয়া কিম্বা মঞ্জরিত কমলাগাছের তলায় বিশ্রম্ভালাপ করছেন। বাগান পেরিয়ে অতঃপর ঢোকা গেল নৃত্যগীত-মুখরিত বলরুমে। বলরুমের পাশে লম্বা গ্যালারি, দেয়ালে ঝুলছে রূপোর জরির কাজ-করা সুন্দর সুন্দর পর্দা, সেইসব পর্দার সামনে সোনালি রেশমে মোড়া সিংহাসন-সদৃশ আসনে আসীন—দ্বারকানাথ ঠাকুর—যিনি এই অত্যাশ্চর্য উৎসবের হোতা, যাঁর পরিকল্পিত এই সমস্ত আয়োজন। তিনি আসনস্থ থেকেই অতিথিদের এমনভাবে সম্বর্ধনা করলেন যে তাঁর সেই সম্বর্ধনার মধ্যে বিনয়ের পরাকাষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল আত্মমর্যাদার গরিমা। য়ুরোপীয়দের কাছে এ-রকম সম্বর্ধনার ধরন একটু অদ্ভুত মনে হলেও, উৎসবের প্রাচ্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর আচরণের একটি সুন্দর সঙ্গতি লক্ষণীয় হয়েছিল।

'এই গ্যালারি পার হবার পর অনেকগুলি কক্ষ—কোনোটিতে নাচ হচ্ছে, কোথাও

নিরিবিলিতে আলাপ-আলোচনা চলছে, কোথাও চলছে জুয়ো খেলা। প্রত্যেকটি কক্ষের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি। আরো একটু দূরে কনসার্ট রুম—সেখান থেকে যাঁদের কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন লাবলাশ, গ্রিসি, পেরসিয়ানি, দোরুস, গাস প্রভৃতি। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রুচির তৃপ্তিসাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ—সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কখন দরজা খুলবে। হঠাৎ এক সময়ে গান থেমে গেল, নাচের বাজনা নীরব হয়ে গেল—এবং সেই সময়ে দরজাও খুলল। সবাই ভিড় করে ঢুকল সেই কক্ষে—দেখা গেল সেখানে অদ্ভুত আকারের অনেকগুলি টেবিলের উপর স্তূপাকার সজ্জিত রয়েছে কাশ্মীরি শাল, ভারতীয় কারুশিল্পের বিচিত্র সব নিদর্শন, চীন ও জাপানের চীনামাটির বাসন, মণিমুক্তা এবং আরো অনেক দুর্লভ ও কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রী। পিতলে তৈরী একটি তেপায়া টুলের উপর প্রকাণ্ড একটি রূপোব পাত্রে রক্ষিত ছিল অনেকগুলি টিকিট—প্রত্যেকটি টিকিটে একটি করে নকশা—সেই গোলাপীকক্ষের রূপোর পাতার উপর মিনেকরা নকশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঁকা। বাইজীর সাজ পরে একটি মেয়ে রূপোর পাত্র থেকে একটি করে টিকিট তুলে নিতেই সেই টিকিটের নকশা, না জানি কেমন করে ফুটে উঠল আলোর অক্ষরে পিছনেব কালো পর্দার উপর। তখন রূপোর পাতার উপর মিনেকরা নকশার সঙ্গে মিলিয়ে, কোনো সৌভাগ্যবতী লটারীতে-পাওয়া তাঁর উপহার দাবি করতে পারলেন। এইভাবে আটশো উপহারের বিলিব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্যারোনেস দ্য মা পেলেন চীনামাটির টীপট, মারকুইজ দা পাস্টোরে একটি ভারতীয় মসলিনের পোশাক, কাউণ্টেস দোফ সোনার জরিতে কাজকরা একখণ্ড কাপড় এবং মাদাম রোনচোনি পেলেন আট হাজার ফ্রাঁ মূল্যের একটি কাশ্মীরি শাল।

'লটারী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হল বল-নাচ এবং চলল ভোর চারটা অবধি। অতঃপর সূচনা হল একটি নূতন পর্বের, সামনের প্রকাণ্ড চাতাল রূপান্তরিত হল বিরাট এক খানা-কামরায়। সেখানে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য-পেয়ের সমাহার, আঠারোটি টেবিল পাতা হল, প্রত্যেকটি টেবিলে দু'শোরও বেশি অতিথি খানা খেতে বসলেন। চাতালের টেবিলে যাঁরা বসতে পেলেন না, তাঁদের জন্য দোতলার তিনটি বিরাট কক্ষে টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছিল—দোতলার জানলা থেকে চাতালের বিরাট ভোজসভা চোখে পড়ার মতো দৃশ্য। ভোজসভার এক ধরনের কৃপণ ব্যবস্থা আছে—মহিলারা যখন প্রথম দফায় টেবিলে বসে আহারাদি করতে গেছেন, ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁদের চেয়ারের পেছনে। মহিলাদের পালা শেষ হলে পর আবার টেবিল সাজিয়ে পুরুষদের বসানোর ব্যবস্থা হয়। এই ভোজসভায় প্রত্যেকের একযোগে বসার ব্যবস্থা ছিল। সান্ধ্যবেশ পরিহিতা, সুচারু প্রসাধনে সুসজ্জিতা, সালংকারা মহিলা-অতিথিদের রূপের দীপ্তি যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল শাদা-কালো ডিনার পোশাকধারী পুরুষ-অতিথিদের

প্রতিতুলনায়। সাজে পোশাকে প্রসাধনে বহুবিচিত্র সেই দৃশ্য আরো যেন নয়নমোহন হয়েছিল দুই হাজার পরিচারকের উপস্থিতির ফলে—লাল-সোনালী উর্দিতে তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারাও যেন সেই বিরাট দৃশ্যপটের অঙ্গবিশেষ। টেবিলের উপর ছিল গলদা চিংড়ির বিরাট বিরাট অট্টালিকা, কেক-মিষ্টির বৃহদাকার দুর্গ, পর্বতপ্রমাণ পিঠে, মশলাদার ছত্রাক সম্বলিত মুরগীর কারি, উপাদেয় সকল রকম মিষ্টদ্রব্য, ক্ষুধা উদ্রেক করার মতো অথবা হজম ত্বরান্বিত করার মতো নানাবিধ চাট, আর ছিল কিছু কিছু ভারতীয় খাবার য়ুরোপীয় রুচির সঙ্গে যার কোনো পরিচয় হয়নি। আহার্যে ভরা পাত্রগুলির মাঝে মাঝে নৌকা-আকারে তৈরি রূপোর দীপদানে জ্বলছিল হাজারো মোমবাতি, ছাদ থেকে ঝুলছিল ছাব্বিশটি বিরাট বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। এই সব আলোতে দীপ্যমান ভোজসভার চাতালটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পরীস্থান।

'দোতলার ভোজনকক্ষগুলির অলংকরণ ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের : ছাদ ও দেয়াল জুড়ে প্রাচীর-চিত্রে আঁকা হয়েছিল ব্রহ্মের আনুপূর্বিক ইতিহাস—যার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারেননি সমবেত অতিথিবৃন্দ। ছবিতে অনেকগুলি কাংস্যবর্ণ মুখের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল উৎসবপতি দ্বারকানাথের বুদ্ধিদীপ্ত হাসিহাসি মুখ—প্রতিতুলনায় অন্য সমস্ত মুখ থেকে স্বতন্ত্র বলে সহজেই চোখে পড়ার মতো। সবাই ভোজনে বসার পর দূরাগত একটা অদ্ভুত আরণ্যক সুর ভেসে এল, ক্রমে সেই সঙ্গীত নিকটতর হতে লাগল, দেখা গেল রেশমী কুর্তা-চুড়িদার পরিহিত ত্রিশ জনের একটা বাদ্যবৃন্দ, তাদের কেউ বাজাচ্ছে খঞ্জনী, কেউ বাঁয়া-তবলায়, ঢাক-ঢোলে চাঁটি মারছে, আর কেউ কেউ বাজাতে লেগেছে সানাই। বাদ্যবৃন্দ আসরে আসীন হবার পর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন বাইজী প্রবেশ করল। ভোজনরত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা তাদের নিজ নিজ দেশের নাচ সমবেতভাবে নেচে দেখাতে লাগল। ভোজন-পর্ব ও বিনোদন-পর্ব যেন আর শেষ হয় না, অতিথিরা টেবিল ছেড়ে যখন উঠলেন তখন ভোর হয়ে গেছে।

'আমাদের স্মরণে আমরা এতাবৎ কাল পারী শহরে অতিথি-মনোরঞ্জনের এই রকম সাড়ম্বর ব্যবস্থা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই উৎসবের স্মৃতি বহুকাল আমাদের মনে থাকবে।'

পারী-স্থিত **কোর্ট জর্নাল**-এর নিজস্ব সংবাদদাতা নিশ্চয় সে-উৎসবে উপাদেয় পানভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁর লিখিত এই বিবরণে এমন আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকবেন। **জর্নাল**-এর পাঠকসমাজে এ-লেখা পড়ে কী-প্রকার বিস্মিত কৌতুকের সঞ্চার হয়েছিল—সে তো সহজেই অনুমেয়। **বেঙ্গল হরকরা**-র সন্দেহপ্রবণ সম্পাদকের মনে যে কী-প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্ট :

'আমাদের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে পারী শহরে আমাদের সহ-নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুর যে-বিরাট ভোজ-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন **কোর্ট**

**জর্নাল**-এ তার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিবরণ থেকে অংশবিশেষ আমরা তুলে দিলাম—পড়ে মনে হবে যেন আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী। সাড়ম্বর বর্ণনার সঙ্গে সাড়ম্বর ঘটনার সত্য সত্য যদি সাযুজ্য থাকে, তাহলে বলতে হবে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ নিশ্চয় আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়ে এমন অত্যাশ্চর্য একটি ব্যাপার ঘটিয়েছেন যা কেবল সেই জিন-এর পক্ষেই ঘটানো সম্ভব। **কোর্ট জর্নাল** বলেছেন এই 'ধনাঢ্য নবাব' তিরিশ লাখের মালিক। আমরা বলি সে তিরিশ লাখ—ফ্রাঁ কিংবা টাকা এমনকি পাউণ্ডও যদি হত এমন অপচয়ের বন্যায় তার অনেকটাই ভেসে যেত হয়তো...।

'এই বিবরণের কতটা সত্য ঘটনা আর কতটা কল্পিত কাহিনী, কোথায় কোনটার শুরু ও কোথায় কোনটার শেষ—আমাদের পক্ষে তা বলা শক্ত। একটি বিষয়ে আমরা কিন্তু সুনিশ্চিত—তা হল এই যে, ভোজ-উৎসব নিঃসন্দেহে বিরাট, বিপুল ও বর্ণাঢ্য হলেও—তার এই প্রকাশিত বিবরণ 'গলদা চিংড়ির বিরাট অট্টালিকা'র মতো 'কয়েক দানা লবণ সহযোগে' সেবন করাই বিধেয়।'

সত্যাসত্য নিরূপণের প্রশ্নটা বাদ দিলেও, দ্বারকানাথ যে জনমানসে কাউণ্ট অব মন্তেক্রিস্তোর মতো উপকথার রোমাঞ্চকর নায়কে পরিণত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে **বেঙ্গল হরকরা**-র লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা-প্রেরিত পরবর্তী একটি খবরে। ১৮৪৬ অব্দে ৮ জুন তারিখে তিনি খবর পাঠাতে গিয়ে লিখেছেন :

'পারী থেকে ফিরে আসার পর থেকে দ্বারকানাথের শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। পারী থাকতে তিনি একটি 'আরব্য রজনী'র আয়োজন করেছিলেন বলে **কোর্ট জর্নাল** কিছুদিন আগে একটি আষাঢ়ে গল্প প্রচার করেছিলেন। এবার আপনাকে তার চেয়েও 'ভালো' একটি গল্প পাঠাব যাতে আপনি বুঝতে পারেন আপনাদের 'ব্যাঙ্কার প্রিন্স' সম্বন্ধে কী-সব আজগুবি কথা রটনা হয়ে থাকে। এই সঙ্গে নূতন কাগজ **লিটরেরি হেরল্ড**-থেকে সেই কর্তিকা পাঠালাম, পড়ে নিশ্চয় আপনি সোচ্চারে বলবেন, হা হতোস্মি!

'দ্বারকানাথ ঠাকুর! কে না শুনেছে ভারতের বাণিজ্যজগতে এই ধনকুবের নবাবের নাম? এঁর কাশ্মীরি শাল, হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা এবং প্রাচ্যদেশীয় আড়ম্বর আমাদের সবার সেরা ও সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কিত সমস্ত কিছু—এঁর ধনদৌলত, সাজপোশাক, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও জীবনযাপনের ধরন—সবই যেন রূপকথার কাহিনীর মতো। এঁর জীবনচর্যা অতি অদ্ভুত স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব। জীবনের প্রতিটি দিন যেন জীবন-খাতার এক-একটি নূতন পাতা, যেন একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস—যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সেই রকম কয়েকটি নূতন পাতা পর পর খুলেছিল—দ্বারকানাথ সম্প্রতি যখন ফরাসী দেশের রাজধানীতে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। লোকশ্রুতি এমনি অত্যুক্তিপরায়ণ যে

পারী শহরে তিনি যেখানে বসবাস করেছিলেন তা রূপান্তরিত হয়েছিল বিরাট একটি স্বপ্নসৌধে; তাঁর ধনদৌলতের হিসাব করা হয়েছিল কুবেরের ঐশ্বর্যের মাপে। কেবল জনহিতকর কাজে তাঁর উদার হস্তের বদান্যতা-বিষয়ে, পারীসিয় অত্যুক্তিও সত্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড সাহস ও প্রখর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে প্রগলভ পারী নীরব ছিল। সেই ত্রুটিটুকু শুধরে নেবার জন্য একটি সাম্প্রতিক কাহিনীর অবতারণা করছি—সে-কাহিনীর নায়ক স্বয়ং দ্বারকানাথ। কাহিনীকার বলেন যে, মাদাম দ-এর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে দ্বারকানাথ নাকি তাঁর গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আমাদের নায়ক লক্ষ্য করেছিলেন যে সেই মোহিনীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য ঘটেছিল আরো তিন জন প্রণয়ীর—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছদৃষ্টিতে তিনি অচিরে তাদের দুজনকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন—তাঁদের একজন পারিবারিক বন্ধু ও অপরজন বন্ধুপদ-বাচ্য হবার উচ্চাশা মনে মনে পোষণ করছেন। তৃতীয় ব্যক্তিটির আদব-কায়দা কেমন যেন আড়ষ্ট, গম্ভীর গম্ভীর মুখের ভাব, মাদাম-এর পার্ষদদের মধ্যে কী করে এ-লোকটা এসে জুটল, দ্বারকানাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। নবাবের প্রতি লোকটার সৌজন্য ত্রুটি নেই কিন্তু গৃহকর্ত্রীকে বড়ো-একটা যেন লক্ষ্যই করে না, কদাচিৎ তাঁর কথায় কান দেয়, কথা কয় আরো কম, আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে চায় না—যেন অপরিচিত মানুষ। মাদাম-এর দরবারে থাকেও খুব অল্প সময়, মাদামও তাকে আটকে রাখার জন্য অতিমাত্রায় উদগ্রীব নন। এইসব নঙর্থক লক্ষণ থেকে বেচারা প্রাচ্য-দেশবাসী কী করে চিনবে মাদাম-এর পতিদেবতাকে? সুতরাং ভেবে দেখুন একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি যখন দাবি জানাল, আমাদের নায়কের তখন কী অবস্থা! তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। খোলাখুলিভাবে তাঁর প্রণয়ের কথা স্বীকার করে তিনি এমন একটি প্রস্তাব দিলেন যা হয়তো স্পর্শকাতর মনকে আঘাত করতে পারে; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে সব জিনিসটার মধ্যে এমন একটা সুরুচি ছিল যা আমাদের সংস্কৃতিতে দুর্লভ। বিস্ময়বিমূঢ় পতিব্যক্তিটির সঙ্গে আমাদের নবাবের কথাবার্তা হল অনেকটা এই রকম : 'দেখুন মশাই, যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রী, তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকেই জানাতাম তাঁর রূপগুণ আমার হৃদয়কে কীভাবে ও কতখানি অভিভূত করেছে। কিন্তু পারীসিয় রীতি-রেওয়াজ আমার তো জানা নেই, স্বামী বর্তমান আছেন—সেকথাও কেউ আমায় বলেনি, সুতরাং আমি ধরে নিয়েছিলাম প্রণয়ের ব্যাপারে মহিলাটি স্বাধীনা। তা না হলে আপনার সম্পত্তিতে কিংবা অধিকারে হস্তক্ষেপ করব তেমনটা আমার স্বভাবে আদৌ আসে না। দেশভেদে আদবকায়দার ইতরবিশেষ হতে পারে কিন্তু নৈতিক কর্তব্য সব দেশে সমান। এখন ধরুন, এমন যদি হত যে আপনার স্ত্রীর রূপগুণের কদর আপনি করেন না এবং আপনার ঘরে আজ তাঁর যা স্থান, সেখানে আর কাউকে বসাতে পারলে আপনি খুশি হন, তাহলে যদি

আমার সম্পত্তির অর্ধেক দিয়েও আমি তাঁর পাণিগ্রহণ করতে পারতাম, আমি খুবই খুশি হতাম।' বলা বাহুল্য আমাদের এই পারীসিয় স্বামী ভদ্রলোক এই ঘটনায় আঁতে ঘা পেয়েছিলেন; নবাবের খোশ মেজাজ উপভোগ করার মতো তখন তাঁর মেজাজ ছিল না। অতএব সেই পারিবারিক বন্ধু মারফত তিনি দ্বারকানাথকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান পাঠালেন। বীরহৃদয় বিদেশী সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হলেন। স্থির ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে-অস্ত্র ব্যবহার করা হবে তা তিনিই আনবেন, কিন্তু কই, অস্ত্র কোথায়? দ্বারকানাথ সচরাচর তাঁর কোমরবন্ধে যে-দুটি ছোরা নিয়ে চলাফেরা করতেন, সেই ছোরা দুটি তিনি প্রতিপক্ষের হাতে দিয়ে বললেন, 'বেছে নিন।' স্থির হয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে ভারতীয় মতে। দ্বারকানাথ সে-মতটা যখন বিশদ করলেন বুঝতে পারা গেল আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সঙ্গে তার জমিন-আশমান ফারাক। এই বৈষম্য থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা কত উন্নত। প্রাচ্য দেশে নাকি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেউ কাউকে অস্ত্রাঘাত করে প্রাণ হনন করে না, কারণ অপরের প্রাণ নেওয়া পাপ। যে ক্ষতিসাধন করেছে এবং যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে—তারা পরস্পর পরস্পরের অবধ্য। তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হবে কেমন? প্রাচ্য দেশে এরা এ-ব্যাপারে এমনি অর্বাচীন যে, এদের ধারণা উভয় পক্ষ যদি যুগপৎ আত্মহনন করতে পারে, তবেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় সর্বতোভাবে সন্তোষজনক। সুতরাং আমাদের নবাব প্রতিপক্ষেব নিকট প্রস্তাব করলেন তিনি যেন সুস্থ মনে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে ছোরা দিয়ে নিজের পেট এক পোঁচে চিরে ফেলেন এবং শপথ করলেন তিনি নিজে প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন কালবিলম্ব না করেই। বুঝতে বিলম্ব হবে না এই প্রকার সুগম্ভীর একটি প্রস্তাবের পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ সেখানেই পরিসমাপ্ত হয়ে গেল—কারো মাথা কাটা পড়ল না অথবা নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এল না। এতদ্দণ্ডে দ্বারকানাথ পারীসিয় জীবনযাত্রার ধরনধারণ থেকে এমন শিক্ষা গ্রহণ করছেন যা তাঁর কাছে নিশ্চয় পরম তৃপ্তিকর মনে হচ্ছে। নীতিবাগীশ হয়তো বলবেন তিনি পারী থেকে কেবল যে শিক্ষা গ্রহণ করছেন এমন নয়, পারীকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষাও দিচ্ছেন বেশ। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর যশ ও জনপ্রিয়তা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক লাস্যময়ী তাঁর দিকে মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। এই বীরপুঙ্গবের কীর্তিকলাপ নিরীক্ষণ করে কেনইবা লোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়বে না—বিশেষত এখনো যখন দুহাতে বিলোবার মতো কাশ্মীরি শালের কিছু ঘাটতি নেই!'

লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত এই সংবাদের উপর **হরকরা**-সম্পাদকের মন্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত: 'এমনটা না হলে দ্বারকানাথ! কী বলেন, পাঠক?'

১৮৪৫-৪৬-এর শীতের মরশুমে পারীতে থাকাকালে দ্বারকানাথ নিসর্গদৃশ্য ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত বারোঁ দ্য শোয়াইতের-এর পরিচয় লাভ করেন।[৩] শোয়াইতের ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর ইউজেন দেলাক্রোয়া-র পরম বন্ধু। দেলাক্রোয়া-র আঁক:

শোয়াইতের-এর প্রতিকৃতি লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে দেখা যায়। দ্বারকানাথ তেলরঙে নিজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকার জন্য শোয়াইতের-কে বায়না দেন ও পুরো পারিশ্রমিক অগ্রিম দিয়ে দেন। প্রতিকৃতি আঁকা শেষ হয় ১৮৪৭ অব্দে. আঁকা শেষ হবার আগেই অকস্মাৎ দ্বারকানাথের মৃত্যু ঘটে লণ্ডনে ১৮৪৬ অব্দের আগস্ট মাসে। সততাপরায়ণ শোয়াইতের বহু খোঁজাখুজি করার পর অনেক কষ্টে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর কাছে সেই তেলরঙা প্রতিকৃতি পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, দেবেন্দ্রনাথ যদি চান তাহলে ছবির অবিকল প্রতিরূপও একটি পাঠাতে পারেন।[৭] ১৮৮৮ অব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার **স্টেটসম্যান** কাগজ শোয়াইতের-রচিত এই তৈলচিত্রের নিরাপদে কলকাতা পৌঁছবার কথা লিখেছিলেন 'স্টোরি অব দ্বারকানাথস পোর্ট্রেট'—এই শীর্ষ-নাম দিয়ে। পরে এই লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৭৫ অব্দে **হান্ড্রেড ইয়ারস অব দ্য স্টেটসম্যান** নামক সংকলন-গ্রন্থে।

য়ুরোপে তাঁর দ্বিতীয় সফরের সময় দ্বারকানাথ পারী গিয়েছিলেন দু-বার—প্রথমবার ১৮৪৫ অব্দের জুন মাসে লণ্ডন যাবার পথে, পক্ষকাল ছিলেন; দ্বিতীয়বার ছিলেন প্রায় তিন মাস—১৮৪৫ ডিসেম্বর মাঝামাঝি থেকে একেবারে ১৮৪৬-এর মার্চ অবধি। প্রথম যে-বার পক্ষকাল পারীতে ছিলেন, যে-বার রাজা লুই ফিলিপ প্রচুর সমাদরে তাঁকে সম্বর্ধিত করেন, সেবার কোঁৎ ফ্যুইয়ে দ্য কঁশ-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের আলাপ হয়। কোঁৎ ছিলেন ফরাসী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব প্রটোকোল। দ্বারকানাথের কাছে এঁর নামে কলকাতাস্থিত ফরাসী কনসাল-জেনারেল-এর একটি পরিচয়-পত্র ছিল। প্রাথমিক পরিচয়ের পর উভয়ের মধ্যে যে-অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোদ্ধৃত পত্রে। এ-চিঠি কোঁৎ-কে লিখেছিলেন দ্বারকানাথ, লণ্ডনের সেন্ট জর্জেস হোটেল থেকে, ১৮৪৫ অব্দের ৫ জুলাই তারিখে[৮] :

'প্রিয় মহাশয়, আমাদের বন্ধু ওয়কর আমায় ছেড়ে চলে গেছেন। তাছাড়া কাস্টমস হাউস থেকে আমার জিনিসপত্র আজকেই কেবল পেলাম বলে, ইতিপূর্বে আমার ছোট সুন্দর বান্ধবীটিকে সেই প্রতিশ্রুত উপহার পাঠাতে পারিনি। কিন্তু জেনারেল ভেন্তুরা এখন এখানে উপস্থিত, তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর নিজের সঙ্গে জিনিসটা নিয়ে যাবেন বলায় আমি তাঁর হাতে জিম্মা করে দিয়েছি। আশা করি উপহারটি নিরাপদে পৌঁছবে। রাতদিনের কোনো একটা সময়ে আমার নিশ্বাস ফেলার জো নেই, সারাটা সময় কাটছে রথী-মহারথীদের সঙ্গে। আমোদ-আহ্লাদ করা দূরের কথা—একটা থিয়েটারে পর্যন্ত এখনো যেতে পারিনি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ হবে আশা করি, তখন আবার দৃশ্য বস্তু ঘুরে ঘুরে দেখতে পারব। পরিবারস্থ সকলকে আমার শ্রদ্ধাভাষণ জানাবেন। ইতি ভবদীয় বশম্বদ দ্বারকানাথ ঠাকুর।'

১৮৪৫-৪৬ এর শীতের মরশুমে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার যখন দীর্ঘতর কাল পারী

শহরে কাটিয়েছিলেন, সেই সময় কোঁৎ-এর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গাঢ়তর হয়ে থাকবে। দুই ইয়ারে মিলে তখন পারীসিয় জীবনের অনেক আমোদ-আহ্লাদ একযোগে উপভোগ করে থাকবেন। তার প্রমাণ মেলে কোঁৎ শেষ জীবনে তাঁর যে আত্মকথা লেখেন সেই **জুর্নাল দ্যাঁ অক্টোজেনের** গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে। সেই পরিচ্ছেদের বেশ খানিকটা অংশ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে। তারই কিছু কিছু অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি[৯] :

'তিনি (জেনারেল ভেন্তুরা) তখনো পারীতেই আছেন, সেই সময় পারী শহরে উদয় হলেন বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইনি একজন জাতিচ্যুত ভারতীয়, নিবাস কলকাতায়, থাকতেন ইংরেজদের নিকটসান্নিধ্যে এবং পত্তন করেছিলেন একটি ব্যাঙ্ক-এর কারবার। ফ্রান্সে এসে ইনি রাজকীয় চালচলনে চলতেন, সুন্দরী মেয়েরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেই তাঁদের তিনি কাশ্মীরি শাল বিতরণ করতেন। তাঁর সঙ্গী ছিল এক ছেলে এবং একটি ভাগনে।

ইংরেজ-সমাজে জীবনযাপন করলেও খোলামনের মানুষ ছিলেন। সংস্কৃতি ছিল মাঝারি গোছের। জিজ্ঞাসু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে সবকিছু জানবার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর মতে য়ুরোপীয় সভ্যতার শক্তিবৃদ্ধির কারণ হল য়ুরোপীয়দের তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি, কল্পনাবিলাসের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। মতামত প্রকাশে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন বলে সবসময় রূপসী সুন্দরী অথবা অদ্ভুত সব বিদেশিনী নটীদের দ্বারা পরিবৃত থাকতে ভালবাসতেন। একবার অপেরা ঘুরে আসার পর তিনি একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নেবার জন্য—যদিও কণ্ঠে তাঁর একেবারেই সুর ছিল না। রাত ও দিনের মধ্যে কোনো তফাৎ করতেন না, অত্যধিক রাত্রি-জাগরণে শক্তসমর্থ মানুষটি তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য খুইয়েছিলেন। অবশেষে লণ্ডনের ক্ল্যারেনডন হোটেলে জেনারেল ও আমার উপস্থিতিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে—শরীরে রক্ত প্রবিষ্ট করতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর ধমনীতে রক্ত নেই—আছে কেবল জল।[১০]

'পারী থাকতে তাঁকে আমি অন্ধ-নিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করেন কলকাতায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান পত্তন করবেন। রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে টুইয়েরিতে নৈশ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করলে পর তিনি রাজাকে চিঠি লিখে জানান যে নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন—কিন্তু পরের বছরের জন্য, আপাতত বর্ষা শুরু হবার আগে তাঁর দেশে না ফিরলেই নয় কারণ সেখানে অনেক জরুরী কাজ তাঁর অপেক্ষায় আছে। পরের বছর তিনি কিন্তু সত্য সত্য ফিরে এসে রাজাকে তাঁর আগমন বার্তা পাঠিয়েছিলেন।[১১]

'একদিন সকালবেলা তিনি এলেন আমার সাক্ষাতে—কে যেন তাঁকে সন্ধ্যাবেলা মাবিয়ে উদ্যানে কী সব মজা হয় বর্ণনা করে থাকবেন। সেদিনটা ছিল শনিবার—উদ্যানে ঘুরে আসার পক্ষে শনিবারই প্রশস্ত। তিনি আমায় বললেন তাঁর সঙ্গে যেতে। আমি

জবাব দিলাম, 'ওখানে আমি আগে কখনো যাইনি, তবে পুরুষ মানুষ তো সর্বত্র যেতে পারে। বেশ তো, সন্ধ্যেবেলা আসবেন আমায় নিতে।' উদ্যানে ঢুকেই সর্বপ্রথম যাঁদের সঙ্গে দেখা, তাঁরা হলেন মঁসিয়ে তিয়ের ও আদমিরাল লা সুস্, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পারীস্থিত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত লোয়েনহাইল্ম-এর কাউন্ট এবং সুইডেনস্থিত পারীর রাষ্ট্রদূত কাউন্ট মোর্ণে। দ্বারকানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় কুইন পোমারে?' একজন কে তাকে চিনিয়ে দিলে পর তিনি তাঁর পরিচারককে দিয়ে নাচিয়ে মেয়েটিকে ডেকে আনালেন, দেখতে রীতিমত কুৎসিত, শাদা দাঁতের আশেপাশে কয়েকটা দাঁত যেন শোকসূচক কালো পোষাক ধারণ করেছে।[১১] নাচিয়ে এগিয়ে আসার পর দোভাষী তাকে বলল : 'দেখো, প্রিন্স (অদ্ভুত পোশাক পরতেন ও দু-হাতে দেদার খরচপত্র করতেন বলে লোকে তাঁকে প্রিন্স বলে মনে করত।) চান, খানিকটা অ-পরিবর্তিত আকারে তোমার কিছু নৃত্য দেখে তিনি শিক্ষা লাভ করেন।' এই বলে নাচিয়েকে উৎসাহিত করার জন্য তার হাতে কিছু টাকাকড়ি গুঁজে দিল। পুলিশের হাতেও কিছু টাকা গুঁজে দিতে সে এমন ভাণ করল যেন দেখেও দেখছে না। একজন মজাদার নৃত্যসঙ্গীর সাহায্যে পোমারে তখন এমন অদ্ভুত একটি নৃত্য দেখাল যে মনে হল শরীরে যেন একটিও হাড় নেই—এমন বিস্ময়কর নমনীয়তা দেখা যায় না। অতঃপর কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লোকেরা সারি সারি বেঞ্চ-পাতা একটি মস্ত হল-এ আশ্রয় নিল। বাবু বসলেন একেবারে প্রবেশ-পথের সামনে। হল-এর মধ্যে বসে ছিল এক পাল যৌবনমদমত্তা ছুঁড়ি, তারা সব নিজ নিজ জায়গা থেকে উঠে এসে বাবুর মহামূল্য নরম পশমিনা শালে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল, কোনো কোনো দুঃসাহসিকা তাঁর পেলব আঙুল থেকে প্রকাণ্ড একটি হীরের আঙটি খুলে নেবার জন্য বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। তাদের একজন যখন সমীপবর্তী হয়ে হিন্দুস্থানীতে কী-সব বলতে লাগল, বাবু এক ঝটকায় তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খবরদার!' এ-মেয়েটি যেন বাবুর পূর্ব-পরিচিত কিন্তু কিছুতেই চিনে উঠতে পারছিলেন না, পার্শ্ববর্তী এক যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কে?' সে জবাব দিল, 'আরে, এ তো মিসেস জেমস।' এই মেয়েটিই লোলা মোঁতেজ নামে পরিচিত সেই বিখ্যাত বারাঙ্গনা। লোলা জাতিতে আইরিশ—ছেলেবেলায় ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত তার কাকার সঙ্গে সে কলকাতা যায় এবং সেখানে জেমস নামে সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। নববিবাহিত দম্পতি কলকাতায় বাবুর নির্মিত একটি 'মধুচন্দ্র কুটির'-এ কয়েকটি দিন মহা-আনন্দে যাপন করে। কোম্পানীতে চাকুরীরত কোনো ব্যক্তির যখন বিবাহ হত বাবু তখন নব-বিবাহিত দম্পতির হাতে কুটিরের চাবি ন্যস্ত করে দিতেন। কুটির ছিল দুটি—একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে; দুটি কুটিরের মাঝে ছিল ফুলন্ত গাছের বেড়া; ইচ্ছা করলে দুই কুটিরের মধ্যে আলাপ-সালাপ চলতে বাধা ছিল না। বাবু লোলা-কে বললেন প্লাস ভাঁদোম-এর উপর ওতেল দা রীন-এ এসে

তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করে, কারণ বাবু তাঁকে কী-যেন বলতে চান। লোলা পরের দিন যাবে বলল।

'কিন্তু রবিবার দিন আমরা গিয়েছিলাম ভার্সাই, হোটেলে ফিরে এসে শুনলাম লোলা এসে একবার ঘুরে গেছে। আবার যখন এল তখন আমরা সবাই আহারে বসেছি। লোলা এসেছে খবর পেয়ে বাবু বলে দিলেন তাকে যেন তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর যে-ব্রিটিশ জেনারেল টেবিলে তার ধারে কাছে বসে ছিলেন তাকে ইঙ্গিতে ডেকে নিলেন,—এই জেনারেল সদ্য ভারতে তাঁর চাকুরীর মেয়াদ শেষ করে বিলেতে ফেরবার পথে পারীতে দুটো দিন কাটাতে এসেছেন। বাবু অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের কাছ থেকে মার্জনা চেয়ে নিয়ে যখন উপরতলা যাবেন, আমিও টেবিল ছেড়ে চটপট তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম, বললাম, 'একটু দেরি করে যাবেন। আমি গিয়ে লোলাকে একটু বুঝিয়ে বলি।' লোলাকে বললাম, 'কয়েক মুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটবে যা তোমার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নিজের যদি মঙ্গল চাও তো নিজেকে একটু সামলে চোলো।' লোলা জবাবে বলল, 'বা রে, ওরকম ঘটনা আমি ঢের ঢের দেখেছি।' আমি তখন বাবু ও তাঁর সঙ্গীর জন্য শোবার ঘরের দরজা খুলে দিলাম। বাবুকে দেখে লোলা একটু হাসল, কিন্তু খানিক বাদে জেনারেলকে দেখে লোলা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল বিছানার উপর। ওমা! এযে তার সেই কাকা! হোটেলের পরিচারিকাকে ডাকা হলে পর সে এসে বুকের কাঁচুলি ঢিলে করে দিল ও চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিল। লোলা চেতনা ফিরে পাবার পর বাবু তাকে বললেন, 'দেখো, তোমায় আগে যে আনন্দকর পরিবেশে দেখেছি সে-কথা মনে রেখে আজ তোমার ভালোর জন্য কিছু একটা করতে চাই। এখন শোনো একবার আমাদের প্রস্তাব। জেনারেল ও আমি বছরে তোমার জন্য পনেরো হাজার ফ্রাঁর একটি পেন্সন বরাদ্দ করতে চাই—তুমি যদি তোমার বর্তমান জীবনযাত্রার ধরন সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারো। যতদিন তুমি প্রকৃতিস্থ থাকবে, সংযত থাকবে, টাকাটা নিয়মিত তোমার লাফিৎ-এর বাসাবাড়িতে জমা দেওয়া হবে। যে-মুহূর্তে পুনরায় কেলেঙ্কারির খবর শোনা যাবে—পেন্সন দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তাহলে মনস্থির করে বলো কী ঠিক করলে।' লোলা খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল, তারপর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ তুলে উচ্চস্বরে বলল, 'না, না, না! আমি পেন্সন চাই না, ভালো মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে হতে আমি চাই না। আমি এখন যেমন রাণী হয়ে আছি, তেমনি রাণী হয়ে থাকতে চাই!' এই বলে সে তার বিস্রস্ত বেশ ঢেকে দিল বিছানার উপর থেকে একখানা শাল টেনে নিয়ে। তারপর দ্রুতপদে প্রস্থান। সে কাশ্মীরি শাল আর কখনো ফেরৎ পাওয়া যায় নি।[১৩]

'পারী-তে থাকতে দ্বারকানাথ যে কত সনির্বন্ধ অনুরোধ উপরোধ পেতেন তার ইয়ত্তা নেই। চিঠিতে অবিরাম মিনতি আসত ধারকর্জের টাকার জন্য, অর্থসাহায্য বা

উপহার লাভের আশায়। প্রণয়-নিবেদনের চিঠিও আসত; সেই রকম একটি আবেগপূর্ণ চিঠি এসেছিল পারীসমাজের জনৈকা অভিজাত মহিলার কাছ থেকে। মফঃস্বল থেকেও চিঠি আসত কিছু কম নয়। তূর-এর এক ওষুধের দোকানের কর্মচারীর কাছ থেকে এসেছিল এক চিঠি—সে চেয়েছিল মোটা টাকার অনুদান—যাতে সে-টাকায় মালিকের দোকান কিনে নিয়ে মালিকের মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে পারে। আমার এই ভারতীয় বন্ধু স্বেচ্ছায় বহু টাকা দান করতেন কেবল জনহিতকর কাজে...।'

## টীকা

১। (ক) *Auld Lang Syne* (chapter on 'My Indian Friends'), by Frederich Max Müller. Longmans Green & Co. 1899

(খ) *The Life and Letters of the Rt. Hon'ble Frederich Max Muller* Edited by His Wife. Vol. I, 1902

(গ) *Scholar Extraordinary*—The Life of Professor, the Rt. Hon'ble Frederich Max Müller, by Nirad C. Choudhuri. The Oxford University Press, Delhi, 1974. ম্যাক্সমূলব দ্বারকানাথকে জর্মন ভাষায় লেখা তাঁব সম্পাদিত এক খণ্ড 'হিতোপদেশ' উপহার দিয়েছিলেন নিজের হাতে বাংলায় লিখে। বর্তমানে সে-কপি আছে কলকাতাব ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারে। কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক *Sunday* তাঁদের ১৯৭৫ অব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেই 'হিতোপদেশ' উপহার-পুস্তকের নামপত্র ও ম্যাক্সমূলর-এর হস্তলিপিব অবিকল প্রতিরূপ ছাপিয়েছিলেন।

২। বৎসর উল্লেখ করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলর ভুল করেছেন। বৎসবটা হবে '১৮৪৫-৪৬ অব্দেব শীতের মরশুম।'

৩। ১৮৩৩ অব্দের ১২ অক্টোবর তারিখে 'সমাচার দর্পণ' কতিপয় কুমারহট্ট-নিবাসীর লিখিত একটি পত্র প্রকাশ করেন। পত্রের বক্তব্য এই যে, যদিচ ধর্মসভার বিধানমতে সতীদাহ-বিরোধীদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা নিষিদ্ধ, তত্রাচ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে পূজাপার্বন উপলক্ষে ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকেন।

৪। রামমোহন রায়কে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, দাহ কবা হয় নি। সুতবাং স্মৃতিসৌধ বচিত হয়েছিল তাঁর শবাধারের উপর, ভস্ম-শেষের উপব নয়। একথা ম্যাক্সমূলরের সুপবিজ্ঞাত থাকাব কথা।

৫। ১৮৪৬ অব্দের ২৯ মে তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে শ্লেষ মিশিয়ে লণ্ডনের 'কোর্ট জর্নাল'-সম্বন্ধে বেশ একটা মজার বর্ণনা দিয়েছিলেন সম্পাদকীয় মন্তব্যে : 'কোর্ট জর্নাল' এমন একটি পত্রিকা যা ভয় ও ভক্তি সহকারে হাতে নিতে হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজা যেমন, সাধারণ পত্রপত্রিকার মধ্যে এ-জর্নাল তেমনি হয়তো 'সবার চেয়ে বিজ্ঞ, বিশুদ্ধ, বিচক্ষণ কিংবা উৎকৃষ্ট' নাও হতে পরে, কিন্তু একে ঘিরে এমন একটি ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য আছে যা থাকে কেবল রাজাদের। চতুর্থ বর্গে সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের রাজভক্তি যেমন প্রবল হয়, 'জর্নাল'-এর প্রতি সাধারণ লোকেব ভক্তি তেমনি প্রবল। তাতো হবারই কথা, কারণ মহামান্যা যদি এ-কাগজ পড়ে থাকেন, তাহলে কাগজের জগতে এ-'জর্নাল' সম্রাজ্ঞীর তুল্য। 'টাইমস' কাগজের বিরাট বিরাট পৃষ্ঠার আড়ালে মহামান্যা মহারাণীর মহতী সত্ত্বা ঢাকা পড়েছে এমন একটা ছবি আমাদের পক্ষে কল্পনা কবা শক্ত। কিন্তু আমরা বেশ কল্পনা করতে পারি তিনি ঈষৎ মাথা নীচু করে তাঁর নিজের 'কোর্ট'-এব এই জর্নালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আট-পেজী ফর্মার

পাতাগুলি নিবিষ্ট হয়ে উল্টে চলেছেন। উপরন্তু 'কোর্ট জর্নাল'-এর সম্পাদক একজন বিশিষ্ট মহিলা—তিনি একজন কাউন্টেস। সহৃদয় পাঠক তাহলে জেনে রাখুন 'কোর্ট জর্নাল' একটি মহিলা-সুলভ কমনীয়তার অধিকারী চব্বিশ পৃষ্ঠার তন্বী সাপ্তাহিক, যার আকার হল প্রস্থে নয় ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে বারো। মুদ্রা-মূল্যে (কাউন্টেস থেকে কুটিরবাসী সকলকেই মূল্যস্বরূপ মুদ্রা তো কিছু দিতেই হয়) এর দাম হল আট পেন্স। সত্যকার অভিজাতের মতো এই কাগজের চেহারা হল নিরলঙ্কার, নিরহঙ্কার—মুখপাতে যদি রাজকীয় মর্যাদার প্রতীকচিহ্ন মুদ্রিত না থাকত তাহলে মনে হত নিতান্ত সাধারণ কোনো কাগজ।'

৬। শোয়াইতের ১৮০৫ অব্দে নিয়েনবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন ও সালৎসবুর্গে ১৮৮৯ অব্দে পরলোকগমন করেন। শিক্ষাদীক্ষা পারী শহরেই, সেখানে বসবাস স্থাপন করে এক নাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বছর চিত্রকর-রূপে কাজ করেছিলেন।

৭। ব্যাকন দ্য শোয়াইতের-এর তারিখবিহীন চিঠি এসেছিল 'বাবু—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোলপুর, বর্ধমানের নিকটবর্তী, কলিকাতা'—এই ঠিকানায়। এ-চিঠি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত। নিচে সে-চিঠির অনুবাদ দেওয়া হল :

'মহাশয়, কয়েক বছর আগে ফরাসী কন্সাল জেনারেল আপনাকে জানিয়ে থাকবেন আমি ১৮৪৭ অব্দে আপনার পিতার একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকেছিলাম। সে-ছবি পারী শহরে ও লণ্ডনের রয়াল একাডেমিতে প্রদর্শিত হবার পর আমার অধিকারেই, বরঞ্চ বলা চলে হেফাজতে ছিল, কারণ পরলোকগত বাবু আমায় মূল প্রতিকৃতির একটি নকল প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। সেই কপিটিও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

'এই প্রতিকৃতি এখন আপনার সম্পত্তি, কারণ ছবি আঁকবার আগেই আমি এর মূল্যস্বরূপ ১০০ পাউণ্ড পেয়েছিলাম। আপনার হয়ে এ-ছবি আমি রক্ষা করছি এবং অপেক্ষা করছি যে আপনি নির্দেশ দেবেন কীভাবে এটি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

'কপিটি অবিকল মূল প্রতিকৃতির মতো, এটিও কোনো প্রকার শর্ত না করেই আপনার কাছে পাঠাতে চাই—কোনো পারিশ্রমিকের উল্লেখ না করে। আপনি যেমন যোগ্য বিবেচনা করেন, তেমনি দেবেন।

'পরিশেষে বলি, চিত্রকলার এই নিদর্শনটি আমার সম্পত্তি নয় বলে আমি আদৌ এটি ধরে রাখতে চাই না। তাছাড়া মনে হয় এ-ছবি আপনাদের কাছে আগ্রহের বস্তু হবে। ইতি ভবদীয় আজ্ঞাবহ সেবক ব্যাকন দ্য শোয়াইতের। ১০নং রু রইয়াল আ পারী।'

দুঃখের বিষয় এ-চিঠির জবাবে দেবেন্দ্রনাথ কী লিখেছিলেন জানবার উপায় নেই। পরিবারবর্গের ধারণা জবাব তিনি একটা নিশ্চয় পাঠিয়ে থাকবেন এবং তৎসঙ্গে একটি চেকও।

৮। মাদাম কৃষ্ণা রিবু ও কোঁৎ ফুইয়ে দ্য কোঁশে-এর বংশধর শার্ল ইয়েগরস্মিট-এর সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত।

৯। উদ্ধৃতি দেওয়া হল মাদাম কৃষ্ণা রিবু ও মঁসিয়ে ইয়েগরস্মিট-এর সৌজন্যে। ইংরেজি অনুবাদের জন্য লেখক ড. লোকনাথ ভট্টাচার্যের নিকট ঋণী। মূল গ্রন্থের জেরোকস কপি পাঠাতে গিয়ে মাদাম রিবু সমীচীনভাবেই পাঠকদের সাবধান করে বলেছেন : 'এই স্মৃতিকথায় কাহিনী ও ইতিহাসের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। উনিশ শতকে অনেকে (প্রায় প্রত্যেকেই) মনে করতেন তাঁদের 'স্মৃতিকথা' লিখে রাখা দরকার—মঁসিয়ে ইয়েগরস্মিট বলেছেন ফুইয়ে দ্য কোঁশে প্রতিবছর একটি করে স্মৃতিকথা লিখে নিজের খরচে ছাপিয়ে প্রকাশ করতেন। পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য স্মৃতিকথা-লিখিয়েরা অনেক সময় সত্যাসত্যের ধার ধারতেন না, কল্পিত ঘটনাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতেন অথবা সত্য ঘটনাকে নানা অলংকারে সাজিয়ে গুজিয়ে হাজির করতেন। কোঁৎ ফুইয়ে দ্য কোঁশে একে ফরাসী তায় কূটনীতিবিদ, একে পরিহাসরসিক তায় বিশ্বনিন্দুক—স্বভাবতই তাঁর প্রবণতা ছিল খাঁটি সত্য কথা না বলে হাসাবার মতো মজাদার কথা বলা। তাঁর

'স্মৃতিকথা'য় যে-সব বিবরণ তিনি দিয়েছেন কিংবা দ্বারকানাথের লণ্ডনে মৃত্যুর পর স্ত্রীকে যে-চিঠি লিখেছিলেন (পরে এ-চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে) তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে কোঁৎ-এর সব উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১০। এই উক্তিটি কোঁৎ-এর বাচালতা ও বাজেকথা বলার অন্যতম নমুনা। দ্বারকানাথ ক্লারেনডন হোটেলে মারা যান নি, কোঁৎ ও জেনারেল ভেন্তুরার হাতে মারা যাবার কথাটাও স্রেফ বাজে কথা। দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছিল সেন্ট জর্জেস হোটেলে, তাঁর শয্যাপার্শ্বে তখন ছিলেন একাধিক ইংরেজ ডাক্তার, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন। ডাক্তারদের মধ্যে থেকে কেউ বলেন নি 'শরীরে রক্ত প্রবিষ্ট করতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর ধমনীতে এক ফোঁটা রক্ত নেই—আছে কেবল জল', মৃত্যু-বিষয়ে সরকারীভাবে যে-সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে কিম্বা মরণোত্তর ময়না-তদন্তের ফলাফলে, এ-উক্তির কোনো সমর্থন মেলে না। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে কোঁৎ কিংবা জেনারেল যে উপস্থিত ছিলেন—সে-কথা কেউ বলে না, না কোনো প্রত্যক্ষদর্শী, না কোনো বিলেতী কাগজ।

১১। কোন্ বারের পারী-গমন বিষয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা তা ঠিক স্পষ্ট নয়। এখানেও সত্যাসত্যের ভেদ বড়ই ক্ষীণ।

১২। আক্ষরিক অনুবাদ—কিন্তু অর্থ পরিষ্কার নয়। এমনও হতে পারে যে কয়েকটি দাঁতে কালো কোনো রঙের প্রলেপ ছিল—অনুবাদক।

১৩। কোঁৎ ফুইয়ে দ্য কোঁশে-এর নিজস্ব পাদটীকা : 'দুর্ভাগিনী লোলার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল, সে আমাদের জানা কথা। কলকাতায় স্বামীকে ছেড়ে আসার পর, এক ইংরেজ তাকে হরণ করে মাদ্রিদ শহরে পরিত্যাগ করে। সেখান থেকে পারী শহরে এসে সে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। নাচিয়ে বলে নিজের পরিচয় দিয়ে সে তখন পথের ধারের এক থিয়েটারে ভর্তি হয়। নাচ দেখে দর্শকেরা এক যোগে টিটকারি দেওয়াতে বাধ্য হয়ে তাকে মঞ্চ-জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। অতঃপর লোলা ম্যুনিক শহরে গিয়ে সেখানকার রাজা লুই-এর মন ভোলাতে সমর্থ হয়। রাজা তার নাম দেন সেনোরা দ্য ব্যারি এবং তাঁকে ল্যাণ্ডসফেল্ড-এর কাউন্টেস উপাধি দিয়ে অভিজাত সমাজে একটা বড় রকম কুৎসা রটনার সুযোগ ঘটিয়ে দেন—এমন কি, ব্যাভেরিয়ার অভিজাত ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেরা সুন্দরীদের প্রতিকৃতি-সংগ্রহশালায় লোলার একটি প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দেবারও ব্যবস্থা করেন। ম্যুনিকের কূটনীতিজ্ঞ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি রাজানুগ্রহে সম্মানিত এই লোলার বৈঠকখানায় ভিড় জমাতেন—এক কেবল ফরাসী দেশের রাজদূত বারোঁ দ্য বুরগোয়িন ছাড়া, তিনি সর্বদা দৃঢ়ভাবে হাজিরা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন।'

উপরোক্ত পাদটীকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' সাপ্তাহিকের ১৯৭৯ অব্দে ১ সেপ্টেম্বর তারিখে (শনিবার) সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ :

'কলকাত্তাইদের অনেকে ভারতের সঙ্গে মাদাম গ্র্যাণ্ড-এর সম্পর্কের কথা অবগত আছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করার মতো আরো একজন রূপসীশ্রেষ্ঠা কলকাতায় তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন। লোলা মোন্তেজ তাঁর রূপে-গুণে মোহিত করেছিলেন রাশিয়ার প্রথম নিকোলাসকে, বালজাক ও বড় আলেকজান্দর দুমা ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়, ফ্রানজ লিসট-এর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ঘটেছিল, ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুডভিগ-এর তিনি ছিলেন রক্ষিতা এবং সে-দেশের পরিচালনা-নীতিতেও তাঁর বেশ হাত থাকত।

'লোলা মোন্তেজ তাঁর গৃহীত নাম, আসল নাম ছিল মারী ডোলোরেস গিলবার্ট। তিনি ছিলেন সামরিক বিভাগস্থ জনৈক ব্রিটিশ অফিসারের কন্যা। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বলেন কলকাতায় প্রথম জীবন কাটিয়ে তিনি ১৮৪১ অব্দে এ-দেশ ছেড়ে যখন চলে যান তখন তাঁর বয়স ছিল

তেইশ। অপর কোনো রমণীর প্রণয়াসক্ত হবার ফলে তাঁর সামরিক অফিসার-স্বামী লোলাকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

'মারী গিলবার্ট মনে করতেন যানবাহনের মধ্যে সবচেয়ে অস্বস্তিকর হল পাল্কি চড়া। 'কিন্তু পাল্কি কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে মানুষ-ঘোড়ারা যখন একযোগে ছুটতে ছুটতে সমস্বরে গান গাইত', শুনতে তাঁর খুব মজা লাগত। কথাগুলো তিনি নিজের ভাষায় লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন : হালকা ওজন / খাবদ্দা / ছোট্ট বাবা / খাবাদ্দা / জলদি চল্ / খাবাদ্দা / সুন্দর বাবা / খাবাদ্দা। 'খাবাদ্দা' কথাটা 'খবরদার' কথার ইংরেজী রূপান্তর।'

□

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

# শেষের সে দিন

অস্থির উত্তেজনার মধ্যে তিনটি মাস পারী শহরে কাটিয়ে, টাকাপয়সা শরীর-স্বাস্থ্য উড়িয়ে পুড়িয়ে, ১৮৪৬ অব্দের ১৮ মার্চ তারিখে দ্বারকানাথ লণ্ডন ফিরলেন। শরীর-স্বাস্থ্যের সহনশক্তি কম হলেও, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি এমনি ভরপুর ছিলেন যে ফিরে আসবার বেশ কিছুদিন পরেও তাঁর মুখচোখে চলাফেরায় কোনো ক্লান্তি, অবসাদ বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়নি। ভাগ্নে নবীনচন্দ্রের নজরে সে-রকম কিছু যে ধরা পড়েনি, সে তো ১৯ মার্চ তারিখে কলকাতায় গিরীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতেই স্পষ্ট :

'গতকাল মামা পারী থেকে ফিরলেন পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে। এমন ভালো দেখলাম তাঁকে, মনে হল লেশমাত্র ক্লান্ত না হয়ে আবার তিনি ইংরেজদের বাড়িতে খানা খেয়ে পার্টি করে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। বাড়িতে ডিনার তিনি বড় একটা করেনই না...।' ৭ এপ্রিল তারিখে লিখলেন : 'বাবুর শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভালো আছে—নগেন্দ্রেরও। নগেন্দ্র লেখাপড়ায় খুব ভালো করছে, খাটতে পারে খুব, সবাই ওর প্রশংসা করেন। সেদিন লর্ড অকল্যাণ্ড বলছিলেন, সারা বিলেত জুড়ে নগেন্দ্রের সমবয়সী এমন একজনও ছেলে তিনি দেখেন নি যে লেখাপড়ায় নগেন্দ্রের মতো চৌকস। কথাটা শুনে বাবু খুবই খুশি হলেন।' আবার ২৯ এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লিখলেন : 'মামার শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভালো চলছে। মাঝে মাঝে তিনি কলকাতা ফিরে যাবার কথা বলেন বটে, কিন্তু কবে যে সে-সুদিন আসবে সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। সেটাই হল দুঃখের কথা। দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, শীগগিরই সকলের সঙ্গে দেখা হবে। মনে হয় বছর খানেকের মধ্যেই...।'

১৯ মে তারিখের একটি চিঠিতে খবর দিলেন কলকাতায় বহু টাকার ঋণ শোধ করতে না পারায় স্টকলার দেউলিয়া হবার উপক্রম হওয়াতে দ্বারকানাথ তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেছেন...মে মাসে চমৎকার আবহাওয়া...গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন যখন ফরাসী রাজা লুই ফিলিপ-এর উপর গুলি চালনা...অতঃপর কিঞ্চিৎ লঘু পরিহাসের সুরে : 'দুয়েক হপ্তার মধ্যে মহামান্যা মহারাণী যে আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করবেন—এই খবর পেয়ে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে না। ওই অলবার্ট লোকটার মতো কর্তব্য-পরায়ণ

পরিচারক ইতিপূর্বে বিলেতের কোনো মহারাণীর কপালে জোটে নি।' বিলাতে সমাগত বজলুর রহিম নামে জনৈক ভারতীয় মুসলমান সম্বন্ধে দু-চারটা ব্যঙ্গোক্তির পর নবীনচন্দ্র জানালেন দ্বারকানাথের টাকায় যে-দুজন মেডিকেল ছাত্র লণ্ডনে পড়তে এসেছিলেন তাদের সাফল্যের কথা : 'শুনে আশ্চর্য হবে আমাদের সঙ্গে যে-দুজন মেডিকেল ছাত্র এসেছিল তারা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'শো জন য়ুরোপীয় ছাত্রকে হারিয়ে দিয়েছে। তাদের একজন তুলনামূলক এনাটমিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে, তার নাম সূর্যকুমার চক্রবর্তী, অপরজন দু'টি ভিন্ন বিষয়ে—সম্ভবতঃ কেমিস্ট্রি ও বোটানীতে—রূপোর মেডেল লাভ করেছে। ছ'হাজার মাইল দূর থেকে এসেও এরা যে স্থানীয় ছাত্রদের উপর টেক্কা দিয়েছে তাই দেখে এখানকার লোকেরা খুবই আশ্চর্য। আশা করি এর পর অন্য ছাত্রেরা এ-দেশে এসে এই দু'জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে যত্নবান হবে। বাবু বেশ ভালো আছেন। নগেন্দ্রও তথৈবচ।'

যদিচ তখনো ইংরেজি ভাষা তিনি ঠিক কব্জা করে উঠতে পারেন নি, নবীনচন্দ্র এখন আব মুখচোরা নন, আজকাল তিনি সদাগরী অপিসে শিক্ষানবিশ, সেখানকার সাহেবসুবোদের ধরনে নানা বিষয়ে বেশ খোলাখুলি সাহসভরে টিকাটিপ্পনী করতে শুরু করেছেন। ২ জুন তারিখের চিঠির সূচনায় জননী জন্মভূমির গুণগান করার ঠিক পরেই, শিখদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়ী হবার খবরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। তখনকার যুগে এ-রকম দ্বিধাবিভক্ত মানসের বহু পরিচয় পাওয়া যায়—দেশভক্তি ও রাজভক্তি তখন প্রায় তুল্যমূল্য। 'এবার তোমাকে এমন একটা আনন্দবার্তা পাঠাব যা শুনে পৃথিবীর তাবৎ ব্রিটিশ প্রজা আহ্লাদিত হয়ে উঠবে। সে সুখবরটা হল এই যে আরো একজন (সম্ভবত এটি পঞ্চমী) রাজকুমারী ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। সম্ভবত আরো কিছুকাল আগেই এঁর আবির্ভাব ঘটা উচিত ছিল। যাই বলো, সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে মনে হয় প্রিন্স অলবার্ট লোকটা মহারাণীর সেবায় খুবই তৎপর, কর্তব্য-কর্মে কখনো ত্রুটি করে না, সুতরাং বলা চলে যথোচিত পরিশ্রম করে বলেই পারিশ্রমিক পায়...।' অতঃপর সচরাচর শাদামাটা হলেও, ইংরেজ মহিলাদের কারো কারো রূপের প্রশংসা করে একটি অনুচ্ছেদ আছে। নবীনচন্দ্র লিখলেন, যাঁরা তাদের হুরী-পরী মনে করেন (মামা রূপসীদের 'পরী' বলতেন বলে ভাগ্নে সম্ভবত এক হাত নিচ্ছেন) তাঁরা হুরী-পরী বিষয়ে সামান্যই জানেন! কিন্তু ব্রিটিশ মেয়েদের মধ্যে যারা সত্যই রূপসী 'সারা বিশ্বে তাদের মতো সুন্দরী খুব কমই দেখা যায়।' সে যাই হোক 'আমি কিন্তু তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি প্রাচ্যদেশীয়দের জেনানায় যে-সব মোহিনী সুন্দরীদের দেখা মেলে, এই এলবিয়নের মুক্তদ্বার হারেম-এ সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য। আমাদের সকলের শরীর-স্বাস্থ্য উত্তম। বাবু আগামী অক্টোবরে বিলেত ছাড়ার কথা বলে থাকেন। মনে হয় তার চেয়ে বেশি দেরি হয়তো আর হবে না।..।'

১০ জুন তারিখে লেখা পরের চিঠিতে নবীনচন্দ্র লিখলেন : 'এ-মাসের শেষ

দিকে বাবু সুইজরল্যাণ্ড যাবার কথা বলছিলেন। সুখের বিষয় অন্যান্য বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রস্তাবটা স্থগিত রেখেছেন। মি: আর. সি. জেনকিন্স ক্রমাগত তাঁকে তাগিদ দিচ্ছেন কলকাতা ফিরে যাবার জন্য, কিন্তু মামা বলছেন ফ্যুলটন কলকাতা গেছেন তোমাদের জমিদারি বিষয়সম্পত্তি তদারকির জন্য, এখন ফ্যুলটন-এর কাছ থেকে চিঠি না আসা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে দিন স্থির করা শক্ত...। ইতিমধ্যে হেন সন্ধ্যা নেই যেদিন আমরা থিয়েটর যাই না, এখানে অনেক অনেক থিয়েটর।'

স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, না ভাগনে না তাঁর ছেলে নগেন্দ্র (নগেন্দ্রের ডায়ারি খুবই আগ্রহ-উদ্দীপক) দ্বারকানাথের নিকট-সান্নিধ্যে আসতে পারতেন। এই দুজন বয়োকনিষ্ঠের সঙ্গে মনের কথা আদান-প্রদান করাটা দ্বারকানাথ অনাবশ্যক মনে করতেন নিশ্চয়। কালেভদ্রে তাঁরা নিতান্ত অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতেন—এবং সেটুকু সময় তাঁর দিলখোলা হাসিখুশি ভাব দেখে আর প্রতিদিন তাঁর কর্মচাঞ্চল্য ও নিমন্ত্রণাদির বহর দেখে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতেন যে 'শরীর-স্বাস্থ্য তাঁর খুবই ভালো চলছে।' কিন্তু পারীর সেই উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতার পর লণ্ডনে ফিরে এসে সত্যিই তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো চলছিল না, টাকাকড়ির ব্যাপারেও টান পড়তে শুরু করেছিল—সব-কিছু মিলে সে সময়টাতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁর উদ্বেগ কত-যে গভীর ছিল সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ১৮৪৬ অব্দের ১৯ মে তারিখে লণ্ডন থেকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। তাঁর নিজের হাতে লেখা এটিই সর্বশেষ চিঠি বলে,[১] পুরো চিঠিটি উদ্ধৃতির যোগ্য :

লণ্ডন ১৯ মে ১৮৪৬

'স্নেহের দেবেন্দর,

'সাদাম্পটন থেকে মেলবাহী জাহাজ আগামীকাল রওনা হবে। এই সুযোগে **রবার্ট স্মল** জাহাজ-যোগে ক্যাপটেন স্কট-এর জিম্মায় যে-সব পার্সেল যাচ্ছে তার দরুণ মাল-প্রেরণের রশিদ পাঠালাম। ওইসব মালের মধ্যে একটি বড় সাইজের বাক্সে গিবসনের তৈরি একটি মহামূল্য মর্মর মূর্তি যাচ্ছে। সেটি খালাস করার পর অপিস-গুদামের সবচেয়ে শুকনো জায়গায় রেখে দিয়ো, যতদিন না বাগানবাড়িতে গ্যালারি তৈরি হয়। সে বিষয়ে পৃথকভাবে তোমায় নির্দেশ পাঠাব। বাকি সব মাল বাগানবাড়িতে নিয়ে সন্তর্পণে পার্শেল খুলতে হবে কারণ ওইসব পার্শেলের মধ্যে আছে স্ফটিকে তৈরি অনেকগুলি মূর্তি ও চীনেমাটির কিছু কিছু জিনিস। যথাস্থানে বাসাবার আগে অরগান ব্যারেলগুলো একবার বার্কিং ইয়ং-কে দিয়ে দেখিয়ে নিয়ো—ওর মধ্যে কিছু আছে ইতালিয়ান সুরের সংগীত এবং বাদবাকী সব নতুন অপেরা।

'মি: ফ্যুলটন পৌঁছে গেছেন কিনা এবং আমার বিষয়-কর্মের তদারকি-ব্যাপারে কী করছেন—এসব কথা জানবার জন্য আমি বিশেষ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি। মাস দুয়েকের আগে তাঁর কাছ থেকে চিঠি পাবার ভরসা খুব কম। স্যর টমাস

টার্টনকে বোলো তিনি জনসেবার কাজেকর্মে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন বলে তাঁকে চিঠি লিখে বিরক্ত করছে চাইনি। তা-ছাড়া এক আমার ব্যক্তিগত খবর ছাড়া অন্য কোনো খবর তো তাঁকে পাঠাতে পারতাম না। আমার বিষয়ে তো তোমার কাছ থেকে কিংবা আমার অংশীদারদের কাছ থেকে সব খবরই তিনি পেতে পারেন। এখানে পৌঁছবার পর লেডি টার্টন-এর সঙ্গে দেখা করেছি, গতকাল তিনিও অনুগ্রহ করে আমার সাক্ষাতে এসেছিলেন। তাঁকে বেশ ভালোই দেখলাম, মনে হয় কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠবেন।

'আমার জনৈক বন্ধু দিল্লির সেই গলায় জড়াবার একটি রুমাল চান—লাল জমি ও চারিদিকে সোনালী জরির পাড়—ঠিক যেমনটি ইতিপূর্বে আমার জন্য পাঠিয়েছিলে। দামটা যেন লেখা থাকে। প্রথম কিস্তিতে আমার জন্য যেসব জিনিস পাঠাবার কথা, তার সঙ্গেই এই স্কার্ফ এলে ভাল হয়।

"২২ মে—এইমাত্র তোমার ৮ এপ্রিল তারিখের চিঠি পেলাম। রাজা বরদাকান্ত এবং তোমার মোক্তারেরা শাহুশ তালুক বিক্রয়ের ব্যাপারে যে-গাফিলতি দেখিয়েছেন, তাতে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। রাজা বরদাকান্তের নাহয় নিজের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তোমার আমলারা কর্তব্যকর্মে এমন নির্লজ্জ অবহেলা করে যথাসময়ে তোমায় খবরটা পর্যন্ত দেয়নি জেনে আমার খুবই আশ্চর্য লেগেছে। অপরাপর জায়গা থেকে যে-সব খবরবার্তা ইতিমধ্যে আমি পেয়েছি এবং মি: গর্ডন তোমার আমলাদের বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন তা থেকে আমি এখন দৃঢ়নিশ্চিত এ-সব রিপোর্ট সত্য। আমার সমস্ত এস্টেটগুলি যে এখনো ছারেখারে যায়নি—এইটেই আশ্চর্য। আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় খবরকাগজের জন্য লিখে নতুবা মিশনারি সায়েবদের সঙ্গে ঝগড়া করে। অথচ তোমার উচিত ছিল বিষয়-আশয়ের এই সব জরুরী ব্যাপারের উপর সর্বদা নজর রাখা ও বিষয়-আশয় রক্ষা করা। যে-সব কাজ সতর্ক হয়ে তোমার নিজের করা উচিত ছিল সেগুলি ফেলে রেখেছো তোমার সব পেয়ারের আমলাদের হাতে। দেশের জলহাওয়া ও গরমি সহ্য করার মতো আমার যদি শক্তি থাকত, তাহলে এতদ্দণ্ডে লণ্ডন ছেড়ে আমি চলে যেতাম নিজের হাতে সবকিছুর তত্ত্বাবধান করতে। তা যখন সম্ভব নয়, আমার কাছে একটি মাত্র রাস্তা খোলা—হাউস-এর নামে চিঠি লিখে আমি তাঁদের এক্তিয়ার দিয়ে বলব তাঁরা যেন বন্ধকী বিষয়-আশ্রয় সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলেন এবং মফঃস্বলের জমিদারীগুলি যতটা পারেন যেন যথাসত্বর বেচে দেন।

'যা কানে আসছে তা থেকে মনে হয় একটা ব্যাপারও ঠিকমতো চলছে না, প্রত্যেকটা মোকদ্দমায় আমাদের হার হচ্ছে—দ্বারবাসিনী ও রামিস্কপুরের মামলা তালগোল পাকিয়ে গেছে, অন্য মামলারও অচিরে একই দশা হবে। মেল-স্টিমার কাল চলে যাচ্ছে বলে অন্যান্য সব ব্যাপার নিয়ে শান্তভাবে যে কিছু লিখব তার আর উপায়

নেই। দেবী রায়, গিরিন্দর ও রামচন্দরকে বোলো তাদের সকলের চিঠিই পেয়েছি, কিন্তু আগামী মেল অবধি আমায় জবাব দেওয়া স্থগিত রাখতে হচ্ছে; আশুতোষ দে-কেও সেই কথাই বোলো।

'আশা করি এ-চিঠি পৌঁছবার আগেই গর্ডন রাণী কাত্যায়নীর সেই কোম্পানী-কাগজের ব্যবস্থা করে ফেলে থাকবেন। দেবী রায়-কে আরো একটা কথা বোলো—সে যদি দ্বারবাসিনীর কোনো খদ্দের পায় তাহলে আমি বেচে দিতে রাজি আছি—কিন্তু আড়াই লাখ টাকার কমে ছাড়তে পারব না। দ্বারবাসিনীর পক্ষে ঐ-দাম মোটেই বেশি নয়, কেউ যদি ঠিকমতো ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করতে পারে। খদ্দের সহজেই কালেক্টর মারফত বিষয়টা বিক্রি করে দিতে পারবেন, তাহলে তিনি এস্টেটের উপর থেকে সব প্রজাস্বত্ব তুলে দিতে পারবেন। কালেক্টর-মারফত বিক্রি যখন হবে তখন যদি আমরা কিনে নিই, তাহলে মনে হবে যেন বেনামীতে কেনা হল।

'চন্দরের মাসোহারা বৃদ্ধি সম্পর্কে বলি, সে যখন টাকাটা চায় কয়েকজন চাকর নিয়োগ করার জন্য, আমার মনে হয় ১০০ টাকাই যথেষ্ট হবে। যতদিন না সে অন্য কোনো চাকরী পায় ওকে ওই টাকাটা দিতে পারো।

'মি: এলিয়ট দেখছি চৌরঙ্গীর বাড়ি থেকে উঠে গেছেন। ওটা বিক্রির ব্যবস্থা দেখো। ভালো ভাড়াটে পাওয়া সর্বদাই শক্ত।

'শাহুশ ও মাল্লোই তালুক এখনো যদি মি: মেকিঞ্জির তত্ত্বাবধানে না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে দেবার ব্যবস্থা কোরো।

'বাড়ির সবাইকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ো। ইতি তোমার স্নেহময়, দ্বারকানাথ ঠাকুর।'

নিম্নলিখিত অংশ একটি আলাদা কাগজে লিখে মূল চিঠির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, উপরে 'পুনশ্চ' লেখা ছিল না :

'মি: হ্যালিডে লিখেছেন চরের জমি বিষয়ে তিনি একটি নূতন আইনের প্রস্তাব দেবেন, ইংলিশম্যান কাগজেও তার উল্লেখ দেখেছি। এসমস্ত ব্যাপারে আমি যাতে উত্তমভাবে ওয়াকিবহাল থাকি—তোমার সে-ব্যবস্থা করা উচিত ও সর্বদা চিঠিপত্র লিখে খবরাখবর দেওয়া উচিত। যদিও কলকাতায় আমি এখন উপস্থিত নেই, এখানে বসেই আমি এই রকম ব্যাপারের সুরাহা করতে পারি। সুতরাং জমি-সংক্রান্ত কিম্বা বিচার-বিভাগীয় ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব যখনি আনা হবে খবরকাগজ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। খবরকাগজে মি: ডাফ-এর সঙ্গে তাঁর কলেজের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করার চেয়েও কিছু গুরুতর কাজকর্ম তোমার করার অপেক্ষায় আছে। ডি. টি.'

নিচে তাড়াহুড়োয় লেখা : 'তোমার ১৯ নভেম্বরের চিঠি পেলাম কিন্তু এবারকার

ডাকে তার জবাব পাঠানো সম্ভব হল না।'

মূল চিঠির পিছনে মোটা অক্ষরে লেখা : '৯ মে, ১৮৪৬। দেবেন্দর নাথ ঠাকুর এসকোয়ার, কলকাতা।'

এই চিঠিটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইটিই দ্বারকানাথের স্বহস্তলিখিত চিঠির মধ্যে সর্বশেষ চিঠি যা আমাদের গোচরে এসেছে। দ্বারকানাথ অবশ্য তাঁর অধিকাংশ চিঠিপত্র, চিরকুট, ডায়ারি ইত্যাদি স্বহস্তে লিখতেন, কারণ সে-কালে টাইপরাইটার ছিল না এবং যদিচ তাঁর একজন একান্ত-সচিব ছিলেন ও ইচ্ছ করলে তিনি একাধিক মাইনে-করা শ্রুতিলেখক রাখতে পারতেন, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র নিজের হাতে লেখাটাই তাঁর পছন্দ ছিল। কী কারণে এই চিঠির গুরুত্ব তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথমত এ-থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সে-সময় তিনি গভীর উদ্বেগে ছিলেন। বাড়তি তালুক প্রভৃতি বিক্রয় করে হাতে নগদ কিছু পেতে চেয়েছিলেন। চিঠি থেকে আরো একটি কথা স্পষ্ট : যদিচ বহুদিন দেশ ছেড়ে প্রবাসে ছিলেন, লণ্ডন ও পারী শহরে হৈ-চৈ আমোদ-প্রমোদে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর জমিদারি বিষয়-আশয় সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল টনটনে এবং জমিদারি-সংক্রান্ত সমস্যা কী-ভাবে সমাধান করা যায়—সেবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল। আর যে-ব্যাপারটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তা হল এই যে, জমিদারি ও অন্যান্য কাজ-কারবার পরিচালনায় দেবেন্দ্রনাথের যোগ্যতা ও নিষ্ঠা বিষয়ে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। চিঠিতে বার বার মৃদু তিরস্কার করে বলেছেন, দেবেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে ওয়াকিবহাল রাখেন না এবং জমিদারি পরিচালনার ভার অযোগ্য আমলাদের হাতে ফেলে রেখে, খবর-কাগজে লেখালেখি করে মিশনারী সায়েবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বৃথা কালক্ষেপ করে থাকেন। দ্বারকানাথের সৌজন্যবোধ ছিল অসাধারণ এবং খুবই স্নেহশীল পিতা ছিলেন তিনি, তা না হলে তিনি হয়তো তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারীকে বলতেন জড়বুদ্ধি হাবাগোবা মানুষ। খুব যখন উত্যক্ত বোধ করতেন হয়তো সত্যিই সে-রকম মনে করে থাকবেন দেবেন্দ্রনাথকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরে যখন বৃহৎ একটি যৌথ পরিবারের পুরোপুরি দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে এসে ভর করে এবং সেই 'হাবাগোবা' মানুষটি যখন মহাঋষি রূপে বহু লোকের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হয়ে পূজিত সম্মানিত হচ্ছেন, সেই সময়ে সুদক্ষ ভূম্যধিকারী-রূপে ও বিরাট জোড়াসাঁকো পরিবারের কর্তা-রূপে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

দ্বারকানাথ নিশ্চয় দেবেন্দ্রনাথকে প্রচুর চিঠি লিখে থাকবেন, মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে এবং কাজে-কারবারে তাঁর অংশীদার অথবা এজেণ্টদেরও তিনি যে কিছু চিঠি লেখেন নি, তা হতে পারে না। খুবই দুঃখের বিষয় এই সমস্ত চিঠি থেকে এই একটিমাত্র চিঠি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে। অবহেলায় এই সমস্ত কিংবা অধিকাংশ চিঠি লুপ্ত হতে দেওয়া হয়েছে কি? অথবা দ্বারকানাথের প্রপৌত্র ও

জীবনীকার ক্ষিতীন্দ্রনাথের অভিযোগই কি সত্য যে এই সমস্ত চিঠিপত্র ও দলিল ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিসাৎ করা হয়েছিল? জানিনা, কে এর জবাবদিহি করতে পারবে।

১৮৪৬ অব্দের সেই গ্রীষ্মের মরশুমে বিলেতে গরম পড়েছিল খুব। ১৯ জুন তারিখের এক চিঠিতে লণ্ডনের প্রখর গরমের কথা উল্লেখ করে কলকাতার নবীনচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অত্যুক্তি করে অভিযোগ করলেন : 'এ-গরম কলকাতার চেয়ে শতকরা একশো গুণ বেশি!' তাঁর মামা এই গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অথবা কোনো কাজ-কারবারের পরিকল্পনা নিয়ে সুইজরল্যাণ্ড যেতে চেয়েছিলেন কি না, জানা নেই। দ্বারকানাথ ছিলেন মনে-প্রাণে আশাবাদী—তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন ঈশান কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত মেঘ হয়তো কেটে যাবে; অচিরে শরীরস্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে—যেমন হয়েছে আগেও অনেকবার—এবং ভারতে ফিবে গিয়ে কাজ-কারবারে আবার শৃঙ্খলা তিনি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। নিজের ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছেন তিনি নিজেই, খুব সামান্য সূচনা থেকে কার-টেগোর কোম্পানীতে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুবিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য গড়েছেন। তাঁর সৌভাগ্যের সৌধে দু-একটা ফাটল দেখা দিয়েছে তো কী হল? মেরামত করে নিতে আর কতক্ষণ! ইংলণ্ডের অভিজাত-সমাজে তাঁর আসন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কলকাতার কাজকর্ম সেরে আবার যখন বিলেতে আসবেন, এঁরা দু-হাত বাড়িয়ে ওঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নেবেন, হয়তো ব্যারনেট-উপাধিতে ভূষিত হয়ে পার্লামেন্ট-এর আসনে তিনি পাকা হয়ে বসতে পারবেন তখন। এমন কত শত সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে উদয় হয়ে থাকবে। তিনি নিশ্চয় ঘুণাক্ষরে আঁচ করতে পারেন নি তাঁর প্রদীপ নিভিয়ে দেবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে।

সংকট-মুহূর্ত এল আকস্মিক সংঘাতের মতো : ৩০ জুন তারিখে ডাচেস অব ইনভেরনেস-এর প্রাসাদে তিনি ডিনারে বসেছেন এমন সময় বিনা কারণে, বিনা সংকেতে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, হঠাৎ এল ভীষণ কম্পজ্বর। এ-কি কলকাতার জলা থেকে পাওয়া ভয়ংকর সেই ম্যালেরিয়ার বীজ যা বহুকাল শরীরের অভ্যন্তরে সুপ্ত থাকার পর হঠাৎ মারমূর্তি হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে? পরে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে এ-অসুখের নাম দেন কম্পজ্বর। গৃহকর্ত্রী প্রিন্স-এর ভক্ত, ছুটে এসে তাঁর লম্বা লোমশ জামা দিয়ে দ্বারকানাথকে ঢেকে দিলেন, কিন্তু কাঁপা যেন আর থামে না।

এই দুর্ঘটনার পর দ্বারকানাথ সেন্ট জর্জেস হোটেলে তাঁর ঘরেই শুয়ে শুয়ে দিন কাটান। সারাক্ষণ মোতায়েন থাকেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা: মার্টিন; পরামর্শদাতারূপে তাঁকে সাহায্য করেন ডা: ব্রাইট ও ডা: চেম্বার্স।[৩] কয়েকটা দিন কেটে গেল অথচ অবস্থার কোনো উন্নতি হল না দেখে, এই দু'জন ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে স্থানান্তর করা হল সাসেকস-এর সমুদ্রতটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ওয়র্দিঙ-এ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ হোটেল (মার্টিন হোটেল) এর এক সারি কক্ষ ভাড়া নেওয়া হল

দ্বারকানাথ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য—সংখ্যায় তাঁরা সবশুদ্ধ সতেরো জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডা: মার্টিন, একান্ত সচিব মি: সেফ, দ্বারকানাথের জর্মন সঙ্গীত-শিক্ষক, একজন দোভাষী ও আরো অনেকে। এই অনেকের মধ্যে দু-জন ছিল তাঁর খাস পরিচারক, ভারত থেকে তারা সারা রাস্তা বাবুর সঙ্গে এসেছে—একজন মুসলমান বাবুর্চি ও অন্যজন হলো বহু পুরাতন হুঁকা-বরদার হুলী।[৪]

যোলো বছর পরে দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ, ভারতীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম আই. সি. এস. হয়েছিলেন, একবার ওয়র্দিঙ গিয়েছিলেন পিতামহের অসুস্থতা ও মার্টিন হোটেলে তাঁর অবস্থিতি বিষয়ে সকল রকম খবরাখবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। ১৮৬২ অব্দের ২৫ আগস্ট তারিখে ওয়র্দিঙ থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথকে জানালেন : 'সেদিন আমি এই হোটেলের মালিকানী ভদ্রমহিলার সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে-সময়ে তিনি হোটেলেই থাকতেন। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর এখানে অবস্থান করার বিষয়ে কিছু কিছু খবর দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সতেরো জন অনুচর, তাদের মধ্যে দুজন ছিল দেশীয় ভৃত্য। তদুপরি তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন একজন একান্ত সচিব, একজন দোভাষী, একজন জর্মন সংগীতবিদ এবং আরো একজন ভদ্রলোক। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা: মার্টিন শুদ্ধ—এঁরা ছিলেন পাঁচজন। এঁরা সবসময় ওঁর কাছাকাছি থাকতেন। ছোটকাকা নগেন্দ্রনাথ ও নবীনবাবু এই দলের সঙ্গে ছিলেন না, তাঁরা লণ্ডন থেকে দু-একবার মাত্র আসা যাওয়া করে তাঁকে দেখে যেতেন।

'পিতামহের শরীর-স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তাঁর ছটফটানির ভাবটা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যহ তিনি ভোর সাড়ে পাঁচটা-ছটায় উঠে ঘোড়াগাড়ি চেপে একবার বেড়িয়ে আসতেন। ফিরে এসে আবার খানিকটা নিদ্রা যেতেন। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে হুলীর রান্না সামান্য ভাত ও মাংসের ঝোল আর হয়তো একটু কমলার জেলি। ক্লারেট ছাড়া আর কোনো মদ্য পান করতেন না। বেড়াতে যাবার সময় সর্বদা সুন্দর একটি কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়িয়ে নিতেন, তখন হোটেলের দরজায় বেশ কিছু মহিলা জমায়েত হতেন তাঁর দর্শনলাভের জন্য। ডাচেস অব ক্লীভল্যাণ্ড প্রতিদিনই আসতেন তাঁর সাক্ষাতে এবং ডাচেস অব ইনভেরনেস প্রত্যহ চিঠি লিখতেন তাঁকে। বর্তমান হোটেল-মালিকানীর দিদি তখন ছিলেন মালিকানী। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত তাঁর সঙ্গে একত্র বসে এক গেলাস ক্লারেট পান করতেন—এমনটা করার কী-যে তাৎপর্য সে এখন নিতান্তই অনুমানের বিষয়। হয়তো তাঁর আশ্রয়ে শান্তিতে আছেন—এইটুকু বুঝিয়ে দিতে চাইতেন। অত্যন্ত অমায়িক স্বভাব ছিল তাঁর, যারাই তাঁকে দেখতে আসত সকলের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতেন।

'খুবই অসুস্থ ছিলেন যদিচ, চিত্তের সমতা কখনো হারিয়ে ফেলেননি। কোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ করা তাঁর ধাতে ছিল না এবং সর্বদাই তিনি প্রফুল্ল থাকতেন। হীনতম চাকর নফরেরাও তাঁর বহুবিস্তৃত বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হত না।

দেশের ছোটখাটো রীতিরেওয়াজ ও দৈনন্দিন অভ্যাসের খুঁটিনাটি—সব তিনি বজায় রাখতেন। পোশাক পরতেন ভারতীয় ধরনে। বসে থাকতেন যখন, আলবোলা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল, হুলী সযত্নে তামাক সেজে দিত। আটটি ছোট ছোট খোপওয়ালা কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি তাঁর একটি মশলার বাক্স ছিল, হুলীর কাজ ছিল আট রকমের মশলা দিয়ে খোপগুলি প্রত্যহ ভরে রাখা। গরমে তাঁর খুব কষ্ট হত বলে তিনি সর্বদা জানলা খোলা রেখে শুতেন, সকালবেলা নিয়মিত স্নান করতেন, বরফ-দেওয়া জল তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। হুলী ছিল তাঁর দিনরাতের চাকর, খুবই প্রভুভক্ত ছিল হুলী। কর্তার শয়নঘরের দরজার বাইরে নিজের বিছানা বিছিয়ে শুয়ে থাকত। কর্তার যতক্ষণ না চোখে ঘুম আসত শয্যাপার্শ্বে একটা মাদুরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা টিপে দিত। পিতামহের জীবনীশক্তি ক্রমেই যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন তাঁর আর বেশি দিন নেই। কেউ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করত তিনি কেমন আছেন, তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সঙ্গে জবাব দিতেন, 'আমি তৃপ্ত'। ক্রমে তাঁর চলৎশক্তি রহিত হবার উপক্রম হওয়াতে ডাক্তাররা মনে করলেন তাঁকে লণ্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে। তিনি এই হোটেল ছেড়ে চলে যান ২৭ জুলাই তারিখে।'

দ্বারকানাথ বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন, তিনি ততদিনে ঠিকই বুঝেছেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। মাত্র সেই দিন তো তিনি পার্শেল ভরে ভরে নানাবিধ শিল্পসামগ্রী কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানালেন বেলগাছিয়া ভিলায় এবার তিনি একটি নূতন গ্যালারী পত্তন করবেন। সেইসব পরিকল্পনা এখন অলীক স্বপ্নে পরিণত হল। তবু তিনি এই মনোবেদনা ও শরীরের সমস্ত গ্লানি শান্ত চিত্তে বহন করলেন। 'এখন কেমন বোধ করছেন?'—প্রশ্নের জবাবে একটি ক্ষীণ হাসি হেসে অস্ফুট স্বরে সেই একই জবাব দিয়ে চললেন, 'আমি তৃপ্ত'। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যতই জাগতিকমনা বিলাসী ব্যক্তি তিনি হোন না কেন, গভীর অন্তরে তাঁর একটা অধ্যাত্মশক্তির সঞ্চয় ছিল।

অবধারিত মৃত্যু নিকটবর্তী জেনেও দ্বারকানাথ শয্যাশায়ী হবার পাত্র ছিলেন না। দেহে যতদিন শক্তি ছিল প্রতিদিন তাঁর গাড়ীতে চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব ও কাজ-কারবারের সহচরেরা যখন সাক্ষাতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, হয়তো বলেছেন বিষয়-আশয়ের কথা, দেশের কাজের কথা, কাজ-কারবারের কথা কিংবা তাঁর বড় সাধের বেলগাছিয়া ভিলা ও তার শিল্পসামগ্রীর কথা। হয়তো একটা নূতন উইলের বয়ান বলে গেছেন মুখে মুখে, এবং হুলীর মতো একান্ত অনুগত ও সেবাপরায়ণ পরিচরদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে-উইলে দরাজ হাতে কোনো অনুদানের ব্যবস্থাও করে থাকবেন। কিন্তু এইসব আলাপ-আলোচনা ও আদেশ-নির্দেশের কোনো হদিশ উত্তরকালের জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহচরেরা, এমনকি তাঁর

একান্ত সচিব মি: সেফ-ও রেখে যান নি। কিছুই তাঁরা লিখে রাখেন নি—এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁরা সকলেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তো ছিলেনই, উপরন্তু দ্বারকানাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রণয় ছিল গভীর ও আন্তরিক। যুক্তিসংগতভাবে ধরে নেওয়া যায়—এই সমস্ত কথাই তাঁরা বিশদভাবে ও লিখিতভাবে জানিয়ে থাকবেন দেশে তাঁর পরিবারবর্গের গোচরে আনবার জন্য। কোথায় উধাও হল সেইসব কাগজপত্র ও মূল্যবান দলিল? কে আজ সেই রহস্যের কূল-কিনারা করবে?

সমুদ্রের জলহাওয়ায় তাঁর শরীরস্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো উপকার তো হলই না, দিন দিন যেন একটু একটু করে অবনতির দিকে যেতে লাগল। সেই জন্য ডাক্তাররা স্থির করলেন তাঁকে লণ্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে। লণ্ডনে ফেরবার পর ২৭ জুলাই তারিখে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হল। ১ আগস্ট তারিখে **মর্ণিং ক্রনিকল** তাঁদের রিপোর্টে বললেন : 'খুবই দুঃখের সঙ্গে আমরা অবগত হলাম যে বহুবিশিষ্ট বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর খুবই গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর বন্ধুরা বেদনার্ত ও আতঙ্কিত...। যকৃতের দোষজনিত তাঁর পীড়ার আশঙ্কাজনক লক্ষণগুলি তিন দিন আগে প্রকাশ পায়। তারপর থেকে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। ডা: চেম্বার্স এবং লোয়ার গ্রসভেনর স্ট্রীটের ডা: মার্টিন সর্বক্ষণ বাবুর শয্যাপার্শ্বে রয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় এই খ্যাতনামা চিকিৎসকদ্বয় বলেছেন যে গত দু-দিনের তুলনায় বাবু অনেকটা যেন ভালো বোধ করছেন।'

কিন্তু দিন ফুরিয়ে গেল। উপরোক্ত রিপোর্ট যেদিন বের হল সেদিনই অর্থাৎ শনিবার ১ আগস্ট তারিখেই, দ্বারকানাথ সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে তাঁর লণ্ডনস্থ আবাস অলবেমার্ল স্ট্রীটের সেন্ট জর্জেস হোটেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই ইন্দ্রপতনতুল্য ঘটনার সঙ্গে সমাপতনিক হয়ে সেদিন বিকেলবেলা লণ্ডনের আকাশ বাতাস যেন ফেটে পড়ল প্রচণ্ড এক ঝড়ের বিক্ষোভে। শুরু হল বিকেল তিনটের সময়, শেষনিঃশ্বাসের মিনিট পনেরো পরে সব যেন শান্ত হয়ে এল। নিসর্গ-প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব ঘটনার কথা উল্লেখ করে ১৮৪৬ অব্দের তেসরা আগস্ট তারিখে (২ আগস্ট রবিবার ছিল বলে কোনো কাগজ বের হয় নি) **টাইমস** বলেছেন : 'গত শনিবার রাজধানী লণ্ডন শহর ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ শহরতলী অঞ্চলের উপর দিয়ে বজ্র, বিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি ও ধারাবর্ষণ-সহযোগে যে-প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল, সে-রকম বিক্ষোভ গত বহু বৎসর দেখা যায় নি।'

জে. এইচ. স্টকলার তাঁর স্মৃতিকথা **মেমোয়ারস** গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'তাঁর মৃত্যুকালে বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল এই মহানগরীর উপর দিয়ে, মনে হয়েছিল সত্যকার এই মহাপুরুষের শেষযাত্রার সুগম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে প্রকৃতি যেন সঙ্গতি রক্ষা করেছিলেন। মর্ত্যলোকের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে উন্নতচরিত্র দ্বারকানাথের দেহবিমুক্ত আত্মা যখন পরলোক যাত্রায় অগ্রসর হচ্ছে, সেইসময় যে- রকম প্রচণ্ড

বজ্রনির্ঘোষ আমি শুনেছি, যে-রকম আকাশের বুকচেরা বিদ্যুতের চমকানি দেখেছি—ইতিপূর্বে তেমন অভিজ্ঞতা আমার আর কোথাও ঘটে নি, আর্মেনিয়ার পার্বত্য ঝড়ের সময় কিংবা ভারতের কালবৈশাখীর সময়েও এমন বজ্রবিদ্যুতের সমারোহ আমি দেখতে পাইনি।'

১৮৪৬ অব্দের ৩ আগস্ট তারিখে সোমবারে **টাইমস** কাগজ এক কলম-ব্যাপী একটি শোকবার্তা প্রকাশ করেছিলেন।[৩] দ্বারকানাথের বংশ-পরিচয়, ধনকুবের সওদাগর-রূপে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, জনহিতকর কাজে তাঁর বদান্যতা ইত্যাদির কথা লেখার পর **টাইমস** বলেছিলেন অর্থবিত্ত ও পদমর্যাদায় অন্যান্য ভারতীয়েরা যেমনই হোন না কেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে জনহিতের জন্য দ্বারকানাথ যা করে গেছেন তার তুলনা হয় না। শুক্রবার ৭ আগস্ট তারিখে **লণ্ডন মেল** লিখলেন : 'জীবৎকালে বহুসম্মানিত, মৃত্যুতে গভীর-ভাবে অনুশোচিত বাবুর মতো খুব কমই লোক আছেন ভারতে, যিনি দেশের লোকের কাছ থেকে এতখানি কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম, তাঁর পরিবারের কুলুজী প্রমাণ করে যে তাঁদের বংশ নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও বনেদী—উচ্চ আভিজাত্যের অধিকারী। কিন্তু তাঁর এই বংশ-মর্যাদার খাতিরে আমরা তাঁর জীবনের পর্যালোচনা করতে চাই এমন নয়, আলোচনা করতে চাই তার চেয়ে বহুতর সঙ্গত কারণে। সুবেশ ও সুদর্শন এই ব্যক্তিটির আচার-ব্যবহার ছিল খুবই মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ, তিনি ছিলেন উচ্চপর্যায়ের নানাগুণসম্পন্ন একজন লোক, সমসাময়িক রাজনীতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, যে-দেশেই তিনি গেছেন সকল সম্প্রদায়ের লোকেব কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কলকাতায় দেশীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকেরা তাঁর কত-যে কদর করত এবং কতভাবে তারা তাঁর কাছে যে ঋণী ছিল সে-কথা প্রমাণ হয়েছিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানী বাহাদুরের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারীরা এবং কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য জগতের প্রতিভূবৃন্দ। সর্বসম্মতিক্রমে সেই সভায় স্থির হয়, জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় দ্বারকানাথের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি কোনো সুযোগ্য য়ুরোপীয় চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে টাউন হল-এর দেওয়ালে, এবং লর্ড মেটকাফ-এর নানা কীর্তির স্মরণে যে-হল নির্মিত হয়েছে সেখানে স্থাপন করা হবে দ্বারকানাথের একটি আবক্ষ মূর্তি। এইভাবে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ ভারত-হিতৈষণায় এই নাগরিকপ্রবরের নানা কার্যকলাপের স্বীকৃতির পরিচয় দিয়েছিল। তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনে, তাঁর অদম্য অধ্যবসায়; দেখেছে কেমন উদার হস্তে তিনি দশ হাজার পাউণ্ডের এক বিরাট দান তুলে দিয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল ফণ্ড-এর হাতে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং সাক্ষ্য রেখে গেছেন সতীদাহ-নিবারণকল্পে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উপর দ্বারকানাথের প্রভাব কতভাবে

তাঁকে সাহায্য করেছিল। অন্যান্য নানা কাজে তাঁর সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞভাবে উল্লেখ করেছেন পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলরাও। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁর নানা গুণের সম্মানে ও জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মহামূল্য অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। মহামান্যা মহারাণীও অনুরূপ একটি স্বর্ণপদক দিয়ে দ্বারকানাথের সর্বতোপ্রাপ্ত সম্মাননার চূড়ায় একটি যেন রাজমুকুট পরিয়ে দেন। কেবল তাই নয়, রাজানুগ্রহের অন্যতম প্রতীকস্বরূপ পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য তাঁর ও প্রিন্স অলবার্ট-এর মিনিয়েচর ছবি উপহার দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের জনহিতকর কাজের মধ্যে সর্বশেষ কাজ হল এ-দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য দুজন মেডিকেল ছাত্র প্রেরণ এবং নিজের টাকায় তাদের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ। যাঁরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন তাঁর এই পরিকল্পনা সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।"

সর্বশেষে **লণ্ডন মেল** এই আশা প্রকট করেন যে পূর্ণ পৌরুষের অধিকারী অবস্থায় দ্বারকানাথের এই আকস্মিক অকালমৃত্যু যদিচ ঘটেছে রাজা রামমোহন রায়ের অকালমৃত্যুর অনতিকাল পরেই, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ যেন এই দুজনের অকাল-বিয়োগকে 'কালাপানি' পার হবার শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বিরোধিতা করার অপরাধ-জনিত অভিশাপ বলে কদর্থ না করেন। সমসাময়িক কালের ভারতে কোনো কোনো গোষ্ঠী বা সমাজ এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে আমল যে না দিয়েছেন এমন নয়। কিন্তু এই দুই পুরোধার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উচ্চাশা-প্রণোদিত অভিযাত্রীরা অভিশাপের ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হননি—তাঁদের দলে ছিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ। এইসব সাহসিক অভিযাত্রীরা ক্রমেই দলে ভারী হতে চলেছেন। যাঁরা জীবিকা, সৌভাগ্য কিংবা নিছক আমোদ-প্রমোদের পিছু-ধাওয়া করে বিদেশভ্রমণ করেন, সেইসব জাগতিকমনা অ-যাজকীয় ব্যক্তিরা তো রয়েইছেন এই দলে। তদুপরি আজকাল বেশ কিছু সংখ্যক সাধু-সন্ত, যোগী ও গুরু মহাত্মারাও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে, বিদেশে গিয়ে পুরাতন শাস্ত্রকে নূতন করে সাজিয়ে প্রচার করতে লেগেছেন, শিষ্যাশিষ্যা জুটিয়ে মঠমন্দির স্থাপন করে প্রণামী-দক্ষিণা আদায় করে পরমানন্দে দিনাতিপাত করছেন। দ্বারকানাথের সময়ে লোকে কালাপানি পার হতে ভয় পেত বলে বিদেশে যেত না, আজকাল বিদেশ-গমনেচ্ছুদের সংখ্যা এমনি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে লেগেছে যে সমস্যা হয়েছে কী করে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। তারা পৃথিবীর সর্বত্র যেতে চায়—এমনকি এমনসব দেশে যেতে চায় যেখানে তারা অবাঞ্ছিত। হিন্দু-গোঁড়ামির চাকা এখন সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে।

দ্বারকানাথের মৃত্যু-বিষয়ক সার্টিফিকেট রেজিস্টারভুক্ত করা হয় ১৮৪৬ অব্দের ৪ আগস্ট তরিখে, সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ দেওয়া হয় 'দক্ষিণ ফুসফুসের জ্বরপ্রদাহ।' কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন যে মরণোত্তর পরীক্ষায় দেখা যায় 'তাঁর শরীরের বিশিষ্ট

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কোনোটিতেই রোগের লক্ষণ নেই।'[৮] বর্তমান লেখক মরণোত্তর পরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো দলিল সন্ধান করে পাননি।

পর দিন ৫ আগস্ট তারিখে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট তারিখে **টাইমস** কাগজ তাঁদের রিপোর্টে লিখলেন :

'বহুলোকের শ্রদ্ধাভাজন ও বিশিষ্ট এই বিদেশাগত অতিথির দেহাবশেষ ৫ তারিখে কেনসল গ্রীন-এর একটি সমাধি-কক্ষে সমাহিত করা হয়।

'পরলোকগতের পুত্রের ইচ্ছানুসারে সমাহিত করার সময় কোনো ধর্মযাজকের সাহায্য নেওয়া হয়নি বা আনুষ্ঠানিক কিছু করা হয়নি।

'শবাধার-সহ শবযাত্রা শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটার সময় বাবুর আবাস (সেণ্ট জর্জেস হোটেল, অলবেমার্ল স্ট্রীট) থেকে।

'শবাধার-বাহক গাড়ির ঠিক পিছনেই ছিল মেজর হেণ্ডারসনের নিজস্ব গাড়ি। তাতে ছিলেন পরলোকগতের পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনলাল[৯] এবং তরুণবয়স্ক বিশিষ্ট ভারতীয় নবীনচন্দ্র মুখার্জি—যিনি বাবুর আত্মীয়। তার পরের গাড়িতে চলেছিলেন শোকাভিভূত স্যর এডওয়র্ড রায়ান (পরলোকগতের পুত্রের অভিভাবক), মেজর হেণ্ডারসন (পরলোকগতের কাজ-কারবারের অংশীদার), ডা: র‍্যালি ও মি: ডি. জে. ম্যাককিলপ। দ্বিতীয় একটি গাড়িতে শবযাত্রীরূপে ছিলেন অনারেবল ক্যাপটেন ডি. গোর, ক্যাপটেন হেণ্ডারসন, মি: সি. প্লাউডেন ও ডা: গুডিভ। তৃতীয়টিতে ছিলেন মি: মরডণ্ট রিকেটস, মি: প্রিন্সেপ, জেনারেল ভাঁতুরা এবং মি: রবার্টস—সবাই ছিলেন বাবুর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। এইসব গাড়ির পিছনে ছিল মোহনলালের নিজস্ব গাড়ি—তাতে চলেছিলেন তিন জন মেডিকেল ছাত্র। শবযাত্রার সবপিছনে ছিল পরলোকগতের নিজস্ব গাড়ি—তাতে ছিলেন বাবুর বার্তাবাহক ও বাবুর অন্যান্য পরিচারকবৃন্দ।

'সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছনোর পর শবযাত্রীরা কেনসল গ্রীনের প্রবেশপথের নিকটস্থ এমন একটি স্থানে গেলেন যে-অংশ মন্ত্র পড়ে পবিত্র করা হয়নি,'[১০] সেখানে ছিল ইট দিয়ে গাঁথা বৃহদায়তন সমাধিকক্ষ—শবাধার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত।

'আন্তরিক শোকের স্তব্ধতার মধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। সমাহিত করার সময় প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ-চমকানির পর মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। সমাধিক্ষেত্রের যাজক রেভা: মি: টুইগার ব্যক্তিগতভাবে শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সমাহিত করার সময় কোনো প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারিত হয়নি।

'সমাধিকক্ষে শবাধার নামিয়ে দেবার পর শবযাত্রীরা ফিরে যাবার উদ্যোগ যখন করছিলেন, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরোধ করলেন সমাধিকক্ষের ছাদ বসাবার আগে কেউ যেন চলে না যান। বলা বাহুল্য সবাই তখন ফিরে এলেন। ছাদ বসাতে বেশ একটু সময় লাগল। অবশেষে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সমাধিকক্ষের মাথাটা ঢেকে দেওয়া হল। অতঃপর শবযাত্রীরা সকলে যে-যার গাড়ি চড়ে সমাধিক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

‘পরলোকগতের পুত্র ভারতীয় ধরনে কালো রঙের কুর্তা-পাজামা পরিধান করেছিলেন। মোহনলাল ও অন্যান্য ভারতীয়েরা সচরাচর যেমন পোশাক পরে থাকেন, তেমনি বর্ণাঢ্য দেশীয় পোশাকে এসেছিলেন।’

‘যে-শবাধারে দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল তার চেহারাটা খুবই জমকালো ছিল। সমস্ত শবাধার মহামূল্য সিল্ক ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। শবাধারের গায়ে ছিল রূপোর ফুল, ঢাকনির উপরে ছিল দু-খানি রূপোর পাত—একটিতে বাংলা ভাষায় লেখা ছিল মৃতের নাম ও পরিচয়, অন্যটিতে তারই ইংরাজী অনুবাদ—

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর

মৃত্যু : ১ আগস্ট ১৮৪৬, বয়স—৫১ বৎসর

‘শোনা যায় পরলোকগতের সুন্দর মুখাকৃতি মৃত্যুর পর একটুও বিকৃত হয়নি বলে যারা দেহাবশেষ শবাধারে স্থাপন করার জন্য সাজসজ্জা করতে এসেছিল, প্রথম প্রথম তারা বিশ্বাসই করতে পারে নি যে এই দেহ থেকে আত্মা বিমুক্ত। সেই অবস্থায় বাবুর মুখের একটি ছাঁচ নিয়ে রাখা হয়।’

অতঃপর শরীর থেকে হৃদযন্ত্রটিকে বের করে রাখা হয়, ভারতে পাঠিয়ে দেবার জন্য—যাতে বাবুর পরিবারের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এই দেহাবশেষের উপযুক্ত রকম ব্যবস্থা হতে পারে।’

ব্লেয়র বি. ক্লিং বলেছেন : ‘মহারাণী শবযাত্রার জন্য চারটি রাজকীয় শকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।’ যেহেতু দ্বারকানাথ সম্বন্ধে মহারাণীর উচ্চ ধারণা ছিল, তিনি যদি তাঁর শোকযাত্রায় রাজকীয় শকট পাঠিয়ে থাকেন তা অসঙ্গত হত না, অবিশ্বাস্যও হত না। কিন্তু কোনো ব্রিটিশ কাগজ এবং বিশেষ করে **কোর্ট জর্নাল**-ও শোকযাত্রায় রাজকীয় শকটের উপস্থিতি-বিষয়ে উল্লেখমাত্র করেননি। অপরপক্ষে কঁৎ ফ্যুইয়ে দা কঁশ ৬ আগস্ট তারিখে লণ্ডন থেকে তাঁর স্ত্রীকে যে-চিঠি (মাদাম কৃষ্ণা রিবু ও মঁসিয়ে ইয়েগরস্মিট-এর সৌজন্যে প্রতিমুদ্রিত হল) লিখেছিলেন তাতে কিন্তু রাজকীয় শকটের উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃতি করছি : ‘গত সন্ধ্যায় এলাম জেনারেলের অতিথি হয়ে..। তুমি ও লুসী শুনে বিরক্ত হবে বাবুকে সমাধিস্থ করার ঠিক মুখেই এসে পড়লাম। বেচারা গত শনিবার মারা গেলেন। প্যারী থাকতে যে-জ্বরজ্বালায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাইতেই মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত। জীবনটাকে নিয়ে ঘোড়দৌড় করতে গিয়েই নিজে নিজের মরণ ডেকে আনলেন। সমাধি দেবার ব্যাপারটা চলেছিল সারা দিন ধরে। মহারাণী ও তাঁর মন্ত্রীপরিষদ গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। অভিজাতবর্গের প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন, সবাইকে একখণ্ড করে কালো রেশমের আবরণ দেওয়া হয়েছিল মাথা ঢাকবার জন্য, কেউ সেগুলো আর ফেরত দেয়নি। এইরকম শোক-অনুষ্ঠানে মাথা ঢাকবার আবরণ পোশাকের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। বাবুর ধর্মবিশ্বাস অন্যরকম ছিল বলে তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কোনো চার্চ কিছু করেনি। তাঁকে যে

সর্বজনীন সমাধিস্থানে সমাহিত করা হল, তা কালে আমাদের পোর লা শ্যেস্-এর[13] মতো হয়ে উঠবে মনে হয়।'

অকালমৃত্যু তাঁর হয়েছিল ঠিকই—কারণ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স একান্ন-বাহান্নর বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেনি এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্যে এমন কোনো রহস্যও ছিল না যা নিয়ে সুবিবেচক ব্যক্তির মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তত্রাচ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে এবং হাটে-বাজারেও তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে নানা জনশ্রুতি ও জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। নগেন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বিলেত থেকে ফিরে আসার পর কী বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে একটা ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য : দ্বারকানাথের মৃত্যুর প্রায় একশো বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর প্রপিতামহের মৃত্যু ঘটেছিল, 'একটা কেমন যেন রহস্যময় পরিবেশে।'[12]

## টীকা

১। *Correspondence-cum-Diary Files of Dwarkanath Tagore* File No 3, Rabindra Sadan, Santiniketan. মূল চিঠি উপরোক্ত নথিভুক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে আছে।

২। রেভারেণ্ড ডঃ ডফ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একজন মিশনারী সাহেব। রামমোহন রায় কলকাতায় এঁর কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা ঘটিয়ে দেন। ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষা-প্রসারে ইনি অন্যতম পুরোধা ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করায় ইনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলে হিন্দুরা এঁর উপর খুব চটা ছিলেন। এর ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সংস্কারকেরা একযোগে ডফ-এর বিরোধিতা করেছিলেন।

৩। দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা ব্যালি যিনি ভারত থেকে তাঁর সহচর হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয় অসুখের সময় তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি পরামর্শদাতা-চিকিৎসক ছিলেন না বলে খবরকাগজে তাঁর নামের উল্লেখ দেখা যায় না। দ্বারকানাথকে সমাহিত করার সময়েও শোকযাত্রীদের মধ্যে ডা ব্যালি ছিলেন।

৪। পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র—উভয়ের মধ্যে কেউই ওয়র্দিঙ-এ দ্বারকানাথের সহচরদের মধ্যে ছিলেন না। অসুখের সময় তাঁর সঙ্গে কিংবা তাঁর কাছাকাছি এঁরা থাকেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষ্যক্রমে জানা যায় যে 'দু-একবার' এসে তাঁরা দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। কিন্তু কই নগেন্দ্র তো তাঁর ডায়ারিতে পিতার অসুখের কথা কিছু লেখেন নি, নবীনচন্দ্রও তো কলকাতায় গিরীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে গিয়ে ঘুণাক্ষরে জানাননি যে তাঁর মাতুল অসুস্থ। যদি উভয়ের কেউ অসুখবিষয়ে কিছু লিখেও থাকেন—সেসব কাগজপত্র আর পাওয়া যায় না।

৫। *Calcutta Review*, Vol. XII, 1924 Ed. Indira Devi, Satyendranath Tagore's Letters অপিচ দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস।'

৬। লণ্ডনের India Office Library লেখককে 'টাইমস' কাগজে প্রকাশিত শোকবার্তার একটি ফোটোস্টাট কপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে সেটি উপহৃত।

৭। 'Fever-disease of right lung'—বর্তমান লেখক মৃত্যু-পঞ্জী দেখেছেন। এর সরকারী ফটোস্টাট কপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে উপহৃত।

৮। *Memoir*, p. 117. কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশ' সাপ্তাহিকের ১৩৬৪ সালের সাহিত্য-সংখ্যায় অমিতাভ গুপ্ত লিখেছিলেন 'দ্বারকানাথের সমাধি' বিষয়ে।

৯। কিছুটা রহস্যে আবৃত হলেও মোহনলালের অভিযাত্রী-জীবনে অনেক কিছু ছিল যা আগ্রহ-উদ্দীপক। ১৮৪৬ অব্দের ২৮ মার্চ তারিখে লণ্ডনের 'কোর্ট জর্নাল' তাঁর একটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করেন। বইয়ের নাম *Travels in the Punjab, Afghanistan and Turkistan to Balk, Bokhara and Herat · and a visit to Great Britain and Germany* (Allen & Co.)। সমালোচনা-দৃষ্টে ধারণা হল তাঁর ভ্রমণ-পর্ব শেষ হতে চোদ্দ বছর লেগেছিল—১৮৩১ থেকে ১৮৪৫ এবং তাঁর অভিযাত্রী জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল যখন তিনি স্যর আলেকজাণ্ডার বার্নস-এর দোভাষী ও পারসিক সেক্রেটারি-রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্যর আলেকজাণ্ডার কাবুলে আততায়ীর হাতে নিহত হন ১৮৪১ অব্দে। মনে হয় মোহনলাল ছিলেন দিল্লির বাসিন্দা। তাঁর বংশপরিচয় কিছু জানা যায় না, যদিচ তাঁর নাম শুনে মনে হয় তিনি হিন্দু—তিনি হিন্দু ছিলেন না মুসলমান না শিখ, সেবিষয়েও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এক জায়গায় তাঁকে মীর্জা-নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রুসিয়ার রাজা ও প্রিন্স অলবার্ট-কর্তৃক তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১০। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে রামমোহনকে সমাহিত করা হয়েছিল ব্রিস্টল সমাধিক্ষেত্রের এমন একটা জায়গায় যা 'মন্ত্রপূত' ছিল না। তার কারণ মৃত্যুকালে তিনি খ্রীস্টান ছিলেন না এবং তিনি চান নি খ্রীস্টধর্ম অনুসারে কোনো ধর্মযাজক তাঁকে সমাহিত করার সময় প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। শোনা যায় দুজনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় ওঁ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সমাহিত করার পূর্বে রামমোহনের মরদেহ যখন ধোওয়া হয়, দেখা যায় তিনি উপবীত ছাড়েন নি। দ্বারকানাথেরও উপবীত শেষ পর্যন্ত ছিল কি না জানা যায় না, না-থাকাটাই বিচিত্র—কারণ তিনি তো রামমোহনের মতো প্রচলিত ধর্ম পরিহার করেন নি।

১১। মুখাকৃতির সেই ছাঁচটির কী দশা হয়েছিল জানা যায় না।

১২। 'টাইমস' কাগজের রিপোর্ট অনুসারে হৃদযন্ত্র সত্যই যদি ভারতে পাঠানোর জন্য সরিয়ে রাখা হয়ে থাকে, তার কী গতি হয়েছিল জানা যায় না।

১৩। *Partner in Empire*, by Blair B. Kling p. 237

১৪। প্যারী শহরের একটি বিখ্যাত সমাধিস্থান—এখানে বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও নামকরা সাহিত্যিকদের সমাধি আছে।

এ-চিঠিটি কোঁৎ-এর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে লেখা। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনার, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জনশ্রুতির একটা সংমিশ্রণ দেখা যায় এই চিঠিতে। তিনি যদি ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় লণ্ডন এসে পৌঁছে থাকেন শবযাত্রায় তিনি কিছুতেই উপস্থিত থাকতে পারেন না, কারণ দ্বারকানাথ সমাহিত হন সকালবেলা। তিনি নিশ্চয় সব খবর পেয়ে থাকবেন তাঁর বন্ধু জেনারেল ভাস্তুরা-র কাছ থেকে। 'টাইমস' কাগজের রিপোর্ট থেকে জানা যায় তিনি শবযাত্রার একটি গাড়িতে ছিলেন। যৎসামান্য যা তিনি শুনে থাকবেন তার উপর রঙ চড়িয়ে অলংকরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'অভিজাতবর্গের প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন।' মাথা ঢাকার জন্য সকলকে 'কালো রেশমের আবরণ' দেবার কথাটাও নিতান্তই বাজে কথা।

১৫। *On the Edges of Times*, by Rathindranath Tagore Orient Longmans, Calcutta, 1958

ইহজীবনে দ্বারকানাথ যেমন নানা বিচিত্র কাহিনীর নায়ক হয়েছিলেন, পরজীবনেও তেমনি। বরঞ্চ আরো একটু অতিরঞ্জিত করে কাহিনী ছড়িয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। সেটা অবশ্য ঘটেছিল স্বল্প সময়ের জন্য, কারণ অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর স্মৃতি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরিবারবর্গের

মধ্যে একটি যে-অতিকথা চালু হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে মহারাণীর দরবারে ও অভিজাত সমাজে দ্বারকানাথের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা আতঙ্কিত বোধ করেন এবং তাঁদের প্ররোচনাক্রমে দ্বারকানাথের মৃত্যু ঘটানো হয়। কোনো কোনো দুষ্ট লোক প্রচার করে, মেমসায়েবদের সঙ্গে বাবুর যখন এতই দহরম-মহরম নিশ্চয় তিনি মহারাণীর হৃদয় জয় করে থাকবেন এবং ঈর্ষাবশত প্রিন্স অলবার্ট গোপনে বিষপ্রয়োগে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শ-বিভাগে অভিলেখাগারে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেসব কাগজপত্র রক্ষিত আছে তার মধ্যে ঠাকুরপরিবারের জনৈক নিকট-আত্মীয়ের লেখা এক চিঠিতে অভিজাতসমাজে প্রচলিত বহুবিধ গুজবের কথা বলা হয়েছে। একটি গল্পে বলা হয়, দ্বারকানাথের অনুরোধ-উপরোধে মহারাণী একটি ভারতীয় শাড়িতে সুসজ্জিত হয়ে প্রিন্স-এর সামনে এসে দাঁড়ালে পর প্রিন্স তাঁর কপালে সিঁদুর পরিয়ে বলেন তাঁকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন ভারতীয় বধূর মতো। মহারাণী তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি তাঁর হাত থেকে কোনো সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করবেন। সেকথা শুনে প্রিন্স বলে উঠলেন : 'সম্মানসূচক উপাধি। মহামান্যা মহারাণী আমায় কী-এমন উপাধি দিতে পারেন যা আমার নামের চেয়েও বড়ো? আমি তো ঠাকুর—ভারতে ঠাকুর মানে স্বয়ং ভগবান।' সেই শুনে মহারাণী চুপ করে রইলেন। নিঃসন্দেহে গল্পটা নেহাৎই অলীক, কিন্তু এরকম কাহিনী থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় দ্বারকানাথের ব্যক্তিত্ব সমসাময়িকদের চোখে কীরকম মোহিনী মায়া বিস্তার করে থাকবে। বাজারে গুজব ছিল আরো এক কাঠি সরেশ—দ্বারকানাথের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে এরা আজগুবি গল্প ফাঁদত। তেমনি একটা গল্পে বলা হত দ্বারকানাথের ঔরসে মহারাণীর গর্ভে একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বিবাহযোগ্যা হলে পর কন্যাকে বেলজিয়মে কার সঙ্গে নাকি বিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য এইসব গল্পই বল্গাবিহীন কল্পনার লক্ষ্যহীন দৌড়—এর কোনোটির মধ্যে ইতিহাসের সত্যের নামগন্ধও নেই।

□

# উপসংহার

দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় পৌঁছয় মৃত্যুর দেড় মাস পরে। দেবেন্দ্রনাথ তখন তাঁর স্ত্রী সারদা ও তিন ছেলে, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্রকে নিয়ে পিনিস যোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় সেদিন পিনিসের অবস্থা সঙীন। কোনো প্রকারে পিনিস তীরে লাগিয়ে আরোহীরা নেমে পড়লেন। এমন সময় একটা ছোটো ডিঙি ঘাটে এসে লাগল, জোড়াসাঁকো বাড়ির স্বরূপ খানসামা ডিঙি থেকে এক লাফে পাড়ে এসে পড়ল এবং দেবেন্দ্রনাথের হাতে একখানি চিঠি দিল—চিঠিতে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু-সংবাদ। আর দেরি করার সময় নেই, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরতে হবে। পরদিন বোটে তিনি সপরিবারে উঠলেন এবং ঝড়ের মুখেই কলকাতা ফিরলেন। মাঝপথে এমনি তুফান উঠল যে বোট ডোবে আর কি! অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টায় পল্তা গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি-যোগে যখন কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন—তখন রাত দুপুর।[১]

অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ সকলের মনে খুবই আঘাত দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু যদ্দূর জানা যায় আত্মীয়স্বজনেরা গভীরভাবে কেউ শোকাভিভূত হননি। এমনও হতে পারে যে ঋষিপ্রতিম দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অবচেতনায় কিঞ্চিৎ নিরুদ্বেগ বোধ করে থাকতে পারেন কারণ তাঁর পিতার ইহজাগতিক আচরণ ও অমিতব্যয়ী স্বভাবের পক্ষপাতী তিনি কখনো ছিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি নাকি বলতেন যে তাঁর পিতা যখন প্রবাসে ছিলেন তাঁকে প্রতি মাসে লক্ষ টাকা পাঠাতে হত। এখন তিনি পিতৃশাসনমুক্ত হয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং পৈতৃক ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকার, ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োগ করতে পারবেন।

### শ্রাদ্ধ

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুশপুত্তলিকা দাহ করে। পরবর্তীকালে মহর্ষি-নামে খ্যাত দেবেন্দ্রনাথের মনে তখন আর সমস্ত প্রশ্ন ছাপিয়ে যে-সমস্যাটা প্রবল হয়ে দেখা দিল, তা হল পিতৃশ্রাদ্ধ কী-নিয়মে হবে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুষ্ঠান মেনে, না তাঁর নবলব্ধ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে উপনিষদের মতে? রামমোহনের প্রতি অনুরাগ ও সতীদাহের বিপক্ষতা সত্ত্বেও পিতা যে শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি অনুষ্ঠান

মেনে চলতেন, একথা দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন মাতা অলকাসুন্দরীর (বালক বয়সে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই দিদিমার বিশেষ ভক্ত ছিলেন) শ্রাদ্ধ দ্বারকানাথ কেমন সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন করেছিলেন। দ্বারকানাথের নিজস্ব সংস্কার ও ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রসঙ্গ থাকলে, নিশ্চয় হিন্দু-সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুষ্ঠান মেনে শ্রাদ্ধকর্ম করা সঙ্গত হত। কিন্তু তাহলে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করতে হত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মেজো ভাই গিরীন্দ্রনাথকে বললেন, 'ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করিয়া শালগ্রাম আনিয়া কেমন করিয়া আমরা পিতৃশ্রাদ্ধ করি?' সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ও পরিবারের মুরুব্বীস্থানীয়েরা—রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, এমনকি সহোদর ভাই গিরীন্দ্রনাথ—বারবার বললেন যেন প্রচলিত মতে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানাদি হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সংকল্পে স্থির হয়ে রইলেন, বললেন শ্রাদ্ধ করবেন অ-পৌত্তলিক মতে, শালগ্রাম তিনি আনবেন না, দানোৎসর্গের মন্ত্র তিনি নিজে স্থির করে দেবেন এবং দিনের কোনো একটা সময় কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুকে নিয়ে কঠোপনিষৎ পড়বেন।

একপ্রকার মনস্থির তো করলেন, কিন্তু দোটানা আর ঘোচে না। এমন সময় একদিন রাত্রে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন—কী-এক নিগূঢ় রহস্যে তাঁর মনের কল্পনা যেন সত্যের রূপ ধরে এল। স্বপ্নে যেন এক ছায়ামূর্তি ইশারায় তাঁকে ডেকে নিয়ে চলল গ্রহতারকার অতীত এক রাজ্যে। সেখানে 'একটা দরজার পর্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলানো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলানোই রহিয়াছে।...এখন দেখিলাম আমার জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন : 'তোকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'[৮] দিব্যদর্শন দিয়ে মা যেন তাঁর উভয়সংকট ঘুচিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্মরণে একবার উদয় হল না যে তাঁর মা যখন জীবিত ছিলেন হিন্দু-সংস্কারগত আচার-অনুষ্ঠান ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে মায়ের যে-অভয়বাণী এল, তিনি মনে করলেন তা যেন দৈববাণী। এবার তিনি সংকল্পে স্থির হলেন; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই যদি বিরূপও হন, তিনি ব্রাহ্মমতেই পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন। শ্রাদ্ধদিবস এল, কেবল দানসামগ্রী উৎসর্গ করে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তেতালার ঘরে চলে গেলেন, পরে তিনি শুনলেন গিরীন্দ্রনাথ বিধিমতে শ্রাদ্ধ করেছেন। এমনি করে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হল। সেদিন সকল আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব আহার করে চলে গেলেন, পরদিন নিয়মভঙ্গের ভোজে কেউ আর এলেন না। দানোৎসর্গের অঙ্গ-হিসাবে ব্রাহ্মণ-বিদায় ও কাঙালী-বিদায়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৪৬ অব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে শনিবারে **বেঙ্গল হরকরা** তাঁদের রিপোর্টে লিখলেন : 'আমরা অবগত হলাম গত

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) পরলোকগত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধে কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত তৈজসপত্র এবং মূল্যবান কাশ্মীরি শাল উৎসর্গ করা হয়। আরো শোনা গেল এইসব সামগ্রী গুণ ও মর্যাদা অনুসারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তাছাড়া তাঁদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ থেকে এক শত টাকা দক্ষিণাস্বরূপ উপহৃত হয়।'

**স্মরণ সভা**

নমো-নমো করে না হলেও, যে-পিতা পারিবারিক সমৃদ্ধির কারণস্বরূপ", তাঁর শ্রাদ্ধকর্ম পুত্র একপ্রকার অনাড়ম্বরেই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু দেশের সংবাদপত্রগুলি যে-ভাষায় দ্বারকানাথেব স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাতে কোনো কার্পণ্য ছিল না, আন্তরিকতার অভাব ছিল না। প্রথম শোক-বার্তা প্রকাশ করেন **বেঙ্গল হরকরা**, তাঁদের ১৮৪৬ অব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় : 'তাঁর মৃত্যুতে নৈতিক দিক থেকে দেশের যে-ক্ষতি হয়ে গেল, কয়েক প্রজন্ম পরে হয়তো তা পূরণ হতে পারে। কিন্তু এ-দেশকে যাঁরা ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের মতে 'তাঁর তুল্য ব্যক্তি' পুনরায় আবির্ভূত হবেন কি না সন্দেহ।'

দু-দিন পরে একই সংবাদপত্র তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন : 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভারত এমন একজন ব্যক্তিকে হারাল যিনি য়ুরোপের চোখে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সকলের চেয়ে বেশি কাজ করেছেন। ভারত-সন্তানদের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন—এমন নয়; তাঁর চেয়ে দক্ষ ব্যক্তি অথবা পণ্ডিত ব্যক্তি এ-দেশে আগেও ছিলেন এবং এখনো আছেন। মানসিক উৎকর্ষের জোরেই যে তিনি দেশের উন্নতি-সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন এমন নয়; তাঁর সাফল্যের কারণ হল তাঁর মনের ঔদার্য ও সর্বব্যাপকতা। তাঁর এই বহু-প্রসারী মুক্ত মনই অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, তাঁকে এমন প্রবর্তনা দিয়েছিল যে তিনি একই সঙ্গে স্বদেশের হিতসাধন ও বিদেশে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল তাঁর কুলধর্মের অন্তর্নিহিত, বংশানুক্রমে তাঁরা 'ঠাকুর'-রূপে পূজিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে জাতিধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন, সেইখানেই তাঁর বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব।

'তিনি যে তাঁর দেশবাসী ও কলকাতাবাসী সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র-রূপে স্মরণীয় থাকার যোগ্য—এখানে সেকথা বলাটাই বাহুল্য, কারণ সকল শ্রেণীর লোকের মনে জনহিতকর কাজে তাঁর বদান্যতা ও রাজকীয় অতিথিপরায়ণতার স্মৃতি এখনো সমুজ্জ্বল। জীবৎকালেই তাঁর মহোচ্চ সামাজিক গুণের স্বীকৃতিতে তিনি কিছু কিছু সম্মাননা পেয়ে গেছেন, বাদবাকি সম্মান যা তাঁর বকেয়া পাওনা, নিঃসন্দেহে তা এখন তাঁর স্মৃতির প্রতি নিবেদন করে দেশবাসী তাঁর ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু দেশবাসী ও তাঁর সহ-নাগরিকবৃন্দ তাঁর স্মৃতির প্রতি তাঁদের করণীয় কৃত্যের কথা যদি

বিস্মৃতও হন, যতদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিংবা তাঁর সহায়তা-পুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে থাকবে, তাঁর স্মৃতিচিহ্নের কোনো অভাব ঘটবে না।

'য়ুরোপে রাজরাজন্যের দরবারে সর্বজনসমক্ষে অথবা পরোক্ষে তাঁর নিজস্ব জীবনচর্যায়, তিনি যে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করে গেছেন, তা সে-দেশের লোক সহজে ভুলবে না। তাঁর রাজসভাসদ-সুলভ সৌজন্যবোধ ও রাজকীয় ঐশ্বর্যগরিমা, তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্রের সুষ্ঠু সমন্বয়, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ—তাঁকে উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সর্বজনপ্রিয় করেছিল। জ্ঞানী ও দার্শনিক রূপে রামমোহন রায় আদৃত হয়েছিলেন কেবল তাঁর সমধর্মীদের মধ্যে; কিন্তু ইহজাগতিক অর্থে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী রূপে দ্বারকানাথ যেমন রাজাদের সমাদর লাভ করেছিলেন তেমনি প্রজাদেরও, যেমন আলস্যবিলাসীর তেমনি অক্লান্তকর্মীরও।'

কেবল ইংরেজী সংবাদপত্রই যে দ্বারকানাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল এমন নয়। ১৮৪৬ অব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে **বেঙ্গল হরকরা** তাঁদের সম্পাদকীয়-তে বলেছিলেন :

'বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দুটি প্রভাবশালী কাগজ **সম্বাদ ভাস্কর** ও **সংবাদ প্রভাকর**—দ্বারকানাথের মৃত্যু-বিষয়ে যা লিখেছেন তার ইংরেজী অনুবাদ আমরা পেয়েছি। আমাদের এতদ্দেশীয় সমকালীনেরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো এই একটি বিষয়ে খুবই যোগ্যতার সঙ্গে লিখেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখাগুলি সুদীর্ঘ বলে স্থানাভাবের জন্য তাঁদের মতামতগুলি পুনরায় প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। হয়তো এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে দুটি কাগজই একযোগে তাঁদের এই বিশিষ্ট স্বদেশবাসীর অকাল-বিয়োগ দেশের পক্ষে পরম দুর্ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের উপকারার্থ তিনি যেসব জনহিতকর কাজ করে গেছেন, শোকার্ত চিত্তে সেইসব কার্যকলাপ স্মরণ করেছেন। **প্রভাকর** উপরন্তু বলেছেন যেহেতু দ্বারকানাথ এখন আর ইহজগতে নেই, 'তাঁর অগণিত দেশবাসীর মধ্যে এমন একজন কেউ রইলেন না যিনি জনহিত বা জনস্বার্থের ব্যাপার নিয়ে দেশের শাসকদের সঙ্গে সমান তালে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন অথবা দেশ-পরিচালনার নীতি নিয়ে শলাপরামর্শ দিতে পারবেন।' এই মন্তব্য যে কতখানি সত্য সে আমরাও জানি, কিন্তু আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে দেশবাসীর দাবীদাওয়া নিয়ে সরকারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার মতো সুদক্ষ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও তাঁর সমকক্ষ কোনো দেশসেবক অচিরে তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারবেন।

'পরলোকগত বাবুর চরিত্রগুণের প্রশংসা করে **প্রভাকর** দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছেন তাঁরা যেন জনসভায় সমবেত হয়ে স্থির করেন কী-উপায়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা যায়। আমরা আশা করি এতদ্দেশীয়েরা এ-ডাকে সাড়া দেবেন—এবং কেবল এতদ্দেশীয়রা নন, অপরাপর আরো যাঁরা তাঁর জীবৎকালে তাঁর

নানা সদ্‌গুণের পরিচয় লাভ করেছিলেন তাঁরাও এগিয়ে এসে তাঁর বিষয়ে তাঁদের স্মৃতিকথা বলবেন। আমরা আরও আশা করি যে অচিরে শুনতে পাব যাঁরা এসব ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন, তাঁরা টাউন হল-এ এই নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করবেন। যাঁর কাছে কলকাতা-সমাজ এতভাবে ঋণী, মরণোত্তর শ্রদ্ধায় তাঁকে সম্মানিত না করে যদি বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হতে দেওয়া হয়, তাহলে কলকাতার পক্ষে সেটা মোটেই শ্লাঘাজনক হবে না।'

প্রখ্যাত প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষাকল্পে জনসভা ডেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য **প্রভাকর** যে-ডাক দিয়েছিলেন তা যথাস্থানে পৌঁছয়নি এমন নয়, কিন্তু সাড়া এসেছিল কিঞ্চিৎ বিলম্বে। ১৮৪৬ অব্দের ২ ডিসেম্বর তারিখে বিকেল ৪ টার সময় এই উদ্দেশ্যে কলকাতার শেরিফ টাউন হল-এ একটি জনসভার আয়োজন করলেন। সেদিন সকালে **হরকরা**-সম্পাদক পাঠক-সমাজকে উচ্চকিত করার জন্য সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে লিখলেন, কলকাতাবাসী যেন দলে দলে টাউন হল-এ সমবেত হয়ে 'এমন একজন ব্যক্তির স্মরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন যিনি দেশবাসীর সামনে জনহিতকর কাজের ও রাজকীয় বদান্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।'

সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরো বলা হয় : 'সর্বজনের কাজে লাগে অথবা সর্বজনের হিতে লাগে, এ-রকম যতগুলি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই শহর গর্ব বোধ করতে পারে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাঁর নাম সংযুক্ত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর বদান্য স্বভাব; আমাদের মধ্যে বহু লোক আছেন যাঁরা কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁর হাতের দান গ্রহণ করে উপকৃত হয়ে থাকবেন। বহু লোককে তিনি দেনার দায় থেকে কিংবা অনুরূপ কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন বহু উদ্যোগকে প্রোৎসাহিত করেছেন যেগুলি তাঁর সাহায্য-ব্যতিরেকে দাঁড়াতেই পারত না; দেশের সম্পদকে দেশের উন্নতির জন্য তিনি যে-ভাবে লাগাতে পেরেছেন তেমন হয়তো আর কেউ পারেননি। প্রাচ্যদেশবাসী হলেও তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় গুণ ছিল তাঁর নৈতিক সাহস; খোলাখুলিভাবে স্বমত প্রকাশ করতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, স্বমতে তিনি দৃঢ় থাকতে পারতেন, ধনীর কাছে কিংবা শক্তিমানের কাছে কোনো দিন তিনি দাস্যভাবে মাথা নোয়ান নি। তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সুকুমার-কলায় তাঁর রুচি। সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল, কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি কিছু কিছু তালিমও নিয়েছিলেন, প্রায়ই গুন্‌গুন্‌ করে তিনি কোনো ইতালিয় সুর ভাঁজতেন এবং শুনে মনে হত সুরটি তিনি ভালোই রপ্ত করে থাকবেন। তিনি কেবল-যে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন এমন নয়, তাঁর বাড়িতে সর্বদাই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতযন্ত্র মজুত থাকত। বিদেশ থেকে তিনি য়ুরোপীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মূল্যবান নিদর্শন আমদানি করেছিলেন, সেগুলি তাঁর দমদম রোডের সুরম্য বাগানবাড়িতে শোভা পেত। অন্যদেরও সুকুমার কলায় যাতে রুচি বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিধিমতো যত্ন করতেন। স্থানীয় শিল্পীদের এবং বিশেষত

সঙ্গীত-শিল্পীদের, তিনি একজন সহানুভূতিশীল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মুক্তহস্তে তাঁদের সহায়তা করার জন্য অর্থব্যয় করতেন। আমাদের পাঠকদের কারো কারো এখনো স্মরণ থাকতে পারে কলকাতায় যখন ইতালিয়ান অপেরা এসেছিল, তিনি কতভাবে তাদের আনুকূল্য করেছিলেন। কলকাতার থিয়েটর যে কতভাবে তাঁর কাছে ঋণী সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর চিত্রসংগ্রহের মধ্যে কয়েকটি চিত্র আমাদের বহু-পরিচিত পুরাতন ড্রুরি লেন থিয়েটর এবং সেই মঞ্চের প্রখ্যাত কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্মৃতিবাহী। তাঁদের দেখা আর মিলবে না কারণ অগ্নিকাণ্ডের পর ড্রুরি লেন-এর আর অস্তিত্ব নেই। সুকুমার কলায় দ্বাবকানাথের আগ্রহ ও অনুরাগের বিষয় আমরা বিশদ করছি বলে কেউ যেন না মনে কবেন আরো বহুতর ও গভীরতর যে-সব বিষয়ে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারেন, সেগুলি আমরা বিস্মৃত হয়েছি। আজকের জনসভায় কোনো কোনো বক্তা নিশ্চয় সেইসব বিষয়ের অবতারণা করবেন। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যূষে তাঁর কিছু কিছু কার্যকলাপের কথা সেই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে;—মনে পড়ছে বরেণ্য রামমোহনের শিষ্য-সহচররূপে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে কীবকম দৃপ্ত সাহসে তিনি হিন্দুসমাজে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে পডছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তথা নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তাঁব দেশবাসীর সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি কত ক্ষেত্রে কত কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রসাবে তিনি যা করে গেছেন সে-কথা সর্বজনবিদিত বলে এখানে তার পুনরুক্তি থেকে আমরা বিরত রইলাম।'

**হরকরা**-র সম্পাদক যেমন আশা করেছিলেন তদনুসারেই যেন সেদিন বিকেলের জনসভায় স্যর জন পিটর গ্রাণ্টকে সভাপতির আসনে বসিয়ে একজনের পর একজন বক্তা দ্বারকানাথের বিবিধ গুণাবলী ও সমাজসেবার নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে শোকাভিভূত জনগণের মনের বেদনা ব্যক্ত করে আর্চডিকন ড: ডিয়ালট্রি প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও পরলোকগতের তিনটি চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। সর্বপ্রথম বললেন তাঁর বদান্য স্বভাবের কথা—কেমন করে তিনি জীবৎকালে ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির হাতে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন এবং কীভাবে একই উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য আরও এক লাখ টাকা তাঁর উইলে রেখে গেছেন। দ্বিতীয়ত নিজের দেশের লোকের মধ্যে ইহজাগতিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। তৃতীয়ত, তাঁর সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদিচ প্রতি পদে তাঁকে তাঁর দেশবাসীর ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়েছে, তিনি তাঁর নৈতিক সাহসের শক্তিতে সকল অন্তরায় অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই শোক-প্রকাশ-সূচক প্রস্তাব সমর্থন করেন বাবু রসময় দত্ত।

এডভোকেট-জেনারেল জে. ডবলু. কোলভিল একটি ওজস্বী বক্তৃতার পর দ্বিতীয়

প্রস্তাবে বলেন, দ্বারকানাথের স্মৃতিতে একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হোক। এর উদ্দেশ্য হবে ভারতীয় তরুণদের জন্য য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব লণ্ডনে সাধারণ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গত তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর দ্বারকানাথ কত যে গুরুত্ব দিতেন সেই কথা উল্লেখ ক'রে, মেডিকেল ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা এবং তারা কেমন পারিতোষিক ও উচ্চ প্রশংসা লাভ ক'রে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—সেই সব কথা উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল।

অতঃপর রুস্তমজী কাওয়াসজীর প্রস্তাবক্রমে এবং শেরিফ মি: জে. পি. ম্যাকর্কিলিগিন-এর সমর্থনক্রমে যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে বলা হয় যে, দ্বারকানাথ মেমোরিয়ল এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী ট্রাস্ট গঠিত হোক—যার সদস্য হবেন পদাধিকার-বলে কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট, এডভোকেট-জেনারেল, গভর্ণমেণ্ট-এজেণ্ট এবং বাংলা সরকারের সেক্রেটারী।

চতুর্থ প্রস্তাবটি আনেন মি: জি এ বুশবি, সমর্থন করেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকারী ট্রাস্টীদের সঙ্গে একটি ট্রাস্টী কমিটি যুক্ত হোক—যার সদস্য হবেন রুস্তমজী কাওয়াসজী, রসময় দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ড: জন গ্রাণ্ট, মেজর হেণ্ডারসন, রামচন্দ্র মিত্র এবং ড: ডবলু. বি. ও'সনেসি।

সর্বশেষে ক্যাথলিক চার্চ-এর তরফ থেকে রেভারেণ্ড ড: নাশ একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে যেমন ইংলণ্ডে তেমনি ফ্রান্সে, দ্বারকানাথ রাজ-পরিবার থেকে এমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন যেমনটা পান 'সমগ্র রাশিয়ার অধিপতি'। তিনি আরো বলেন যে দ্বারকানাথ ছিলেন সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, তাঁর মানবতাবোধ সকল শ্রেণীসীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বব্যাপী হয়েছিল, তাঁর দাক্ষিণ্যে জাতিধর্মের বালাই ছিল না। একটি বিষয়ে তিনি বক্তা, সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে দ্বারকানাথের প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এসম্বন্ধে তিনি ক্যাথলিক আর্চবিশপের সঙ্গে পত্রব্যবহার করে প্রস্তাব করেছিলেন এতদ্দেশীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেন একটি নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।[৭]

খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় বলতে হবে **হরকরা**-সম্পাদক যে-আশা প্রকট করে বলেছিলেন যে টাউন হল-এর এই জনসভার সুবাদে দ্বারকানাথের 'সুকীর্তি তাঁর অবর্তমানেও বেঁচে থাকবে' সে-আশা সফল হয়নি। সভায় সমাগত সকলের মনে যে-উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল তা অচিরেই বাষ্পের মতা উবে যায়, ভারতীয় ছাত্রদের লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার্থে পাঠাবার জন্য যে স্থায়ী ফাণ্ড গঠন করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়নি। এগারো বছর আগে রামমোহন-স্মারণিক যেমন মৃত-কল্প হয়েছিল, দ্বারকানাথ-স্মারণিকের দশাও হয়েছিল একই রকম।

কলকাতায় রামমোহন রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের উপযোগী কোনো স্মারণিক গড়ে

যে ওঠেনি, সেই বিফলতার জন্য দ্বারকানাথের একাগ্র অধ্যবসায়ের অভাব নিশ্চয়ই অংশত দায়ী। তেমনি প্রস্তাবিত দ্বারকানাথ এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড যে গড়ে উঠল না তার জন্য দায়ী দ্বারকানাথের নিজস্ব পরিবারের অনীহা। টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভার যে-সব বিশদ বিবরণ কাগজে বেরিয়েছিল তার কোনোটিতেই উপস্থিত সজ্জনদের মধ্যে না দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথের নাম না গিরীন্দ্রনাথের (তরুণ নগেন্দ্রনাথ তখনো হয়তো বিলেত থেকে ফেরেননি)। ১৮৪৬ অব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে যখন সর্বসম্মতিক্রমে দ্বারকানাথের স্মৃতিতে এই স্থায়ী তহবিল গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখনো পরলোকগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট সাম্রাজ্য অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। কার-টেগোর কোম্পানীর দুর্ভেদ্য দুর্গে ফাটল দেখা যায় কিছুকাল পরে। হাউস-এর দরজায় তালা পড়ে এক বছর বাদে—য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কও তথৈবচ।[৫]

১৮৪৭ অব্দে বাণিজ্য-জগতে যে-একটি বিরাট ঝড়ের ঝাপটা লাগে তারই এক ঝটকায় ঠাকুর-পরিবারের বহুবিস্তৃত বিষয় সম্পত্তি যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। অনাগত সঙ্কটের একটা আশঙ্কা দ্বারকানাথের মনে যে একেবারে ছিল না, বলা চলে না। ইতিপূর্বে আর একটা সঙ্কটের ঢেউ যখন এসে লেগেছিল বাণিজ্য-জগতে, তখন দ্বারকানাথ ছিলেন একটা উঠ্‌তি ঢেউয়ের মাথায়। তখনই তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন বাজারে দেনাপাওনার ভিত্তিটুকু কত পলকা। তিনি এটাও বুঝেছিলেন, এই ধরনের সঙ্কট এড়িয়ে চলার মতো বুদ্ধিবিবেচনা কিংবা মুখোমুখি মোকাবিলা করার মতো সাহস, তাঁর দুই ছেলের মধ্যে কারো ছিল না। তাই তিনি ছেলেমেয়ে ও তাঁদের পরিবার-পোষ্যবর্গের মোটামুটি আরামে জীবন-ধারণের সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন ও একটি উইল সম্পাদন করে যান। তাঁর এই দূরদৃষ্টির ফলে, যদিচ অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূতহারে তাঁর বংশবৃদ্ধি হতে থাকে (সমসাময়িক লিও টলস্টয়ের মতো মহর্ষিও ছিলেন যেমন বহু-সন্তানবান তেমনি অতিমাত্রায় ভগবদ্ভক্ত), প্রায় শতাব্দী কাল ধরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার তাঁদের জীবনধারণের মান বজায় রাখতে পেরেছিলেন ও উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ওই এক-শো বছরের কোনো একটা সময়ে হয়তো ঠাকুর-পরিবার তাঁদের পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধির উৎসস্বরূপ দ্বারকানাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলকাতার দায়িত্বমোচনে কিঞ্চিৎ মদত জোগাতে পারতেন। কিন্তু কার-টেগোর কোম্পানীর পতন-জনিত আকস্মিক বিপর্যয়ে তাঁরা এমনি বিমূঢ় হয়েছিলেন যে বেশ কিছুকাল তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে ধারদেনা মেটাবার ধান্দায়। এই উদ্ধারকার্য ও পারিবারিক বিষয়-আশয়ের পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার নিয়ে এমনই ব্যস্ত ছিলেন যে, বলতে গেলে তাঁর ধনপ্রাণমন যা-হতে সকলি তাঁকেই তিনি ভুলে রইলেন, স্মৃতির সঙ্গে শৃঙ্খলিত থাকতে তিনি যেন আর চাইলেন না। তাছাড়া, দ্বারকানাথকে লোকে বলত ইহ-জাগতিক, বে-হিসাবী এবং মৃত্যুর পর

কার-টৌগোর কোম্পানীর পতনের জন্য মুখ্যত তাঁকেই তারা দায়ী করত। এমন বাবাকে ভুলে থাকাই ভালো!

মোটা টাকার দেনা শোধ করার প্রয়োজনে বেলগাছিয়ার সুরম্য ভিলা বেচে দিতে হল পাইকপাড়া-রাজের কাছে। ভিলাতে যে-সব মূল্যবান সামগ্রী ছিল—ছবি, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলার নিদর্শন—কিনে নিলেন বর্ধমানের মহারাজা। এই সমস্তকিছুতে যেন মহর্ষির ঘোরতর অনাগ্রহ। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর পৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র দুই জন, শিল্পী-ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ, অনাগ্রহী ছিলেন না। আজ যদি দ্বারকানাথের ব্যক্তি-সত্তা ও জীবন-সম্পর্কিত কোনো স্মারণিক সামগ্রী রক্ষা পেয়ে থাকে, পেয়েছে এঁদের যত্নে। আজ তাই দ্বারকানাথের ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু জিনিস এখনো দেখতে পাওয়া যায় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ, ও রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শ-শালায় এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে।

পিতৃস্মৃতির প্রতি মহর্ষির অনীহা আমাদের আরো বেশি আশ্চর্য করে যখন ভাবি, যে-রামমোহন রায় মহর্ষির ধর্মপ্রেরণার প্রধান উৎস-স্বরূপ, দ্বারকানাথের প্রতি তাঁর প্রণয় ছিল গভীর। ১৮৩১ অব্দের ৩১ মে তারিখে লণ্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন তাঁর ভারত-ভ্রমণার্থী ইংরেজ বন্ধু ক্যাপটেন নবম্যান ম্যাকলিয়ডকে পরিচয়পত্র দিতে গিয়ে 'আমার প্রিয় বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৮]

উগ্রতপা মহর্ষির প্রভুশক্তির আওতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, পিতার ব্যক্তিত্বের বহুবিস্তারিত প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তি দমন করার অভ্যাস তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। পরবর্তী জীবনে এইসব মনগড়া বিধিনিষেধ কিছু কিছু ভাঙতে পেরেছিলেন বলেই, তাঁর বিচিত্রমনা প্রতিভা শতদলের মতো বিকশিত হতে পেরেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতির প্রতি অনীহা যেন সংক্রমিত হয়েছিল তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে। পিতামহ সম্বন্ধে তাঁর এই অনাগ্রহ এমনি গভীর ছিল যে দেবেন্দ্রনাথ ক্বচিৎ কদাচিৎ পিতার বিষয়ে দু-একটা সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পর্যাপ্ত রচনায় কিংবা ভাষণ বা বক্তৃতায় দ্বারকানাথের বিষয়ে এক প্রকার নীরব থেকেছেন। পিতার অনীহা যেন পুত্রে বিদ্বেষের রূপ নিয়েছিল। কেন-যে এমন হয়েছিল বুঝতে পারা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ তো কোনো দিনই এমন গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন না যে পৌত্তলিক পিতামহকে হেয় জ্ঞান করবেন; তাঁর উদার উন্মুক্ত মানসিকতার পরিচয় আছে 'গোরা' উপন্যাস ও অন্য নানা রচনায়: তিনি তো তপস্বী ছিলেন না যে ইহজাগতিক মনোবৃত্তির সকল লোককেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন। বাস্তবপক্ষে তাঁর ছেলেবেলার সেইসব মনগড়া বাধানিষেধ সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণ প্রাণের প্রেমিক, জীবনের মধ্যে বাঁচতে চাইতেন তিনি। তবে কেন তিনি তাঁর পিতামহকে ঠিকমতো বুঝতে চান নি, কেনইবা পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পারেন নি? অথচ অস্তিত্ব-ধারণের বস্তুগত সুখসুবিধা ছাড়াও তিনি তাঁর এই পিতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে

লাভ করেছিলেন (সমগ্রত না হলেও অংশত তো বটেই) তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতা, জীবনের প্রতি তাঁর সুস্থ ভলোবাসা, সঙ্গীতে, নাটকে ও চারুকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর প্রশস্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর মনের বিশ্বমুখিনতা—এবং তাঁর দেশভ্রমণের নেশা। এই পৌত্র-পিতামহ প্রশ্নটি বর্তমান লেখককে খুবই ভাবিয়েছে এবং সে-প্রশ্নের সদুত্তর তিনি আজো পাননি। তবে তিনি একপ্রকার নিঃসন্দেহ যে রবীন্দ্রনাথ যদি একটু কষ্ট করে তাঁর পিতামহের জীবন ও কার্যকলাপ অনুধাবন করতে পারতেন, তাঁর সহজাত ঔদার্যগুণ ও পরোপকার-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারতেন—তবে তিনি নিশ্চয় ক্রমে তাঁকে ভালো করে বুঝতে ও শ্রদ্ধা করতেও শিখতেন।

### দ্বারকানাথের সমাধি

একাধিক দিক থেকে বলা যায় দ্বারকানাথের জীবন যেন ইতিহাসের বিদ্রূপ। বর্তমান লেখক ১৯৭৬ অব্দের গ্রীষ্ম-মরশুমে যখন বিলেত যান, ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি দর্শনের পর লণ্ডনে ফিরে এসে দ্বারকানাথের সমাধি তিনি সন্ধান করতে থাকেন। প্রফেসর ব্লেয়র বি. ক্লিং তখন ছিলেন লণ্ডনে, তিনি ইতিপূর্বে দ্বারকানাথের সমাধি খুঁজে বের করেছিলেন কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে। তিনিই লেখককে সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং দেখিয়ে দেন সমাধি-ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারের ঠিক সামনে এমন একটি জায়গায় দ্বারকানাথের সমাধি, যে-স্থান মন্ত্র পড়ে পবিত্রীকৃত হয়নি। বহুকালের অবহেলায় সমাধির শোচনীয় দুরবস্থা দেখে লেখক মনে ভারি আঘাত পান। সদ্য তিনি ব্রিস্টলের আর্নোজ ভেল সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকানাথের নির্দেশে রচিত রামমোহনের সুন্দর সমাধিমন্দির দেখে এসেছেন, দেখেছেন সেখানে নিত্য তীর্থযাত্রীদের ভিড়। আর সেই দ্বারকানাথের নিজস্ব সমাধি কেনসল গ্রীন-এর এই সমাধিক্ষেত্রে হতাদরে অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় অযত্নে পড়ে আছে, কেউ সেখানে বড় একটা যায়ও না—যেন আত্মীয়বান্ধবহীন কোনো নিঃস্ব ব্যক্তির শেষ-বিশ্রামের জন্য যেমন-তেমন একটা স্থান! নিকটবর্তী সমাধিগুলির মর্মরে-প্রস্তরে আত্মীয়স্বজনের শোকসূচক প্রীতি-ভালোবাসা কেমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উৎকীর্ণ—কিন্তু দ্বারকানাথের সমাধি-প্রস্তরের উপর কেবল গুটিকতক কথা খোদাই-করা—'ডি. টেগোর, ক্যালকাটা, ১৮৪৬।'

সমাধির চারদিকে এমন আগাছার জঙ্গল যে দেখে মনে হল কেউ কখনো এ-সমাধি দেখতে আসে না। লেখক একটি টবে করে কিছু ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন, কবরের পায়ের দিকে সেই টবটা রাখার পর লেখক কবরের নম্বর টুকে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের রেজিস্ট্রি অপিসে গিয়ে খোঁজ করলেন সমাধি-প্রস্তর ও ধারেকাছের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে বছরে কত খরচ পড়তে পারে। অফিস বললেন, খরচ পড়বে বছরে পাঁচ পাউণ্ড চল্লিশ পেন্স—নগদে সে-টাকাটা তদ্দণ্ডে জমা দিয়ে লেখক রশিদ চেয়ে নিলেন, তারপর সে-রশিদ জমা দিয়ে গেলেন ভারতের হাই-

কমিশনে। তদানীন্তন ডেপুটি হাই কমিশনার নটবর সিং-কে লেখক বললেন যে প্রতি বছর ওই টাকাটা তিনি হাই কমিশনে পাঠিয়ে দেবেন যাতে সমাধিক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁরা সে-টাকাটা তুলে দিতে পারেন। নটবর সিং নিজে ইতিহাসের ছাত্র বলে দ্বারকানাথের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতেন; তিনি লেখককে নিশ্চিতি দিয়ে বলেন অতঃপর ভারতের হাই-কমিশন নিজখরচে এই বিশিষ্ট ভারতীয়ের শেষ-বিশ্রামস্থল সুষ্ঠুভাবে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পরে নটবর সিং লেখককে জানান, হাই-কমিশন অগ্রিম এমন একটা অঙ্কের টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন যার সুদ থেকে সমাধিক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ আগামী পঁচিশ বৎসর কাল, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দী শেষ হওয়া পর্যন্ত দ্বারকানাথের সমাধির যথোচিত যত্ন নিতে পারবেন। এই নিশ্চিতি পেয়ে লেখক খুবই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন।

এই সমাধির পূর্বতন ইতিহাস রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে, তা থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬২ অব্দের ১৭ মে তারিখে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত মনোমোহন ঘোষের একটি চিঠি আছে। মনোমোহন ছিলেন ঠাকুর-পরিবারের বন্ধু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনিও বিলেত গিয়েছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসতে। কৃতকার্য হতে তিনি পারেননি, দেশে ফিরে এসেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ব্যারিস্টার-রূপে। কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্র দেখে আসার পর তিনি তাঁর চিঠিতে লিখলেন :

'কেনসল গ্রীন—নামটা শুনেই নিশ্চয় আপনার মন বিষাদে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠবে, সেই মহামানবের কথা স্মরণ করে যিনি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত। সমাধি দর্শন-মাত্র আমাদের মনেও অনুরূপ ভাবের উদয় হয়ে থাকলেও আমরা খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম। দেশে থাকতে এই সমাধির যে-বর্ণনা আমরা শুনে এসেছিলাম তার সঙ্গে বাস্তবের সামান্যই মিল। এই সমাধি-নির্মাণের ভার যাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল তারা কীভাবে প্রতারণা করেছে দেখে আমরা উভয়েই নিদারুণ বিরক্ত। আমরা শুনেছিলাম সমাধির উপর একটি সুরম্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে এবং তার গায়ে বাংলা অক্ষরে খোদিত হয়েছে পরলোকগতের কীর্তিকলাপের কথা। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল সবটাই মনগড়া মিথ্যা কাহিনী। সমাধির উপর একটি তিন হাত লম্বা প্রস্তরখণ্ড (মার্বল নয়) শায়িত এবং তার উপর কেবল এই কথাগুলি খোদিত :

D. T.
Dwarka Nath Tagore
of Calcutta
Absit : 1st August 1846

'কেবল এই কটি কথা যেনতেনপ্রকারেণ সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদাই করা। কবরের চারদিকে লোহার শিকলের বেষ্টনী, চারকোণায় চারটি মৃতপ্রায় সাইপ্রেস গাছ।

পাশেই দেখা গেল কতিপয় সুদৃশ্য স্মৃতিসৌধ। সর্বক্ষণ মনের মধ্যে আমরা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম এই কথা ভেবে : যে-মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বিলেতে এসেছি, বিলেতে আসতে পারার জন্য একমাত্র যাঁর কাছে আমরা ঋণী, তিনি একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কবরে শুয়ে আছেন, অথচ যারা তার চাটুকর সভাসদ-মাত্র ছিল—তারা দিব্য মার্বল-পাথরে তৈরি সমাধিতে শয়ান এবং তাদের সমাধিপ্রস্তরে কত প্রশংসাসূচক বাগ্‌বিস্তার। আমি শুনেছি আপনার জ্যেঠামশায়কে (মহর্ষি) হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল ওই কবরটার জন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম খরচ হয়েছে বড় জোর দুই পাউণ্ড অর্থাৎ কুড়ি টাকা। বিলেতের সারা তল্লাটে এই রকম কদাকার সমাধি কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এত এত টাকা যে পাঠানো হয়েছিল তার কী গতি হল। মি: প্রাট (জনৈক ইংরেজ বন্ধু) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন (ইনি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের লোক। ১৮৬২ অব্দে ইনি প্রথম ভারতীয়, যিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলেন। বিলেতেই প্র্যাকটিস করতেন। বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ল' ও বাংলার চেয়ার লাভ করে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন) মনে করেন ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকাব এবং টাকাটা ফেরৎ পাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই সমস্ত কথা আপনার জ্যেঠামশায়কে জানাবেন কি? তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে বলবেন এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়ে আমি নিদারুণ বিরক্ত।

'এই চিঠির সঙ্গে আমি সাইপ্রেস গাছের ছোট একটি ডাল পাঠালাম। এটি আপনার পিতামহের সমাধি থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম। বাড়ির সবাইকে এটি দেখাবেন। খুব সম্ভব আগামী মেল-এ আপনার পূজ্যপাদ জ্যেঠামশায়কে আমি একটি চিঠি লিখব। ইতিমধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন—যদি তিনি চান যে তাঁর পিতার সমাধি অন্যভাবে গঠিত হয় এবং তার উপর যথোপযুক্ত লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহলে তিনি যেন অবিলম্বে আমাদের জানান ও এজন্য কত টাকা ব্যয় করতে চান তার একটা আন্দাজ দেন। যদি যথাসত্বর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন ও জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমাদের সেকথা জানাতে পারেন, তাহলে তাঁর পিতার মৃত্যুদিবসের বার্ষিকী অর্থাৎ পয়লা আগস্টের মধ্যে, নূতন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলছেন, কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে আপনার পিতামহের লণ্ডনস্থ বন্ধুদের ডেকে যদি সমাধিপ্রস্তরের উপর কী-লিপি উৎকীর্ণ হতে পারে—তার বয়ান স্থির করা হয় তো ভালো হয়। আমার তো মনে হয় আপনার জ্যেঠামশায় যদি বাংলায় একটি বয়ান লিখে পাঠান, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।'

মনোমোহন ঘোষের এই সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে কী জবাব গিয়েছিল, জানা যায় না। বর্তমান লেখক তার কোনো হদিশ পাননি।

সমাধি-সম্পর্কিত ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরো একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া

যায়; এ-চিঠি লিখেছিলেন মেজর হার্বার্ট ডবলু. ডেন্ট—ব্রডলী, ব্রোকেনহর্স্ট, হান্টস থেকে, চিঠির তারিখ ২৫ জানুয়ারি (১৯০৬?)। চিঠির প্রাপক ছিলেন স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইনি ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবংশীয়, ব্রিটিশ সরকার এঁকে মহারাজা ও স্যর উপাধিতে ভূষিত করেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে অফিসার-মহলে তখন ইনি ছিলেন ঠাকুরবংশের সবচেয়ে নামজাদা। মনে হয় ইণ্ডিয়া অফিস থেকে নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে মেজর ডেন্ট যতীন্দ্রমোহনকে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন :

'প্রিয় মহাশয়,

'ভাস্কর এইচ. উইকস রচিত 'দ্বারকানাথ ঠাকুর'-এর একটি মার্বল পাথরের আবক্ষ মূর্তি বর্তমানে আমার এক্তিয়ারে আছে।

'আমার পিতার পিতৃব্য, মি: ল্যান্সলট ডেন্ট—যিনি বহুকাল চীনদেশে ছিলেন—মি: ডি. ঠাকুরের বন্ধু ছিলেন। এই মূর্তিটি আমার এক্তিয়ারে এসেছে তাঁর উত্তরাধিকাররূপে।

'আপনার পরিবারের কেউ যদি এটি সংগ্রহ করতে চান, আমি বিক্রি করতে রাজি আছি।

'আমি কোথায়-যেন উল্লেখ দেখেছিলাম যে মি: ডি. ঠাকুরকে সমাহিত করা হয়েছিল কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে। সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে আমি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম সমাধির বর্তমান অবস্থা কেমন। তাঁর জবাব এই সঙ্গে পাঠালাম। আপনাদের পরিবার নিঃসন্দেহে জানতে চাইবেন সমাধিটি ভালোভাবে মেরামত করতে হলে কত টাকা খরচ করা দরকার।

'আরো তিনটি চিঠি পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে : (১) এল. ডেন্টকে লেখা ডি. ঠাকুরের চিঠি; (২) ডি. ঠাকুরকে লেখা এল. ডেন্ট-এর চিঠি, এবং (৩) মি: উইলিয়ম ডেন্টকে লেখা ভাস্কর মি: উইকস-এর চিঠি—এই আবক্ষ মূর্তি প্যাক করা প্রসঙ্গে।

'উপরন্তু ফোটো-চিত্র পাঠাচ্ছি আবক্ষ মূর্তির; আর পাঠাচ্ছি ১৮৪৬ অব্দের **টাইমস** কাগজে প্রকাশিত মি: ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্ত দুটি লেখা, এবং কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর একটি ক্যাটালগ।

'**টাইমস** কাগজ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপহৃত যে-স্বর্ণপদকের কথা বলেছেন, নিশ্চয় সেটিই এই আবক্ষ মূর্তিতে স্থান পেয়েছে। আমি মহাশয়ের বশম্বদ হার্বার্ট ডবলু. ডেন্ট, মেজর, আর্মি, রিটায়ার্ড।'

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিশ্চয় জানতেন গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রপিতামহের চিঠিপত্র ও অন্যান্য স্মারক দ্রব্য সংরক্ষণে অতিমাত্রায় আগ্রহী—তাই তিনি ডেন্ট-এর চিঠি ও সংলগ্ন সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন গগনেন্দ্রনাথকে। এইসব কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট টি. বার্গেস-

এর চিঠি। সে-চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন : 'সমাধি নং ৬২৪৭ 'ঠাকুর'-এর অবস্থা খুবই শোচনীয়। পাথরের খুঁটিগুলি চারপাশে একেবারে বসে গেছে। শিকলগুলি জং ধরে একপ্রকার নষ্ট হবার দাখিল। ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, খোদাই-করা লিপিতে কালো রং লাগানো, পাথরের খুঁটি উঠিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, শিকলগুলি ঘষে মেজে দু-কোট রং দেওয়া—এইসব কিছু মিলে খরচ পড়বে ৪ পাউণ্ড ১৫ শিলিং। তাহলে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

সহৃদয় গগনেন্দ্রনাথ নিশ্চয় পত্রপাঠ চেক পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন, কারণ ১৯০৬ অব্দের ১৭ এপ্রিল তারিখে মি: বার্গেস চেক-এর প্রাপ্তি স্বীকার করে জানালেন যে আবশ্যকীয় মেরামতিকার্য সুসম্পন্ন হবে।

রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে উপরোক্ত নথীভুক্ত আর একটি যে চিঠি আছে সেটি লিখেছিলেন এন. সি. সেন (সম্ভবত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন) ৪ নং ওকউড কোর্ট, কেনসিংটন থেকে, ১৯২৭ অব্দের ১০ মার্চ তারিখে। চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। চিঠিতে তিনি বলেছেন :

'একটি গুরুতর ও জরুরি ব্যাপারে আপনার সহায়তা ও পরামর্শলাভের ইচ্ছায় এই চিঠি লিখছি। কিছুদিন আগে আমি কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধির বর্তমান অবস্থা কেমন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাবে লিখেছেন : 'এই সমাধিপ্রস্তরটি একখণ্ড পালিশবিহীন ধূসর রঙের গ্রানিট পাথর—খুবই ময়লা। সমাধিপ্রস্তরের চারদিকে ছয়টি পাথরের খুঁটি ছিল—সবগুলি বসে গেছে। খুঁটিগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল লোহার শিকল দিয়ে—সেসব শিকল মরচে পড়ে ক্ষয়ে খসে গেছে। লণ্ডনে বেড়াতে এসে ভারতের তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সমাধি যখন দেখতে আসেন, তাঁদের আমি জানিয়েছিলাম মেরামতি কাজে কেমন খরচ হতে পারে। কিন্তু তারপর তাঁদের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। সমাধিটি মেরামতি হওয়া একান্ত দরকার—আমি পুনরায় শিকল লাগাতে বলব না—তার দরকার নেই। শিকল বাদ দিলে মেরামতির হিসাব এই রকম দাঁড়ায় :

| | | |
|---|---|---|
| গ্রানিট পাথরের সমাধি ও তার ভিত্তি সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা | .. | ৪ - ১৫ - ০ |
| ছয়টি বিভিন্ন অংশের মেরামতি ও পরিষ্করণ | ... | ২ ৫ - ০ |
| লিপিঅংশে কালো রঙ করা | ... | ০ - ১২ - ০ |
| | | ৭ - ১২ - ০ |

চেক-প্রপ্তির পর আমি ব্যক্তিগতভাবে সব-কিছু কাজ তত্ত্বতদারক করব। ইতিমধ্যে আপনি যদি একবার আসতে চান আমায় জানাবেন, অপিসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত

করে, সমাধি দেখবার জন্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'উপরোক্ত চিঠি থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সমাধির বর্তমান অবস্থা কেমন এবং কীরকম মেরামতি দরকার। আমার খুব ইচ্ছা যে সমাধিটি মেরামত করে পরিষ্কার করা হয়। টাকার অঙ্ক তো এমন কিছু বড়ো নয়, আর মেরামতি ও অন্যান্য সংস্কার-কাজের জন্য ১০/১৫ পাউণ্ড সংগ্রহ করাটাও নিশ্চয় কঠিন হবে না। উদ্বৃত্ত টাকাটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর হেফাজতে রেখে দিলে তিনি সংরক্ষণের দিকটা দেখতে পারবেন। আপনি কি আপনাব বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে সত্বর আমায় জানাবেন এবিষয়ে কিছু করা যায় কিনা..।'

রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর পিতার পরামর্শ নিয়েছিলেন কিনা এবং জবাবে নির্মলচন্দ্র সেনকে কী লিখেছিলেন তার কোনো হদিশ মেলে না। কিন্তু সেনের চিঠির উপরদিকের মার্জিনে রথীন্দ্রনাথের হাতে এই কথাগুলি লিখিত : '২৫-৪-২৭ তারিখে ৭ পাউণ্ড ১২ শিলিং-এর একটা ড্রাফট পাঠানো হল।' ১৯২৭ থেকে ১৯৭৬ অবধি (লেখক সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন ১৯৭৬ অব্দে) এই সমাধি সম্বন্ধে আর কিছু করা হয়েছিল কিনা, তা আর জানবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৃতীয়বার বিলেত যান ১৯১২ অব্দে, তারপর ইংরাজী **গীতাঞ্জলি** প্রকাশ ও নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর আরো কয়েকবার তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ততদিনে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এবং অন্তত কয়েক বছর ধরে ইংরাজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাদির জন্য রয়্যালটি তিনি নিশ্চয় মন্দ পাননি। বিলেতে তাঁর ভক্তও কিছু কম ছিল না। কিন্তু তিনি কখনো পিতামহের সমাধি-সন্দর্শনে গেছেন কিংবা তার সংস্কার-সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। তা যদি তিনি করতেন তাহলে হয়তো দ্বারকানাথের সমাধির উপর তেমনি সুরমা একটি স্মৃতিসৌধ রচিত হতে পারত যেমনটি দ্বারকানাথ রচনা করেছিলেন রামমোহন রায়ের সমাধির উপর।

অপরপক্ষে মেজর এইচ. ডবলু. ডেণ্ট-এর মতো একজন প্রায়-অচেনা অজানা লোক নিজের তাগিদে সমাধির অবস্থা বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর রিপোর্ট পরিবারবর্গের অবগতি ও যথাকরণীয় কাজের জন্য যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তা নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী। ডেণ্ট-এর সেই চিঠি লেখার একুশ বছর বাদে এন সি. সেনও অনুরূপ কাজ করেছিলেন—যদিচ দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর কোনো রক্তসম্পর্ক ছিল না।

মেজর ডেণ্ট-এর চিঠিতে ভাস্কর উইকস-রচিত দ্বারকানাথের একটি আবক্ষ মর্মর-মূর্তির উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন তাঁর পিতার পিতৃব্য চীনদেশের ল্যান্সলট ডেণ্ট-এর উত্তরাধিকাররূপে মূর্তিটি তাঁর হাতে এসেছিল এবং ল্যান্সলট ছিলেন দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। দ্বারকানাথ প্রথম যে-বার ১৮৪২ অব্দে বিলাতভ্রমণে যান, সেবার কলকাতা-বাসীদের প্রদত্ত চাঁদায় উইকসকে দিয়ে একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি

করিয়েছিলেন। সেই মূল ভাস্কর্য-নিদর্শন এখন কলকাতা বেলভিডিয়র জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ-পথে শোভা পাচ্ছে। ল্যান্সলট নিশ্চয় উইকসকে অর্ডার দিয়ে একটি কপি নিজের জন্য তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। মেজর ডেন্ট প্রস্তাব করেছিলেন ঠাকুর-পরিবারের কেউ যদি মূর্তিটি কিনে নিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেটি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর সে-প্রস্তাবক্রমে মূর্তিটি এ-দেশে এসেছিল কি না এবং এসে থাকলে এখন তা কোথায় আছে সে-সব খবর জানা দরকার।

বর্তমান লেখক নিম্নবর্ণিত তথ্যের জন্য অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর কাছে ঋণী . প্রখ্যাতা কবি-ভগ্নীদ্বয় তরু ও অরু দত্ত তাঁদের পিতার সঙ্গে যেবার লণ্ডন যান—সবাই মিলে তাঁরা কলকাতা সুপ্রীম কোর্ট-এর ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যর এডওয়র্ড রায়ান-এর লণ্ডনস্থ বাসভবনে তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। স্যর এডওয়র্ড ছিলেন দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই বাসভবনের 'প্রবেশ-পথে তাঁরা দেখেছিলেন দ্বারকানাথের একটি চমৎকার মার্বল পাথরে নির্মিত আবক্ষ মূর্তি।' এটি কি মেজর ডেন্ট-বর্ণিত সেই কপি না স্যর এডওয়র্ডও চীনের ল্যান্সলট-এর মতো উইকস-এর কাছ থেকে বাড়তি আরো একটি কপি বন্ধু দ্বারকানাথের স্মৃতিতে খরিদ করেছিলেন—সে এখন নিতান্তই অনুমানের বিষয়। এটি যদি দ্বিতীয় কপি হয়ে থাকে তাহলে এ-মূর্তি এখন কোথায়, কার অধিকারে রয়েছে—লেখক তা জানতে পারেননি।

## টীকা

১। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' : অজিতকুমার চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা, কলকাতা। সংস্করণ ১৩৭৭।

২। মা যখন জীবিত ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। পিতামহী অলকাসুন্দরী সম্বন্ধে তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে তিনি যেসব সাদর ও আন্তরিকতাপূর্ণ উল্লেখ করেছেন, মায়ের বেলা তেমনটা করেননি। উপরন্তু মাতা দিগম্বরী তাঁর জীবৎকালে এমনি গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন যে তাঁর দিনের অধিকাংশ সময় কাটত শালগ্রামের সেবা করে। একটা সময় এসেছিল যখন ম্লেচ্ছসংসর্গ-দুষ্ট স্বামীর সঙ্গে সহবাস তিনি পরিহার করেছিলেন, দৈবাৎ স্পর্শদোষ ঘটলে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল মাথায় ঢেলে তিনি শুদ্ধ হতেন। বলা হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে শালগ্রামের বিরোধিতা করার জন্য পুত্রকে তিনি আশীর্বাদ করলেন—তবে-কি তিনি মরণান্তর অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ করে গোঁড়া ব্রাহ্মে পরিণত হয়েছিলেন। মায়ের আশীর্বাদ বিষয়ে এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সত্ত্বেও দুই-দিগম্বরীর পরস্পর-বিরোধিতার কারণ দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বলেই স্বপ্ন তাঁর কাছে সত্য মনে হয়ে থাকবে—এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না।

৩। তখনো বিষয়-আশয় পুরোপুরি বজায় ছিল—তাসের ঘরের মতো সব-যে ভেঙে পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনা তখন কারো মনে উদয়ও হয়নি। ভাঙচুর শুরু হয় বছর খানেক পরে।

৪। *Bengal Hurkaru*, 4 December, 1846.

৫। *Partner in Empire*, by Blair B. Kling.

এই গ্রন্থে Kling কার-ঠাকুর কোম্পানী, য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কাজ-কারবারে উত্থান-পতনের বিশদ ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন।

৬। *Bengal Past and Present,* July-December, 1970-সংখ্যায় উদ্ধৃতি আছে। মূল চিঠি আছে লণ্ডনের ব্রিটিশ মুজিয়ম-এ।

৭। *Life and Letters of Toru Dutt,* by Harihar Das. Humphrey Milford, Oxford University Press, 1921.

□

# দ্বারকানাথের প্রতিকৃতি

দ্বারকানাথ তাঁর শ্রদ্ধেয় কিংবা অন্তরঙ্গ পরিচিতদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার নামী ব্যারিস্টার রবার্ট কাটলার ফার্গুসন-এর কাছে ব্যবহার-শাস্ত্রে শিক্ষা নিয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে দ্বারকানাথ এই ফার্গুসন-এর প্রতিকৃতি আঁকিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়ির চিত্রশালায়।[১] এ-ছবি এখন যে কোথায় আছে—লেখক তা জানেন না।

ভারতে থাকতে তিনি তাঁর নিজের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের আরো কোনো প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রেখেছিলেন কি না—তাও জানা নেই। জর্মন পরিব্রাজক ক্যাপটেন লেওপোল্ড ফন ওরলিখ, ১৮৪৩ অব্দে যখন বেলগাছিয়া ভিলা সন্দর্শনে যান, তিনি সেখানে একজন পরমাসুন্দরী ভারতীয় মহিলার প্রতিকৃতি দেখেছিলেন, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় আঁকা।[২]

১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথ প্রথম যে-বার বিলেত যান কলকাতার নাগরিকবৃন্দের অনুরোধ-ক্রমে এবং তাঁদের প্রদত্ত চাঁদায়, তিনি নিজের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র আঁকার বরাত দিয়েছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর এফ. আর. সো-কে এবং ভাস্কর উইকস-কে দিয়ে মার্বল পাথরে তাঁর আবক্ষমূর্তি রচনা করিয়েছিলেন। তৈলচিত্র এখন আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ এবং আবক্ষ মূর্তিটি দেখা যায় কলকাতার বেলভিডিয়র-এ অবস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রবেশ-পথে। কলকাতার টাউন হল-এ স্থানান্তরিত হবার পূর্বে পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রটি ১৮৪৩ অব্দের জুন মাসে লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। কলকাতার টাউন হল-এ ছবিটি দেখে এইচ. ই. এ. কটন তার একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর **ক্যালকাটা ওল্ড এণ্ড নিউ** পত্রিকায়।[৩] কটন-এর বর্ণনা অনুসারে লণ্ডনে যখন এই ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয়, চিত্রপটের পিছনে ক্যানভাস-এর উপর তৈলচিত্রের জন্য রঙ-সরবরাহকারীর একটি বিজ্ঞাপনে দাবী করা হয়েছিল যে নূতন উপাদানে প্রস্তুত করার ফলে তৈলচিত্রে ব্যবহৃত রঙ 'আশ্চর্য উজ্জ্বল'-রূপে প্রতিভাত হয়েছে। কটন বলেছেন : 'কিন্তু ১৯০১ অব্দে কলকাতা করপোরেশন যখন টাউন হল-এর প্রতিকৃতি সংগ্রহ, মেরামতি ও পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব মি: আলেকজাণ্ডার স্কট-এর হাতে ন্যস্ত করেন, দেখা যায় সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল দ্বারকানাথের ছবিটির। বার্ণিশের সঙ্গে রঙ মিলেমিশে একাকার হওয়াতে পুনরুদ্ধারের কাজ সুসম্পন্ন

করতে প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম করতে হয়। তার ফলে মুখাকৃতি ও চমৎকার কাশ্মীরি শালের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছিল এবং পশ্চাৎপটে আলবোলা ও অন্যান্য সামগ্রীকে আরো একটু বেশি স্পষ্টীকরণ করা গিয়েছিল।

কলকাতা টাউন হল-এর জন্য দ্বারকানাথ যখন স্যো-কে এই প্রতিকৃতি রচনার বরাত দেন, তারই কাছাকাছি একটা সময়ে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্রের জন্য দ্বারকানাথ বরাত দিয়েছিলেন রয়্যাল একাডেমির প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত চিত্রকর স্যর মার্টিন আর্চার শী-কে। সম্ভবত এ-ছবি তিনি আঁকাতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য—তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় টাঙাবার জন্য অথবা বিশেষ-কাউকে উপহার-স্বরূপ দেবার জন্য। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে তাঁর হাতে-লেখা যে চিরকুটের খাতা আছে, তা-থেকে দেখা যায় প্রায় একই সময়ে তিনি এই দুই শিল্পীর—স্যো ও শী-র—স্টুডিয়োতে গিয়ে চিত্রকরদের সামনে বসে সীটিং দিয়েছেন। ১৮৪২ অব্দের ৪ অক্টোবর তারিখে লণ্ডন **মন্থলি টাইমস** কাগজের একটি খবরে প্রকাশ : 'স্যর মার্টিন শী—এই বিশিষ্ট ভারতীয়ের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকছেন, অনুরূপ প্রতিকৃতি আঁকছেন মি. স্যো।' বর্তমান লেখক যতটুকু জানতে পেরেছেন তা থেকে তাঁর মনে হয়েছে সার মার্টিন শী-রচিত প্রতিকৃতি ভারতে কখনো আসেনি। হতে পারে যে দ্বারকানাথ ঢাকঢোল না পিটিয়ে ব্যক্তিগত উপহারস্বরূপ এই ছবি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দিয়ে থাকবেন—এবং হয়তো এ-ছবি তাঁর কোনো প্রাসাদে থেকে থাকবে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেইরকম অনুমান। হয়তোবা বহুবান্ধব দ্বারকানাথ তাঁর এই ছবি তাঁর কোনো বিশেষ বন্ধু বা বান্ধবীকে দিয়েও থাকতে পারেন। ভিক্টোরিয়া আমলের অভিলেখাগারগুলি খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো কিছু হদিশ মিলতেও পারে।

১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথের কৌতুকপ্রিয় ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বন্ধু কাউণ্ট দ্যো'রসেও তাঁর একটি প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন। দ্যো'রসে-এর কটন নাম দিয়েছিলেন 'ফুলবাবুদের রাজা'। দ্বারকানাথ এবং শিল্পী উভয়ের স্বাক্ষরসম্বলিত এই প্রতিকৃতি এখন আছে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকারে। ফারসিতে দ্বারকানাথের স্বাক্ষরসম্বলিত পান্নার অভিজ্ঞান-আঙ্টিও আছে তাঁর কাছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের আর-এক বংশধর সুভো ঠাকুরের অধিকারে আছে দ্বারকানাথ ও তাঁর ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের যুগল মূর্তি। ভাস্কর এইচ. উইকস **রেইনবো** স্টিমারে বসে জলরঙে এ-ছবি এঁকেছিলেন ইংলিশ চ্যানেল পার হবার সময়, ১৮৪২ অব্দের ৯ জুন তারিখে। উইকস সম্ভবত একই স্টিমারে চ্যানেল পার হন। তাঁর অপর একটি জলরঙের ছবি 'ডোভার কাস্‌ল' স্টিমারে বসেই আঁকা। এই দুটি ছবিই এখন আছে সুভো ঠাকুরের অধিকারে।[২]

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে জি. আর. ওয়র্ড-রচিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি

এনগ্রেভিং আছে। নিতান্ত আকস্মিকভাবে এ-ছবি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আসে। লণ্ডনে বেড়াতে গিয়ে একদিন তিনি শিল্পকলা-বিপণির সামনে দিয়ে চলেছেন, হঠাৎ নজরে এল জানলার একটি বিজ্ঞাপন, 'ভারতীয় রাজকুমারের প্রতিকৃতি'। মুখাকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝলেন তাঁর প্রপিতামহের প্রতিকৃতি—তখনি তিনি সেটা কিনে নিলেন। এই এনগ্রেভিং দেখে মনে হয় এটি এ. আর. স্যো-র আঁকা পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রের ক্ষুদ্রাকার প্রতিলিপি। সম্ভবত দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার সঙ্গী ও তাঁর ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র এই প্রতিলিপিরই উল্লেখ করে থাকবেন লণ্ডন থেকে কলকাতায় গিরীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ১৮৪৫ অব্দের ২৩ আগস্ট তারিখের চিঠিতে : 'কিছুদিনের মধ্যে তোমায় হয়তো বাবুর একটি পূর্ণাবয়ব ছবি পাঠাতে পারব। প্রখ্যাত চিত্রকর মি: স্যো বাবুর যে-প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন এবং যা এখন তোমাদের টাউন হল-এ শোভা পাচ্ছে, এ-ছবিটি হবে তারই হুবহু নকল—অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে।' কোন্ আর্টিস্ট এই প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন নবীনচন্দ্র তাঁর নাম উল্লেখ করেননি এবং যদিচ এ-চিঠি লেখার পর প্রায় এক বছর কাল তিনি লণ্ডনে ছিলেন, কলকাতায় এই প্রতিলিপি পাঠাবার কথা আর উত্থাপন করেননি। কাজেকাজেই নিশ্চিত বলা শক্ত সে-প্রতিলিপি কলকাতায় পৌঁছেছিল কিনা এবং পৌঁছে থাকলে তা এখন কোথায় আছে। রথীন্দ্রনাথ যে-প্রতিলিপি লণ্ডনে বেড়াতে গিয়ে কিনেছিলেন, হতে পারে এটি-ই সেই প্রতিলিপি—যদিনা অবশ্য ওয়র্ড তাঁর কৃত এনগ্রেভিং-এর একাধিক কপি বাজারে ছেড়ে থাকেন। সে সম্ভবনা যে না ছিল এমন নয়।

ইতিপূর্বে একাদশ পরিচ্ছেদে তেলরঙে আঁকা দ্বারকানাথের অপর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ছবি আঁকার জন্য দ্বারকানাথ বরাত দিয়েছিলেন বারোঁ দ্য শোয়াইতের-কে—পারী শহরে ১৮৪৫-৪৬ অব্দে তাঁর দ্বিতীয় সফরের সময়। স্মরণ থাকতে পারে এ-ছবি তাঁর জীবৎকালে সম্পূর্ণ হয়নি এবং দ্বারকানাথের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে এটি ভারতে এসে পৌঁছয়। দ্বারকানাথ-বংশীয়া মাদাম কৃষ্ণা রিবূর ধারণা, মূল তৈলচিত্রটি এখন তাঁর পারী-স্থিত বাসভবনে শোভা পাচ্ছে। এটি বিখ্যাত শিল্পকলা-সামগ্রীর কারবারি ও ব্রিটিশ-ভারতীয় চিত্রে বিশেষজ্ঞ জাইলস আয়ারের লণ্ডনস্থ, সেণ্ট জেমস অঞ্চলের ৩৯নং ডিউক স্ট্রিট-এর দোকান থেকে মাদাম রিবূ কিনেছিলেন ১৯৭৮ অব্দে। লেখককে তিনি একটি পত্রে জানিয়েছেন যে তাঁর মা এনা রায় ১৯৭৯ অব্দের গ্রীষ্মের মরশুমে যখন কন্যার পারী-স্থিত বাসভবনে বেড়াতে যান, 'তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারেন যে এই প্রতিকৃতিই জোড়াসাঁকোর মার্বল পাথরে মোড়া বৈঠকখানাঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকত। জোড়াসাঁকো বাড়ির সে-অংশটা ছিল আমার দাদামশায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্বারকানাথের প্রপৌত্র) দখলে।'

মাদাম রিবূর মা আরো একটি কথা বলেছিলেন—তৈলচিত্রের একটি কোণা আকস্মিক কোনো কারণে একটু জখম হয়। পরিবারস্থ একজন আর্টিস্টকে বলা হয়

সেটুকু জায়গা মেরামত করে দিতে—পাশেই দ্বারকানাথের বৈঠকখানাবাড়িতে তিনি থাকতেন। মেরামতি কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক না পেয়ে ছবিটি তিনি নিজের কাছেই রেখে দেন—'বৈঠকখানাবাড়ি থেকে সে-ছবি কেমন-করে যেন চলে যায় নতুন বাজারে প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের টেগোর কাসল-এ।' ১৯৪৬ অব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে **ওরিয়েন্ট ইলাস্ট্রেটেড উইকলি** কাগজ তাঁদের দশম পূজা-বার্ষিকীতে সুভো ঠাকুর লিখিত **দ্য হাউস অব টেগোরস**-প্রবন্ধের সঙ্গে এই ছবির একটি প্রতিলিপি ছাপিয়েছিলেন। মাদাম রিবূ আরও বলেন, 'ঠিক কবে ও কখন এবং কীভাবে সে-ছবি যে ভারত ছেড়ে বিলেতে এসে পৌঁছয়—কেউই ঠিকমত বলতে পারে না।...প্রসঙ্গত বলতে পারি আমি যখন ছবিটি খরিদ করি তার আগেই তার পরিষ্করণ ও সংস্কারের কাজ সমাধা হয়ে থাকবে, সংস্কারের আগে ছবির চেহারা কেমন ছিল তার একটি ফোটো আছে আমার কাছে। জাইলস আয়ার এই তৈলচিত্র সম্পর্কে যতটুকু খোঁজখবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা থেকে তাঁর ধারণা, বেশ কয়েক বছর আগেই এ-ছবি বিলেতের বাজারে এসে থাকবে।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর পরিষ্কার মনে আছে তাঁর দাদামশায় শোয়াইতের-এর মূল প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন তেলরঙে। অবনীন্দ্রনাথের পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন ওকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সেখান থেকে চিঠি লিখে তিনি শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি সমর্থন করে বলেছেন, 'পিতামহ শোয়াইতের-কৃত উপবিষ্ট দ্বারকানাথের প্রতিকৃতির যে-প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন আমরা যখন গুপ্তনিবাস (জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানাবাড়ি ত্যাগ করে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারবর্গ ব্যারাকপুর রোড-স্থিত গুপ্তনিবাসে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন) ছেড়ে চলে যাই তখন সেই প্রতিলিপি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার পিতা (আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তখন সেই ছবিটি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথকে দেন...। আমরা যখন জোড়াসাঁকোয় থাকতাম পিতামহের আঁকা প্রতিলিপিটি থাকত দোতলার হল-ঘরে আর শোয়াইতের-এর মূল ছবিটি থাকত তেতলায়—সেখানে গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারবর্গ বসবাস করতেন। যখন গিরীন্দ্রনাথের পরিবারের সকলে জোড়াসাঁকো ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, তেতলার সেই মূল ছবিটি এবং নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[৫] একটি তৈলচিত্র বিক্রয় করা হয় রাজা পি. এন. ঠাকুরের কাছে...পরে রাজাবাহাদুরের ছেলে দ্বারকানাথের প্রতিকৃতিটি বেচে দেন জনৈক মি: তালুকদারের কাছে। তাঁর হাত ঘুরে ছবিটি চলে যায় লণ্ডনের শিল্পকলা-সামগ্রীর কোনো কারবারীর কাছে।'

জনশ্রুতি-নির্ভর হবার ফলে পারিবারিক কাহিনী কখনো কখনো উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপায় কখনোবা পরস্পরবিরোধীও হয়। বারোঁ দ্য শোয়াইতের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে-চিঠি লেখেন (একাদশ পরিচ্ছেদে ৭নং টীকায় উদ্ধৃত) তাতে মূল প্রতিকৃতির

একটি অবিকল প্রতিলিপির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ নিজেই তার দাম নির্দিষ্ট করে কিনে নিতে পারেন। একই আর্টিস্টের আঁকা একই বিষয়ের দুটি ছবি যদি একসঙ্গে এ-দেশে এসে থাকে, তাহলে খানিকটা বোঝা যায় সে-ছবি আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে বেড়ায় কেন। ব্যাপার আরো যেন জটিল হল অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন এই ছবিরই আরো একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। রাজা পি. এন. ঠাকুরের পৌত্র সন্দীপ ঠাকুর (তিনি এখন জাপানের ওসাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন) জানিয়েছেন যে তাঁর পিতামহ শোয়াইতের-এর যে-প্রতিকৃতি কিনেছিলেন, সেটি তাঁদের পরিবার দান করেছেন রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় এবং সেটিই সম্ভবত কিছু কিছু মেরামত করে থাকবেন শিল্পী পরেশনাথ সেন। এটি হয়তো সেই অবিকল প্রতিলিপি। মূল ছবিটি বৈঠকখানাবড়ির সংগ্রহ থেকে কিনে নিয়েছিলেন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। এটি কিছুদিন ঝুলত টেগোর কাসল-এর দেয়ালে, তারপর হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যায় কৃষ্ণ রিবু-র অধিকারে।

কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যা **সমকালীন** পত্রে জোড়াসাঁকো বাড়ির 'দোতলায় বসবার ঘরে' দ্বারকানাথের যে-আলেখ্যের কথা গভীর আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, সেটি এনা দেবী-বর্ণিত শোয়াইতের-অংকিত প্রতিকৃতি না-ও হতে পারে। অমৃতময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ছেলেবেলা থেকে আমরা নিত্য দেখতাম দোতলার বসবার ঘরের দেয়ালে দ্বারকানাথের একটি পূর্ণাবয়ব ছবি। বারবার দেখে চেহারাটা যেন আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, চোখ বুজলে এখনো দেখতে পাই মাথায় মাঝারি উঁচু, দোহারা চেহাবার একজন লোক, বাবরি চুলের উপর শামলা আঁটা, পরণে জরির কাজকরা মখমলের জোব্বা এবং তার উপর জড়ানো, সুঁচের কাজ-করা একটি জমকালো কাশ্মীরি শাল। হাতের আঙুলগুলি মেয়েদের আঙুলের মতো পেলব ও সুকুমার, কিন্তু পাকানো গোঁফ জোড়ায় দৃপ্ত পৌরুষ। ছবির এক পাশে একটি মার্বল পাথরের তৈরি টেবিলের উপর চমৎকার মিনের কাজকরা একটি আলবোলা, এক ধারে দোয়াতদান, কলমদান ও এক গাদা বাঁধানো বই।' এ-বর্ণনা বরঞ্চ স্যো-র আঁকা প্রতিকৃতির সঙ্গে বেশি মেলে।

এফ. আর. স্যো, স্যর মার্টিন আর্চার শী, বারোঁ দ্য শোয়াইতের ও কাউন্ট দ্যো'রসে-র আঁকা চারটি প্রতিকৃতির কথা আমরা জানি, তার মধ্যে শী-র আঁকা প্রতিকৃতির হদিশ এখনো মেলেনি। এইসব প্রতিকৃতি ছাড়া আছে—এইচ. উইকস-এর একটি জলরঙা ছবি ও মার্বল-পাথরের আবক্ষ মূর্তি। উপরন্তু তারিখবিহীন, শিল্পীর স্বাক্ষরবিহীন একটি জলরঙা ছবি আছে যার নাম 'দ্বারকানাথ ঠাকুর—ফেলিকস সেবাস্তিয়েঁ ফ্যুইয়ে দ্য কঁশ-এর বন্ধু' এবং একটি কালি-কলমে আঁকা স্কেচ বা কার্টুন এই দু'জন বন্ধুর, তার নিচে কঁশ-এর হাতে লেখা : '১ মার্চ ১৮৪৬, পারী, ফ্যুইয়ে দ্য কঁশ, আমার বন্ধু কলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুরকে।' এই গ্রন্থে ছবি দুটি ছাপা হল মঁসিয়ে ইয়েগরস্মিট

ও কৃষ্ণা রিবু-র সৌজন্যে।

১৮৪২ অব্দে প্রথমবার বিলাতভ্রমণের সময় দ্বারকানাথ মহারাণী ও প্রিন্স অলবার্টকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকিয়ে যেন কলকাতার লোকদের উপহার দেন। দ্বিতীয় সফরের সময় দ্বারকানাথ যখন আয়ারল্যাণ্ড-এর কর্ক শহরে যান, তাঁর নির্বন্ধে খ্যাতনামা আইরিশ দেশব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক ফাদার ম্যাথু রাজি হয়েছিলেন দ্বারকানাথ-নিযুক্ত একজন বিখ্যাত আইরিশ চিত্রকরের সামনে বসে তাঁর প্রতিকৃতির জন্য 'সীটিং' দিতে। ব্রিটিশ রাজদম্পতির প্রতিকৃতি এখনো টাঙানো আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ। কিন্তু ফাদার ম্যাথু-র প্রতিকৃতির কী গতি হয়েছিল লেখক তা জানতে পারেননি। তাঁর উঠতি অবস্থায় দ্বারকানাথ ছিলেন যেন কোনো আখ্যানের নায়কের মতো খুবই চিত্তাকর্ষী একজন ব্যক্তি। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর আরো কিছু প্রতিকৃতি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সন্ধানের অপেক্ষায়।

প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ থাকার ফলে কৃষ্ণা রিবুর উদ্যোগে ও লণ্ডনের সেন্ট জেমস অঞ্চলের আয়ার এণ্ড হবহাউস-এর সৌজন্যে লণ্ডনে প্রদর্শিত দ্বারকানাথের একাধিক প্রতিকৃতির নিম্নলিখিত তালিকা পেয়েছি:

১। তৈলচিত্র—বারোঁ দ্য শোয়াইতের-অঙ্কিত।
লণ্ডন রয়েল একাডেমিতে ১৮৪৮ অব্দে প্রদর্শিত। (অধুনা মাদাম জঁ রিবু-র সংগ্রহভুক্ত)।

২। মার্বল পাথরের আবক্ষ মূর্তি—ভাস্কর : এইচ. উইকস।
লণ্ডন রয়েল একাডেমিতে ১৮৪৩ অব্দে প্রদর্শিত।

৩। মার্বল পাথরে আবক্ষ মূর্তি—ভাস্কর : জে. ই. জোনস।
লণ্ডন রয়েল একাডেমিতে ১৮৪৬ অব্দে প্রদর্শিত।

৪। জলরঙা প্রতিকৃতি—চিত্রকর : ডবলু. বার্কলে।
১৮৪৮ অব্দে আর. এস. বি. এ.-প্রদর্শিত।

৫। জলরঙা প্রতিকৃতি—চিত্রকর : কাউন্ট দ্যো'রসে।
১৯৫২ অব্দে কোলনাগির অধিকারে।

৬। তৈলচিত্র—এফ. আর. স্যে অঙ্কিত।
লণ্ডন রয়েল একাডেমিতে প্রদর্শিত।

৭। আবক্ষ মূর্তি—ভাস্কর : সি. বি. বার্চ।
লণ্ডন রয়েল একাডেমিতে ১৮৫৬ অব্দে প্রদর্শিত। স্বত্বাধিকারী কলকাতার জি. এম. টৌগোর এস্কোয়ার।

('শী-র আঁকা তৈলচিত্র সম্বন্ধে আয়ার এণ্ড হবহাউস কোনো খবর দিতে পারেননি।)

কিন্তু রঙে আঁকা হোক অথবা পেন্সিলে আঁকা হোক, এমেচার আর্টিস্টের আঁকা

দ্বারকানাথের এমন-একটি প্রতিকৃতি ছিল যা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী। ফ্যানি স্মিথ নামে একজন সুন্দরী ও গুণবতী তরুণী সুদর্শন তরুণ নগেন্দ্রনাথের প্রেমে পড়েছিলেন। দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার যখন বিলেতে যান তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল সে-দেশে ছেলেকে লেখাপড়ায় ও সহবতে সুশিক্ষিত করে তুলবেন বনেদি ইংরেজ বাড়ির ছেলেদের মতো। ফ্যানি ছেলের প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে ছেলের বাবার আভিজাত্যব্যঞ্জক চেহারা ও জমকালো পোশাক-আশাক দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৪৬ অব্দের শুরুতে দ্বারকানাথের একটি প্রতিকৃতি স্বহস্তে এঁকে ফ্যানি সেটি উপহার দিয়েছিলেন নগেন্দ্রকে। নগেন্দ্রকে লেখা তাঁর একাধিক চিঠিতে এই ছবির উল্লেখ আছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ফ্যানির আঁকা এই প্রতিকৃতির কথা আর শোনা যায়নি। একদিন অবনীন্দ্রনাথ এক চিঠি পেলেন, লিখেছেন লণ্ডন থেকে ১৮৯৭ অব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রতিকৃতি-অঙ্কণে তাঁর ইংরেজ গুরু, লুই পামার। পামার তাঁর চিঠিতে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন জনৈকা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার চিঠি থেকে—নাম ফ্রান্সেস অথবা ফ্যানি স্মিথ। এই স্মিথ-পরিবারের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বেশ ভাব হয়েছিল ১৮৪৬ অব্দে। মি: পামার লেখেন : 'এই মহিলা একজন এমেচর আর্টিস্ট, বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তাঁর ছেলে নগেন্দ্রনাথকে দেবার জন্য। নগেন্দ্রনাথ হয়তো জানতেনও না সে-ছবির কী গতি হয়েছে। ছবিটি বহুকাল ডালিচ্-এ ফ্যানির বাবার বাড়ির দেয়ালে টাঙানো থাকত। মহিলাটি তাঁর চিঠিতে তোমার পিতামহের (নগেন্দ্র) সঙ্গে তাঁর বন্ধুতার কথা বিস্তারিত করে লিখেছেন। নগেন্দ্রনাথের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আমার খুব ইচ্ছা হয় তরুণ বয়সে তাঁর পিতামহ কত-যে সুদর্শন ছিলেন—সেই কথাটা তাঁর পৌত্রকে জানাতে। আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল তাঁর—বাবার বাড়ির বাগানে বসে আমরা দুজনে পড়তাম শেকসপীয়র, বাইরন ও অন্যসব কবিদের লেখা বই। পড়তে পড়তে তিনি অনেক কবিতা সংস্কৃতে (সম্ভবত বাংলা হবে, কারণ নগেন্দ্রনাথের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল না) অনুবাদ করতেন। চলনে বলনে তিনি ছিলেন শান্ত গম্ভীর, গায়ের রঙ ছিল ফর্সা, আর চোখ দুটি এত সুন্দর যে তুলনা হয় না। আমাদের ভালোবাসা ছিল অতীতের প্রেম-কাহিনীর মতো, নগেন্দ্র ছিল বয়সে তরুণ ও রূপে-গুণে অদ্বিতীয়, আমিও ছিলাম তরুণী রূপসী। তরুণ বয়সের সবটুকু প্রেম আমরা উজাড় করে দিয়েছিলাম পরস্পরের কাছে। জানতাম দুজনেই, এ-প্রণয়ের পরিণতি ঘটবে বিচ্ছেদের দুঃখে। শেষ-বিদায়ের দিন এল, নগেন্দ্র নানা উপহার এনেছিলেন আমার জন্য, তা থেকে আমি গ্রহণ করেছিলাম একটি মাত্র জিনিস— সেটি তাঁর পরিধানের শাল। দুঃখের অশ্রুতে আমাদের প্রণয়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। যদিও স্ত্রী ও মা হয়ে আমি সুখী হয়েছি এবং চুলে আমার পাক ধরেছে, আজো

যখন সেই বিগত দিনের সহজ সরল অমলিন কিশোর বয়সের প্রেমের কথা স্মরণ করি, আমার দু-চোখ জলে ভরে যায়। আমি শুনেছিলাম নগেন্দ্র আর ইহজগতে নেই, তা যদি না শুনতাম তাহলে আমি কখনো হয়তো বিবাহ করতাম না।'...[৬]

অবনীন্দ্রনাথ ফ্যানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূচনা করার পর উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ঘটেছিল। ফ্যানি তাঁকে ছাপা ছবিতে হাতে রঙ করা এক কপি 'আইরিশ পোয়েমস' নামে বই পাঠিয়েছিলেন। অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা 'নদী' বিচিত্রিত করার কথা হয়তো তাঁর পিতামহের মনে জেগেছিল ফ্যানির পাঠানো সেই বই দেখার পর। অমিতেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এটা অবশ্য নিতান্তই আমার অনুমান।'

## টীকা

১। *Memoir*. p. 8.

২। *Travel in India*, Longman, Brown, Green & Longman, 1845.

৩। W. Newman & Co., Calcutta, 1907.

৪। এই দুটি ছবি এই গ্রন্থে ছাপা হয়েছে সুভো ঠাকুরের সৌজন্যে।

৫। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রতিকৃতি কে-যে এঁকেছিলেন এবং এখন তা কোথায় আছে—খোঁজ করা দরকার।

৬। মূল চিঠি আছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগারে।

# গ্রন্থপঞ্জী

## ভূমিকা

দ্বারকানাথ তাঁর জীবৎকালে এবং বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বছর কালে দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। সে-সময় তাঁর সম্বন্ধে যত কথা বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে, তেমন বোধহয় আর কোনো ভারতীয় সম্বন্ধে বলা বা লেখা হয়নি। অথচ তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও বহুবিচিত্র কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলিল পরবর্তী কালের হাতে যা এসেছে, তা নিতান্তই যৎসামান্য। এই দুটি ঘটনার মধ্যে এমন একটি পরস্পর-বিরোধিতা আছে যে স্বতই প্রশ্ন জাগে কেন এমনটা হল। তবে কি দ্বারকানাথের প্রপৌত্র ও জীবনীকার ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনী-গ্রন্থে যে-অভিযোগ করেছেন তা আপাত-অবিশ্বাস্য মনে হলেও—সত্য? কার-টেগোর কোম্পানীর কথা লিখতে গিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এই কুঠির কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটি সর্বপ্রধান ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বে ও তাঁহার আদেশে দগ্ধীভূত হওয়াতে এই কারবার যে কত বিস্তৃত ছিল এবং কিরূপে পরিচালিত হইত তাহার বিবরণ উদ্ধার করিবার কোনো আশা নাই।...'

জীবনী-সংক্রান্ত কাগজপত্র যৎসামান্য যা বেঁচেছে তার অধিকাংশ ক্ষিতীন্দ্রনাথই উদ্ধার করেছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ সেগুলি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। পারিবারিক আবাস ছেড়ে চলে যাবার সময় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বত্ব অধিকার করে যখন সেখানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়—তখন একে একে ঠাকুরপরিবারের বিভিন্ন শাখা সেখান হতে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল) ক্ষিতীন্দ্রনাথের বিধবা পুত্রবধূ মেনকা ঠাকুর ক্ষিতীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত নানা পারিবারিক তথ্য এবং কিছু কিছু সামগ্রী ও তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারখানি রবীন্দ্রভারতীকে দান করে যান। আরো কিছু দলিলপত্র ও স্মারণিক দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করেছিলেন দ্বারকানাথের অপর এক প্রপৌত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেগুলি এখন শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের অভিলেখাগার-ভুক্ত। এফ. আর. স্যে-অঙ্কিত বিখ্যাত তৈলচিত্রটি কলকাতা টাউন হল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এখন আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ। সেখানেই আছে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অলবার্ট-এর মিনিয়েচর ছবি এবং দ্বারকানাথকে উপহৃত তাঁদের দেওয়া দুটি স্বর্ণপদক। ভাস্কর উইকস-রচিত দ্বারকানাথের আবক্ষ

মর্মরমূর্তি শোভা পাচ্ছে কলকাতা বেলভিডিয়রে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ-পথে।

একদা-বিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলা—যেখানে দ্বারকানাথ তাঁর বিরাট জমকালো উৎসবাদির ব্যবস্থা করতেন—তা এখন একপ্রকার বন্ধই থাকে—দেখে মনে হয় যেন সর্বজনবিদিত একটি স্মৃতি-স্তূপ। সেখানে যে-সব মনোরম শিল্পসামগ্রী ছিল কিনে নিয়েছিলেন বর্ধমান মহারাজ, কিছুবা নীলামে বেচে দেওয়া হয়েছিল। দ্বারকানাথের উত্তরাধিকারীরা তখন পিতৃঋণ শোধ করার জন্য নগদ টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত, তাছাড়া অ-পৌত্তলিক বলে স্মারণিক দ্রব্যে তাঁদের স্পৃহা ছিল না। পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে দ্বারকানাথ যে-বিরাট বৈঠকখানা-বাড়ি তৈরি করেছিলেন, শহরে যা ছিল তাঁর সদর-বাড়ি এবং যে-বাড়িতে থেকে অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ একদিন বাংলায় শিল্পকলার নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন, সে-বাড়ি কবে ধুলিসাৎ করা হয়ে গেছে এবং সেখানে উঠেছে জগাখিচুড়ি স্থাপত্য-রীতিতে তৈরী রবীন্দ্রস্মারণিক এক নাট্যমঞ্চ।

কালপারম্পর্য বজায় রেখে দ্বারকানাথের সর্বপ্রথম জীবনকথা প্রকাশিত হয় ১৮৭০ অব্দে। এটির নাম ছিল *Memoir of Dwarkanath Tagore*—লিখেছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার-এর বাৎসরিক স্মৃতিসম্মিলনীতে এই লেখা পাঠ করেন। মুদ্রণের পূর্বে তিনি এই রচনা কিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করলেও, বক্তৃতার ভাসা-ভাসা ভাবটুকু খানিকটা রয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গ-কথার আকারে বহু পরিপূরক তথ্যসহ কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের সুযোগ্য সম্পাদনায় *Memoir* গ্রন্থের একটি বাংলা অনুবাদ (অনুবাদক : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ), সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রকাশ করেন ১৯৬২ অব্দে। কিশোরীচাঁদ-রচিত ইংরেজী *Memoir* গ্রন্থের পর আরো একটি ভাসা-ভাসা ধরনের *Memoir* বের হয়, এটির লেখক ছিলেন জেমস ফারেল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত **দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী** ১৯৬৯ অব্দে প্রকাশিত হলেও লিখিত হয়েছিল ১৯০১ অব্দে। জীবনী-রূপে এটি অসম্পূর্ণ এবং কোনো কোনো বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিশদ হলেও, কিশোরীচাঁদ রচিত *Memoir*-এর তুলনায় একটু যেন কম পরিতৃপ্তিকর। বরঞ্চ **সমকালীন**-নামক বাংলা পত্রিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় দ্বারকানাথ-জীবনের প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে যে-প্রবন্ধাবলী লিখেছেন সেগুলি অধিকতর মনোজ্ঞ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী-রচনার দিক থেকে সহায়ক।

দ্বারকানাথের জীবৎকালে তাঁর যেসব জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সব চেয়ে সুপরিজ্ঞাত লেখাটি ১৮৪২ অব্দে বেরিয়েছিল **ফিশার্স কলোনিয়াল ম্যাগাজিন**-এ লেখকের নাম না দিয়ে। লণ্ডনের **টাইমস** কাগজ ১৮৪৬ অব্দের ৩ আগস্ট তারিখে পুরো এক কলম-ব্যাপী একটি যে-শোকবার্তা প্রকাশ করেন তাতেও একটি জীবনালেখ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু এ পর্যন্ত দ্বারকানাথ-বিষয়ে য-কিছু লেখা বেরিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে

পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য হল ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক ব্লেয়র বি. ক্লিং-লিখিত ও ১৯৭৬ অব্দে য়ুনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্ণিয়া-প্রকাশিত গ্রন্থ *Partner in Empire*। অন্যান্য জীবন-কথায় তথ্য যদিবা আছে, কোন্ সাক্ষ্য-প্রমাণ বা দলিলের উপর সেইসব তথ্যের ভিত্তি—তা সবসময় জানা যায় না। ক্লিং-এর গ্রন্থ সে-অভাব মোচন করেছে; এ-বইয়ে তথ্য-প্রমাণাদি তো আছেই, উপরন্তু দ্বারকানাথের শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত নানা উদ্যোগ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীও আছে। অধ্যাপক ক্লিং একজন পেশাদার ইতিহাসবিদ। পূর্ব-ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দ্বারকানাথ প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর বিরাট বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং সে-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন কেমন করে ঘটেছিল। যাঁরা এই বিশেষ বিষয় অনুধাবন করতে ইচ্ছুক তাঁরা অধ্যাপক ক্লিং-এর এই প্রামাণ্য গ্রন্থ-পাঠে উপকৃত হবেন।

বর্তমান লেখক দ্বারকানাথের বাণিজ্যিক উদ্যোগের কথা বিস্মৃত হননি, এড়িয়ে যেতেও চাননি। কিন্তু তাঁর মুখ্য আগ্রহের বিষয় হল দ্বারকানাথের ব্যক্তিত্ব; তাঁর স্বভাবের মানবিক ও কারুণিক দিক, তাঁর নানাবিষয়িনী প্রতিভা; খোলাখুলিভাবে ইহজাগতিক হয়েও কেমন করে তিনি নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও সংবদেনশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করেছিলেন; কত নিপুণভাবে তিনি দেশের লোককে দেখিয়েছিলেন কীভাবে প্রভুশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, শেষোক্তকে জব্দ করতে হয়; কেমন করে তিনি রচনা করেছিলেন জাতীয় সংহতির ভিত্তি; জাগ্রত করেছিলেন নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের চেতনা। তাঁর অব্যবহিত উত্তরাধিকাররূপে তিনি রেখে গেছেন ধর্ম, নীতি ও সমাজ-সংস্কারের এক বিরাট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে—পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি উপহার দিয়ে গেছেন কালিদাস-উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্য-প্রতিভাকে। এমন মহৎ সম্পত্তি রেখে যেতে পেরেছেন পৃথিবীর ক-জন লোক?

অতঃপর যে-গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে এবং মূল গ্রন্থের পাদটীকায় যে-সব পত্রপত্রিকা ও অপরাপর উল্লেখ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি এমনসব সামগ্রী যা প্রত্যক্ষ ভাবে লেখক পড়ে দেখেছেন। এইসব সামগ্রীর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে কাজে লেগেছে সমসাময়িক কালের দৈনিক কাগজ ও পত্র-পত্রিকা যা এ-দেশে বা বিলেতে ছাপা হয়েছিল। এগুলি দেখবার সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম-সংলগ্ন ব্রিটিশ লাইব্রেরি। গ্রন্থ ও দলিলপত্রের-আকারে সংখ্যায় বেশি এবং সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-নজির পাওয়া যায় ব্ল্যাকফ্রায়ার্স রোড-এর উপর অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরি ও রেকর্ডস বিভাগে এবং টেমস নদীর অপর তীরে অবস্থিত অলড্‌চি-এর বুশ হাউস-এ সংরক্ষিত তাঁদের খবরকাগজ বিভাগে। ব্রিটিশ লাইব্রেরির খবরকাগজ বিভাগ লণ্ডনের শহরতলী কলিনডেল-এ অবস্থিত। ১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথ এডিনবরা গিয়েছিলেন—তাঁর সেই

সফর-সংক্রান্ত তাবৎ প্রামাণ্য খবরাখবর ও দলিল দেখা যায় এডিনবরার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও টাউন কাউন্সিলের মহাফেজখানায়। কলকাতা বেলভিডিয়রস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সেকালের গ্রন্থপুস্তক ও পত্রপত্রিকার যে-সংগ্রহ আছে, এ-দেশে তেমন সংখ্যায় আর কোথাও নেই। আরো কিছু কিছু প্রামাণ্য নজিরের সন্ধান পাওয়া যায় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী ম্যুজিয়ম এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। এইসব প্রতিষ্ঠানে দ্বারকানাথ-সংক্রান্ত যে-সব দলিলপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দেখা যায় তার তালিকা অনুগ্রহ করে প্রস্তুত করেছেন তৎ-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কগণ।

এইসব প্রতিষ্ঠানের শিরোনামার নিচে সেইসব দলিলপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা দেওয়া হল :

**ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা**

**তৈলচিত্র** : ১৮৪৩ অব্দে এফ. আর. স্যে-অংকিত দ্বারকানাথের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি।

**দলিল** : ১। সমাজ-সংস্কারে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্মরণ করে লেডি উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর পত্র। ১৮৪২ অব্দের ৯ অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথকে লিখিত।

২। উইণ্ডসর কাসল থেকে ১৮৪৪ অব্দের ৩ আগস্ট তারিখে দ্বারকানাথকে লেখা চার্লস মারে-র চিঠি। এই চিঠিতে মারে জানিয়েছিলেন যে মহারাণী আদেশ দিয়েছেন তাঁর ও প্রিন্স অলবার্ট-এর মিনিয়েচর ছবি প্রস্তুত করা হবে দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। দ্বারকানাথের অনুরোধক্রমে তাঁদের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র তৈরি হয়ে জাহাজ-যোগে প্রেরিত হয়েছে।

**পদক** : ১। ১৮৪২ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের উপহৃত স্বর্ণপদক।

২। মহারাণী ভিক্টোরিয়া-কর্তৃক দ্বারকানাথকে উপহৃত স্বর্ণপদক।

**রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা, জোড়াসাঁকো, কলকাতা**

১। বারোঁ দ্য শোয়াইতের কর্তৃক পারী শহরে ১৮৪৭ অব্দে অংকিত দ্বারকানাথের তৈলচিত্র।

২। জনৈক ফরাসী চিত্রকর অংকিত—পারী শহরে দ্বারকানাথ।

৩। আগস্ট ১৮৪২ অব্দে প্রদত্ত এডিনবরার চার্টার অব সিটিজেনশিপ—নাগরিক অধিকারের সনদ।

৪। ডিউক অব নরফোক-মারফত প্রেরিত মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত

দ্বারকানাথের কুলচিহ্ন-সম্পর্কিত দলিল।

৫। ১৮৪২ অব্দের ৬ জানুয়ারি তারিখে দ্বারকানাথের প্রথম বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে টাউন হল-এ প্রদত্ত কলকাতা নাগরিকবৃন্দের মানপত্র।

৬। আদিমবাসীদের দাসত্বমোচন ও সংরক্ষণ সমিতি কর্তৃক ১৮৪২ অব্দে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে এডিনবরা শহরে প্রদত্ত মানপত্র।

৭। ১৮৪২ অব্দে ওয়েলস সংস্কৃতি সংরক্ষণ সমিতি প্রদত্ত মানপত্র।

৮। দ্বারকানাথ-ব্যবহৃত টুপি রাখার স্ট্যাণ্ড।

৯। দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত মোনোগ্রাম সম্বলিত ফল রাখার পাত্র।

১০। নামের আদ্যাক্ষর উৎকীর্ণ করে দ্বারকানাথের প্রথম শীলমোহর।

১১। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখায় দুই খণ্ডে দ্বারকানাথের পত্রাবলীর কপি।

১২। পুরাতন খবরকাগজ কর্তিকা সংগ্রহ।

১৩। ১৯০০ অব্দে আলফ্রেড ব্রেম-লিখিত ইণ্ডিয়া জেনারেল প্রেস নেভিগেশন কোং লিমিটেড-এর রিপোর্ট।

১৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত বারোঁ দ্য শোয়াইতের-এর চিঠি তাঁর আঁকা তৈলচিত্র প্রসঙ্গে।

১৫। দ্বারকানাথ-সম্পর্কিত বাজারী গুজব সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি।

১৬। দ্বারকানাথের সামাজিক ও আর্থিক কার্যকলাপ বিষয়ে সেকালের ভারতীয় পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতির সংগ্রহ।

১৭। ১৮৪২ অব্দে তাঁর বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে টাউন হল-এ দ্বারকানাথের সম্মানে সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা সম্পর্কে বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধ-সম্বলিত চিঠিপত্র।

১৮। দ্বারকানাথ-সংবর্ধনায় বক্তৃতা।

১৯। সংবর্ধনার উত্তরে দ্বারকানাথের বক্তব্য।

২০। ভারতে য়ুরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধিতা ক'রে হাউস অব কমনস-এর কাছে এতদ্দেশীয়দের আবেদন।

২১। ১৮৩৫ অব্দের **ক্যালকাটা মন্থলি জর্নাল**-এ প্রকাশিত, লর্ড বেন্টিঙ্ককে মানপত্র দেবার প্রস্তাব নিয়ে এতদ্দেশীয় সভার প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি ও দ্বারকানাথের বক্তৃতা।

২২। ১৮৩৫ অব্দের **ক্যালকাটা মন্থলি জর্নাল** থেকে সংবাদপত্র আইন সম্পর্কে দ্বারকানাথের উক্তি থেকে উদ্ধৃতি।

২৩। টাইপ কপি-সম্বলিত *Our Family Correspondence : 1835-1837* নামে একটি বাঁধানো খাতা।

২৪। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র।

২৫। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লিখিত পনেরোটি চিঠি—বাংলায় নয়টি ও ইংরাজীতে ছয়টি।

২৬। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও মি: গ্যারো-কে লিখিত দ্বারকানাথের দুটি চিঠি।

২৭। অধ্যাপক ব্লেয়র বি. ক্লিং কর্তৃক গৃহীত দ্বারকানাথ-নথীপত্রের একখানি ৩৫ মিলিমিটার ফিলম স্ট্রিপ।

**রবীন্দ্রসদন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন**

১। ১৮৩৯ অব্দের ২৮ জুন তারিখে উইলিয়ম প্রিন্সেস ও অপরাপর লোকের নামে দাতব্যকর্মে দ্বারকানাথের লক্ষ টাকা দান সম্পর্কিত ট্রাস্ট ডীড।

২। ১৮৪০ অব্দের ২০ আগস্ট তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অপরাপর ব্যক্তির নামে দ্বারকানাথের ডীড অব সেটেলমেণ্ট।

৩। ১৮৪০ অব্দের ২০ আগস্ট তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অপরাপরের সঙ্গে দ্বারকানাথের চুক্তিনামা।

৪। এক বছরের মেয়াদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নামে জমি-বাড়ি ইজারা দেবার পাট্টা—১৮৪০ অব্দের ১৯ আগস্ট তারিখে দ্বারকানাথ-কর্তৃক সম্পাদিত।

৫। ১৮৪৩ অব্দের ১৭ আগস্ট তারিখে সম্পাদিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইল।

৬। ঠাকুর-এস্টেট সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলায় লেখা দলিলপত্র—দ্বারকানাথ-স্বাক্ষরিত।

৭। পরলোকগত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের এস্টেট থেকে প্রাপ্য ঋণের তালিকা।

৮। ১৮৬৩ অব্দের ১০ আগস্ট তারিখে সম্পাদিত পরলোকগত দ্বারকানাথ ঠাকুরের এস্টেট সংক্রান্ত আমমোক্তারনামা।

৯। নিঃস্ব অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ঠাকুর তহবিলের জন্য সাময়িক ভাবে ট্রাস্ট-নিয়োগ।

১০। ১৯০৫ অব্দে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত *Our Family Correspondence* নামে বাঁধানো খাতা। কয়েকটি মূল চিঠিপত্র ছাড়া বাদবাকি সবকিছু টাইপ-করা।

১১। দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথের ডায়ারি।

১২। নগেন্দ্রনাথকে লেখা ফ্যানি স্মিথের একগুচ্ছ পত্র।

১৩। ফ্যানি-অংকিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা সি. লুই পামার-এর একটি পত্র।

১৪। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ট্রাস্ট ফাণ্ড হিসাবের খাতা।

## গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (বাংলা)

উদ্ভটসাগর, পূর্ণচন্দ্র দে : 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স দ্বারকানাথ', মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৩৬।

কুমার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সম্পাদিত : 'বংশ পরিচয়', ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬২।

গুপ্ত, অমিতাভ : 'দ্বারকানাথের সমাধি', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৬৪।

ঘোষ, বিনয় : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৮০০-১৯০০), কলকাতা ১৯৬৮।

ঘোষ, বিনয় : 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (সম্পাদিত), চার খণ্ডে সমাপ্ত। কলকাতা ১৯৬২-৬৬।

চক্রবর্তী, অজিত কুমার : 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭১।

চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র : 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয় সম্পত্তি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৪৮।

চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র কথা', কলকাতা, ১৩৪৮।

দে, পূর্ণচন্দ্র : 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্র', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৫২।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : 'আপন কথা', সিগনেট প্রেস, ১৩৫৩।

ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মেডিকেল কলেজ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৫৪।

ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ : 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৭৬।

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ : 'আত্মজীবনী', সম্পাদনা : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৪৬।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৪৬।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ : 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস', ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯১৫।

ঠাকুর, সৌম্যেন্দ্রনাথ : 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন', রূপা এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে কয়েকটি কথা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮৫৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১৮১৮-১৮৪০। সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫৬।

বসু, নগেন্দ্রনাথ ও মুস্তাফি, ব্যোমকেশ : 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯২৪।

বসু, নগেন্দ্রনাথ : 'বিশ্বকোষ', কলকাতা, ১৩০৫।

বসু, রাজনারায়ণ : 'সেকাল ও একাল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫৮।

বাগল, যোগেশচন্দ্র : 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩।

মিত্র, কিশোরীচাঁদ : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' (বাংলা অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ), কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। সম্বোধি, কলকাতা, ১৯৬২।

মিত্র, প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ ঠাকুর) : 'আলালের ঘরে দুলাল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৭।

মুখোপাধ্যায়, অমৃতময় : 'সমকালীন' পত্রে ১৩৬৯ থেকে ১৩৭৬ অবধি সময়ের মধ্যে প্রকাশিত দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : 'রবীন্দ্র-জীবনী', চার খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

### গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জী (ইংরেজী)

AHMED, A. F SALAHUDDIN : *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835.* Leiden, 1965

*Andrew Yule & Company, Ltd 1863-1963.* Andrew Yule & Company, Calcuta, 1963.

BAGAL, JOGESH CHANDRA . 'Early Years of the Calcutta Medical College'. *Modern Review*, September, 1947.

BAGAL, JOGESH CHANDRA : 'Milestones to our Freedom Struggle'. *Modern Review,* September, 1953.

BANERJEE, HIRANMAY : *The House of the Tagores.* Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968.

BANERJEE, SREENATH : *The Life of Dwarkanath Tagore* (Reprinted with permission of Newsman & Co. from Cotton's *Calcutta Old and New,* with alterations and additions.) Published by Author, 1974.

BANERJEE, TARASANKAR : 'Dwarkanath Tagore—the Salt Dewan'. *Calcutta Review,* November, 1963.

BASU, DILIP : 'The Banian and the British in Calcutta, 1800-1850', *Bengal Past and Present,* December, 1973.

BELL, JOHN HYSLOP : *British Folks and British India Fifty Years Ago: Joseph Pease and the Contemporaries,* London, n.d.

BHATTACHARYA, JOGENDRA NATH : *Hindu Castes and Sects.* Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1896.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, PARIS (Bulletin published in 1961 on the

occasion of an Exhibition on Rabindranath Tagore Centenary) containing a brief sketch of Dwarkanath Tagore and a reference to some reminiscences of his visit to Paris by his friend Felix-Sebastien Feuillet de Conches, along with two sketches of Dwarkanath.

BOSE, AMALENDU : 'A Note on Dwarkanath Tagore'. *Visva-Bharati Quarterly,* Vol. 31, no. 3, 1965-66.

BOSE, RAJNARAIN : *Sekal O Ekal* (Bengali), Calcutta, 1874. Bangiya Sahitya Parishad edition, Calcutta, B.S. 1358.

BOSE, SHIB CHUNDER : *The Hindoos As they Are,* Calcutta, 1881.

BROWN, S. S. : *Home Letters Written from India Between 1828 & 1841.* London, 1875.

BUCKLAND, C. E. : *Dictionary of Indian Biography.* London, 1906.

CAPPER, JOHN : *The Three Presidencies of India.* London, 1853.

CHANDRA, R. AND MAJUMDAR, J. K. : *Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohun Roy,* Vol. 1, 1791-1830, Calcutta, 1938.

CHATTOPADHYAY, GAUTAM : ed. *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century,* Vol. 1, Calcutta, 1963.

CHAUDHURY, K. N. : ed. *The Economic Development of India Under the East India Company, 1814–58.* Cambridge, 1971.

CHOUDHURI, NIRAD, C. : *Scholar Extraordinary—The Life of Professor the Rt. Hon. Frederick Max Müller, P. C.* The Oxford University Press, Delhi, 1974.

COLLET, SOPHIA DOBSON : *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* 3rd edition, edited by D. K. Biswas and P. C. Ganguli and published by Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1962.

COTTON, H. E. A. : *Calcutta Old and New.* W. Newman & Co., Calcutta, 1907.

DAS, HARIHAR : 'The Early Visitors to England'. *Calcutta Review,* October, 1924.

DAS, SATYAJIT : ed. *Selections from the Indian Journals,* 2 Vols, Calcutta, 1959.

DAS GUPTA, A. C. : *The Days of John Company : Selections from Calcutta Gazette, 1824–1832.* Calcutta, 1959.

DAS GUPTA, H. N. : *The Indian Stage,* 4 Vols., Calcutta, 1931–46.

DAS GUPTA, KALYAN KUMAR : 'Dwarkanath Tagore : 19th Century Pioneer'. *Indo-Asian Culture,* July 1971.

DE, SUSHIL KUMAR : *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century.* 2nd ed., Calcutta, 1961.

DIMOCK, EDWARD C. JR. : 'Doctrine and Practice among the Vaisnavas of Bengal' in Milton Singer's ed. *Krishna : Myths, Rites and Attitudes.* Honolulu, 1966.

DIX, J. : *Pen and Ink Sketches of Eminent Literary Personages.* London, n.d.

DUTT, NRIPENDRA KUMAR : *Origin and Growth of Caste in India,* Vol. II, Calcutta, 1965.

EDEN, EMILY : *Letters from India,* 2 Vols. Richard Bentley & Son, London, 1872.

FURRELL, JAMES W. : *The Tagore Family : A Memoir,* 2nd ed. Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1892.

GHOSH, MANMATHA NATHA : 'Friends and Followers of Rammohun', Satishchandra Chakravorty ed. *Father of Modern India,* Commemoration Volume, 1933, Calcutta, 1935.

GUPTA, ATULCHANDRA : ed. *Studies in the Bengal Renaissance.* National Council of Education, Jadavpur, Calcutta, 1958.

HEBER, R. : *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India.* 3 Vols., London, 1828.

HENDERSON, H. B. : *The Bengalee,* 2 Vols., Calcutta, 1829, 1836.

HUME, JAMES : *Letters to Friends by an Idler* From June 1842 to May 1843, Calcutta, 1843. From June 1843 to May 1844, Calcutta, 1844.

*Hundred Years of the University of Calcutta, 1857–1956.* University of Calcutta, 1951.

HUNT, JAMES D. : *Gandhi in London.* Pramilla & Co., New Delhi, 1978.

JACQUEMONT, VICTOR : *Letters from India 1829–1832.* London, 1936.

JOHNSON, GEORGE W. : *The Stranger in India,* 2 Vols. London, 1843.

KESAVAN, B. S. : *India's National Library.* Calcutta, 1961.

KLING, BLAIR B. : 'The Origin of the Managing Agency in India'. *Journal of the Asiatic Society,* Vol. XXVI, No. 66.

KLING, BLAIR B. : *Partner in Empire : Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India.* University of California Press, 1976.

KOPF, DAVID : *British Orientalism and the Bengal Rennaissance.* Berkeley, 1969.

KOTNALA, M. C. : *Raja Ram Mohun Roy and Indian Awakening.* Gitanjali Prakashan, New Delhi, 1975.

MAJUMDAR, J. K. : *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India,* Calcutta, 1941.

MAJUMDAR, R. C. : ed. *History of Bengal,* Vol. I, Hindu Period. University of Dacca, 1943.

MAJUMDAR, R. C. : *History of Ancient Bengal,* G. Bhardwaj & Co., Calcutta, 1971.

MAJUMDAR, R. C. : *Glimpses of Bengal in the 19th Century* Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1960.

MARTIN, MONTGOMERY : *History of the British Colonies.* In 5 Vols. 1834–35, Cochrane & McCrone.

MEHROTRA, S. R. *The Emergence of the Indian National Congress.* Vikas Publishers, Delhi, 1971.

MITRA, ASHOK : *Calcutta India's City.* Calcutta. 1963.

MITTRA, KISSORI CHAND : *Memoir of Dwarkanath Tagore.* Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1870.*

MUKHERJEE, NILMANI : *A Bengali Zamindar—Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his Times, 1808–1888.* Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta, 1975.

MUKHERJEE, S. N. : *Calcutta : Myth and History,* Subarnarekha, Calcutta, 1977.

MUELLER, F. MAX : *Biographical Essays,* London, 1884.

MUELLER. F. MAX : *Auld Lang Syne,* Longman, Green & Co., London, 1899.

MUELLER, F. MAX (MRS) ed : *Life and letters of the Rt. Hon'ble Frederick Max Müller,* Vol. I, Longman, Green & Co., London, 1902.

NANDA, B. R. : *Gokhale, Gandhi and the Nehrus : Studies in Indian Nationalism.* Allen & Unwin, London, 1974.

NATARAJAN, S. : *A History of the Press in India.* Asia Publishing House, Bombay, 1962.

ORLICK, CAPTAIN LEOPOLD VON : *Travels in India,* 2 Vols. Longman, Brown Green and Longman, London, 1845.

PARKS, FANNY : *Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque during Four and Twenty Years in the East.* 2 Vols. London, Pelham Richardson, 1850.

ROBERTS, EMMA : *Scenes and Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society.* 3 Vols. London, 1835.

ROY, PRAFULLA CHANDRA : *Life and Experience of a Bengali Chemist.* 2 Vols. Calcutta, 1932 & 1935.

ROY, RAMMOHUN : *The English Works of Raja Rammohun Roy,* 6 parts, ed. Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Calcutta, 1945–51.

RUNGTA, RADHE SHYAM : *The Rise of Business Corporations in India. 1851–1900.* Cambridge University Press.

SARKAR, JADUNATH : ed. *The History of Bengal,* Vol. II, Muslim period. New ed. by Academica Asiatica, Patna, 1973.

SASTRI, SIBNATH : *Ramtanu Lahiri, Brahman and Reformer.* ed. Roper Lethbridge, London, 1907.

SEN, AMIT : *Notes on the Bengal Renaissance.* Calcutta, 1946.

SEN, DINESH CHANDRA : *History of Bengali Language and Literature.* Calcutta, 1954.

SEN, PROSANTA KUMAR · *Biography of a New Faith.* Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1950.

SINHA, MIHIR : 'Dwarkanath Tagore, the Prince of Indian Renaissance'. *Quest,* April, 1964.

SINHA, NARENDRA KRISHNA : *The History of Bengal : 1757–1905.* The University of Calcutta, 1967.

SINHA, NIRMAL : ed. *Freedom Movement in Bengal, 1818–1904. Who's Who.* Calcutta, 1968.

SINHA, N. C. : *Studies in Indo-British Economy Hundred Year Ago.* Calcutta, 1946.

SINHA, PRADEEP : *Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History.* Calcutta, 1965.

SPEAR, P. : *The Nabobs.* London, 1932.

STOCQUELER, J. H. : *The Handbook of India.* W. H. Allen & Co. 2nd ed. London, 1845.

STOCQUELER, J. H. : *Memoirs of a Journalist.* Times of India, Bombay, and Fleet Street, London, 1873.

TAGORE, DEBENDRANATH MAHARSHI : *The Autobiography of .* English translation by Satyendranath Tagore and Indira Devi, Calcutta, 1909.

TAGORE, RATHINDRANATH : *On the Edges of Time.* Orient Longman, Calcutta, 1958.

TAGORE, SATYENDRANATH : 'Letters', edited by Indira Devi. *Calcutta Review,* 1924 (Vol. XII).

THOMPSON, GEORGE : *Addresses delivered at Meetings of the Native Community at Calcutta and on other occasions.* Calcutta, 1843.

THORNER, DANIEL : *Investment in Empire.* Philadelphia, 1950.

TRIPATHI, AMALES : *Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793–1833.* Orient Longman, 1956.

*Author's apology : Although spelt as 'Kissori' in the present text, the name was printed as 'Kissory' in the title page of the original edition of *Memoir of Dwarkanath Tagore,* when published in 1870, by Thacker, Spink & Co., Calcutta.

# অনুক্রমণী

Lasertypeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi
and printed at Beauty Print, New Delhi